গল্প সমগ্র

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

সূচিপত্র

গল্প সমগ্র

সুজিত-মিতু ও লক্ষ্মীর পাঁচালি

সুজিত অফিস থেকে ফিরে তার বউকে সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেল না। ছেলে খেলতে বেরোবার জন্য উন্মুখ হয়ে ছিল। ব্যাট বগলদাবা করে বলল মা রান্নাঘরে। গলার আওয়াজে মিতু রান্নাঘর থেকে লম্বা করে গলা বাড়িয়ে বলল— 'জামা কাপড়গুলো বদলাতে থাকো না বাবা, একটু তর সয় না।'

জামাকাপড় বদলানো হয়ে গেল, হাত পা ধোয়া হয়ে গেল, বসার ঘরের ঠাকুর্দার আমলের আরামকেদারাখানায় দু ঠ্যাং দু দিক থেকে তুলে দিয়ে আরামে সিগারেট ধারানো হয়ে গেল, সে-সিগারেট ছাইদানে ভস্মীভূত কঙ্কাল হয়ে গেল, তখনও চা-টার দেখা নেই। অগত্যা সুজিত পায়ে পায়ে রান্নাঘরের দিকে এগোল— 'কী রাজকার্যটা হচ্ছে শুনি।'

উত্তরে মিতু বলল— 'হাত-পা ছেড়েছ? হাত-পাগুলো বদলাও।'

সুজিত অবাক হয়ে নিজের হাত-পাগুলো চোখ বড় বড় করে দেখতে লাগল, 'আরে ব্বাপ, বিকেলবেলার অফিস-ফেরত চা-জলখাবার অর্জন করতে হলে হাত পা বদলাতে হবে? এই হাত পায়ে হবে না?'

মিতু ততক্ষণে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে, ঘেমে নেয়ে গেছে একেবারে, ঘাম-লেপটানো চুলের গুছিগুলো ডান হাতের পিঠ দিয়ে সরাতে সরাতে বলল— 'ধুর, কী বলতে যে কী বলি!— জামাকাপড় বদলাবার কথা বলতে গিয়ে...এরই মধ্যে হয়ে গেল তোমার? দাঁড়াও দিচ্ছি, টপ করে জলটা বসাব, আর হয়ে যাবে।'

—'হ্যাঁ খপ করে হয়ে যাবে, কিন্তু তুমি যে দেখছি ধপ করে বসে পড়েছ। এই বিকেলবেলায় শিল-নোড়া নিয়ে বসেছ, ব্যাপারখানা কী। দেখি, এসব কী, হলুদ, লঙ্কা, বাপরে বাপ, তুমি কি হালুইকর বামুনের জোগাড়ের কাজ নিয়েছ কোথাও? প্র্যাকটিস দিচ্ছ?'

—'জোগাড়েই বটে!' মিতু চায়ের জল বসাতে বসাতে বলল—'দু-তিন দিনের মশলা একেবারে বেটে ফ্রিজে তুলে রাখব। এই সময় ছাড়া আর সময় কই বলো। বসেছি তো তিনটেয়। আমার কি কোনও জন্মে অভ্যেস আছে যে তাড়াতাড়ি পারব?'

—'তা তোমার সেই বাহনটি?' মুখচোখ পাকিয়ে সুজিত প্যাঁচার মুখাকৃতি নিজের মুখে তৈরি করতে চেষ্টা করল।

—'লক্ষ্মী? তার হাতময় র‍্যাশ বেরিয়েছে। একজিমাঅলা হাতের বাটনা খাবে? তো বলো।'

—'সব্বোনাশ, বাটনা খাব কী? কোনওদিন খেয়েছি? তা বাটনার দরকারই বা কী? গুঁড়ো মশলায় হয় না?'

— 'হলুদে ঘোড়ার নাদ, মরিচে ধুনো, জিরেতে বালি, খাবে? তো বলো।'

সব প্রশ্নের উত্তরেই মিতু সুজিতকে একই ভঙ্গিতে কোণঠাসা করে ফেলে। খাবে? তো বলো। খাবে? তো বলো।

—'রাজ্যসুদ্ধু লোক কি ঘোড়ার নাদ, আর রাস্তার ধুলো খাচ্ছে মশলা বলে? তা ছাড়া লঙ্কাই বা বাটছ কেন অত? ওতে তো আরও হাত জ্বালা করবে।'

—'লক্ষ্মী লঙ্কাবাটা ছাড়া খেতে পারে না, রাঁধতেও পারে না, আমি বলেছি আমাদেরটা আলাদা করে সরিয়ে রেখে নিজেরটা যেন ও লঙ্কা পেঁয়াজ দিয়ে রেঁধে নেয়।'

—'লক্ষ্মী খাবে বলে তুমি লঙ্কা বাটছ?'

—'চুপ চুপ', মিতু ছিলেছেঁড়া ধনুকের মতো সটান হয়ে যায়। 'ওদিকের বারান্দায় আছে, গাছে জল দিচ্ছে।'

সুজিত অতএব চুপ করেই গেল। গাছগুলো যত না মিতুর শখের, তার চেয়েও বেশি সুজিতের। নার্সারি থেকে বাছাই করা বীজ এবং চারা। মাটি মিশেল করা, সার অর্থাৎ কেমিক্যাল সার দেওয়া, গোলাপের জন্য হাড়ের গুঁড়ো ইত্যাদির জন্যে হর্টিকালচারে আনাগোনা এসব সুজিত নিজের তাগিদেই করে। ছাদ নেই, জমি তো নেই-ই। পুরনো ধরনের বাড়ি, তাই লম্বা চওড়া একটা বারান্দা আছে পুব দিকে। সকালের রোদ পড়লেই গাছগুলো এখানে হেসে উঠবে—সূর্যমুখী, টগর, জবা, জুঁই, বেল, রঙ্গন, এমন কি স্থলপদ্ম। শীতকালে গোলাপ ছাড়াও প্যানজি, লার্কস্পার, সুইট সুলতানা, জিপসি, অ্যাসটার ফোটে। এখনও ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা করবার সময় পায়নি সুজিত। গোলাপও যা ফোটে, খুব একটা ভাল নয়। তা মালিক কিনেই খালাস, প্রাথমিক সার-টারগুলোও, দিয়ে দিল। তারপর নিয়মিত জল দেওয়া, মাটি উলটে দেওয়া, বাজে পাতা ফেলে দেওয়া, নিয়ম করে গাছ ছাঁটা এসবের ধৈর্যই তার নেই। নিজের শখের বোঝা অতএব বউয়ের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে চুপ। সকালবেলার 'বাগানে' বসে আবার হুল-ফোটানো মন্তব্যও হয়।

—'কী গো, কাল রজনীতে কি তোমার রজনীগন্ধা বনে ঝড় হয়ে গেল নাকি?'

—'"তোমার" মানে? "আমার" বলো। শখের বেলা ওনার, যত্নের বেলা আমার, না?'

সুজিতের সব শখই এমনি। সেবার কুকুর কিনেছিল। মিতুর কুকুরের গায়ে হাত দিলেই গা শিরশির করে, সে কুকুর ছুঁতেই চায় না। আর সুজিতের ধারণা ছিল, কুকুর মানে সে অফিস বেরোবার সময়ে কুকুর লম্বা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তার গাল চেটে দেবে, অবোলা চোখ দিয়ে কাকুতিমিনতি করবে 'আর কিছুখন না হয় বসিলে কাছে' গোছের, অফিস থেকে ফিরলে দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং ভীমবেগে ল্যাজ নাড়তে থাকবে। এ ছাড়াও মুখে করে চটি এনে দেওয়া, খবরের কাগজ এনে দেওয়া এ সবও তার শখের কুকুর করবে, চোর এলে ঘেউ ঘেউ করা ছাড়াও। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল সেই কুকুর মানুষের ছানার চেয়েও তুলতুলে, এক প্রায় হাড়হীন খোসা ছাড়ানো মতো জীব, যাকে ছোট্ট বোতলে করে ডুডু খাওয়াতে হয়, ঘণ্টায় ঘণ্টায় তুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে তার অ্যা এবং হিসি পরিষ্কার করাতে হয় যখন-তখন। ডাক্তার ডাকতে হয় নিয়ম করে, ইঞ্জেকশন, স্নান, বড় বড় লোম আঁচড়ানো এবং পাউডার মাখানো তো আছেই। তার ওপর ল্যাজ নাড়তে এবং 'সিট ডাউন' 'ইধর আও' ইত্যাদি কুকুরি বুলি শেখবার অনেক আগেই সে তার দাঁতের ধার পরখ করতে সুজিতের বালিশ-তোশকের তুলো বার করে ফেলল, চেয়ারের পায়া কামড়ে কামড়ে ভিন্ন আকৃতির করে দিল, বসার ঘরে

কৌচের রেক্সিন ফুটো করে দিল। সুতরাং, সুজিতের ধৈর্য অনেক দিন আগেই শেষই হয়ে গিয়েছিল, এখন সে পুরোপুরি মিতুর ঘাড়ে কুকুরের দায়িত্ব চাপিয়ে দিতে চায়। ছেলে কুকুরের সঙ্গে বল খেলবে কিন্তু চান করাবে না। দু বছরের সেই কুকুর আতঙ্ক হয়ে ওঠায় সুজিত তাকে বন্ধুকে দিয়ে দিল। এই নিষ্ঠুরতায় মিতু আজও যখন-তখন চোখের জল মোছে। গাছের শখটা আরও অনেক কম 'মানবিক'।

গোলাপ চারা শুকিয়ে গেলে বড় জোর তুলে ফেলতে ফেলতে বলতে হবে— 'ইস্স্, বসরাই-এর চারা ছিল গো, ফোটাতে পারলুম না।' মিতু চোখে ব্যঙ্গ এবং ক্রোধের মিশেল নিয়ে এক পলক মাত্র তাকাবে, ভাবটা 'যে পারে সে এমনি পারে, পারে গো ফুল ফোটাতে'। রাগ না, ঝাল না, কান্নাকাটি তো নয়ই। সুতরাং আপাতত এই বারান্দা-বাগানই তাদের সংসার-মরুভূমিতে মরূদ্যান। টগর ফোটে অজস্র, কত পুজোর ফুল নেবে নাও না। রজনীগন্ধা, বেল, জুঁইও তাই। শীতের মরশুমে ছোট ছোট রং-করা টবে সুন্দরী ফুলসুদ্ধ গাছ বসবার ঘরে সাজিয়ে রাখা যায়।

রবিবার দিন সুজিত একটু-আধটু আড্ডা মারতে ভালবাসে। আড্ডা তার নিজের বাড়িতেও বসে, অন্য কোনও বন্ধু-বান্ধবের বাড়িতেও বসে। শান্তির বাড়ি আড্ডা বসার সুবিধেটা একটু বেশি। কারণ শান্তি এখনও অবিবাহিত। বাড়িতে শুধু মা। শান্তির বাড়ির আড্ডায় তিন রাউন্ড চা-কফি তো হয়ই, ওরা গেলে শান্তির মা ভীষণ খুশি হয়ে টুকটাক খাবার জিনিস পাঠিয়ে দেন। পলতার বড়া, পেঁয়াজি, এঁচড়ের চপ। একেবারে দেশি খাবার কিন্তু গরম গরম খেতে দারুণ। শান্তিদের দেশ থেকে মুড়ি আসে। সে মুড়ির স্বাদই আলাদা। মাঝে মাঝেই পেটে কিছু পড়ার দরুন ভাত খিদেটা জানান দেয় না। এ রোববার সুজিত ফিরল কাঁটায় কাঁটায় একটা। দরজা খুলে দিল মিতুই। খুলে এক সেকেন্ডও দাঁড়াল না, মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। আঁচলে চাবি বাঁধার রেওয়াজটা থাকলে ঝনাৎ করে একটা শব্দ হত নির্ঘাত। ছেলেবেলায় এ আওয়াজ সুজিত এনতার শুনেছে। একটু অপরাধী-অপরাধী মুখে সে তাড়াতাড়ি জুতো খুলে স্নানে ঢুকতে যাবে, মিতু বলল— 'লক্ষ্মীর খিদে পেয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি করো।'

—'তো একটু বেশি করে জলখাবার খাইয়ে দিলেই পারো।'

মিতু বলল— 'বাবা, প্রথম রাউন্ডে চা-মুড়ি, দ্বিতীয় রাউন্ডে পাউরুটি তরকারি, তৃতীয় রাউন্ডে মিছরির শরবত আর কত খাওয়া খাওয়াব গো। তার ওপরে আছে দু মিনিট অন্তর পানের খিলি মুখে পোরা।'

কাজের লোকের জন্য সুজিতদের বাড়িতে ইদানীং পানের পাট আরম্ভ হয়েছে।

মিতু মুখখানাকে তোম্বা করে এসে বলল— 'চান না হয় একটু পরেই করবে, আগে ভাতটা খেয়ে নাও।' অনুরোধ নয়, উপরোধ নয়, একেবারে অনুজ্ঞা, 'আগে ভাতটা খেয়ে নাও।'

এরকম অনুজ্ঞা সত্যি কথা বলতে কী সুজিত কোনওদিনই মিতুর কাছ থেকে শোনেনি। একটু ঘাবড়ে গিয়ে মাথা চুলকে বলল— 'ভাত খেয়ে চান? সেকী গো। স্বাস্থ্যের পক্ষে ভীষণ খারাপ বলে যে? কেন? তোমার কি খুব খিদে পেয়ে গেছে?'

—'বললুম তো আমার নয়, ওর। বলছিল এত বেলা অবধি টাঙানো থাকতে হলে কাজ করতে পারবে না। আগের বাড়িটাতে নাকি একেবারে ঘড়ি ধরে খাওয়া-দাওয়া...।'

—'তো ওকে খাইয়ে দাও।'

মিতু মুখ বাঁকিয়ে বলল—'আ-হা-হা, শুধু ভাতটা নামিয়েছে আর প্রেশার কুকারটা বসিয়েছে। রান্না-বান্না সব আমি করলুম, এর পরে যদি খাইয়ে দিই আগে থেকে তাহলে তো মাথায় চড়ে বসবে।'

আড্ডা-ফেরত আধা-সপ্তাহের বাজার করে এনেছে সুজিত। গোছাতে গোছাতে মিতু মাথায় হাত দিয়ে বসল, রকম দেখে সুজিত বলল—'হল কী?'

—'তোমার আক্কেলখানা দেখছি। একসঙ্গে এঁচড়, মোচা, থোড়, আর কিছু গাছের গুঁড়ি শেকড়-বাকড় পেলে না?'

—'বাঃ, তিনমাস পরে তুমি লোক পেলে, রকম রকম সবজি খাওয়া তো উঠেই গেছে আমাদের। আনব না?'

—'কেন গো লোক বলে সে বুঝি মানুষ নয়। এঁচড়, মোচা, থোড়, তিনদিন পর পর কাটতে তারও তো প্রাণ বেরোবে, না বেরোবে না?' গলা খাটো করে মিতু বলল।

এবার সুজিতের রাগ হয়ে গেল, বলল—'ঠিক আছে, এবার থেকে বেগুন আর পটল আনব। সঙ্গে বেশ করে ঝিঙে। আর কিছু খেয়ে আমাদের কাজ নেই। এগুলো তোমার লোক কাটতে পারবে তো? না আমি কেটে দেব?'

সন্ধের শো-য়ে দুজনের সিনেমা যাবার টিকিট কাটা আছে। মিতু ভয়ে ভয়ে বলল— 'কী গো, টিভিটা খুলে দিয়ে যাবো না কি?'

—'পাগল হয়েছ, তিনটে সাড়ে তিনটে থেকে টিভি খোলা থাকবে? বন্ধ করতে পারবে কি পারবে না। তারপর টুবলুর পড়াশোনা আছে। মাস্টারমশাই আসবেন।'

লক্ষ্মী আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বলল —'দাদাবাবু টিবি খোলা বন্ধ করা আমার অভ্যেস আছে। টিবি ছাড়া বাড়িতে তো কখনও কাজ করিনি। আমি খুলে নোব'খন। নিশ্চিন্দি হয়ে যান দাদাবাবু।'

সুজিত আমতা আমতা করে বলল— 'টুবলুর রোববার মাস্টারমশাই আসেন, এইখানে পড়বে।'

লক্ষ্মী অনেক স্মার্ট, সে চটপট বলল— 'জগবন্ধু উকিলবাবুর বাড়ি কাজ করতুম, তাঁদের ছেলেরা তো দিনরাত টিবির সামনে বসেই পড়ত। টিবি বিডিও। তা সে যাক, আমি টুবলুমণিকে ভেতরের ঘরে বেবস্থা করে দেব।'

মিতু ছোট্ট ছোট্ট করে চিমটি কাটছিল সুজিতের হাতে। 'টুবলুমণি' শুনে বোধহয় একেবারে গলে গেল। বলল—'ঠিক আছে লক্ষ্মী, দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ো, আর আস্তে খুলবে। যেন বেশি আওয়াজ না হয়।'

রাস্তায় নেমে সুজিত ফেটে পড়ল একেবারে— 'গলে যে জলবত্তরল হয়ে গেলে? বাটি ধরব নাকি? টুবলুমণি! আজ টিভি খুলবার অনুমতি দিচ্ছ, কাল আলমারি খোলবার অনুমতি দেবে। ভাল, ভাল।'

মিতু বুঝতে পেরেছে কাজটা ভাল হয়নি। সে করুণ মুখ করে বলল— 'মুখের ওপর কী করে বলা যায় গো। গিন্নি-বান্নি। আমাদের চেয়ে বয়সে বড়, ভব্যিযুক্ত। তুমি

নিজে বললে না কেন?'

—'আমি বলব? তুমি থাকতে? এসব আ-আ-আমাদের কোনওকালে অভ্যেস নেই।'

—'অভ্যেস নেই তো চুপ করে থাকো। আমাকে বোকো না। আমি যেমন পারব তেমন করব তো।'

ছবিটা ভাল। কিন্তু সুজিত একদম উপভোগ করতে পারল না। খালি মনে হচ্ছে কনট্রাস্ট-এর নবটা একটু গড়বড় করছে, একেবারে খারাপ হয়ে না যায়, হলেই তো টেকনিশিয়ান, এবং টেকনিশিয়ান একরকমের বাঘ, ছুঁলে আঠারো ঘা, তার ওপরে আবার টুবলুর মাস্টারমশাই না এলে তো একেবারেই চিত্তির। ছেলেকে তারা হিন্দি-ফিল্ম বা বাজে বাংলা ছবিও দেখতে দেয় না। শিশুকে শিশুই রাখবে এই সুজিতের প্রতিজ্ঞা। প্রতিবেশীরা, আত্মীয়স্বজনরা, বন্ধুবান্ধবরা যা-ই করুক না কেন। তাদের শিশুরা টি.ভি. বিষয়ে যথেচ্ছাচার করুক। সুজিত তার শিশুকে, এখন সাড়ে আট বছরের, কোনওমতেই স্বেচ্ছাচারী হতে দেবে না। সে খুব কৌশলে টুবলুকে ওই সব লাল-দাগ দেওয়া টি.ভি. সময়গুলো অন্যভাবে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করে। মুশকিল হচ্ছে মাস্টারমশাই স্বয়ংই। অর্থাৎ বাইশ-তেইশ বছরের যে যুবকটি টুবলুকে পড়ায়, শনি-রবিবারে কেন কে জানে তার প্রায়ই অসুখ করে যায়। সে গাঁইগুঁই করতে থাকে। কাজেই রবিবারে গরগরে ছবি থাকলে তার আবার মাথা ধরা-ফরা হয়ে থাকা সম্ভব। সেক্ষেত্রে টুবলু ছাড়া গরু। যা খুশি করবে। সুজিত-মিতু তার জন্য অনেক আত্মত্যাগ করে। টুবলু দেখতে পারবে না, এমন ছবি তারা দেখেই না সাধারণত। রবিবার মাস্টারমশাই না এলে সুজিতই তাকে নিয়ে বেরোয়। পার্কে ঘোরে। ফাঁকা পার্ক। আশপাশের বাড়ি থেকে ফিল্মি গানের তীক্ষ্ণ কলরোল, নাচের হল্লা এবং মারদাঙ্গার আওয়াজ ভেসে আসে। সুজিত টুবলুকে প্রাণপণে গল্প বলতে থাকে। অবশেষে টুবলু খুব উদাস চোখে পার্কের গাছের মাথা দেখে, ঘাস দেখে, তারপর বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'পার্থ বলছিল, আজ একটা খুব মিষ্টি প্রেমের বই আছে বাবা, আজ আমাকে নিয়ে এলে কেন?'

আজকালকার বাচ্চারা মায়ের পেট থেকেই রকবাজ হয়ে জন্ম নেয়। গোঁফ দাড়িগুলো অদৃশ্য থাকে, কিন্তু থাকে ঠিক। সুজিতের এতদিনের আত্মত্যাগ, ছেলেকে অন্য জিনিসে তন্ময় রাখার চেষ্টা এবং সর্বোপরি তার কাছ থেকে ব্যাপারটা গোপন রাখবার চালাকি একেবারেই সফল হয়নি। সেই অকালপক্ক টুবলু সুযোগটা পেলেই তা লুফে নেবে।

ইন্টারভ্যালের সময়েই সুজিতের মুখ আশঙ্কায় থমথম করছে। ঝড়ের আভাস। মিতু করুণ মুখে বলল—'শেষ পর্যন্ত দেখবে তো? না কী? আমার কিন্তু ভীষণ ভালো লাগছে।'

সুজিত থমথমে মুখে বলল—'হ্যাঁ, একগাদা খরচ করে ড্রেস-সার্কলের টিকিট কিনেছি—দু ঘণ্টা লাইন দিয়েছি, দেখবার জন্যেও গোটা হপ্তা হাঁ করে বসে আছি। দেখব তো বটেই। তবে আমি গল্পটা কিছুই ফলো করতে পারছি না। এনজয় করছি না একটুও।'

দরজা খুলে দিল টুবলু।

—'টুবলু—মাস্টারমশাই এসেছিলেন?'

—'হ্যাঁ-অ্যা-অ্যা। —'আজ তো মাস্টারমশাই টিভি দেখলেন, বলেছেন মঙ্গলবার অঙ্ক দেখিয়ে দেবেন।'

—'মাস্টারমশাই টিভি দেখলেন?'

—'মাস্টারমশাই দেখলেন, লক্ষ্মীমাসি দেখল, আমি কিন্তু দেখিনি বাবা। আমি জেনারেল নলেজের বই পড়ছিলুম। যখন তিনটে গাড়ি শাঁ শাঁ করে রেস দিচ্ছিল, একটা পুলিশের, একটা বেসরকারি ডিটেকটিভের, আর একটা হিরোইনকে নিয়ে ভিলেনের ... সেই সময়ে আমি বই পড়েছি, তার পরে যখন লড়াই হল, পাহাড়ের ওপর থেকে ডিটেকটিভ ভিলেনকে ফেলে দিল, গড়াতে গড়াতে গড়াতে গড়াতে, রক্তে সমস্ত জামা-কাপড় ভিজে যাচ্ছে, আর হিরোইন জামা-কাপড় ভাল করে পরছে, আগে তো পরা ছিল না বাবা, তখন আমি লিখছিলুম।'

—'খুব করেছ। বেশ করেছ। বাঃ।'

লক্ষ্মী খুব বিজ্ঞ লোকের মতো বলল— 'তা আপনাদের ছেলেকে ভাল বলতেই হবে, বউদি। অমন মার-কাট ছবিখানা দেখল না। সুদ্ধু সময়ে সময়ে এসে বসছিল। আর মাস্টারটিও ছেলেমানুষ। ঘর থেকে মাঝে মাঝে মুখ বাইড়ে দেখছিল, তো আমি বললুম— এসে বসুন না, এখানে। খোকাকে টাক্‌স দিয়ে আসুন গিয়ে। এমন ছবিটা মিচ্‌ করবেন? তাইতে এসে বসে।'

অর্থাৎ আজকের নাটকের ডিরেকশন পুরো শ্রীশ্রীযুক্তেশ্বরী লক্ষ্মীমণির। কে জানে এখন থেকে সব নাটকই তিনিই পরিচালনা করবেন কিনা। মিতুর কী মনে হচ্ছে কে জানে, মুখখানা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে আছে, সে বোধহয় সুজিতের বিরাগের কথা মনে করে। সুজিতের মনে যা হচ্ছে তা সুজিতই জানে।

পরের শনিবার নাগাদ লক্ষ্মীমণি তার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ দাবি পেশ করল।

—'হ্যাঁ গা বউদি, আপনাদের ফ্লাক্‌স নেই?'

—'ফ্লাস্ক? কেন গো?'

—'আছে কি নেই বলুন না আগে।'

—'হ্যাঁ আছে তো।'

—'বার করতে তো দেখিনাকো।'

—'দরকার হয় না, তাই দেখো না।'

—'বার করে দেবেন তো। শনি-রবিবার বিকেলের চা-টা করে রেখে দোব। বই দেখার সময়ে চা করতে বড্ড বিরক্ত লাগে।'

মিতু হাঁ করে ছিল। কিছু বলতে পারল না। সুজিত ছাড়া সবার কাছেই ও মুখচোরা। কিছুক্ষণ পর লক্ষ্মী বলল—'আপনি সন্ধেটাও চারটের মধ্যে দিয়ে দেবেন। দিয়ে-টিয়ে একেবারে নিশ্চিন্তি হয়ে বসবেন।'

এবার মিতুর মুখ ফুটল। বলল— 'সন্ধে হবার আগেই সন্ধে দিয়ে দোব? আচ্ছা তো! এত কী সিনেমা দেখার ঝোঁক? আর তোমাকে তো আর সন্ধে দিতে হচ্ছে না। তোমারই বা অত মাথা-ব্যথা কেন?'

লক্ষ্মী বলল— 'আপনি গা ধোবেন, সাজগোজ করবেন, তারপর সন্ধে দেবেন, আর আমি বসে বসে দাদাবাবুর সঙ্গে বই দেখব?'

মিতু বলল— 'তবু ভাল, আক্কেল আছে তোমার।'

—'থাকবে না কেন বউদিদি, সবই আছে। দুঃখী নোক আমরা। বই দেখে যা একটু আহ্লাদ করি, কেমন নাচা-গানা, ভাব-ভালবাসা, আমাদের গরিব লোকেদের জীবনে তো সেসব হবার নয়, দেখে দেখে আশ মেটাই। তো তাতে যদি আপনাদের খুব অসুবিধে হয় তো নাই দেখলুম অমন বই, বউদিদি।' লক্ষ্মী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

মিতু ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'আমি আবার তোমায় কখন বই দেখতে বারণ করলাম। আচ্ছা লোক তো তুমি।'

তার পরের শনিবারে লক্ষ্মীমণি তার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দাবি পেশ করল।

—'সকালবেলায় চালের সঙ্গে আপনি আটাটাও বার করে রাখবেন বউদি।'

—'কেন গো?'

—'রুটিগুলো করে রেখে দেব। রাত্তিরে একটু গরম করে নিলেই খাওয়া যাবে।'

—'সে কী! অমন রুটি আমরা খেতে পারি না লক্ষ্মী।'

—'অভ্যেস করে নেবেন, জগবন্ধুবাবু উকিলের বাড়িতে তো এক রাশ রুটি হত। সেসব বেলাবেলি করে নিয়ে গিন্নিরা, কত্তারা, ছেলেপুলে, আমরা সব বই দেখতে বসতুম।'

—'উকিলবাবুর বাড়ির কাজ ছাড়লে কেন?'

—'বড়গিন্নির বড্ড মুখ গো বউদিদি। অত মুখ আর খিটিমিটি আমি বাপু সইতে পারি নে। তবে রাস্তায় দেখা হলেই সাধাসাধি করছে। এসো লক্ষ্মী, বসো লক্ষ্মী, তুমি গিয়ে থেকে ঘরদুয়োর আঁধার হয়ে রয়েছে লক্ষ্মী। হপ্তায় একদিন করে ওদের বাড়ি সারারাত বিডিও। রাত দশটা থেকে আরম্ভ হবে, সকাল সাতটা-আটটা পর্যন্ত। নাগাড়ে। মাইনেটাও বাইড়ে দেবে বলচে...।'

লক্ষ্মী উকিলবাবুর বাড়ির গল্প আরও বলত, কিন্তু মিতুর বড্ড ভয়-ভয় করছে, নার্ভাস লাগছে। সে উসখুস করতে করতে বারান্দায় চলে গেল। সুজিত যতক্ষণ না ফিরছে সে যেন বড্ডই অসহায়, নেহাত একা।

রাত্তিবেলায় সুজিত বুঝতে পারে, মিতু এপাশ ওপাশ করছে। ঘুমোচ্ছে না মোটেই। দু-তিন বার উঠে জল খেল, দরজা খুলে বাথরুমে গেল।

সুজিত বলল—'কী, করছ কী বলো তো? তোমার কি ডায়াবিটিস ধরল? ঘুমোতে টুমোতে দেবে না নাকি?'

মিতু ঢোক গিলে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল— 'হ্যাঁ গো তুমি বলছিলে এবার বিবাহবার্ষিকীতে যা চাইব দেবে, তা বলব?'

—'এই এত রাত্তিরে? আর সময় পেলে না? তা বলো, বলেই ফেলো।'

—'কথা দাও দেবে?'

—'তা দেব না মিতু, না জেনে-শুনে কথা দিয়ে দশরথ রাজার কী অবস্থা হয়েছিল মনে আছে তো? আকাশের চাঁদের মতো কোনও জিনিস না চাইলে দেব এখন।'

মিতু বলল—'একটা ভিডিও ক্যাসেট প্লেয়ার।'

—'সে কী? তোমার ঝোঁক এদিকে গেছে কখনও বুঝিনি তো? আমরা কখন ছবি দেখব? টুবলু রয়েছে না?'

—'টুবলুকে না হয় টিউটোরিয়্যালে দিয়ে দাও। না-কিনলে বোধহয় লক্ষ্মীকে আর রাখা যাবে না' বলতে বলতে মিতু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। সুজিত চিন্তিত হয়ে বলে,—'তাই তো। কিন্তু অত টাকা স্পেয়ার করার তো আমার উপায়ই নেই। ইন্‌কামট্যাক্স অ্যাভয়েড করতে প্রতি বছর উদ্বৃত্ত টাকাগুলো ইনভেস্ট করতে হচ্ছে। করে টরে ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। তবে এক কাজ করো, ও যদি হপ্তায় একদিন ভিডিও দেখতে যেতে চায় ছেড়ে দিয়ো। এ ছাড়া তো আমি আর কোনও উপায় দেখছি না।'

রবিবার সন্ধে সাতটা। মিতুর দাদা-বউদি সোনারপুর থেকে বেড়াতে এলেন। গলদঘর্ম সুজিত দরজা খুলে দিল।

—'আরে আরে আসুন দাদা, বউদি আসুন, মিতু দেখে যাও।'

মিতু বেরিয়ে এল। আরেক গলদঘর্ম ব্যাপার।

দাদা বললেন—'কী ব্যাপার সুজিত, গায়ে হাতে পায়ে ময়লা লেগে, ঘেমে নেয়ে গেছ!'

সুজিত বলল— 'আর দাদা সারা মাস সময় পাইনি। আজ পাখাগুলো, জানলার শার্সি, দরজা-টরজা সব সাফ করছিলুম। বসুন আমি চট করে চানটা সেরে আসি।'

বউদি বললেন—'মিতু, তোর এ দশা কেন রে?'

মিতু বলল—'সারা সপ্তাহের মাছ মাংস এনেছে আজকে, সবজি-টবজি সব। সারা সকাল তো সেই করেছি, তারপর ছিল কাচাকুচি, বেডকভার, পর্দা, বড্ড চিটচিট হয়েছিল গো। এখন রান্না করছি, কালকের সুদ্ধু করে রাখব।'

বউদি বললেন—'ভালই করেছিস। লোক নেই যখন, তখন কাজ এগিয়ে রাখা ভাল। আমি তো সব সময়ে আটচল্লিশ ঘণ্টা এগিয়ে থাকি।'

দাদা বললেন— 'বছরভর বাসি খাচ্ছিরে মিতু, তোর বউদির ওই আটচল্লিশ ঘণ্টার বাতিকে আমার পেটের বারোটা বেজে গেল।'

সুজিত বলল—'কে বললে আমাদের লোক নেই?'

মিতু একগাল হেসে বলল—'লোক আছে, খুব ভাল লোক গো!'

দাদা-বউদি দুজনেই সামান্য আগে পরে বললেন—'সে কী রে? লোক আছে তো তোরা এমন...'

মিতু বলল—'আজ ও ভিডিও দেখতে গেছে আরেক বাড়ি, দুপুরে বারোটা থেকে রাত্তির বারোটা।'

—'তো কালকের সুদ্ধু রান্না করে রাখছিস যে!'

—'বারোটা অব্দি ভিডিও দেখে কি কাল আটটার আগে উঠতে পারবে বউদি। তারপর চানটান, জল খাওয়া সারতে সাড়ে নটা। পুজোয় বসে একবার। ততক্ষণ ওর অফিস শুনবে?'

—'বেডকভার, পর্দা এসব তোকে কাচতে হচ্ছে কেন?'

—'বারে, লোক বলে কি সে মানুষ নয়? বেডকভার পর্দা কাচতে কষ্ট হয় না বুঝি?'

দাদা বললেন—'সোমবার কি তোর লোক মঙ্গলবারের রান্নাটা করবে? তোর বউদির মতো?'

মিতু বলল—'ওর দাদা সাঙ্ঘাতিক স্বাস্থ্য-স্বাস্থ্য বাই। একদম বাসি জিনিস খায় না। কিছুতেই বোঝাতে পারি না ফ্রিজে-রাখা খাবার বাসি হয় না। ফ্রিজে আগের দিনের খাবার থাকলে সে আমরাই খাই। কালকে এসে ও নিজের ভাতে-ভাত করে নেবে। মঙ্গলবার মঙ্গলবারের রান্নাই করবে। গুছিয়ে-গাছিয়ে রাঁধতে ওর একটু দেরি হয় তাই সকালের দিকটা আমিই চালিয়ে নেব।'

—'বিকেলেরটা ও করবে তো?'

সুজিত বলল—'নিশ্চয়ই। সিরিয়্যাল কি চিত্রহার দেখতে দেখতে। মিতু হাজির থাকবে রান্নাঘরে, খুন্তি-টুন্তি নাড়বে। ও মশলা-টশলা ফেলে দেবে কড়ায়।'

মিতু মুখ হাসিতে ভাসিয়ে বলল—'তা হোক, ও যে আছে বউদি, জগবন্ধু উকিলবাবুর বাড়ি যে চলে যায়নি, এই-ই আমাদের মহাভাগ্য। লোক থাকলেই আমরা খুশি।'

দাদা বললেন—'এত দিনে এগজিস্‌টেনশ্যালিজ্‌ম কথাটার মানে পরিষ্কার হল সুজিত।'

লক্ষ্মীর পদত্যাগ

লক্ষ্মীমণিকে শেষ পর্যন্ত টিকিয়ে রাখা গেল না। এত করেও। পানের নেশা বলে পানের সরঞ্জাম কেনা হয়েছিল। সে-ও আবার বাংলা পান হলে হবে না। মাগো। হাকুচ তেতো আর রাক্কুসে ঝাল। তাই ছাঁচি পানই আসছিল। কিন্তু সে এবার জর্দা দাবি করাতে সুজিত দৃঢ়ভাবে সে দাবি নাকচ করে দেয়; বলে— 'পেরে উঠব না, দাবিটা অন্যায়, এসব তো আছেই, তা ছাড়াও এখন সরকার পর্যন্ত ড্রাগ আর ক্যানসারের বিরুদ্ধে নেমে পড়েছে। চতুর্দিকে সেই বাবদ প্রচার হচ্ছে, এই পরিপ্রেক্ষিতে জর্দার মতো একটা নেশার জিনিস যে দাবি করে তাকে পুলিশে দেওয়া উচিত।' শেষের তিনটে শব্দ সুজিত যুধিষ্ঠিরের স্টাইলে 'ইতি গজ'র মতো নীচের স্কেলে বলেছিল। স্কেলের এই ওপর-নীচ পেশাদার আবৃত্তিকারদের মতোই সুজিত-মিতুদের অভ্যেস হয়ে এসেছে।

মিতু বলে—'শুনেছ লক্ষ্মী, দাদা কী বলছেন। ক্যানসার অসুখ জানো? সাঙ্ঘাতিক যন্ত্রণা, জর্দা খেলে সেই অসুখ হতে পারে।'

লক্ষ্মী বলে—'ক্যানসার আর জানবোনি বউদিদি, গোবিন্দর ঠাকুমা তো তাতেই গেল, জর্দা খেয়ে খেয়ে গন্ধ ভুড়ভুড়ি হয়ে বসে থাকত বুড়ি, এখন বোঝো ঠ্যালা। তা সে নেশা গোবিন্দর বাপ আবার আমাকেও ধইরেছিল কিনা।'

অর্থাৎ লক্ষ্মীমণি জ্ঞানপাপী। কত ধানে কত চাল বিলক্ষণ জানে।

মিতু তখন বলে—'এসব নেশার জিনিস খাওয়া সরকারও আজকাল পছন্দ করছে না।'

লক্ষ্মী ভয়ে ভয়ে (ছদ্ম?) বলে—'ওরে বাবা জর্দাও আবার ওই সব ড্রাক-মাকের মধ্যে পড়ে নাকি?'

মিতু গাঁইগুঁই করতে থাকে—'না ঠিক ড্রাগ নয়।'

'ড্রাকের মতো, তাই না বউদিদি? ও আমার খেয়ে কাজ নেই।' লক্ষ্মীমণির কথায় মিতু আশ্বস্ত বোধ করে।

কিন্তু লক্ষ্মীমণি যখন টুবলুর মতো গোবিন্দভোগ চালের ভাত খাওয়ার বায়না ধরল এবং ব্রত-পার্বণ ও একাদশীর দিনে সাদা ময়দার খান কতক লুচি, বেগুনভাজা আর রসগোল্লা কিংবা দানাদার দিয়ে, তখন সুজিত-মিতু পড়ে গেল মহা ফাঁপরে।

কনফারেন্স বসল। মিতু বলল—'দ্যাখো বাড়িতে যদি আমার শাশুড়ি থাকতেন তাঁকে তো আমরা এইরকমই দেবার চেষ্টা করতুম!'

সুজিত উত্তপ্ত হয়ে বলল—'লোকজন আর আমার মা এক?'

মিতু বলল, 'সেটাই তো ভাববার দিন এসেছে। ওরাও মানুষ, আমরাও মানুষ, ওদের নইলে আমাদের চলে না সত্যিই। ওরা তো পেটের জন্যেই আসে! যদি কিছু খেতে ইচ্ছে হয়, পারলে দেওয়া উচিত।'

সুজিত বলল—'তুমি তো ওকে আমাদের সঙ্গে সমান করেই খেতে দাও। নাকি? আগেকার মতো বাসিরুটি আর 'লোকজনদের বেগুনভাজা'র কালে পড়ে রয়েছ এখনও?'

'মোটেই না', মিতু জোর গলায় বলল—'বাড়িতে যখন যা হয় দিই তো বটেই। অনেক সময়ে নিজে না খেয়ে ওকে দিই।'

সুজিত বলল—'হ্যাঁ, এটা তো আমি প্রায়ই দেখি। তাহলে? তাহলে যেটা পারব না সেটা নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই।'

মিতু ছাড়বার পাত্রী নয়, বলল—'যদি পারতুম তাহলে?'

সুজিত বলল—'পারলেও নয়। আমরা যেরকম খাচ্ছি, ওরও সেরকমই খাওয়া উচিত। এক আধদিনের শখের কথা আলাদা। আমার মা হলে তাঁকে আমি দিতুম, কিন্তু লক্ষ্মী বলেই দোব না। এতে আমাকে বুর্জোয়াই বলো আর প্রতিক্রিয়াশীলই বলো। এভাবে তুমি লোক রাখতেও পারবে না। যত আদর দেবে তত বাঁদর হবে। সব মানুষ সমান বলে নাচানাচি করলেই সমান হয় না মিতু। জ্ঞানগম্যি, বিচার-বিবেচনা এইসবে আসমান-জমিন ফারাক থাকবে আর মানুষ সব হাত পা গুনে গুনে সমান হয়ে যাবে, আবদার, না।'

মিতু বলল, 'তুমি অত উত্তেজিত হচ্ছ কেন? আমাদের কোথাও একটা লজিকের ফ্যালাসি হচ্ছে। সেইটে ধরবার চেষ্টা করছি খালি।'

সুজিত বলল, 'দ্যাখো, অফিসেও অফিসার্স ক্যানটিন অন্যান্য কর্মচারীদের ক্যানটিন থেকে আলাদা। এটা শুধু শ্রেণী বৈষম্য নয়। যে যার আয় অনুযায়ী খাদ্য খাতে ব্যয় করবে এটাই তো স্বাভাবিক। নিজের বাড়িতে তুমি বরাবর রাঙাচালের ভাত আর পুঁইচচ্চড়ি খাও, নবাববাড়িতে চাকরি করছ বলে রোজ নবাবের মতো মুর্গমুসল্লম খেতে চাইলে, সেটা চলবে? না ঠিক হবে?'

মিতু বলল—'ভাববার বিষয়, সত্যিই। অধিকারভোগ, আধারভেদ, আয় অনুযায়ী ব্যয়, শ্রেণীবৈষম্য, সাম্য, মৈত্রী স্বাধীনতা... আমার ছাইমুণ্ডু সবই যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। সত্যি বলছি তোমাকে, ছোট ছেলে মেয়ে আমি ওই জন্যেই রাখতে পারি না। টুবলুর দাদা-দিদির মতো বয়সের একটা বাচ্চা আমার বাড়ি কাজ করবে, টুবলু রোজ ডিম-কলা-দুধ খাবে সে খাবে না, টুবলু ইস্ত্রি করা ভাল জামাকাপড় পরবে, সে পরবে না, এরকম ঘটতে থাকলে আমি ঘুমোতে পারব না গো।'

সুজিত নরম গলায় বলল—'এই দ্যাখো, তুমি ক্রমাগত গ্রাউন্ড শিফট্ করতে থাকলে আমি কী করে পেরে উঠব? বাচ্চার কথা আলাদা। এ তো তোমার চেয়েও বয়সে বড়, যথেষ্ট স্বাস্থ্যবতী এক মহিলা যে তোমাকে দিয়ে অর্ধেক কাজ করিয়ে নিয়ে পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে আছে, আর যখন তখন গোবিন্দভোগ গোপালভোগ ইত্যাদি দিয়ে আমাদের ব্ল্যাকমেল করছে।'

মিতু পুরনো কফি-হাউজি কায়দায় টেবিল চাপড়ে বলে উঠল—'দারুণ বলেছ তো? দা ওয়ার্ড। আমাদের দুর্বলতা, অসহায় অবস্থা ইত্যাদির সুযোগ নিয়ে ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছে, এর ফলে হাইপারটেনশন, ইসকিমিয়া, নিউরোসিস হতে পারে। ইন ফ্যাক্ট আমার বোধহয় সবগুলোই হয়েছে। বুকে চাপ, মাথা গরম, যখন তখন কেঁদে ফেলি।'

সুজিত বলল—'কাঁদো-কাঁদো দেখি প্রায়ই। কিন্তু একেবার কেঁদে ফেলতে তো দেখিনি কখনও?'

'বাথরুমে কাঁদি গো। লোকেদের যেমন বাথরুম সঙ্, আমার তেমনি বাথরুম কান্না।'

সুজিত বলল—'বলো কী? এখুনি যা হয় একটা হেস্তনেস্ত কর। বাথরুমে গিয়ে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদো? সর্বনাশ।'

সুতরাং মিতু লক্ষ্মীমণিকে বলল—'ছেলে স্কুলে যাবার সময়ে তাড়াতাড়িতে একটু আলুভাতে ভাত খেয়ে যায়, টিফিন কী নেয় আর কতটুকু খায় সে তো নিজেই দ্যাখো লক্ষ্মী। আমরা নিজেরা তো আর রোজ রোজ গোবিন্দভোগ খাচ্ছি না। তা ছাড়া লক্ষ্মী, রেশনের চালও তো আমরা খাই না, তোমাকে দিইও না!'

লক্ষ্মী একটু মুচকি কেঁদে বলল—'টুবলুমণির বিত্তান্ত তো আমারও বউদি। কোনওমতে দুটি নিরমিষ্যি ভাত মুখে তুলি। আমাদের আমতিতার চাল সে বলে মিষ্টি কত। এসব চাল আমাদের মুখে রোচে না। সে সাড়ে পাঁচ টাকা দিয়েই কিনুন আর সাড়ে ছ টাকা দিয়েই কিনুন। তা ছাড়া আপনি তো আর বেধবা নন, বেধবা হলে বুঝতেন সেদ্দ চাল দিয়ে নিরিমিষ্যি খাবার কী কষ্ট। তেমন-তেমন বেধবা সেদ্ধ চাল ছোঁবেই না।'

মিতুর ভীষণ রাগ হয়ে গেল, কিন্তু সে এই অলুক্ষুনে কথাটাকে হজম করে একটু কড়া গলায় বলল—'তোমাকে তো অনেকদিনই বলেছি ওসব মাছ খাব না, ডিম খাব না ছাড়ো। ওসব মানাটাই অন্যায়। যত বাজে সংস্কার। দু দিন অন্তর তোমার ব্রতপার্বণ, ওসব কাজ করতে গেলে চলে না। আর মাছ খাও না বলে তো বড়ি-বড়া শাক, যা যা ভালবাসো সবেরই জোগাড় রেখেছি। পেঁয়াজ রসুন খাচ্ছ তো দুবেলা।'

লক্ষ্মীমণি বলল—'কী? এত বড় কথা বললেন বউদি! বামুন-কায়েতের ঘরের

বেধবা নই বলে কি আমি বেধবা নই? পাপ-পুণ্যির জ্ঞান নেই? দুটো ভাতের জন্যে কি শেষে নরকে যাব?' বলে লক্ষ্মী দুমদুম করে অপসৃত হল। খাবার সময়ে গুরুগম্ভীর চালে বলল—'না খেয়ে গেরস্তের অকল্যাণ করবনি। কিন্তু এমন মেলেচ্ছ বাড়িতে আমি আর থাকছিনি। কাছারি বাড়ির মা— মেমসায়েব নয়। নিজে বেধবা, বলতে কী তার জা, বোন, বড়মেয়ে গুষ্টিসুদ্ধ সব বেধবা। তুমি যদি মত বদল না করো তো বউদি আমি সেখানেই চললুম।'

অর্থাৎ মত বদল করলেই সে ম্লেচ্ছ বাড়িতে থাকতে পারে।

মিতু তখন সাহস সঞ্চয় করে বলল, 'তাই যাও। আমি মত বদল করতে পারব না।'

সুজিত অফিস থেকে ফিরে যথারীতি মিতুকে দেখতে পেল না। মিতু-মিতু হাঁক ছাড়ি, মিতু নেইকো বাড়ি? অথচ বাড়ি থাকার কথা। মিতুর স্কুলও তার ছেলের মতো সাড়ে আটটায় আরম্ভ হয়ে দুটোয় শেষ হয়। আজ শনিবার, ছুটি। যাই হোক শেষে সুজিত খুব একটা কাব্যগন্ধী দৃশ্য দেখতে পেল। মিতু বসে আছে বারান্দা-বাগানে, হাতে একটি আধফোটা গোলাপ। পাশ থেকে মুখ দেখা যাচ্ছে, মানে ভাল করে দেখা যাচ্ছে না।

সুজিত বলল—'হ্যাল্লো লেডি শাজহান ইন মুঘল মিনিয়েচার।' মিতু মুখ ফেরাল না।

সুজিত বলল—'ভুল হয়ে গেছে, হ্যাললো লেডি নেহরু উইথ আ ভলুম অফ রবার্ট ফ্রস্ট।'

মিতু মুখ ফেরাল না।

তখন সুজিত কড়া ধমক দিয়ে বলে উঠল—'অ্যাই মিতু, অই কপালে কী পরেছ?'

মিতু এইবার মুখ ফেরাল। মুখ থমথম করছে। চোখ ছায়া ঘনাইছে বনে বনে। নামল বলে। বলল—'কপালে কী পরেছি? পোড়া কপালে লোকে কী পরে গো? বলিরেখা-টেখা হয়েছে বোধহয়। আর কিছু হওয়ার নেই। শেষ। সব শেষ।'

সুজিত প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেছে। আস্তে আস্তে বলল—'কানপুর থেকে চিঠি এসেছে নাকি কোনও? বাবা-মা ভাল আছেন তো?'

সুজিতের নিজের বাবা-মা গত। মিতুর বাবা-মা ছোটভাইয়ের কাছে কানপুরে থাকেন। তাঁদের দেখতে যেতে পারে না বলে মিতু এমনিতেই একটু কাতর হয়ে থাকে সব সময়ে।

মিতু এবার উঠে দাঁড়িয়ে ডুকরে উঠল—'বাবা-মা ভাল আছেন। কিন্তু এদিকে সর্বনাশ হয়ে গেছে। লক্ষ্মী চলে গেছে।'

সুজিত হাতের ব্রিফকেস নাড়িয়ে বলল—'লক্ষ্মী চলে গেছে মানে? আসছে বলো। চোদ্দো মাসের বকেয়া বাড়তি ডি.এ বাবা, লাগাও পোলাও-মাংস-বিরিয়ানি কোপ্তা কাবাব।'

মিতু বলল—'আমার সর্বনাশ হয়ে গেল আর তুমি বলছ পোলাও-মাংস? বলতে তোমার মুখে বাধল না?'

সুজিত বলল—'কীসের সর্বনাশ তোমার? লোক আছে এই অন্ধ মোহে আপাদমস্তক আবৃত হয়ে তুমি কাপড় কাচছিলে, রান্না করছিলে, মশলা বাটছিলে। বাসনটাও বোধহয় ধুচ্ছিলে...'

'হ্যাঁ, কাচের বাসন ও বড্ড ভাঙত।'

'আর আমি দিবারাত্র গাইছিলুম—'এ মোহ আবরণ খুলে দাও, খুলে দাও হে...' তা আমার সেই প্রার্থনা প্রভু শুনেছেন। ব্যস। এবার থেকে মোহমুক্ত সত্যের আলোয় আলোকিত সংসার। উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত।'

মিতু হেসে কেঁদে বলল—'ঠিক বলছ? তুমি রাগ করোনি?'

সুজিত বলল—'ঠিক বলছি, আমি রাগ করিনি।'

মিতু বলল—'ঠিক বলছ, তুমি আমায় সাহায্য করবে?'

সুজিত বলল—'ঠিক বলছি আমি তোমায়... অ্যাঁ? সাহায্য? কীসের সাহায্য? কখন সাহায্য? কেমন সাহায্য? আমি তো এ বিষয়ে কিছু কমিট করিনি।'

মিতু বলল—'ওরে আমার মায়ের আঁচলচাপা, গোবরগণেশ, কোলের ছেলেটি রে! কীসের সাহায্য, কেমন সাহায্য, কখন সাহায্য, তাই না? খালি কেনটা জিজ্ঞেস করোনি এই আমার চোদ্দোপুরুষের ভাগ্যি। দেখাচ্ছি এবার তোমায় কে কী কেন কবে কোথায়। এসো আমার সঙ্গে।'

টুবলু এই সময়ে মায়ের হাতে বাবার খোয়ারের গন্ধ পেয়ে এসে পৌঁচেছে। ফ্রয়েডসায়েব বলেন ছেলেরা বাবাকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে। সেই পরম বীরপুরুষ বাবা, যিনি নাকি সব প্রশ্নের শেষ উত্তর, সব সমস্যার শেষ সমাধান সেই পিতা স্বর্গ পিতা ধর্মকে ছেলেরা ভালবাসে খুবই, কিন্তু তিনি বেকায়দায় পড়লেও ছেলেরা বিপুল আনন্দ লাভ করে।

টুবলু দেখল সদ্য-অফিস ফেরত বাবার কনুই ধরে তার মা বীরবিক্রমে তাকে বারান্দা থেকে বসার ঘরে এনে ফেলেছে। বাবার মুখ কাঁচুমাচু। মায়ের মুখে ট্রাডিশন্যাল মহিষাসুরমর্দিনীর হাসি। সেই দেবী যিনি বধ করবার সময়েও হাস্যমুখে থাকেন। টুবলু কে কী কেন কবে কোথায়টুকু শুনতে পেয়েছিল, হাততালি দিয়ে বলে উঠল—'কী মজা কী মজা, বাবা একটা ধাঁধাও পারেনি। ও বাবা, পারোনি, না?'

বাবা করুণ নয়নে ছেলের দিকে চেয়ে বলল, 'ধাঁধা নয় বাবা, রাঁধা।'

'রাঁধা?' টুবলু প্রথমটা বুঝতে পারেনি, কিন্তু মহা চালু ছেলে, সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পেরে বলল—'বাবা তুমি মায়ের কাছে রান্না শিখবে? আজ থেকে? এখন থেকে? আজকে আমরা তোমার রান্না খাব? বাবা আজকে কাটলেট শেখো না! আমার বন্ধু পার্থর বাবাও তো রান্না করে, বেড-টি না দিলে পার্থর মা আর পার্থ ঘুম থেকে ওঠেই না। বাবাকে দিতেই হয়। তা নয়তো পার্থর ভোরবেলা পড়া মুখস্থ হবে না, স্কুল যাওয়াও হবে না। পার্থর বাবার অফিসের রান্নাও হবে না।'

মিতু বলল—'দেখলে?'

সুজিত বলল—'দেখলুম, শুনলুম....।'

মিতু বলল—'দেখলেও, শুনলেও। কিন্তু কিছুই বুঝলে না। গ্রিন রেভল্যুশন, ইনডাস্ট্রিয়াল রেভল্যুশন আর ফ্রেঞ্চ রেভল্যুশন— এই তিনটে তো মোটে জানো, বোলশেভিকটাকে তো পাত্তাই দাও না। এদিকে নীরবে নিভৃতে যে কীভাবে কিচেন রেভল্যুশন হয়ে যাচ্ছে তার খবরই রাখো না। রাখবে কেন। রাখলে যে অসুবিধে। নিজেকেও যে সে রেভল্যুশনে শামিল হতে হয়। পার্থর বাবা বেড-টি দেন, এ খবর তোমার ছেলেও রাখে। আমি উপরন্তু খবর রাখি তিনি স্পেশ্যালিস্ট। প্রেশারকুকারে

বসালে কতটা চালে কতটা জল দিতে হবে এ তথ্যও তাঁর জানা। কাজেই রান্নার লোক ওদের লাগেই না। ঠিকে লোক আছে, সে না এলেও শেয়ার্ড লেবার। ছেলে ঘর ঝাড়ল, তো বাবা ঘর পুঁছলেন, বাবা ঘর পুঁছলেন তো মা বাসন মাজলেন. এরকম আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকলে তো কথাই নেই। কোনও লক্ষ্মী-অলক্ষ্মীর তোয়াক্কাই করতে হয় না। কিন্তু আমার বাড়ির মানুষটি দেখি সর্বক্ষণ অনুজ্ঞায় কথা বলছেন, ইমপ্যারেটিভ মুড— পোলাও-মাংস লাগাও, কেন লাগাই বলা যেত না? লাগানো যাক বললেও তো খানিকটা কর্মৈষণা প্রকাশ পেত।'

সুজিত বলল—'ঠিক আছে। ঠিক আছে। এত গঞ্জনা আমি সইব না। করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে। আজ থেকেই এ বাড়িতে ভাববাচ্য চালু হোক। এই অকালকুষ্মাণ্ড পক্কেঁচড় টুবলু, ভাববাচ্য আর কর্মকর্তৃবাচ্যের অ্যাপ্লিকেশন হবে এখন থেকে বাড়িতে। লিখে রাখবে, শিখে রাখবে। অ্যাডভান্সড স্টাডি। দু-এক বছর পর থেকেই দরকার লাগবে।... আচ্ছা, মিতু, চা-টা তাহলে পাওয়া যাক।'

মিতু বলল—'অবশ্যই। আজ আমার শনিবারের ছুটি। কাল রবিবার। এ দু-দিন কর্তৃবাচ্য, টুবলু লক্ষ্য কর— আমি চা করছি। দিচ্ছি।'

টুবলু বলল— 'সোমবার কী হবে মা?'

মিতু বলল—'সোমবারে তোমার বাবা যদি বলে "খাওয়া যাক", আমি বলব "নিশ্চয় নিশ্চয় হয়ে যাক।"

টুবলু বলল—'তারপর? এগুলো সব ভাববাচ্য মা?'

'সবই ভাববাচ্য, বাবা'—সুজিত হৃষ্টমুখে বলল।

'আরেকটা কী খটমট যে বললে তখন? সেটা কবে হবে বাবা?'

'কী খটমট?' সুজিত উৎসাহিত হয়ে বলল, 'কর্মকর্তৃবাচ্য' নিশ্চয়ই বাবা. নিশ্চয়ই হবে। যেমন ধরো আমি যখন বলব "রান্নাটা এবার করা যাক।" তখন তোমার মা বলবে— "হ্যাঁ হ্যাঁ রান্না হচ্ছে।" এই হল গিয়ে তোমার কর্মকর্তৃবাচ্য।'

ওতুলের প্রতিদ্বন্দ্বী

অতুল নিজেকে গুঁই বলে না, ইংরিজি বানান অনুযায়ী বলে গুইন। এতে অতুলের বাবার আপত্তি আছে যথেষ্ট, কিন্তু গুইন হিসেবে ছেলের দাপট অর্থাৎ সাফল্যে চমৎকৃত হয়ে তিনি এ বিষয়ে আর বিশেষ উচ্চ-বাচ্য করেন না। কেউ মিঃ গুইনকে ডাকতে এলে এখন তিনি বেশ গর্বের সঙ্গেই কবুল করেন এই মিঃ গুইন তাঁরই কুলপ্রদীপ, তিনি দেখছেন সে বাড়ি আছে কি না, ভারি ব্যস্ত মানুষ তো! অতুল মস্তান নয় কিন্তু। সে নিজেকে বলে মস্তানের বাবা। অর্থাৎ তাদের এলাকার মস্তানরা—খেঁদা, ন্যাড়া, বীরু এরা ওতুলদার পরামর্শ ছাড়া এক পা চলে না। খেঁদা-ন্যাড়াদের কবজায় রেখে অতুল পুরো এলাকাটাকেই কব্‌জায় রেখেছে বলা চলে। এই প্রতিপত্তি অবশ্যই

একদিনে হয়নি। এমনি এমনিও হয়নি। প্রথমত, অতুলের শরীর স্বাস্থ্য ঠিক যে তুলনায় দশাসই, ঠিক সেই তুলনায় মোলায়েম তার গলার স্বর এবং আচার-ব্যবহার। যে পাবলিক রিলেশনস প্রতিভা তার বাপ-ঠাকুর্দা খদ্দের চরাতে চরাতে বহু জেনারেশন ধরে আয়ত্ত করেছেন, সেই দুর্লভ জনসংযোগক্ষমতা একরকম জন্মসূত্রেই তার হাতের আমলকি। অতি কৈশোর থেকে সে প্রথমে তার পাড়ার, তারপর তাদের এলাকার, তারপরে আরও বৃহৎ এলাকার যাবতীয় ঝগড়া-কাজিয়া মেটানো ইত্যাদি অভিভাবকগিরি করে এসেছে অত্যন্ত সফলভাবে। প্রথম প্রথম পাড়ার বড়রা তাকে 'জ্যাঠা ছেলে' বিশেষণে বিশেষিত করতেন। পরে ঠিক তাঁরাই বলতে আরম্ভ করেন—'ওতুল বড় বিচক্ষণ ছেলে।' তাঁদের কারও ছেলে ঘোঁতন, কারও নাতি ট্যাপা, কারও মেয়ে বুঁচি এদের কেসগুলো অতুল সমুদয় জট ছাড়িয়ে একেবারে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দিত। সুতরাং প্রতিপত্তি অতুলের হবে না তো কি সুবিকাশ সরখেলের হবে? এর ওপরে অতুলের একটা সাংস্কৃতিক অ্যাঙ্গল আছে। সে সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট তো বটেই। উপরন্তু গান করতে পারে, বক্তৃতা করতে পারে, এমনকি কলমের জোরও তার আছে। বিশাল কালীপুজো এবং সরস্বতীপুজো হয় তাদের পাড়ায়। দুটি পুজোরই জাঁকজমক এবং পরবর্তী সাংস্কৃতিক উৎসব-সূচী আপনার আমার চোখ ট্যারা করে দেবার মতো। বিশ ফুট কালীপ্রতিমা বিসর্জনের সময়ে অতুল যখন তার প্রকাণ্ড সাদা কপাল তেল-সিঁদুরে চর্চিত করে, সিল্কের পাঞ্জাবির মধ্যে দিয়ে লাল, রোমশ বক্ষপট বিদ্যুচ্চমকের মতো দেখাতে দেখাতে শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে চলে, এবং তাকে কেন্দ্র করে খেঁদা, ন্যাড়া, বীরু ও সম্প্রদায় প্রবল বিক্রমে স্ট্যাম্প-মারা বিসর্জনী নাচ নাচতে নাচতে তার সঙ্গ নেয়, তখন বিশফুটি কালীপ্রতিমাই পূজ্য ছিলেন, না হলুদসিল্কের ওতুলকৃষ্ণই সত্যিকারের পূজ্যপাদ ছিল বোঝা শক্ত হয়ে ওঠে।

তবে কোনও মানুষের পক্ষেই সব মানুষের মন রাখা সম্ভব নয়। জনপ্রিয়তার বত্রিশপাটি হো-হো হাসির মাঝে মধ্যে দু-একটা ফোকলা দাঁতের ফাঁকি থেকেই যায়। কিছু হিংসুটে মানুষ বিসর্জনী মিছিলে সিল্কের বুকখোলা পাঞ্জাবি-পরিহিত ওতুলকৃষ্ণকে পুতুলকৃষ্ণ, বিপুলকৃষ্ণ ইত্যাদি বিকৃত নামে ডেকে নিজেদের মধ্যে মজা পেয়ে থাকে। কিন্তু বেশির ভাগ ঝুল বারান্দা থেকেই সদ্য বয়ঃপ্রাপ্ত নারী-জনতা বাবা-মা, জ্যাঠা-কাকাদের চোখ এড়িয়ে ওতুলদার এই উদ্দণ্ড নৃত্যপর শ্রীচৈতন্যরূপ বা প্রভুপাদরূপ দেখে পুলকিত হয়ে ওঠে। এই সময়টায় জেগে এবং ঘুমিয়ে তারা কত রকম স্বপ্ন দেখে। সে-সব কিশোরী তরুণীস্বপ্নের গোপনীয় ডিটেলের মধ্যে আমাদের না যাওয়াই ভালো।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা জলসার সময়ে ঘোষক বা ঘোষিকা অফ বম্বে ফেম থাকে, জনপ্রিয়তম লোকসংগীত গায়ক থাকে, নেচে নেচে গান-গাওয়া বিখ্যাত গায়িকা, সুন্দরী আবৃত্তিশিল্পী, সুকণ্ঠ শ্রুতিনাট্যনট ইত্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি হয়। সবচেয়ে বড় কথা পাড়ার উঠতি প্রতিভাদের অতুল এই সময়টায় সুযোগ করে দেয়। সুচন্দ্রা সান্যাল যে অবিকল আশা ভোঁসলেকে নকল করতে পারে, ট্যাপা ওরফে অরুময়কে যে কুমার অরু নাম দিয়ে অনায়াসে নামকরা আধুনিক-গাইয়েদের পাশে দাঁড় করিয়ে দেওয়া যেতে পারে, ছোট্ট গেনি যে জাত-বাউলদের মতো নাচতে এবং গাইতে পারে এসব

অতুলকৃষ্ণরই আবিষ্কার। সুচন্দ্রা সিনেমায় চান্স পেল বলে, গেনি তো সেই কবেই চিচিং-ফাঁক-এ ঢুকে বসে আছে। কুমার অরু 'তরুণদের জন্য'র জন্যে শিগ্গিরই অডিশন দেবে।

এই মরশুমটাতে এনতার প্রেমও হয়। পাড়ার কিশোরী-তরুণীরা পুজোয় বাবার বোনাস ভাঙানো মহার্ঘতম শাড়িটি পরে। রঙে-চঙে সুন্দরতম হয়ে ওঠার চেষ্টা করে, তারপর পরম অবহেলায় আয়রন করা চুল দুলিয়ে, পিন-করা আঁচল উড়িয়ে ওতুলদা, ন্যাড়াদা, বীরুদাদের ঝাপটা দিয়ে দিয়ে চলে যায়। মতামতের আদান-প্রদান হয়, জলসার নানা কাজের ভার পায় এরা, আর্টিস্টদের মনোরঞ্জন, খাবার-দাবার এগিয়ে দেওয়া, অটোগ্রাফের খাতা দফায় দফায় সই করানো, পেল্লায় দায়িত্ব সে সব। এবং এই সব চলতে চলতে আঙুলে আঙুল ঠেকে, কাঁধে কাঁধ; শাড়ির আঁচল খসে, কোমরের রুমাল থেকে উৎকট সুগন্ধ বার হতে থাকে। পাটভাঙা কাগজের পোশাকের মতো কড়কড়ে পাজামা-পাঞ্জাবি, পেখমধরা, ঘাড়ে কেয়ারি চুল, দু আঙুলের ফাঁকে পৌরুষ-ব্যঞ্জক সিগারেট। ওতুলদা তখন আড়চোখে কার দিকে চাইল রে? রূপার দিকে। ধ্যাত্, ও তো সোমালির দিকে। টিঙ্কু কিছু বলছে না। মুখ টিপে টিপে হাসছে। সে, একমাত্র সে-ই জানে ওতুলদা, ন্যাড়াদা, ইত্যাদিরা কার দিকে চাইল। কার দিকে আর চাইবে? এমন ফিগার, এমন ঠোঁট, এমন কাজলপরা চোখ আর এ শহরে দুটো আছে নাকি? টিঙ্কু আয়নায় নিজেকে যতই দেখে ততই নিজে নিজেই মস্ত্ হয়ে যায়। তাই বলে কি আর পাড়ার সব ছেলে মেয়েগুলির পাড়ার মধ্যেই বিলি-ব্যবস্থা হয়ে যায়? তা হয় না। তা হবারও নয়। এসব হল মরশুমি প্রেম। নতুন শীতের হাওয়ার কারিকুরি। কার সঙ্গে বিয়ে হল? না ন্যাড়া-গুণ্ডার সঙ্গে। মিসেস ন্যাড়া গুণ্ডা! ছ্যাঃ। মেয়েরা আজকাল আগের মতো রাম-বোকা আর নেই।

অনেক দিন খালি পড়েছিল শম্ভু উকিলের জরদ্গব বাড়িটা। অতবড় বাড়িটায় দুটি মাত্র মানুষ। খালি পড়ে থাকা ছাড়া একে আর কী বলে? শম্ভু উকিল মারা যাবার পর একতলা বাড়িটাতে রইল শুদ্ধু শম্ভু উকিলের আইবুড়ো বোন ধিঙ্গি দুগ্গা, বা দুগ্গা দিদি, আগেকার দিনে হলে যাকে ইন্দির ঠাকরুণের মতো দুগগা-ঠাকরুণ বলে ডাকা হত। তো এই দুগ্গা অতুলের সঙ্গে লড়ে গেল। অনেকদিনের নজর ছিল অতুলের বাড়িটার ওপর। অনায়াসে একটা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র খোলা যায়। বিঘেখানেক জমির ওপর একটেরে একতলা। চার পাঁচখানা বড়সড় ঘর। লাইব্রেরি, ইনডোর গেমস্, আড্ডা বা অফিসঘর, সব এক ছাতের তলায় হতে পারবে। খোলা জমিটা সাফ-সুফ করে ব্যাডমিন্টন কোর্ট, ব্যায়ামাগার, পাড়ার ছেলেমেয়েদের নিয়ে ড্রিল-টিল, দরকারমতো জলসার আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা সবই এক জায়গায় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কত সুবিধে বলো তো? শম্ভু উকিলের ক্যানসারের যন্ত্রণা যতই বেড়ে ওঠে, অতুলকৃষ্ণদের হৃদয়ও ততই আশা-উদ্বেল হয়ে উঠতে থাকে। ঠাকুরপুকুরে নিয়ে যাওয়া, শেষমেশ হিন্দুসৎকারের গাড়ি, ঠোঙাভর্তি খই-পয়সা, সাদা পদ্মের রীদ সবই ওরা করল। পাড়ায় বিরাট করে শোকসভা হল। কনডোলেন্স। শম্ভু উকিল যে কত বড় মহামানব ছিলেন, শ্রীঅরবিন্দ, বিবেকানন্দ, চিত্তরঞ্জনের মতো গুপ্তযোগী, দেশপ্রাণ, মহাপ্রাণ সেসব কথা জ্বালাময়ী ভাষায় অতুল সবাইকে বুঝিয়ে দিল। অনেকেরই চোখে জল। কারও রুমাল

ভিজে সপসপ করছে, কেউ থাকতে না পেরে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলছে, খালি দুগ্‌গা মুখ বেঁকিয়ে, পানের পিক ফেলে বললে—'ঢ-অ-অ-ং। বক্তিমে শুনে আর হেঁসে বাঁচিনে।' সুতরাং দুগ্‌গার হাত থেকে শম্ভু উকিলের বাড়িটা চটপট উদ্ধার করা আর হয়ে উঠল না। শম্ভু উকিলকেও মরণোত্তর পল্লীরত্ন, কি দানবীর উপাধি দেওয়া গেল না।

দুগ্‌গা রক্ষিত আবার আরেকটি কম্মো করলে। একঘর ভাড়াটে এনে বসালে। অতুল কত করে বোঝালে আজকালকার দিনে সব আইন ভাড়াটেদের পক্ষে। ভাড়া-বসানো আর খাল-কেটে কুমির আনার মধ্যে কোনই তফাত নেই। ওই ভাড়াটে দুগ্‌গাদিদি শেষ পর্যন্ত ওঠাতে পারবে না। এই বাজারে লাখ-লাখ টাকার জমি দুগ্‌গাদিদির হাতছাড়া হয়ে যাবে। দুগ্‌গা রক্ষিতের ওই এক কথা। 'তোদের গভ্‌ভে যাওয়ার চেয়ে বর ভাড়াটেতেই গিলুক। তোরা আমাকে দূর করে দিবি। ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরুবি। তাস পিটে, টাসা পিটে হল্লা করে নরক গুলজার করে তুলবি। তার চেয়ে ভদ্দরলোক তার পুত-পরিবার নিয়ে শান্তিতে থাকুক। নিজের ঠেঁয়ে নিজের মতো। অকালকুষ্মাণ্ডর দল, তোদের তাতে কি? দাদা নেই, আমার এখন নিজের খরচ-খর্চা নিজেরই চালাতে হবে। বুঝলি? যা এবার পালা।' অতুল যাদের দাঁতে কাঁকরের মতো ফুটে থাকে সন্দেহ নেই দুগ্‌গা রক্ষিত তাদেরই একজন।

ভাড়া তো হল। ঝাঁকড়া চুল, মোটা চশমা পরা ধারালো চেহারার এক যুবক, তার পেছন পেছন মেরুদণ্ড সিধে এক-বিনুনি-করা এক রোগা যুবতী এবং দুটি প্রায় এক সাইজের ভারী-ভুরি বাচ্চা এক টেম্পো মাল নিয়ে এসে নামল। দু চার দিনের মধ্যেই শুনতে পাওয়া গেল—এ ভদ্রলোক যে সে নয়। উদীয়মান কবি আর্যশরণ ঘোষ। কবি আর্য ঘোষের আবার প্রধান বৈশিষ্ট্য সে নাকি লড়াকু মানুষ। শুধু পদ্যই লেখে না, নানারকম সমাজসেবামূলক কাজ-কম্মো করে থাকে। যুবতীটি তার স্ত্রী নয়, বোন। আর্য ঘোষ আসবার কয়েক মাসের মধ্যেই শম্ভু উকিলের বাড়ির সংলগ্ন জমির চেহারা ফিরতে লাগল। ওরা নাকি ফুল ভালোবাসে। মাথাভর্তি ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল নিয়ে আর্যশরণ আর তার বোন যখন চুবড়ির মতো ডালিয়া আর চন্দ্রমল্লিকার দেখাশোনা করে, পাঁচ রকমের জবা আর সাতরকমের গোলাপ গাছে সার দেয়, তখন কাছাকাছির ঝুলবারান্দায় উঁকিঝুঁকি চলে। রূপা বলে—'ফ্যানটা, বল টিঙ্কু!' টিঙ্কু বলে—'কোন্‌গুলো? ডালিয়া না ক্রিসেনথিমাম না গ্ল্যাডিওলাস?' রূপা মুচকি হেসে বলে—'তোর মাথা।' টিঙ্কু বলে— 'আই সি।' দুজনেই দুজনকে বোঝার মজায় হাসতে হাসতে ভেতরে ঢুকে যায়।

সেবার কালীপুজোর ফাংশনে সভাপতি করা হল আর্যশরণ ঘোষকে। অতুলই করল। অতুল বড় উদার চরিত্রের ছেলে। একথা বলতেই হবে। সে গুণের আদর করতে জানে। তা সেই সভার সভাপতির ভাষণ, এলাকাকে কাঁপিয়ে দিল। সে কি কবিতা, না জ্বলন্ত ফুলঝুরির মতো শব্দঝুরি, সে কি উপদেশ না অনুপ্রেরণা পাড়ার লোক ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারল না। কিন্তু তারা একেবারে বোওল্ড হয়ে গেল। এমন অপরূপ করে যে কেউ শক্তিপুজোর ব্যাখ্যা করতে পারে, এমন কাব্যময় ভাষায় অনর্গল বলে যেতে পারে কাউকে মুহূর্তের জন্যেও 'বোর' না করে, বলবার সময়ে কারুর চেহারা যে এমন প্রদীপ্ত মশালের মতো হয়ে উঠতে পারে, এলাকার লোকের অভিজ্ঞতার মধ্যে এসব ছিল না।

সেবার কালীপুজোয় যা হবার হয়ে গিয়েছিল। সরস্বতীপুজো হল একেবারে অন্যরকম। স্থানীয় আর্টিস্ট সুকেশ মিত্তিরকে দিয়ে কাগজের প্রতিমা হল। বাসন্তী রঙের মণ্ডপ হল। পলাশ গাঁদায় ছেয়ে গেল বেদি। আলপনা হল মনে রাখবার মতো। পুষ্পাঞ্জলি দিতে এল দফায় দফায় সব্বাই। সরোদ, সেতার, বাছা বাছা গান, এবং সন্তুর ছাড়া আর কিছু বাজল না, তা-ও মৃদুস্বরে। শ্বেতপদ্মাসনা দেবী স্তোত্র গানের মধ্যে দিয়ে শান্তভাবে ঘটবিসর্জন হয়ে গেল। সবার মনে হল এমন পুজো আর কখনও হয়নি, আবার হবে কি?

পাড়ার সাংস্কৃতিক কমিটির চেয়ারম্যান অতুলকৃষ্ণ। তাই বলে স্থায়ী নয়। একেবারে গণতান্ত্রিক উপায়ে, সবাইকার মতামত নিয়ে ব্যাপারটা হয়, তবু জানা কথাই অতুলই প্রেসিডেন্ট হবে। এবার আশ্চর্যের বিষয়, পাড়ার কিছু মাতব্বর ব্যক্তি বললেন—'আর্যকে করা হোক না কেন? ছেলেটার এলেম আছে।' ততোধিক আশ্চর্যের বিষয়, ন্যাড়া, মস্তান ন্যাড়া, ওতুলদার ডান হাত ন্যাড়া, যাকে বেপাড়ায় ন্যাড়া গুণ্ডা বলে উল্লেখ করা হয়, সেই ন্যাড়া এতে সায় দিল—'সত্যিই তো ওতুলদা কদ্দিক সামলাবে? তবে হ্যাঁ, ঝামেলা পোয়াতে হয় সেক্রেটারিকে, আর্যদা না হয় সেক্রেটারি হোক, ওতুলদা যেমন প্রেসিডেন্ট ছিল প্রেসিডেন্ট থাক।' সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি পাস হয়ে গেল। ক্লাবের খাতা-পত্তর, বিল বই, অডিট-রিপোর্ট, সুভেনির এভরিথিং চলে গেল আর্যশরণের খপ্পরে।

সমস্ত ঘটনাটার পর ন্যাড়াকে ডেকে রক্তচক্ষে অতুল বলল—'এর পর ফের ওতুলদা আজকে একটু মাল খাওয়াও বলিস, বলতে আসিস।'

ন্যাড়া অবাক হয়ে বলল—'যাচ্চলে, তুমিই তো প্রেসিডেন্ট, মানে সব্বেসব্বা রইলে। আযযদা খালি খেটে মরবে। আসলে কি জানো, পাবলিক যা চায় মাঝেমধ্যে তা দিতে হয়, নইলে শালা ডেমোক্র্যাসিও মচকে যাবে, পাবলিকও খচে যাবে। রূপা-টিঙ্কুরাও আযযদাকে চাইছে। দাওই না চান্স একবার মাইরি।'

মাসখানেকের মধ্যে খাতা-তহবিল সব মিলিয়ে-টিলিয়ে আর্যশরণ একদিন অতুলকৃষ্ণকে ডেকে পাঠাল। বেশ সুগন্ধি চা খেতে খেতে, খাওয়াতে খাওয়াতে বলল—'আচ্ছা অতুল, তুমি কী করো?'

—'কী করি? মানে? দেখতে পান না কী করি আর কী না করি?'

—'এগজ্যাক্টলি। দেখতে পাই। অতুল, আজকালকার দিনে কেউ আশা করতে পারে না একটা মানুষ দিবারাত্র আর পাঁচজনের জন্যে বিনামাশুলে খেটে যাবে। দিস ইজ টু মাচ। তুমি, ন্যাড়া, খেঁদা, বীরু এবং আরও যারা ক্লাবের বিভিন্ন কাজ সারা বছর ধরে করে যাও, অথচ যাদের কোনও আয় নেই, তাদের একটা লিস্ট করে ফেলা যাক। জনা ছয় সাতের বেশি হবে না বোধহয়। আমার প্রস্তাব তাদের প্রত্যেককে ক্লাবের হোলটাইমার হিসাবে কিছু মাসোহারা দেবার ব্যবস্থা করা যাক।'

অতুল বলল—'দে দ্দেখুন আর্যদা, এটা আমাদের অপমান করা। ন্যাড়া বীরুদের অপমান করা। আমরা যেটা করছি সেটাকে বলে মানবসেবা, কথাটা শুনেছেন?'

আর্যদা প্রশান্তমুখে বললেন—'শুধু মাসোহারা নয়, পুজো বাবদ সুভেনির ইত্যাদির জন্য যে যত বিজ্ঞাপন আনবে তার কিছুটা পার্সেন্টেজও কমিশন হিসেবে তোমাদের দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হোক। হিসেবের খাতায় যে বিরাট বিরাট গরমিলগুলো রয়েছে সেগুলোকে তোমাদের প্রাপ্য বকেয়া বলে অ্যাডজাস্ট করে নেওয়া হবে। তাহলেই

হল। নইলে এইসব খাতাপত্তর, সাধারণ মানুষের কষ্টার্জিত টাকার থেকে ট্যাক্স নিয়ে তৈরি তহবিল, এসব প্রহসন হয়ে যায় অতুল।'

আর্যশরণের পরের চালটা এল আরও সাংঘাতিক। সে কালীপুজোর প্রস্তুতিপর্বে বলল—বিশ ফুট প্রতিমা করে প্রতিবছর বিসর্জনের সময় ওভারহেড তার-কাটা সে বড় বিশ্রী। দশ ফুট প্রতিমা আরও অনেক সুন্দর হবে। কুমোরটুলির নারায়ণচন্দ্র পালকে দিয়ে করাও, অপূর্ব শ্যামামূর্তি করে দেবেন। আর রাস্তা আটক করে লরি, টেম্পো, ট্যাক্সি, প্রাইভেট কার, রিকশা এদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় কোরো না। মানুষকে এভাবে প্রেশারাইজ করা ঠিক না। ভয়ে কেউ কিছু বলতে পারে না। কিন্তু আমি জানি গতবছর মুদির দোকানের তারাশংকরকে সাড়ে চার হাজার টাকা চাঁদা দিতে বলেছিলে বলে সে বেচারির স্ট্রোক হয়ে যায়। এগুলো ঠিক না।'

কালীপুজোর রাতে একটি জম-জমাট কারণসভা বসত। সেটাও এবার বসল না।

অতুল যেমন উদারতায় বশিষ্ঠ, তেমনি বুদ্ধিতেও আবার সত্যি-বৃহস্পতি। সে সাপের লেজে পা পড়ার অপেক্ষাটিতেই ছিল। খ্যাঁদা, বীরু, নেড়ার সঙ্গে তার গোপন বৈঠকগুলো ঘনঘনই বসতে লাগল।

টিঙ্কুর বাবা রতনমণি ঘটক, রূপার বাবা সারদাচরণ সরকারকে ডেকে বললেন—'সারদা, এসব কি শুনছি?'

সারদাচরণ বললেন—'শুনেছো? তুমিও শুনেছো তাহলে? ছোকরা ভদ্দরলোকের মতন থাকে...' রতনমণি বললেন—'শুনব না মানে? পরস্ত্রী ফুসলিয়ে এনে বোন সাজিয়ে সবার চোখের ওপর বাস করবে, আর শুনবো না?'

—'কী কেচ্ছা, কী কেলেঙ্কারি, শেষকালে কি সেই লিভিংটুগেদার না কী বলে, সেসব ব্যভিচার এইখানে, এই পাড়াতেই আরম্ভ হল?'

সুচন্দ্রার মা একদিন শম্ভু উকিলের বাড়ির ভেতর গিয়ে কখানা শোবার ঘর দেখে এলেন। রিপোর্ট হল, একটা ডবল বেড। আর একখানা তক্তপোশ। বেশ লম্বা চওড়া, ইচ্ছে করলে দুজনেও শোয়া যায়।

এক রবিবার সকালে হতভম্ব আর্যশরণ দেখল তার বাড়ির সামনের বাগান তছনছ করতে করতে এগিয়ে আসছে বেশ বড়সড় একটা মারমুখী জনতা। তাদের মুখে অসন্তোষ, ঘৃণা, জিভে অকথ্য গালাগাল। একেবারে সামনে কিছু প্রৌঢ়, গুটিকয় বৃদ্ধ। তাঁরা বললেন, তাঁদের চক্ষুলজ্জা মানসম্ভ্রম ইত্যাদি অনেক কিছুর বালাই আছে। হঠকারিতা তাঁরা প্রাণ গেলেও করতে পারেন না। তাঁরা তাকে কিছুই বলবেন না। শুধু এই ভদ্রলোকের পাড়া ছেড়ে আর্যশরণ অন্যত্র উঠে যাক। যে সব জায়গায় এসব চলে, যাক না সেখানে। সাতদিনের মধ্যে যদি না যায়, তাহলে পরিণামের জন্যে তাঁরা দায়ী থাকবেন না। ছেলেপুলে নিয়ে ভদ্রপাড়ায় ঘর করেন কি না সকলে। ছেলেদের এডুকেশন, মেয়েদের বিয়ে সবই তো তাঁদের ভাবতে হবে। জনতার মধ্যে অতুল, কিম্বা তার সাকরেদরা লক্ষণীয়ভাবে অনুপস্থিত ছিল।

আর্যশরণ ঘটনার ল্যাজামুড়ো কিছুই বুঝতে পারছিল না। কিন্তু দুগ্‌গা এ পাড়ারই মেয়ে। সে ঠিকঠাক বুঝেছিল। ভাঙাবাড়ির ন্যাড়া ছাতে উঠে সে পরিত্রাহি চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'জানিস, অলপ্পেয়েরা গীতুকে গীতুর শ্বশুরবাড়ি থেকে যতুকের জন্যে

পুড়িয়ে মারতে চেষ্টা করেছিল, ওর বাপ-জেঠা অনেক কষ্টে উদ্ধার করে এনেছে, জানিস রাস্তায় দু-দুবার অ্যাসিড-বালব ছুঁড়েছে, ফস্‌কে গেছে তাই। আর্য ওর পিসির দ্যাওর, যদি বিপদের সময়ে মেয়েটাকে আশ্রয় দিয়ে থাকে তো বেশ করেছে, খুব করেছে, ডাইভোর্স মামলা হয়ে গেলে যদি ওকে বিয়ে করে তো বেশ করবে, খুব করবে, আমার বাড়ির মানুষ। সে কী রকম আমি জানি না তোরা জানবি ঘোড়ার ডিমের দল? এক্ষুনি এখান থেকে বিদায় হ’, আমার সম্পত্তির ক্ষেতি করিছিস, আমি শম্ভু উকিলের বোন, হরিহর উকিলের বেটি, তোদের নামে মামলা রুজু করব। ক্ষেতিপূরণ দিতে তোদের ইয়ে বেরিয়ে যাবে।’

জনতা আস্তে আস্তে পিছিয়ে গেল। দুগ্‌গা তখনও চেঁচিয়ে চলেছে—‘এসব ওই ওতুল হতচ্ছাড়ার কাণ্ড। কালীপুজোর ফণ্ড নিয়ে সোমবচ্ছর নেশাভাঙের ব্যবস্থা চলছিল। আর্য সেটি বন্ধ করেছে কি না…।’

পরের ঘটনা খুব সংক্ষিপ্ত। কোনও জনতাকে মারমুখী করে তুললে, সে যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তো আরেকটি লক্ষ্য সে বেছে নেবেই। শক্তিটার খরচ হওয়া চাই তো! জনতার মধ্যে শুধু সারদা-রতনমণির মতো প্রৌঢ়ই ছিল না, বেশ কিছু তাগড়া জোয়ানও ছিল যারা কুৎসা শোনবার আগে আর্যশরণের ভক্ত হয়ে পড়েছিল। এরা ফিরে গিয়ে চাঁদমারি করে অতুলকে। আর্য এবং তার বউদির ভাইঝি গীতা মাঝে পড়ে না থামালে অতুলকে হাসপাতালে যেতে হত? আপাতত সে শুধু নাক-আউট হয়ে ছাড়া পেল।

কিন্তু আর্যশরণ দুগ্‌গাদিদির শত অনুরোধেও, পাড়ার মাতব্বরদের হাজার ক্ষমাপ্রার্থনাতেও ও পাড়ায় আর রইল না। বলল—‘গীতার ছোট ছোট ছেলে দুটির পক্ষে অভিজ্ঞতাটা বড় মারাত্মক হয়েছে। গীতাও মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছে।’ একদিন সকালে শম্ভু উকিলের শূন্য বাড়ি যেমন হঠাৎ ভরে উঠেছিল চায়ের গন্ধে, ফুলের শোভায়, উৎসুক যুবক-যুবতীদের কলকণ্ঠে, বাচ্চাদের খেলার আওয়াজে, আর একদিন সকালে তেমনি আবার পূর্ণ বাড়ি শূন্য হয়ে গেল। বাগানময় শুধু সটান শুয়ে রইল কিছু মরশুমি ফুলগাছের মৃতদেহ। পা দিয়ে মাড়িয়ে যাওয়া থ্যাঁতলানো টোম্যাটো আর বেগুন। ঘরগুলোর মধ্যে দু'চারটে ছেঁড়া পাতা, ফেলে-যাওয়া ক্ষয়াটে অ্যালুমিনিয়মের ঢাকনি, খালি শিশি বোতল, ফাটা বল আর ডাঁই করা খবরের কাগজ।

অনেক অনে-ক দিন হয়ে গেছে। প্রতিভাবান অতুল তার পাড়াতে আবার আগের প্রতিষ্ঠা ফিরে পেয়েছে। যদিও কালীপুজোর সমারোহের দিন আর কখনোই সেভাবে ফেরে নি। ন্যাড়া, খ্যাঁদা এখন সোজাসুজিই রাজনৈতিক নেতাদের মাস্‌ল্‌ম্যান। বীরু একটা বহুতলের কেয়ারটেকার। অতুল তার বাবার গয়নার দোকানে নিয়মিত বেরোচ্ছে। বেশ জমাট প্রতিপত্তিঅলা ভবিষ্যুক্ত ধনী ভদ্রলোক। বাবার আমলের রাক্ষুসে তেলখাওয়া অ্যামবাসাডরটাকে বিদায় করে সে একটা ঝা-চকচকে তন্বী মারুতী-ভ্যান কিনেছে। ধবধবে সাদা। বর্ধমানের ভেতর দিকে গাঁয়ের চাষবাস দেখতে গিয়েছিল, ফেরবার সময়ে কাইতির কাছাকাছি একটা মাঠে দেখল প্রচুর ভিড় জমেছে এবং ভিড়ের মধ্যে থেকে ঝাঁকড়া চুলের মধ্যে সাদা সুতোর ছড়াছড়ি এক পরিচিত চেহারার ভদ্রলোক মোটা ফ্রেমের মধ্যে অন্যমনস্ক চোখ নিয়ে বেরিয়ে আসছেন। গাড়ি থামিয়ে অতুল তার গিলেকরা পাঞ্জাবির হাতা গুটিয়ে নেমে এল। সে ভারি উদার স্বভাবের মানুষ।

—'আর্যদা না? কেমন আছেন?'

হাসি মুখে ভদ্রলোক বললেন—'আরে চেনা-চেনা লাগছে খুব, প্লেস করতে পারছি না তো ঠিক.....।'

—'আমি ওতুল! সদর বক্সীর ওতুলকৃষ্ণ গুইন।'

—'অতুল! অতুলকৃষ্ণ? ওহো, সেই লাইব্রেরি করতে তেত্রিশ হাজার টাকা দিয়েছিলেন না?' বড় বড় চোখ করে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকেন আর্যশরণ। আত্মগত বলতে থাকেন—'টাকার অ্যামাউন্টটাই বড় কথা নয় অতুলবাবু, দেবার ইচ্ছের মূল্যটা টাকার মূল্যের থেকে অনেক বেশি। আমি আজকের পথনাটকে এটাকেই আমার থিম করেছিলাম। গ্রামের লোকে বেশ নিল কিন্তু! ভারি এনজয় করল, দেখি আবার আমার ট্রুপের ছেলেমেয়েগুলো কোথায় গেল.... আসছি।'

অতুল দেখল, আর্যশরণ ঘোষ তাকে এবং তার সঙ্গে জড়িত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত ঘটনাবলি বেমালুম ভুলে গেছেন।

মাহ ভাদর

শহরের অবিরাম ঘূর্ণমান কর্মচক্রের কেন্দ্রবিন্দু থেকে অনেক দূরে নতুন বাড়ি বানিয়েছেন মুখার্জি-দম্পতি। দূরে দূরে ছোট্ট ছোট্ট বাগানের মধ্যে পুতুলের বাড়ির মতো বসানো বাসগৃহ। সুন্দর, সুন্দর ছাঁদ। লাল টালি, কাচ-ঢাকা বারান্দা, হাঁসের পালকের মতো মসৃণ গা। বেশ লাগে দেখতে। কিন্তু নির্জন। বড্ড নির্জন। রাত আটটার পরই নিশুতি হয়ে যায় একেবারে। বাজার-হাটও একটু দূরে। কিন্তু ভোর-সকালে বহুবিধ গাছপালার সবুজ ছায়াপথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে যাও। প্রাতর্ভ্রমণও হবে, আবার বাজারও হবে। মন্দ কী। মুখার্জি-সাহেব পরিতুষ্ট মুখে চারদিকে চেয়ে গিন্নিকে বললেন, 'কী গো? অসুবিধে হবে খুব?'

'হলেই বা করছি কী?' গৃহিণী ঈষৎ অভিমানের সুরে বললেন।

'কেন? তিন লিটারের ফ্রিজ কিনে দিয়েছি। সব স্টোর করো। ওষুধপাতি, পোস্টেজ—এসবও স্টকে থাকবে। টেকনলজির যুগ। ওয়াশিং মেশিন থেকে, ভ্যাকুয়াম-ক্লীনার থেকে কোন্‌টা নেই? বই পড়ো, বাগান করো আর গান শোনো। টেলিভিশনে সারা গ্লোবের খবরাখবর নাও। যেটা যখন ভালো লাগে। আর সবচেয়ে বড় কথা নির্জনতা, খানদানি নির্জনতা একেবারে। উপভোগ করো। এনজয় করো সেটা।'

মুখার্জি-গিন্নি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বুড়ো বয়স এমনিতেই নির্জন। হাজার মানুষ আশ-পাশে ঘুরলেও মনে হয় কেউ নেই। যাদের সঙ্গে এক স্মৃতি ভাগ করে বাঁচা, তারা সব চলে গেছে। যারা আছে তারা অন্য প্রজাতির জীব যেন। নির্জনতা আর কাকে

বলে? এই নিঃসঙ্গতা যেন পাষাণভার, বুকের ওপর ক্রমশই ভারী হয়ে চেপে বসছে। আর উনি এলেন এখন নির্জতার ওঁপর লেকচার দিতে। দূর দূর!

তা ভোরবেলা সত্যি সত্যিই প্রাতর্ভ্রমণের নাম করে বাজার আর বাজারের নাম করে প্রাতর্ভ্রমণ সারেন মুখার্জি সাহেব। পরনে খাকি শর্টস, হাফহাতা মোটা সুতির ভেস্ট, পায়ে কেডস আর হাতে লাঠি। ঘুরতে ঘুরতে একসময়ে চুরুটটা ধরিয়ে নেন। ফিরে একপট চা নিয়ে দুজনে বসবেন, 'পাটশাক পেয়েছি আজ,' কিম্বা 'একেবারে ফ্রেশ পটল, বুঝলে?' 'খয়রা মাছগুলো ঠিক খাবার আগে কড়-কড়ে করে ভাজবে। এসব জিনিস তুমি শহরে পাবে না। সেখানে তুঁতেয় ভেজানো পটল, শাকে ইনসেক্টিসাইডের গন্ধ, বুঝলে?'

নিঃশব্দে চা ঢালতে ঢালতে স্বামীর যাবতীয় কথা এক কান দিয়ে ঢুকিয়ে আর এক কান দিয়ে বার করে দ্যান মুখার্জি-গিন্নি। তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, এখন পাটপাতা আর ফ্রেশ পটল নিয়ে আদিখ্যেতা ভালো লাগে না তাঁর। টাটকা খয়রা মাছ! হুঁ! মাছের জন্যে তো তিনি মরে যাচ্ছিলেন কি না!

চা খেয়ে বাগানে নেমে পড়েন সাহেব। খুরপি দিয়ে খোঁচাখুঁচি। এটা তুলে ফেলা, ওটা বসানো, ঝারি কিনেছেন একটা। গাছে জল দিতে দিতে মুখ থেকে হাসির ছটা বেরোতে থাকে একেবারে। গিন্নি এই সময়ে খুটুর খুটুর করে গৃহকর্ম আরম্ভ করেন। অল্পসল্প ফার্নিচার। সব নরম কাপড় দিয়ে ঝকঝকে করে মোছেন। কাচগুলো খবরের কাগজের টুকরো জলে ভিজিয়ে পরিষ্কার করেন। উমি আসে, সে বাসন ধুয়ে, ঘরদোর পরিষ্কার করতে থাকে, বলে, 'নতুন করে মোছামুছি আর কী করবো দিদিমা, সব তো পরিষ্কারই আছে গো। থাকতো একটা কচি-কাচা তো হণ্ডুল-মণ্ডুল করে দিত তোমার সব। তখন উমির কাজ বাড়ত।' ন্যাতা টানে আর আপনমনে বকবক করে যায় উমি, সতৃষ্ণ শ্রবণে শুনতে থাকেন মুখার্জি-গিন্নি। উমি কাজ সেরে চলে গেলেই একটু দূরে গুঁড়ি-মেরে-বসে থাকা নির্জনতাটা আবার হুড়ুম করে এসে পড়বে, গ্রাস করে নেবে এই ছোট্ট 'ফ্লাওয়ারি নুক'।

উমি বলে, 'এবার চানটা সেরে নাও গো দিদিমা, আমি কাপড়চোপড়গুলো কেচে, মেলে দিয়ে যাই।'

নিতান্ত অনিচ্ছুকভাবে মুখার্জি-গিন্নি চানঘরে ঢুকে যান। তাঁর রান্না সারতে আর কতটুকু সময় যাবে? দুই বুড়োবুড়ির রান্না। এটা বারণ, সেটা চলে না। পরিমাণও খুব কম। তবে মুখার্জি-সাহেব শৌখিন খুব। নানান রকম খেতে ভালোবাসেন। তাই টুকটাক করে হালকা হালকা খাবার বানান গৃহিণী। পনির অ্যাসপারাগাস, মটর ডালের বড়ি দিয়ে পাটপাতা; মৌরলা মাছের টক, বেগুন-বাসন্তী। এইটুকু একমুঠো বানান। তাইতেই ঢের হয়ে যায়, ঢের। বিকেলে বাসন ধুতে এসে উমি বলে—'তোমাদের যেন পুতুলের ঘরকন্না, এইটুকুনি-টুকুনি বাটিতে কী খাও গো দিদিমা?'

—'কেন ডাল?'

—'ঘন ক্ষীরের মতন করো বুঝি?'

—'দূর, পাতলা সূপের মতো ডাল চুমুক দিয়ে না খেলে খাওয়াই হয় না তোর দাদুসাহেবের।'

উমি, মুখার্জি সাহেব উঁচু দরের দামী মানুষ বুঝে শুধু দাদু বলে না, বলে দাদুসাহেব। আর মুখার্জি সাহেব উমিকে বলেন শেঠ উমিচাঁদ। দিদিমার সঙ্গে কথাবার্তা জমলেই তিনি বলবেন এই যে শেঠ উমিচাঁদ। ষড়যন্ত্র কদ্দূর এগোলো?

বিকেলবেলা রোজই দুজনে হাঁটতে বেরোন। শীতকালে চারটে নাগাদ। গরমকালে আর একটু পরে। তখন সাহেবের পরনে তাঁতের সূক্ষ্ম ধুতি, ফিনফিনে পাঞ্জাবি, কাঁধে চাদর, হাতে রুপো বাঁধানো লাঠি। এটা গরমকালে। শীতে ঢোল্লা গরম কাপড়ের ট্রাউজার্স। গিন্নির বুনে-দেওয়া কার্ডিগ্যান, মাফলার, মাথায় কানঢাকা টুপি। মুখার্জি-গিন্নি কী শীত কী গ্রীষ্ম ধবধবে সাদা বাহারি পাড়ের টাঙ্গাইল শাড়ি। সাদা ব্লাউস। শীতকালে উলের জামা, হাতা-ওলা সোয়েটার আর তার ওপর গরম শাল।

বেরোবার সময়েই চা-টা খেয়ে নেন দুজনে। ফিরে খেলে বড় দেরি হয়ে যায়; রাতে ঘুম হয় না। ফিরে দুজনের কারোই কোনও কাজ নেই। গোল বারান্দায় বসে গান শোনেন মুখার্জি-সাহেব। পুরোনো দিনের গান—কানা কেষ্ট, ভীষ্মদেব, শচীন দেব বর্মণ এইসব। কিম্বা বাজনা শোনেন, মেনুহিনের ভায়োলিন। বিদেশি সব বাখ মোৎসার্ট মেন্ডেলসন-ফন গুচ্ছের কী যেন আছে! একঘেয়ে ঘ্যানঘ্যান ঘ্যানঘ্যান করে বেজে যায়। সাহেবের মন রাখতে বেশ খানিকক্ষণ বসে থাকেন গৃহিণী, তারপর টুক করে উঠে পড়ে গুটিগুটি ঘরের ভেতরে চলে যান। একটু আয়নার সামনে দাঁড়ান। একটু এ ছবি দেখেন, একটু ও ছবি, পিকাসো না কী ছাইভস্ম। অসভ্য ছবি সব। কাঞ্চনজঙ্ঘার লম্বা পোস্টার একখানা—বরফে বরফ। তিনি ফিরে দাঁড়িয়ে বিছানার টান-চাদর আবারও টান-টান করেন তারপর আঁচল থেকে চাবি নামিয়ে আলমারি খোলেন, লকার খোলেন। লকারের ভেতর সোনা-দানা নেই। হীরে-মুক্তো কিছু নেই। রয়েছে কয়েকটা ফটো অ্যালবাম। বাস। যে কোনও একটা নামিয়ে নেন। তারপর খাটের পাশের হেলানো চেয়ারে বসে অ্যালবামের পাতা খোলেন : বেরিয়ে পড়েন রায়বাহাদুর মাখনলাল চ্যাটার্জি। তাঁর বাবা। ইয়া গোঁফ, সুট কোট হ্যাট, একেবারে পুরোদস্তুর সাহেব। রঙটি ছাড়া। তা রঙ তো আর ফটোগ্রাফে বোঝা যায় না! তাঁদের বিয়ের ছবি। বিয়ের পরেই তোলা। ইলাস্ট্রেটেড উইকলিতে দেওয়া হয়েছিল। মুখার্জি-সাহেবের চেহারাটা তখন কত ভালো ছিল! স্বাস্থ্যবান, উজ্জ্বল যুবক। পাশে তিনি, খুব রোগা। গলার হাড় দেখা যাচ্ছে। চুড়িবালা হাতে ঢলঢল করছে। মাথায় ঘোমটা নেই। ঘোমটা খুলে দিয়েছিল ফটোগ্রাফার, 'আজকাল আর ফটোতে ঘোমটা চলছে না।' দেখে শাশুড়ির কী রাগ। 'যতই সাহেব-মেমসাহেব হও, নতুন বিয়ের কনে মাথায় ঘোমটা থাকবে না? এ ছবি দেখলে এ-বাড়ির গুরুজনরা সব বলবে কী?' আবার আলাদা করে ঘোমটা-দেওয়া ফটো তোলা হল। সেই ফটোই বাঁধানো তাঁদের টেবিলের ফটো-স্ট্যান্ডে থাকত।—হাজারিবাগে বাড়িসুদ্ধু সব যাওয়া হয়েছিল, রোজ পিকনিক। রোজ পিকনিক। সেখানে পঙ্কজ মল্লিকের সঙ্গে আলাপ। কত গান, কত গল্প। সেই সব ফটো। অনিরুদ্ধ ঠাকুরপোর ছবি। জ্বলজ্বলে চেহারা, হাসিটা কী! একেবারে জ্যান্ত। চোখের সামনে যেন ভাসছে! চীনের যুদ্ধে মারা গেল। অনেকক্ষণ ধরে ছবিটা খুলে বসে থাকেন মুখার্জি-গিন্নি।

—'আরে কোক খাবে তো ক্যানের কোক খাও', মুখের সামনে ক্যান খুলে ধরছে।

—'আসল জিনিস। খেলেই তফাতটা ধরতে পারবে।' কত জিনিস আনত, দু হাতে উপহার দিত, এনতার খরচ করত। পাতা ওলটালেন মুখার্জি-গিন্নি, একটি ঝুমুঝুমু চুল-অলা শিশু বেবি-ফ্রক পরা, নিদন্ত মুখে হাসছে। এ ছবি অনিরুদ্ধ ঠাকুরপোর তোলা। তলায় লেখা বুড়িমায়ি, পঁচিশে নভেম্বর, উনিশশ তেতাল্লিশ।

খসখস শব্দ, চটি ঘষতে ঘষতে মুখার্জি-সাহেব ঘরে ঢুকছেন। চকিতে গৃহিণী অ্যালবামটা বন্ধ করে দ্যান। ঘরে ঢুকে আড় চোখে অ্যালবামটা দেখেন সাহেব। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেন—'ও সব তো পাস্ট, ইতিহাস নিয়ে কি আর বাঁচা যায় গিন্নি, বাঁচতে হয় বর্তমানে। প্রেজেন্ট কন্টিনুয়াস। এই মুহূর্তে কী হচ্ছে, আমি কী করছি, কেন করছি—এই।'

'বাঁচার দরকারটা কী'। মৃদু, থমথমে স্বরে কথাগুলো বলে মুখার্জি-গিন্নি ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যান। হালকা কী একটা গন্ধ-অলা ট্যালকম পাউডার মাখেন, সেই গন্ধটা অতীতের সুখস্মৃতির মতো ঘরের হাওয়ায় ভেসে থাকে। নিশ্বাস ফেলে মুখার্জি-সাহেব অ্যালবামটা তুলে নেন। অন্যমনস্কভাবে যে কোনও একটা পাতা খুলে ফেলেন। অমনি বেরিয়ে পড়ে কালো গাউন পরা মাথায় ঝালর-অলা টুপি, হাতে গ্র্যাজুয়েশনের সার্টিফিকেটটা পাকানো, এক তরুণী। হাসছে। তলায় লেখা বুড়িমা ১৯৬৫। দেখতেই থাকেন, দেখতেই থাকেন। অবশেষে কাপড়ের খসখস শব্দ পান পিঠে ঝনাৎ করে চাবি ফেলার শব্দ। গিন্নি আসছেন। চট করে অ্যালবামটা বন্ধ করে বিছানার ওপর যেখানে ছিল, সেখানে রেখে দিয়ে, নিজের কামানো গাল পরীক্ষা করতে থাকেন মুখার্জি-সাহেব। যেন ভীষণ চিন্তিত, কাল সকালে দাড়িটা কামাবেন, না কামাবেন না।

গৃহিণী ঢুকে কোনদিকে না তাকিয়ে ঝনাত করে আলমারি খোলেন, কড়াক করে লকারের চাবি ঘোরান, অ্যালবামটা রেখে দ্যান। চাবি বন্ধ করেন পর পর; তারপর বলেন, 'এত তো গান শোনো, গান শুনলে তো জানি মানুষের মনমর্জি নরম-সরম হয়। তা যদি না-ই হয় তো শোনা কেন?' তিনি যত দ্রুত সম্ভব ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান। মুখার্জি-সাহেব জানালার বাইরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। এতোক্ষণ, যে মনে হয় তাঁকে কেউ স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে গেছে।

সকালবেলায় বেরিয়ে একদফা আলাপ হয় স্থানীয় লোকজনদের সঙ্গে। তার মধ্যে সবজিঅলা তাজু, মুরগীঅলা কিষেন, মাংসকাটা আনোয়ার, ডিমঅলা ভুবন এরা আছেই।

'ও সাহেব, পরশু দিনকেই তো মুরগী নিলেন। আজ আমার কাছ থেকে একটু খাসির মাংস নিয়ে যান না।' অনুযোগে অনুরোধে মিশিয়ে আনোয়ার বলে।

'আরে বাবা, রেড মীট আমাদের চলে না। মুরগী, তা-ও তোর দিদিমা খায় না। তবে নেবো, নেবো। বাড়িতে লোকজন এলে দেখবি নিয়ে যাব।'

'কবে তোমার বাড়ি লোক আসবে?' কাঁচা গলায় ডিমঅলা ভুবন বলে। বারো তেরো বছরের ছেলেটা। ভুবনের কাছ থেকে ডজনখানেক ডিম কিনে সবজি-বাজারের দিকে এবার এগোন মুখার্জি-সাহেব। উদাস গলায় বলেন, 'আসবে, আসবে...।'

ছোট বাজার। যা এলো তা এলো। তার বাইরে আর কিছু নেই। তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। —'বেগুনগুলো কেমন চিকন দেখুন সাহেব' তাজু তার আজকের পসরা নিয়ে বড়াই করে। মামুলি আলু পেঁয়াজ ছাড়া আজ তার কাছে ওই বেগুন।'

—'চিকন তো বলছিস খুব! কানা নয় তো! ভাবিসনি আমি দেখতে পাবো না।' ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেন মুখার্জি-সাহেব। শাকে ভিটামিন, মিনার‍্যালস আছে। টাটকা শাক তিনি রোজ কিনবেন। বাঃ, আজ বড় বড় পালং পাতা রয়েছে। চট করে থলি খুলে ধরেন তিনি। মাছ? মাছ বসেনি? ছোট ছোট পোনা, চারাও নয়, বড়ও নয়। মাছঅলা ভোম্বল বলে, 'একেবারে লাফাচ্ছে দাদুসাহেব, ঝালে খাবেন, ঝোলে খাবেন, ভাজা খাবেন, মুখ ছেড়ে যাবে, তাকত বাড়বে।'

ছোট বাজারের ব্যাপারী। বড় বড় শহুরে বাজারের বিক্রেতাদের ঘমন্ড্ এদের নেই। যত না বিক্রিবাটা হয়, তার চেয়ে বেশি হয় গল্পসল্প, একটু ডাকাডাকি করে মানুষকে বুঝি আপন করে নেওয়া।

বাজারে আসেন আরও দু' পাঁচজন ভদ্রলোক। বিকাশ গাঙ্গুলি, অজয় মান্না, প্রীতম সিংহ, বীরেশ্বর মহাপাত্র। প্রায় সকলেই মুখার্জি-সাহেবের থেকে ছোট। জিনিসপত্রের দর নিয়ে, শহরের ক্রমবর্ধমান দূষণ নিয়ে, সংস্কৃতির হাল নিয়ে আলোচনা হয়। তাঁর থেকে ছোট হলেও দেখা যায় এঁরা তাঁর সঙ্গে একমত হয়ে যাচ্ছেন। শহর থেকে দূরে হওয়া সত্ত্বেও এই জায়গায় বাস করতে এসেছেন দূষণমুক্ত হাওয়া, শব্দহীন দিনরাতের খোঁজে। বিকাশবাবু বলেন— 'আমি তো প্রায় বার্ডওয়াচার হয়ে গেলাম মুখার্জিদা। এতো রকমের যে পাখি আছে, তারা যে শুধু বইয়ের পাতায় থাকে না, বাস্তবেও নড়েচড়ে উড়ে ডেকে বেড়ায়— তা আমার জানা ছিল না। অনেকেরই গাড়ি আছে। প্রীতম তো গাড়ি নিয়েই অফিস করে। ট্রাভল এজেন্সি আছে তার। শহরে চলে যায় হুশ করে। একটা পার্ট-টাইম ড্রাইভার পেলে মুখার্জি-সাহেবও গাড়ি রাখতে পারেন। নইলে আজ কাল আর গাড়ি চালাতে ঠিক ভরসা পান না। তা প্রীতম বলে, 'গাড়ি রাখবেন কেন আঙ্কল, হররোজ তো দরকার হচ্ছে না। কোথাও যেতে হলে প্রীতম আছে। প্রীতমকে ডেকে নেবেন।'

তা এসব আলাপ মুখার্জি-সাহেবের একার। আসল আলাপ-সালাপ হয় বিকেলবেলা। সস্ত্রীক বেড়াতে যাবার সময়ে। তখন মিসেস বিকাশ, মিসেস ও মিস মহাপাত্র, মিসেস মান্না, তাঁর দুরন্ত নাতি— এঁরাও বেরিয়ে পড়েন।

মিসেস বিকাশ একদিন বললেন—'ছেলেমেয়ে সব বিদেশে, বাইরে বুঝি, বউদি?'

মুখার্জি-গিন্নি কিছু উত্তর দেবার আগেই সাহেব বললেন—'না, নেই, আমাদের নেই অণিমা, দুর্ভাগ্য!'

পরে বিকাশবাবু বাড়িতে এসে গৃহিণী অণিমাকে ভীষণ বকাঝকা করেন। শহর ছেড়ে এসেছ বলে কি সভ্যতা-ভব্যতার অভ্যেসগুলোও সেখানে রেখে এসেছো? সেই এক মেয়েলি কৌতূহল—'ছেলে পিলে কটি?' আমার দিদিমা-ঠাকুমাকেও বলতে শুনেছি, মা-মাসিদেরও বলতে শুনেছি, আর আমার ডবল এম.এ. গিন্নিকে বলতে শুনছি। ছিঃ!'

অণিমা ডবল এম.এ. মানুষ, মোটেই বকাবকি মেনে নেন না! ঝাঁঝাল গলায় বলেন—'শহুরে সভ্যতার মুখোশ জীবনভর বয়ে বেড়াবে তো তুমিই বেড়াও। আমি মানুষ, মুখোশ নই, বুঝলে? মানুষই মানুষকে এসব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করাকরি করে, পরস্পরকে জানতে। মেয়েলি কৌতূহলেও নয়, আর কাউকে অপদস্থ করতেও নয়।'

তা সে যাই হোক, বকুনিটা অণিমা গাঙ্গুলির ওপর দিয়ে গেলেও, দরকারি খবরটা সবারই জানা হয়ে গেল। মান্নাদের, মহাপাত্রদের, সিংদের, আরও আয়েঙ্গার, সেনগুপ্ত, রায়চৌধুরী যে যেখানে ছিল সব্বার। অরিন্দম মুখার্জি সেন্ট্রাল গভর্মেন্টের বড় চাকুরে, রিটায়ার্ড হবার পরও প্রাইভেট একটা কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন অনেকদিন, ধনশালী লোক, স্ত্রীটি সেকালের গ্র্যাজুয়েট হলেও অতি ভালোমানুষ। এঁদের নেই। নিঃসন্তান। অনিল সেনগুপ্ত বলেন—'এ নিয়ে তোমরা এতো খেদ করছো কেন আমার মাথায় আসছে না ভায়া, আমাদের অনেকেরই তো আছে। আমার তো শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে পাঁচটি। বড় বস্টনে, মেজ অস্ট্রেলিয়ায়, সেজ বোম্বাই, বড় মেয়ে ডেড অ্যান্ড গন, ছোটটি কানেটিকাট তা হরে-দরে তো সেই একই হল, না কি? যাঁহা পাঁচ তাঁহা শূন্য কেমন কি না?'

এই অনিল সেনগুপ্তর বাড়ি নিমন্ত্রণ রাখতে গিয়েই সুরাহাটা হল। অনিলের স্ত্রী সাহানার ছায়ার মতো ঘোরে একটা রোমশ বেঁটে ভুটিয়া কুকুর পুটপুটি। কালো পুঁতির মতো চোখ হালকা খয়েরি রঙের লোমের ক্লোকটি পরে সে সারা বাড়ি ঘুরে বেড়ায় আর ছোট্ট একটি নাতিপুতির মতো সাহানার আঁচল কামড়ে থাকে। লোকজন এলে কিছু দূরে চলে যায়। এবং থাবায় মুখ রেখে পিটপিট করে চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকে। একটুও হিংসে-বিদ্বেষের লক্ষণ নেই। অভ্যাগতরা যতক্ষণ থাকবেন সে এইরকম সভ্য-ভব্য হয়ে থাকতে থাকতে এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়বে। এবং তাঁরা চলে গেলেই গোলাপি জিভ বার করে বিশাল হাই তুলে আবার সকর্মক হবে। সাহানাই পরামর্শটা দিলেন—'আচ্ছা দাদা, আপনারা তো থাকেন একটেরে, একটা কুকুর পুষুন না! কুকুর যে কী ভালো সঙ্গী! কুকুরের স্নেহমমতা, বিশ্বস্ততা, এসব যে কী দুর্লভ গুণ, যারা কুকুর না রেখেছে বুঝতে পারবে না। আপনাদের কখনও কুকুর ছিল না?'

মিসেস মুখার্জি বললেন, 'না সাহানা। কুকুর আমার বরাবর কেমন ভয়, ঘেন্নাও বলতে পারো। কখনও পুষি নি।'

'মুখার্জিদা আপনি?'

'আরে আমার তো ভালো লাগে। কিন্তু এ সব ব্যাপারে গিন্নির ইচ্ছায় কর্ম। বুঝলে কি না?'

সাহানা বললেন, 'ও সব বললে শুনছি না, কুকুর আপনাদের একটা কিনিয়ে দেবোই। পরে আমাকে আশীর্বাদ করবেন।'

সেই হাজরা রোডে জহর দাসের বাড়িতে আসা। অনিল সেনগুপ্তর অ্যামবাসাডর চড়ে। বেল বাজাতেই ভেতর থেকে ভৌ ভৌ, ঘাউ ঘাউ, কৌ কৌ—সারমেয়দের অর্কেস্ট্রা। দোতলার জানলায় জানলায় কৌতূহলী সারমেয়কুল ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। একজন আবার মুখ ঝুঁকিয়ে দিয়েছে, তার নোয়ানো বিঘৎ পরিমাণ ব্রাউন রঙের কান ঝুলছে। দেখেশুনে মিসেস মুখার্জি বললেন, 'বাপ রে!'

সাহানা বললেন,—'ভয় পাবেন না দিদি, ওরা তো সব ঘরে ঘরে বন্ধ। কত রকমের ব্রিড আছে, নিজে দেখে শুনে পছন্দ করে নিতে পারবেন।'

জহর দাস এবং তার স্ত্রী পুতুল তখন সাদা সাদা এপ্রন পরে সদ্যোজাত কুকুর শাবকদের পরিচর্যা করছিল। সে এক এলাহি ব্যাপার। এক একটা বড় বড় লোহার

ক্রিবে, মা কুকুর তার ছানাদের নিয়ে সগর্বে বসে আছে। চারদিকে এমন করে তাকাচ্ছে যেন অমন কাজটি ভূ-ভারতে আর কেউ কস্মিন কালে করেনি। ওঁদের দেখে জহর দাস শ্রীমতী পুতুলের হাতে সবকিছু ছেড়ে তাঁদের সঙ্গে চলে এলেন।

'কী রকম কুকুর চান? পেট টাইপ? না প্রহরী কুকুর? চোর ডাকাত তাড়াবে, বদলোক ঢুকতে দেবে না। কী রকম?'

—দু তিন মাসের অ্যালসেশিয়ান বাচ্চা দেখালেন।

'এর আসল নাম জার্মান শেফার্ড ডগ, বুঝলেন? সবচেয়ে পপুলার এখন। ট্রেনিং দিন। দুর্দান্ত পুলিশ ডগ হয়ে দাঁড়াবে। ভালোবাসুন, খেলা করুন, সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরোন, একেবারে বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য বন্ধু।'

'বাচ্চাটাকে তো বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। বড় হলে কী রকম দাঁড়াবে বলুন তো?'

একটা ঘরের দরজা খুললেন জহরবাবু, একটা উঁচু লম্বা ভারী কুকুর দৌড়তে দৌড়তে এগিয়ে এলো। —কিচ্ছু করল না, খালি মুখ নিচু করে আগন্তুকদের শুঁকতে লাগল।

—'এই রকমটা দাঁড়াবে, এটাই বাবা বাচ্চাটার। সাতষট্টি আটষট্টি পাউন্ডের মতো ওজন হবে।'

'ওরে বাবা' মুখার্জি-গিন্নি বলে উঠলেন,—'অ্যালসেশিয়ান আমি কোনদিনও দু-চোখে দেখতে পারি না। নেকড়ের মতো। কেমন হিংস্র দেখতে। তার ওপর অত ওজন, আমি সামলাতে পারব না বাপু।'

জহর দাস হেসে বললেন, 'আপনি যদি বাচ্চা-কাচ্চার মতো নিয়ে, আদর করে আনন্দ পেতে চান আবার এ-ও চান বাড়িতে ইঁদুর আরশুলা বেড়াল না থাক, যদি চান চোর ডাকাত এলে লড়াই করতে না পারুক অন্তত পক্ষে ডেকে আপনাকে জাগিয়ে দেবে তাহলে আপনার জন্যে আইডিয়াল কুকুর হবে মাসিমা আইরিশ টেরিয়ার। সঠিক নামটা হবে গ্লেন অব ইমান টেরিয়ার। খুব রেয়ার ডগ, মানে আমাদের এখানে। টেরিয়ার আমার কাছে দুটো বাচ্চা এসেছে, একটা রাজ্যপালের জন্যে তাঁর এডিকং নিয়ে গেছেন, আর একটা আছে আপনাকে দেখাচ্ছি।'

নীলচে ছাই-ছাই রঙের একটা ছোট্ট গোল্লামতন দেখালেন জহরবাবু। বললেন 'পেট ডগ, বিশেষ করে যেগুলো টয় টাইপ, সবই খুব লোমশ হয়। টিবেটান অ্যাপসো, কি টেরিয়ার, ওয়েস্ট হাইল্যান্ড টেরিয়ার, পিকীনিজ, পামিরেনিয়ান, স্পিৎজ্। লোম নিয়ে উস্তম-খুস্তম হয়ে যাবেন। এটারও লোম আছে, ন্যাড়া টাইপের কুকুর মোটেই নয়, অথচ ম্যানেজেব্ল্। ভীষণ মজাদার, কেজো কুকুর। এটাকে মানুষ করতে আপনার কোনও অসুবিধে হবে না। ভালোবেসে ফেলবেন। বড্ড ভালোবাসবেন। বিচ কিন্তু।'

—'বিচই ভালো' বলে বেতের টুকরি সুদ্ধু নরম স্পঞ্জের গদীতে উলের বলটি তুলে নিলেন মুখার্জিগিন্নি। সাহানা বললেন, 'আমাদের পুটপুটিটার সঙ্গে মিলবে ভালো। ওটাও বিচ। খেলবে এখন দুজনে খুব।' ছাপানো কুকুর-পালন-বিধি নিয়ে ফিরে এলেন মুখার্জি দম্পতি।

'ফ্লাওয়ারি নুক'-এর ফ্লাওয়ারগুলি আছে ঠিকই। কিন্তু 'নুক'টি এখন ঝুপলির হয়ে গেছে। ঝুপলি, সেই নীলচে ছাই রঙের গোল্লাটা পেট উলটে বোতলের দুধ খায়। ছোট

বাচ্চাদের মতো সামনের দুই থাবা দিয়ে বোতল আঁকড়েও ধরে কখনও কখনও। মোটা তুলোর বিছানায় বেতের দোলনায় শোয়ানো হয় তাকে। পিচ পিচ করে হিসি করে বড় কম্মো করে, সেখানকার তুলোটুকু ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়। ঝুপলির উন্নতি হয়, ঝুপলি নিজের কট থেকে ঝাঁপিয়ে নামে, লুটোপুটি খায়, খাটের পায়া কামড়ে ধরে, নিউ মার্কেট থেকে তার জন্যে টীদিং রিং আনা হয়। ডগ বিস্কিট আসে। খেলবার জন্যে বল আসে, ছোট বড়। খেলনা আসে। ঝুপলিকে কোলে নিয়ে মুখার্জি-মা বসেন চোখ বুজিয়ে, মুখার্জি-বাবা পা চেপে ধরেন। প্যাঁট করে ইনজেকশন ফোটানো হয়। পাউডার সাবান, বুরুশ, চিরুনি দুতিন রকম। অ্যান্টিসেপটিক। বোরিক তুলো, পেরোক্সাইড ভিনিগার। ক্রমশ নীলচে ছাই লোমে ছেয়ে যায় শরীর, মুখ। তার মধ্যে থেকে থ্যাবড়া কালো নাকটা বেরিয়ে থাকে। বোকার মতন কুতকুতে চোখ। বেঁটে লোমশ, খাড়া ল্যাজ নড়ে। মুখার্জি সাহেব তাকে সপাটে ওপরে ছুঁড়ে দ্যান, লুফে নেন, আবার ছুঁড়ে দ্যান। রই রই করে ছুটে আসেন গিন্নি! 'কী করছো? কী করছো? তোমার বদভ্যেস কি কখনও যাবে না? অত উঁচু থেকে পড়ে গেলে মানুষ বাঁচে?'

—'প্রতিমাদেবী, এটা মানুষ বাচ্চা নয়,' ঝুপলিকে লুফে নিতে নিতে মুখার্জি সাহেব বলেন!

'আর মানুষ বাচ্চাদেরও এমনি করে লোফালুফি করতে হয়, নার্ভ স্ট্রং করবার জন্যে, কুকুরের তো কথাই নেই!'

—'সব সময়ে অত কুকুর-কুকুর করবে না তো! কুকুর বলে কি মানুষ নয়!' সযত্নে ঝুপলিকে কোলে তুলে প্রতিমাদেবী বেরিয়ে যান।

মুখার্জি সাহেব ভারি মজা পেয়ে হাসতে থাকেন, 'কুকুর বলে কি মানুষ নয়? সত্যিই তো কুকুর বলে কি এটা মানুষ নয় নাকি?'

মাস তিনেকের বাচ্চা যখন, তখন থেকেই কুকুর-পালন বিধি দেখে দেখে ঝুপলির ট্রেনিং আরম্ভ হয়ে যায়। নরম সোয়েডের কলার তৈরি হয় তার জন্যে বিশেষ অর্ডার দিয়ে। তার সঙ্গে স্টীলের চেন। আনব্রেকেবল গোল ফুলকাটা বোলে ঝুপলি পরিজ খেল, চকচক করে জল খেল, এইবার মুখার্জি সাহেব ডাকবেন—'ঝুপলি কলার। ঝুপলি কলার।' কলার পরতে ঝুপলির ভীষণ আপত্তি। সে দূর থেকে বোকার মতো চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।

প্রতিমা বলবেন 'পরে নাও ঝুপলি, ল-ক্ষ্মী মেয়ে, কী সোনা মেয়ে গো! ও তো গয়না! বাবা গয়না কিনে দিয়েছে! ঝুপলি আরও বোকাটে চোখ করে পিছু হটে। মুখার্জি সাহেব বলেন—'ওভাবে মানুষের মেয়েকে বলার মতো বললে হয় না আজ্ঞে! 'ও তো গয়না! বাবা গয়না কিনে দিয়েছে!' হুঃ, খুব বুঝল ও, গয়নার লোভে লসলস করছে কি না! কিছু শেখাতে হলে সোজাসুজি গম্ভীর, কঠিন গলায় নির্দেশ দিতে হবে, সম্ভব হলে মনো সিলেবল, যেমন সিট ডাউন—ডাই সিলেবলও চলতে পারে, কিন্তু ভেঙে ভেঙে উচ্চারণ করতে হবে। যেমন—'ঝুপলি, কলার প-রো', গম্ভীর কড়া গলায় বলে কলারটা সামনে ধরে নাচাতে লাগলেন মুখার্জি-সাহেব, হঠাৎ এক পা দু'পা করে এগিয়ে এসে ঝুপলি কলারের ফাঁসের মধ্যে মাথাটা গলিয়ে দিল। ইতি উতি তাকাচ্ছে। ঠিক করেছে কিনা বুঝতে পারছে না এখনও। মাথায় কিস্যু নেই।

তখন তাকে প্রচুর আদর করতে হয়, গলায় খুশি ঢেলে দিতে হয় বুঝলে? যাতে সে বোঝে এই রকম আচরণ করলেই সে ভালোবাসা পাবে, হাততালি পাবে। এই দেখো লেখা আছে—'ল্যাভিশ প্রেইজ অন হিম হোয়েন হি রেসপন্ডস টু কমান্ড', এসব ট্রেনিং-এর অঙ্গ। জহরের বইটা ভালো করে পড়ে দেখো না। তোমাকে তো তাই-ই করতে বললুম।' 'এইবার তোমার ওই লক্ষ্মী মেয়ে, সোনা মেয়েগুলো প্রাণভরে ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে পারো' বিজয়গর্বে স্ত্রীর দিকে চেয়ে মুখার্জি বলেন।

'আমার ভারি বয়ে গেছে।' গিন্নি উঠে যান।

'নাগ হয়েছে নাগ?' ছি! ছি! ছি! মানী মানতে শেখেনি, মানী মানতে শেখেনি' বলে মুখার্জি সাহেব তাঁর বয়স-টয়স ভুলে গিয়ে আঙুলে তুড়ি দিয়ে দিয়ে নাচেন, ঘুরে ঘুরে নাচেন। গিন্নিকে খেপাবার এই নতুন উপায় খুঁজে পেয়ে তিনি যারপরনাই আহ্লাদিত। তাঁর রকম দেখে ঝুপলি তার কচি গলায় ডাকে পৌ পৌ পৌ, গলার চেন ঝনঝনিয়ে সে-ও দু'একটা পাক খেয়ে নেয়। কিন্তু নাচে তার মুখার্জি-কর্তার মতো প্রতিভা নেই, দেখা যায়।

উমি এসে বলে—'ও দাদুসাহেব কী করছো গো? দিদিমা যে কাঁদতে নেগেছে।'

'অ্যাঁ?' সাহেবের নাচ থেমে যায়।

কুকুর বগলে তিনি তৎক্ষণাৎ দিদিমার উদ্দেশে রওনা হন।

খাবার টেবিল সামনে নিয়ে চোখে আঁচল দিয়ে দিদিমা বসে আছেন।

'কী হল? আরে বাবা, কুকুর যখন তোমার আদেশ ঠিকঠাক পালন করতে পারবে?'

'আমার পড়েও কাজ নেই, কিছু করেও কাজ নেই!' গিন্নি একই রকম থমথমে মুখে বসে থাকেন।

'তবে রইল তোমার ঝুপলির মর্নিং ওয়াক, সে মোটা হিপো হোক, তার গেঁটে বাত ধরুক, আমার কী, ঝুপলিকে গিন্নির কাছে টেবিলের ওপর বসিয়ে দিয়ে সাহেব চলে যান। আর কুকুরটাও এমনি পাজি যে পৌ পৌ করে দুবার ডেকে মায়ের কোলের ওপর লুটোপুটি খেয়েই লাফাতে লাফাতে ছোটে মুখার্জি সাহেবের পিছু পিছু, পেছনে চেন লুটোচ্ছে।

'কী বিচ্ছু দেখো দিদিমা,' উমি চেঁচায়, 'ওই যে জানে দাদুসাহেব বেই বেই যাবে?'

'ওরা ওইরকমই। মায়ের থেকে আদর যত্ন সেবা সব আদায় করবে। আর হবার বেলায় হবে বাপ-সোহাগী; গভীর খেদের সঙ্গে দিদিমা উচ্চারণ করেন।

উমি বালতিতে ন্যাতা ডুবিয়ে বলে—'তা যদি বলো দিদিমা, ব্যাটাছেলে হয়েও দাদুসাহেব 'ঝুপলির জন্যে কম করে না। দৌড়োদৌড়ি ছোটাছুটি, খেলা দেওয়া। মুখের গোড়ায় খাবারটি যেমন বোঝে, ঘুমের সময় কোলটি যেমন বোঝে, খেলাটিও তো তেমন ষোল আনার জায়গায় সতেরো আনা বোঝে কি না! একটা মানুষের বাচ্চার সঙ্গে তফাত কী?'

হঠাৎ বুকটা চেপে ধরেন মুখার্জি গিন্নি প্রাণপণে। বুকের মধ্যে যেন তীক্ষ্ণ লৌহশলাকা ঢুকিয়ে দিয়েছে কেউ। না না, সত্যিই, মানুষের বাচ্চার সঙ্গে কোনও তফাতই নেই। কোনই তফাত নেই।

আনোয়ারের আজকাল মুখে খুশি ধরে না। মুখার্জি সাহেব নিয়মিত মাংস কিনছেন।

হাড়-হাড় দেখে মাংস বেছে দেয় আনোয়ার। মেটুলি, কিডনি একেক দিন। মুরগীঅলা কিষেণের দিন খারাপ যাচ্ছে। তাকে মুখার্জি সাহেব ধৈর্য ধরে বোঝান—তাঁর নিজের জন্যে আর কতটুকু লাগে। দিদিমা যে খায় না। আর ঝুপলি? কক্ষণো ওদের মুরগী দিতে নেই। সরু সরু হাড় যদি একবার পেটের ভেতরে চলে যায় তো ইনটেসটিন ফুটো হয়ে যাবে একেবারে। তখন অক্কা। '—নলি নলি হাড় দিস, বেটি চিবোক, যত পারে চিবোক'—তিনি আনোয়ারকে নির্দেশ দ্যান। বেছে বেছে গাজর কেনেন, বাঁধাকপি কেনেন, পালং শাক, কলমি শাক। ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থ যেন কম না হয়ে যায় ঝুপলির শরীরে।

ইতিমধ্যে মুখার্জি গিন্নিরও বিজয় গৌরবের কারণ ঘটে। তিনি প্রথম থেকেই ঝুপলির পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা শুচিতা সম্পর্কে খুব সজাগ। প্রত্যেকবার খাবার পর তুলো জলে ভিজিয়ে মুখ মুছে দ্যান। ঝুপলির দাঁত মাজার দরকার নেই শুনে তিনি আকাশ থেকে পড়েছিলেন। মানতেও চান নি। কিন্তু তাঁর স্বামী যখন কিছুতেই দাঁত মাজাতে দিলেন না তখন তিনি জল আর পেরোক্সাইডে মিশিয়ে তাতে তুলো ভিজিয়ে রোজ রাতে একবার করে ঝুপলির দাঁত পরিষ্কার করে দিতে থাকলেন। ঝুপলি হেগো পেছনে থাকবে এ-ও তিনি কিছুতেই বরদাস্ত করতেন না। তুলো ভিজিয়ে তার শৌচকার্য সম্পন্ন করতে লাগলেন। মুখার্জি সাহেব যতই ব্যঙ্গের হাসি হাসুন। আর খেপান, এ কাজগুলো তিনি করবেনই। উমি পর্যন্ত তাঁকে বোঝায় 'আচ্ছা দিদিমা, ধরো তুমি কোনদিন পারলে না অদড় হলে তখন? কে ওকে ছুঁচিয়ে দেবে? কে দাঁত মাজাবে? ভগবান ওদের ওমনি করেই গড়েছেন, দাঁত মাজবার, ছোঁচাবার দরকার হয় নাকো।'

শুনে দাদুসাহেব বলেন '—উমিচাঁদ একটা মুখ্যু মেয়ে যা এতো সহজে বুঝে গেল, তুমি ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশনের গ্র্যাজুয়েট হয়েও তা বুঝলে না গিন্নি; তোমাকে আর উর্মিচাঁদকে দেখেই আমি খুব ভালো করে বুঝতে পারি— নলেজ ইজ ইনস্টিংটিভ, ইট কান্ট বি অ্যাকোয়ার্ড।'

তা সে যাই হোক তার মুখার্জি-মায়ের গর্বোল্লাসের উদ্রেক করে একদিন ঝুপলি ঝুম ঝুম করে বাগানে দৌড়ে গেল। ঝুপলি কোথায় গেল? ঝুপলি কোথায় গেল? দেখা গেল ঝুপলি বাগানের মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে সযত্নে তার বড়-বাইরে চাপা দিচ্ছে।

'দেখেছো? দেখেছো। কী রকম ট্রেনিং। কাজটা যে খারাপ, জিনিসটা যে নোংরা ও ঠি-ক বুঝতে পেরেছে।' মুখার্জি গিন্নি বলে ওঠেন।

রে রে করে ওঠেন মুখার্জি-কর্তা 'জিনিসটা নোংরা না হয় স্বীকার করছি প্রতিমা যদিও জিনিসটা আমরা প্রত্যেকে দেহের ভেতরে বইছি। কিন্তু কাজটা খারাপ, মানে? কাজটা তাহলে না করাই ভালো বলছ? ঠিক আছে উমিচাঁদ, তোকে ভার দিয়ে রাখলুম, পাহারা দিবি কাল থেকে তোর দিদিমা যেন খারাপ কাজটা না করে।'

উমি হি হি করে হাসতে থাকে। প্রতিমা বলেন 'বুড়ো যে হয়েছ, সেটা অসভ্য কথা শুনলেই বোঝা যায়। যার যত বয়স তার তত অসভ্য-মুখ!'

এরই মধ্যে আবার ছোট্ট একটু অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটে গেল। সাহানা সেনগুপ্তদের কুকুর পুটপুটি, আর প্রতিমা মুখার্জিদের ঝুপলি বিকেলের দিকে একই সঙ্গে বেড়াতে যায়। বেড়িয়ে টেড়িয়ে হয় মুখার্জিদের বাড়ির গোল পোটিকোতে, নয় সেনগুপ্তদের

বাগানে দুই দম্পতি কুকুর নিয়ে বসে আড্ডা দ্যান। এ সময়টা কুকুরদের চেন, কলার সব খুলে নেওয়া হয়। কলারটা খুলে সযত্নে গলাটা ক্রিম দিয়ে তবে ঝুপলিকে ছেড়ে দ্যান মুখার্জি সাহেব। দুটো কুকুরে মিলে কৌ কৌ পৌ পৌ করে, লুটোপুটি খায়, এ ওর পেছনে দৌড়য়। 'এক দিন দেখা গেল ঝুপলি তীরবেগে দৌড়চ্ছে। কী? না একটা ধেড়ে ইঁদুর। দেখাদেখি পুটপুটিও দৌড়লো। কিন্তু ঝুপলি একটা টেরিয়ার, তার ভেতরের জিন তাঁকে ইঁদুর ভোঁদড় শিকার করতে শিখিয়ে দ্যায়। অপর পক্ষে পুটপুটি একটা চূড়ান্ত অলস ও সুখী কুকুর—দিবারাত্র পাখার তলায় শুয়ে হ্যা হ্যা করে আর থাবা পেতে ঘুমোয়। সুতরাং অবিলম্বে ঝুপলি ইঁদুর ধরে। আছড়ে মেরে ফেলে। মুখার্জি সাহেব মন্তব্য করেন—'দ্যাখো সাহানা, পুটপুটির মা বিদ্যেয় ঝুপলির মায়ের থেকে বড় হতে পারে, ঝুপলি কিন্তু পুটপুটিকে অনায়াসে হারিয়ে দিয়েছে।' ইতিমধ্যে ঝুপলি তার জীবনের প্রথম শিকারটিকে পরম পরিতোষ সহকারে খেতে শুরু করেছে। এবং প্রতিমা চেঁচিয়ে উঠেছেন—'ম্যাগো, ঝুপলি এই, ঝুপলি—তুই কি খেতে পাস না যে ওইসব নোংরা! ছি ছি ঝুপলি খায় না। না না।' ঝুপলি ভেবলে গিয়ে একবার মুখ তুলে মা বাবার দিকে তাকাল, কেন যে মা তাকে বাহবা দেওয়ার পরই হঠাৎ এমন কঠোর হয়ে গেছে তা সে বুঝতে পারল না, এবং না পেরে ইঁদুরটিকে চেটেপুটে খেয়ে নিল। পুটপুটি তখন অনেক দূরে বসে পিট পিট করে দেখছে।

সাহানা বললেন, 'ঠিকই বলেছেন মুখার্জি দা, কিন্তু কে যে বেশি খানদানী সেটাও স্পষ্ট বোঝা হয়ে গেল। একজন ইঁদুর খায়, আরেকজন ছুঁয়েও দেখে না।' ঠাট্টার সুরেই বললেন সাহানা, কিন্তু পরে দুই দম্পতি যে যার বাড়িতে একা হলে এ নিয়ে বেশ মনোমালিন্য হল। প্রতিমা বললেন—আজে-বাজে জিনিস খাবার ঝোঁকটা ঝুপলি তার বাবা অর্থাৎ মুখার্জি সাহেবের থেকে পেয়েছে। তিনি যে অত শুদ্ধতা, বাছ-বিচার মেনে চলেন সে কি এমনি এমনি? আর সাহানা কোন্ মুখে খানদানের কথা উচ্চারণ করে? পুটপুটিকে ওরা দার্জিলিঙে এক ভুটিয়ার কাছ থেকে কিনেছিল। কুড়ি না পঁচিশটা টাকা দিয়ে। আর ঝুপলি? জহর দাস তো বিগত তিন পুরুষের হিসেব দিল ঝুপলির। ঝুপলির ভাই তো রাজ্যপালের ঘরে মানুষ হচ্ছে। আইরিশ টেরিয়ার। পাওয়াই যায় না এদেশে। তবে?'

ওদিকে সেনগুপ্তদের বাড়িতে সাহানা বললেন—'এম. এ. বি. টি. করা যে এতো দোষের সেটা এই প্রথম জানলুম!' অনিল সেনগুপ্ত বললেন— 'আরে ছাড়ো তো তোমাদের মেয়েলি কুটকচালি!' সাহানা তখন রাগ করে বললেন—'ঠেস দেওয়া কথাটা কিন্তু কোনও মেয়ে বলেনি, একজন পুরুষই বলেছেন এবং তাঁর সত্তরের যথেষ্ট ওপরে বয়স পঁচাত্তর তো হবেই। পেডিগ্রি-ডগ কিনে অহংকারে একেবারে মটমট করছেন। আরে বাবা পরামর্শটা কে দিল? কিনিয়েটা দিল কে?'

ঝুপলি কিন্তু সেনগুপ্ত-পরিবারেরও খুব নেটিপেটি। প্রথম ইঁদুরটি মারার পর থেকে সে নিজেদের বাড়িতে তো বটেই সেনগুপ্তদের বাড়িতেও ইঁদুর মারতে যায়। যদিও আর খায় না। ইঁদুরের স্বাদ তার ভালো লাগেনি। একতলা বাংলো বাড়ি। ইঁদুর-ছুঁচোর উপদ্রব আছেই, উপদ্রব বাড়লে সাহানাই বলেন—'ঝুপলিকে ডাকো তো!' ইনি তো একটি কম্মের ঢিপি।' এই নিন্দাবাদ শুনে পুটপুটি তার ক্রোকের মধ্যে আরও সেঁদিয়ে যায়। অন্তত সাহানার তাই ধারণা। কিন্তু লজ্জা পেলে কী হবে। আরাম, ঘুম এ সমস্ত

ছাড়বার কোনও লক্ষণই সে দেখায় না। সাহানা বলেন—'বেহায়া তো! অপমান হজম করবে, তবু গতর নাড়বে না।'

সেবার পুজোয় বিজয়ার সময় ভারি মজাই হল। বিজয়া দশমীটাই একমাত্র উপলক্ষ্য যখন মুখার্জিদের বাড়িতে প্রচুর জনসমাগম হয়। সব বাড়িতেই হয়। মুখার্জিদের বাড়ি একটু বেশিই। একাদশী থেকে কালীপুজো পর্যন্ত চলে। তা, এইরকম একটা দল সেবার বোধহয় প্রথম আসছে, আশেপাশে জিজ্ঞেস করছে বাড়ির নম্বর বলে। এদিকে পরিকল্পিত পল্লী যেমন হয়, একই রকমের রাস্তা, বাড়িগুলোও মোটামুটি ধাঁচের। কিছুতেই ঠিকানা খুঁজে পাচ্ছে না দলটি, অবশেষে একটি বালক বলল—'ও ঝুপলিদের বাড়ি? ওই তো ডানদিকে গিয়ে বাঁ দিকে ঘুরেই দুটো বাড়ি পরে।'

এঁরা মুখার্জিদের মাসিমা মেসোমশায় ডাকেন। বাড়ি খুঁজে আসা হল, খাওয়া দাওয়া আড্ডা সব হল, শেষে ইতস্তত করে বললেন—'মেসোমশায় কি কোনও বাচ্চা পোষ্য-টোষ্য নিয়েছেন না কি?'

'কেন বলো তো?'

'না। ওইদিকে একটি ছোট ছেলে বলল— কি না ঝুপলিদের বাড়ি।' ঝুপলি তখন গ্যাঁট হয়ে তার মায়ের কোলে বসে বসে কুতকুত করে অভ্যাগতদের দেখছে। এতো বোকার মতো যে দেখলেই হাসি পাবে।

মুখার্জি সাহেব তাকে দেখিয়ে হেসে বললেন—'পোষ্যই বটে। এই যে ইনিই সেই ঝুপলি ঠাকরুণ, যাঁর নাকি এই বাড়ি! সাধ করে নাম রেখেছিলুম 'ফ্লাওয়ারি নুক'। ফ্লাওয়ার্সও মন্দ ফোটাই নি। তিন রঙের জিনিয়া, কলাবতী, রাজ্যের দোপাটি, জবা, লাল, সাদা গোলাপ। কিন্তু হলে কী হবে বাড়ি এখন 'ঝুপলিজ নুক' হয়ে গেছে! একেই বলে ফোকটেল, বুঝলে হে প্রকাশ! আর একেই বলে কপাল!'

এইভাবেই চলছিল। চলছিল ভালোই। বছর বছর ঝুপলির জন্মদিনে পার্টি হয়। সবাই মিলে নানারকম মুখরোচক খাবার ধ্বংস করতে করতে আড্ডা জমে। কিন্তু একদিন প্রতিমা অত্যন্ত অসময়ে অস্বাভাবিক বেগে ছুটে গেলেন সাহানার বাড়ি। দুজনে মিলে ফিসফিস করে কী কথা হল। শেষে সাহানা বললেন, 'অত ভাবছেন কেন বলুন তো? ওরা জানোয়ার, নিজেদেরটা নিজেরা বুঝবে, ওর জন্যে কি এখন আপনি স্যানিটারি ন্যাপকিনের খোঁজে যাবেন, না কি?'

—'কী লজ্জা, কী নোংরা! পাঁচজনের সামনে, ছি ছি!'

'পাঁচজন কোথায় পেলেন দিদি? বাড়িতে তো পুরুষ বলতে এক আপনার উনি। মুখার্জিদার সঙ্গে এতদিন ঘর করলেন সে কি লুকোচুরি খেলে?'

'তোমার যেমন কথা!' প্রতিমা মুখার্জির ভাঁজ পড়া মুখ লাল হয়ে গেল।

'তবে? নিজেই তো দেখে-শুনে বিচ নিলেন? তখন ভাবেন নি যে ইয়ে হবে?'

না সত্যিই ভাবেন নি প্রতিমা। কেন নিয়েছিলেন? কেন স্ত্রী-জানোয়ারের প্রতি এই পক্ষপাতিত্ব? কেন? কেন? জহর দাস যখন, বলল—'বিচ কিন্তু।' তিনি তো আর পাঁচটা দেখতে চান নি, একেই তুলে নিয়েছিলেন। ঝুমুঝুমু চুল, পশমের গোল্লার মতো, যেন নীলচে ছাই রঙের ফারকোট পরে আছে। কাশ্মীর থেকে কিনেছিলেন এটা! ছোট্ট ফারকোট। সাদা জুতো বকলশ দেওয়া। বড় হয়েও, যখন বি.এ. পাশ করে এম.এ-

পড়ছে সে তখনও অমনি ছোট্টখাট্টো, মিষ্টি, কোঁকড়া পিঠ-ছাপানো চুল! বুকের ভেতর থেকে ডাকটা পাথর ঠেলে বেরিয়ে পড়ছে বুড়ি, বুড়িমা! প্রতিমা প্রাণপণে চাপবার চেষ্টা করেন, মুখ চোখ সে চেষ্টায় একবার লাল তারপর ফ্যাকাশে হয়ে যায়, যেন পাথর গিলছেন। চোখে অন্ধকার। সাহানা বলেন— 'কী হল দিদি!' শরীরটা হঠাৎ খারাপ লাগছে না কী? আর শরীরের বা দোষ কী? যা গরমটা পড়েছে। কথায় বলে ভাদুরে গুমোট।' সাহানা ঠাণ্ডা জল আনেন; কপালে বরফ বুলিয়ে দ্যান! সামলে উঠে আস্তে আস্তে বাড়ি ফিরে আসেন প্রতিমা।'

'ঘেউ ঘেউ ঘেউ!' রাস্তায় কতকগুলো নেড়ি কুত্তা তাঁর পেছু নেয়। দূর! দূর! প্রতিমা কোনমতে বাড়ি ফিরে আসেন। বাড়ির গেটের কাছে এসে নেড়ি কুত্তাগুলো দ্বিগুণ জোরে ডাকতে থাকে 'ঘেউ ঘেউ ঘেউ।'

'আ-মর—মোলো যা'—উমি বাগান থেকে ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে মারে—'দূর দূর দূর' যায় না নেড়িগুলো। যদি বা অন্যগুলো যায় একটা কিছুতেই যায় না। গেরুয়া আর কালো মেশানো রঙ, বেশ হৃষ্টপুষ্ট। পাত কুড়নো খেয়েও। গেট টপকাবার চেষ্টা করে, ডাকতে থাকে ঘেউ ঘেউ ঘেউ। খাবার ঘরের কোণে কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়েছিল ঝুপলি। তার ছোট ছোট কানগুলো খাড়া হয়ে ওঠে, সে একবার সাড়া দেয়—কৌ।

—'ঘৌ ঘৌ ঘাউ!' ওদিক থেকে ভেসে আসে।

তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে ঝুপলি—কৌ, খৌ, ঘৌ, ঘৌ—সে তিরবেগে গেটের দিকে ছুটে যেতে থাকে। মুখার্জি সাহেবের সমস্ত শরীরের জোর লাগে তাকে কোলে তুলে নিয়ে আবার খাবার ঘরে আনতে, কলার এবং চেন বেঁধে আটকাতে। আটকাবার পরও ঝুপলি মেঝেতে গড়াগড়ি দেয়, আকুলি-বিকুলি করে এবং ডাকতে থাকে কৌ, কৌ, ভৌ। যদিও নেড়িটাকে ততক্ষণে নির্ভীক উমিচাঁদ তাড়াতে তাড়াতে পাড়া পার করে দিয়ে এসেছে।

মুখার্জি সাহেব জরুরি বৈঠকে বসেন সেনগুপ্তের সঙ্গে। সেনগুপ্ত বলেন—'আমার পুটপুটিটা যদি পুং হত তো কথাই ছিল না। দুটোতে কেমন চমৎকার মিলও। আহা জানোয়ারদের জগতে যদি হোমো থাকত দাদা।'

মুখার্জি চুরুটে টান দিয়ে বলেন—'না অনিল, কথাটা তুমি লাইটলি নিও না।'

অনিল সেনগুপ্ত বলেন—'আচ্ছা রাত্তিরের দিকে সব চুপচাপ হয়ে গেলে একটা খুব গম্ভীর কুকুরের ডাক শুনি যেন। কোথায় বলুন তো? দাঁড়ান আমি খোঁজ নিই।'

দু চারদিন পরে খোঁজ খবর করে এসে অনিল সেনগুপ্ত বলেন—'চলুন দাদা আপনার সমস্যার সমাধান বোধহয় হয়ে গেল। যশবন্ত কাপুর বলে এক পাঞ্জাবি থাকে ওদিকে। অ্যালসেশিয়ান। আপত্তি নেই তো?'

—'আরে বাবা জাতে খানদানি হলেই হল। অ্যালসেশিয়ানই হোক আর তোমার ডালমেশিয়ানই হোক।'

বিকেলের দিকেই ঘটকালি-অভিযান শুরু হল। প্রতিমা যেতে চান নি।

—'যত সব অনাছিষ্টি কাণ্ড!' সাহানা পুটপুটিকে নিয়ে হাওয়া খেতে বেরোবেন। অগত্যা অনিল সেনগুপ্ত একাই মুখার্জিদাকে সঙ্গ দেন। মুখার্জি সাহেবের পাশে পাশে হেঁটে চলে শেকল-বন্দী সদ্য রজঃস্বলা ঝুপলি।

যশবন্ত কাপুর সাদরে গেট খুলে দ্যান—'আই য়ে আই য়ে মুখার্জিসাব, আই য়ে সেনগুপ্তা সাব, ইয়ে তো আপকীই কোঠি হ্যায়। বইঠিয়ে, আরাম কিজিয়ে।' লনের মাঝখানে বেতের চেয়ার টেবিল পাতা। কেতাদুরস্ত বেয়ারা এসে লস্যি দিয়ে যায়। বেয়ারাকে নির্দেশ দেন যশবন্ত কাপুর—রোভারকো ছোড় দো।' সবে দু তিন চুমুক দেওয়া হয়েছে লস্যিতে, পশ্চাৎপটে মিসেস কাপুরকেও দেখা যাচ্ছে হাসতে হাসতে, বিপুল ফাঁদের সালোয়ার কুর্তা পরা সদালাপিনী বেরিয়ে আসছেন, এমন সময় শোনা গেল—'ঘাঁউ ঘাঁউ ঘাঁউ।' অর্থাৎ রোভারকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। পরক্ষণেই সুপুষ্ট পেশীপ্রবাহে বিদ্যুৎ খেলিয়ে দৌড়তে দৌড়তে আসতে লাগল রোভার। রোভার তো রোভারই। বালি-বালি রঙের মাজা শরীরটি। দুই কানের মাঝখানটা কালো, নাক মুখও কালো। ঝকঝকে, বলিষ্ঠ, অভিজাত, মধ্যযুগের বীর যোদ্ধাদের মতো কুকুর রোভার। জামাই করতে হয় তো এইরকম! বাতাসে নাক তুলে যেন কী শুঁকল, তারপর ঝড়ের বেগে ঝুপলির দিকে দৌড়ে আসতে লাগল রোভার। এবং সঙ্গে সঙ্গে মুখার্জি বাবার হাতের শেকল হ্যাঁচকা টানে খুলে টেবিলের ওপর লস্যির গেলাস উলটিয়ে ঝুপলি তার লোম-টোম খাড়া করে দিল ভোঁ দৌড়। দৌড় দৌড় দৌড়। একেবারে এ গলি পেরিয়ে সে গলি পেরিয়ে সে বাড়ি টপকিয়ে সে ফ্লাওয়ারি নুক-এ হাজির। মুখার্জি মা-র কোলের ভেতরে ঢুকে তবে নিশ্চিন্ত।

লনে লস্যির প্লাবন বইছে, দুখানা গ্লাস ভেঙে চৌ-চির হয়ে গেছে। মুখার্জি সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে ক্ষমা-পার্থনা করলেন বারবার।

'ইসমে আপকা ক্যা কসুর হ্যায় জী?' যশবন্ত কাপুর মজা পেয়ে হাসতে লাগলেন।

গম্ভীর মুখে বাড়ি ফিরে এলেন মুখার্জি বাবা, সেনগুপ্ত-কাকা। বাড়ি ফিরতে সাহানা জিজ্ঞেস করলেন—'কী হল?'

সেনগুপ্ত বললেন—'না; রিস্তা নাকচ করে দিলে বেটি! বহোৎ নারাজ।'

'তাই-ই!' সাহানা হেসে গড়াগড়ি খেতে লাগলেন সব শুনে!

মুখার্জিদের পক্ষে কিন্তু ব্যাপারটা খুব হাসির রইল না। তাঁরা ঝুপলিকে সাধারণত ছেড়ে রাখতেই পছন্দ করেন। খুব ভালো মেজাজের কুকুর। কাউকে বিরক্ত করে না, কামড়ায় না। ঘরদোর নোংরা করে না, গেট বন্ধ আছে, তার চত্বরের মধ্যে যত খুশি ঘুরে বেড়াক না। চেন পরবে একমাত্র বেড়াতে যাবার সময়ে। ঝুপলি তার এ স্বাধীনতা উপভোগ করে, অপব্যবহার করে না কখনও। মুখার্জি সাব বিকেলবেলা তাকে বেড়াতে নিয়ে যাবার সময়ে ডাকাডাকি করেও পেলেন না। আশ্চর্য! ঝুপলি তো বাড়ির মধ্যে নেই। আতিপাতি খুঁজেও তাকে পাওয়া গেল না। এ বাড়ি ও বাড়ি খোঁজা শেষ করে, উদ্বেগে হতাশায় কালো হয়ে দুজনে বসে আছেন, এমন সময়ে দেখা গেল ঝুপলি ফিরছে। গেটের ফাঁক দিয়ে গলে এলো। আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলো। বাবা কিছু বলছেন না, মা কিছু বলছে না। ঝুপলি ভেতরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল সে তার চেনটা মুখে করে আনছে। বাবার পায়ের কাছে চেনটা রেখে দিয়ে সে চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইল। বোকা বোকা কুতকুতে চোখদুটো বাবার চোখের দিকে চেয়ে স্থির। প্রতিমা ধীরে ধীরে উঠে ভেতরে চলে গেলেন। মুখার্জি-সাহেব আর্দ্র গলায় বললেন,—'ঝুপলি, ঝুপলি, নটি গার্ল তোমাকে চেন পরতে হবে না, এখন চেন পরালে

তোমার মা ভীষণ কাঁদবে। কিন্তু আর কক্ষনো অমন একা একা বাইরে যাবে না। যাবে না তো?' ঝুপলি তার বেঁটে ল্যাজটা প্রাণপণে নাড়াতে লাগল। তারপর লাফিয়ে বাবার কোলে উঠল, কোলের মধ্যে যদ্দুর সম্ভব কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে বসে আদর খেতে লাগল।

জোর আলোচনা চলছে বাবা আর কাকার মধ্যে। অনিল সেনগুপ্ত বললেন—'জহর দাসকে কনট্যাক্ট করা ছাড়া তো আর উপায় দেখছি না। কেনেল ক্লাবের ব্যাপার-স্যাপার আমরা কিছুই জানি না! ওদের শুনেছি অনেকরকম নিয়মকানুন আছে। গিয়ে শুধু শুধু অপমান হবো কেন? তার চাইতে জহরকে কনট্যাক্ট করি। কিন্তু জহরের তো আবার ফোন পাচ্ছি না।'

তা মানুষটাকে দু দিন সময় দে! জহর থাকে, সে কি এখানে? অনিলের গাড়ি গেছে গ্যারাজে, তারও তো সাতষট্টির কাছে বয়স হল। ওরকম হুড়ুমদুম করলে সে পারে? ঝুপলি দিব্যি সকালবেলা ব্রেকফাস্ট করলো, দুটোর সময়ে আটার রুটি, মাংস, অসময়ের গাজর দিব্যি সব শাঁটালো। তিনটে নাগাদ খুব সম্ভব, দূরে শোনা গেল সেই আওয়াজ ঘেউ ঘেউ, ঘৌ। ঘেউ ঘেউ ঘেউ!

অমনি ভৌ ভৌ! সাড়া দিয়েই ঝুপলি ছটফট করতে লাগল। মুখার্জি-সাহেব রকম দেখে তাকে বেঁধে রাখলেন। প্রতিমা আড়চোখে চেয়ে দেখলেন একবার, তারপর বললেন—'এ ভাবে শাস্তি দেওয়া কেন? কথায় বলে যার যেখানে মজে মন...।

—'তাই বলে একটা পারিয়া ডগ? নেড়ি কুত্তা?' গর্জন করে উঠলেন মুখার্জি সাহেব। প্রতিমা কেঁপে উঠলেন।

ছোট্ট একটু দুপুর-ঘুমের অভ্যেস মুখার্জি সাহেবের। আর্ম চেয়ারে শুয়ে শুয়েই ঘুমোন। চটকাটা ভাঙলে মুখ-টুখ ধোবেন, চান করবেন, পোশাক পরিচ্ছদ পরবেন, তারপর দাঁতে চুরুট কামড়ে চেন হাতে ঝুপলিকে নিয়ে বেরোবেন। বেরোতে গিয়ে দেখলেন, চেন ছেঁড়া পড়ে রয়েছে, ঝুপলি নেই।

বিকেল কাটল, সন্ধ্যে হল, রাত হল, রাত গড়িয়ে ভোর হল ঝুপলি নেই। রাতে দুজনে ঘুমোতে পারেন নি, পোর্টিকোয় বসে কাটিয়ে দিয়েছেন। ভোরের দিকে চেয়ারে বসে বসেই ঢুলেছেন। পরদিন যখন দুপুর কেটে বিকেল হচ্ছে, আকাশে সাজো সাজো রব পড়ে গেছে, গুড় গুড় করে মেঘ ডাকছে, ভরা বাদর শুরু হল বলে, এমন সময় দেখা গেল ঝুপলি ফিরছে! খোলা গেট দিয়ে ঢুকে এলো, কুৎকুতে লোমে-ঢাকা চোখদুটো এদিক ওদিক ঘুরছে, সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে এবার।

মুখার্জি সাহেব গর্জন করে উঠলেন—'গেট আউট, গেট আউট আই সে।'

ঝুপলি ভেবলে গিয়ে তাকাল। তিনি পথ আটকিয়ে দাঁড়ালেন। যেদিক দিয়েই ঝুপলি ঢুকতে যায় তাঁর কেডস্ পরা পা জোড়া সেখানেই গিয়ে দেয়ালের মতো কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। প্রতিমা পেছন থেকে আর্ত গলায় বললেন—'কী করছো? কী করছো? এবার ছেড়ে দাও। অনেক শাস্তি হয়েছে, ওকে ঢুকতে দাও।'

মুখার্জি সাহেব তীক্ষ্ণ গলায় বললেন—'নো'।

গর্জমান আকাশের তলা দিয়ে মুখ নিচু করে ঝুপলি চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরেই আকাশে রোলার গড়িয়ে প্রচণ্ড জোরে বৃষ্টি নামল। জলের প্রবল ছাটে

পোর্টিকো ভিজে যাচ্ছে, উঠে যেতে যেতে প্রতিমা কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন—'দেখো তো কী করলে? এই বৃষ্টিতে কোথায় ভিজে জাব হবে এখন! নিউমোনিয়া না হলেই বাঁচি। মুখার্জি বললেন—'কিস্যু হবে না। কম চালাক নাকি? সেনগুপ্তদের বাড়ি সেঁদিয়েছে দেখবে। পুটপুটির সঙ্গে হয়তো খেলা জুড়ে দিয়েছে।'

—'তাই বলে এই ভীষণ বৃষ্টির মধ্যে এইভাবে বার করে দেবে?'

মুখার্জি-সাহেব দাঁতে চুরুট কামড়ে বললেন—'ওর একটু শিক্ষা হওয়া দরকার।'

—'ওই শিক্ষাই দাও জীবন ভর, আর কিছু দিও না, কিছু দিতে শিখো না', প্রতিমা দ্রুতবেগে স্বামীর এলাকা থেকে দূরে শোবার ঘরের আশ্রয়ে চলে যেতে থাকলেন।

বৃষ্টি থামলে, চকচকে ভিজে রাস্তার ওপর টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে মুখার্জি সাহেব চললেন সেনগুপ্তর বাড়ি। বেল বাজছে। সাহানা খুললেন—'কী ব্যাপার দাদা? আপনি এতো রাতে?'

—'ঝুপলি আসে নি?'

—'কই না তো? বাড়িতে নেই?'

—'নাঃ।'

মহাপাত্রদের বাড়ি গেলেন মুখার্জি—'ঝুপলি? আমার টেরিয়ারটা! এসেছে?'

—'কই না।'

প্রীতমের বাড়ির বেল বাজালেন মুখার্জি। প্রীতম খুলে দিয়েছে—'ক্যা হুয়া আঙ্কল : কুছ গড়বড় তো নহী হুয়া!'

—'ঝুপলি ইজ মিসিং। একটু বকাঝকা করেছিলুম!'

—'ওহ হো' প্রীতম বোকার হাসি হাসল 'কীধর জায়েগী উও, পেট হাউজ ডগ, কোঠী গিয়ে দেখুন, এসে বসে আছে।'

কোঠীই চলে এলেন মুখার্জি। উর্মি খুলে দিল।—'ঝুপলি ফিরেছে রে?'

—'না তো দাদুসাহেব! এই দুর্যোগের রাতে কোথায় গেল বলো তো?'

বাইরের জুতো মোজা ছেড়ে শোবার ঘরে এসে থমকে গেলেন মুখার্জি। প্রতিমা একটা অ্যালবাম বুকে আঁকড়ে মড়ার মতো চোখ বুজিয়ে শুয়ে আছেন। ঠোঁট নড়ছে। বোধহয় জপ করছেন।

তার পর দিনও ঝুপলি এলো না। পর দিনও না। পর দিনও না। কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হল লস্ট কলমে 'এ টুয়েলভ ইঞ্চ হাই ব্লুয়িশ গ্রে আইরিশ টেরিয়ার আনসারিং টু দা পেট নেম অব ঝুপলি ইজ মিসিং সিন্স থার্ড সেপ্টেম্বর....এটসেটেরা এটসেটেরা।' একদিন দুদিন করে পুরো একমাস হয়ে যাবার পর অবশেষে মুখার্জি সাহেব বুঝতে পারলেন ঝুপলি আর আসবে না। এবং প্রিয় মানুষে আর প্রিয় কুকুরে কোনও কোনও ক্ষেত্রে কোনও তফাতই নেই। ঝুপলি তাঁর সমস্ত আদেশ বেদবাক্য বলে মানতে শিখেছিল। মনোসিলেবিক সব আদেশ। 'সিট ডাউন' তো 'সিট ডাউন', 'স্টে পুট' তো 'স্টে পুট', 'গেট আউট' তো 'গেট আউট'। সে এমনটাই বুঝেছে। তার বোকাটে কুতকুতে চোখ, ভোঁতা কালো নাক আর বেঁটে খাড়া লোমশ লেজ নিয়ে ঝুপলি এই নিরাত্মীয় পৃথিবীর বুকে হারিয়ে গেছে।

পোর্টিকোয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষাক্লান্ত মানুষটি শেষে একেবারে ভেঙে পড়েন।

ভাঙা গলায় বলতে থাকেন—'আই ডিডন্‌ট্‌ মীন ইট বুড়ি, ওহ বুড়ি মা, আই নেভার মেন্ট ইট। ইউ জাস্ট কাম ব্যাক অ্যান্ড সি....'

মেঘলা আকাশের তলা দিয়ে ফিরছেন সেনগুপ্ত দম্পতি। দুজনেরই মন খারাপ। সাহানা ভারী গলায় স্বামীকে জিজ্ঞেস করেন—'ঝুপলিকে আবার কবে থেকে বুড়ি মা বলে ডাকা ধরেছেন মুখার্জিদা?'

অনিল সেনগুপ্ত বিষণ্ন মুখে বলেন—'কী জানি!'

অনিকেত

অদ্ভুত একটা কিনকিন কিরকির আওয়াজ করতে করতে দেয়াল ঘড়িতে ভোর চারটে বাজল। অনেকক্ষণ আগেই জেগে গিয়েছিলেন অনিকেত রায়মহাশয়। তিনটে বাজাও শুনেছেন জেগে জেগে। অনিদ্রার রাতে এইসব ঘড়ির আওয়াজ যে কী গা-শিরশিরে হতে পারে অনিকেতবাবুর চেয়ে ভালো তা কেউ জানে না। তবু কী একটা মায়ার বশে ঘড়িটাকে তিনি অবসর দিতে পারেননি। তাঁর দাদামশায়ের ঘড়ি। চমৎকার চলে এসেছে চিরকাল। ঘড়ির এইরকম চলে আসাটাকে কোনও ব্র্যান্ড-নেমের গৌরব মনে করার কোনও কারণ নেই। কত সুইস, কত জার্মানই তো এলো গেল। কে ফাস্ট যাচ্ছে, কে স্লো, কার টাইম বন্ধ হয়ে গেছে। কেউ প্রলাপ বকছে। কিন্তু অনিকেতবাবুর দাদামশায়ের ঘড়ি টিকটাক ঠিকঠাক চলছে। সাত জার্মান জগাই একা, তবুও জগাই লড়ে। এ কৃতিত্ব জগাইয়েরই। আসল কথা কোনও কোনও ঘড়ি যন্ত্র হলেও ঠিক যান্ত্রিক থাকে না শেষ পর্যন্ত। প্রাণ টান গোছের কিছু একটা পেয়ে যায়। জগাই পেয়েছে। এটাকে একটা মির‍্যাক্‌ল্‌ বলা যায়। ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে অনিকেতবাবু খসখসে গলায় বললেন তুই যদি পারিস জগাই তো আমিই বা পারবো না কেন? পেরে যাবো ঠিক। কী বল!

—টিক টক—জগাই বলল।

—টিক টক? ঠিক কথা বলছিস? অনিকেতবাবু বললেন—তা হলে পারি? পেরে যাই? বলতে বলতে সজোরে কম্বলটা সরিয়ে বিছানার বাইরে এক লাফ মারলেন অনিকেতবাবু। পা দুটো ঝনঝন করে উঠল। কিন্তু ওইটুকুই। ফাটা, ভাঙা এসব কিছু হল না। হৃষ্ট মুখে কনকনে ঠাণ্ডা মেঝের ওপর সোজা পায়ে ল্যান্ড করলেন অনিকেতবাবু।

'ডাক্তারেরা কিন্তু বলে থাকে ঘুম থেকে উঠে ছটোপাটি করবেন না। ধীরে সুস্থে কয়েকটি আড়মোড়া ভাঙবেন। ডান কাতে শোবেন, বাঁ কাতে শোবেন, তারপর হাতের ওপর ভর দিয়ে আস্তে উঠে বসবেন, পা ছড়াবেন। এক পা এক পা করে মাটিতে নামবেন। ধীরে ধীরে সোজা হয়ে দু হাত দুদিকে ছড়িয়ে আরও একটি পেল্লাই আড়মোড়া ভাঙবেন। তারপর....'

কে বলছে? কে বলছে কথাগুলো?

অনিকেতবাবু চারদিকে তাকিয়ে হদিস করতে পারলেন না। টিপটিপে বুকে

অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে বুঝলেন এই এস.সি. ডি. বা সুপার কমপ্যাক্ট ডিস্‌ক বাইরে কোথাও নয়, তাঁর নিজের বুকের ভেতরেই বাজছে।

বছর চারেক আগে স্ত্রী গায়ত্রী যখন খুব অসুস্থ, হাসপাতাল থেকে বাড়ি নিয়ে এসেছেন জোর করে, সেই সময়ে গায়ত্রীর নাম করে নিজেও একবার ভালো করে ডাক্তারি চেক আপ করিয়ে নিয়েছিলেন। সেই ডাক্তারই বলেছিলেন : আরে দাদা, আপনার হাইপারটেনশন নেই, রক্তে চিনি নেই, ব্লাড কোলেস্টেরলও ধর্তব্যের মধ্যে নয়। হার্ট চলছে চমৎকার লাবডুব ঝাঁপডুব ছন্দে। জোয়ানের মতো আপনি বাঁচবেন না তো বাঁচবে কে? তবে হ্যাঁ....

ডাক্তার এক ঝুড়ি কর্তব্য ও অকর্তব্যের কথা বলেছিলেন। সেগুলো সযত্নে মুখস্থ করে রেখে দেন অনিকেতবাবু। কষ্ট করে মুখস্থ করতে হয়নি। কানের ভেতর দিয়ে একবার ঢুকতেই মরমে পশেছে। তাই তাঁর শরীর মনে না রাখলেও মন সেগুলো মনে রাখে, মনে করিয়ে দেয়।

বিছানা গোছাতে লাগলেন অনিকেতবাবু। সবাই-ই হয়ত নিজের কাজ নিজে করে কিন্তু করে দায়ে পড়ে, দায় সারা করে। অনিকেত করেন যত্ন করে মেথডিক্যালি। বালিশটা থুপে থাপে ঠিক জায়গায় রাখলেন। কম্বলটা দু হাতে তুলে নিলেন। খুব ভারী লাগল। ভালো করে দেখতে গিয়ে রায়মহাশয়ের বুক হিম হয়ে গেল। এ কী? দুটো কম্বল কেন? জানালা বন্ধ। পায়ে মোজা। গায়ে উলিকট। একটা কম্বলই তো যথেষ্ট? দুটো কেন? এ কি দার্জিলিং নাকি? কিংবা নিদেনপক্ষে বর্ধমান, চাতরা, নবাবগঞ্জ? আরে বাবা এ যে শহর কোলকাতার গাদাগাদি মধ্যিখান? কম্বলটা দিলে কে? কে এমন ষড়যন্ত্রনিপুণ, নিষ্ঠুর অন্তরালবর্তী বিভীষণ আছে যে মাঝরাতে তার ঘরে ঢুকেছে, এবং গায়ে দিয়ে দিয়েছে দ্বিতীয় কম্বল? নাঃ সুপ্রতীকের কথা তিনি আর শুনবেন না। এবার থেকে দরজা বন্ধ করে শোবেন। তিনি নিশ্চয়ই রাতে কুঁই কুঁই করেছেন। বেশ সশব্দে। বলা যায় না হয়ত কেঁদেছেন, অচেতনের ওপর তো হাত নেই! ছি ছি! সেই কান্নার শব্দে আকৃষ্ট হয়ে সুপ্রতীক অথবা আরও ভয়াবহ। রুমিই হয়ত। কী ভাবল।

চটপট করে বাথরুম সেরে মাথা গলা কান-ঢাকা টুপিটা মাথায় গলিয়ে নিলেন তিনি। গায়ে চাপালেন ওভারকোট। পায়ে উলের মোজা। এ সবই সিমলাতে কেনা হয়েছিল অন্তত বিশ বছর আগে। সিমলায় সে বছর ভালো বরফ পড়েছিল। এখন সেই সিমলাই আয়োজন কলকাতিয়া জানুয়ারিতে গায়ে চাপাচ্ছেন তিনি। আয়নার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন : অ্যাবমিনেব্‌ল স্নোম্যান! বলেই চমকে উঠলেন কারণ কে যেন সঙ্গে সঙ্গেই বলল অ্যাবমিনেব্‌ল ওল্ড ম্যান। চারদিকে চকিতে একবার তাকিয়ে নিলেন অনিকেত রায়মহাশয়। তাঁর দীর্ঘশ্বাসে আয়নার পরিষ্কার গায়ে একটা দলা-পাকানো বাষ্পের দাগ হল। সিনথেটিক সোলের জুতো জোড়া পায়ে গলিয়ে এবার নিঃশব্দে লম্বাটে সরু দালানটা পার হওয়া, দরজাটা টেনে দিয়ে নিজেই এলিভেটর নামিয়ে সদরে পৌঁছনো, তারপর নিজের ইয়েতি সদৃশ আকারটি নামিয়ে দেওয়া। রাত-দারোয়ান গলা বাড়িয়ে ঘড়ঘড়ে গলায় প্রশ্ন করল— কে যায়?

—দুশ তেইশ।

কচ্ছপের মতো গলা গুটিয়ে নিল ব্যাটা।

খোলা গালের ওপরে এসে বিঁধছে মাঘের ধারালো ছুরির মতো হাওয়া। একবারটি শিউরে উঠলেন অনিকেতবাবু। তারপর হনহন করে পা চালালেন পুবের পার্কটার দিকে। দু চারটে রাত-কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠল। শীতে পা টেনে ধরেছে, কিন্তু তাকে ওই রাত কুকুরগুলোর মতোই পাত্তার মধ্যে আনতে চাইছেন না তিনি। নির্ভীক পদক্ষেপে তিনি পার্কের দিকে এগিয়ে চলেছেন।

রাস্তায় এখনও দাপটের সঙ্গে জ্বলছে পরাক্রান্ত পথ-বাতিগুলো। যেন বড় বড় জ্বলজ্বলে চোখে দেখছে কে যায়, কারা যায়। খোকা না বুড়ো, বুড়ো-খোকা না বুড়ো-বুড়ো। দেখছে এবং হিসেব রাখছে। মাথা নিচু করে ওভারকোটের দু পকেটে হাত ভরে রাস্তাটা পার হলেন তিনি। হনহন করে হেঁটে পার্কে পৌঁছতে পাঁচ মিনিট। আড় চোখে তাকিয়ে দেখলেন আরও কিছু কিছু মূর্তির আবির্ভাব হয়েছে আশেপাশে। মাথা গা কম্বল শাল মুড়ি দেওয়া, কেউ কোট প্যান্টালুন হাঁকড়েছে। মাথা ঢেকে নিয়েছে মাফলারে! নানান মূর্তি। কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছে না। প্রাণপণে হাঁটছে।

'হাঁটবেন, হাঁটবেন, ভোরে একবার, সন্ধেয় একবার করে হাঁটবেন। হাঁটাই এখন একমাত্র ব্যায়াম....বুকের ভেতরে এস সি. ডি.-টা খনখনে গলায় বলে যেতে লাগল। আশপাশ দিয়ে জড়পুঁটলির মতো হণ্টনকারীদের দেখে মনে হয় তাদের বুকের মধ্যেও ডিস্কটা বাজছে....হাঁটবেন। হাঁটবেন....ভোরে....সন্ধেয়....হাঁটাই এখন একমাত্র ব্যায়াম....।'

আজ নিয়ে তৃতীয় দিন হল অনিকেত এইভাবে বেরোলেন। সুপ্রতীক জানে না, রুমি জানে না। ওরা ওঠবার আগেই আবার নিঃশব্দে ফিরে যাবেন তিনি। পকেট থেকে চাবি নিয়ে দরজা খুলবেন। ওই সময়ে একটা দমকা কাশি আসতে চায়, সেটাকে কোনমতে চেপে টয়লেটের মধ্যে গিয়ে মুক্ত করে দ্যান তিনি। বালতির ওপর কলটাকে পুরো প্যাঁচ ঘুরিয়ে খুলে দ্যান। ছড়ছড় করে জল পড়তে থাকে। খক খক ঘঙ ঘঙ ঘঙ আখ্‌খা আখা আখ্ খা আখা. অনিকেত মনের সুখে কাশতে থাকেন। ঘরে গিয়ে এক চামচ ওষুধ খাবেন ড্রয়ার চাবি দিয়ে খুলে, একটা থ্রোট লজেন্স মুখে রাখবেন তারপরে।

রুমি যখন ঘুমচোখে বসবার ঘরে এসে কাগজ খুঁজবে তখন সে কাগজ পড়ে ভাঁজ করে টেবিলে রাখা, বিজয়ীর ভঙ্গিতে অনিকেতবাবু বাঁ পায়ের ওপর ডান পা রেখে তাকে মৃদুমন্দ নাচাতে নাচাতে সিগারেট খাচ্ছেন। রুমি যদি ভালো করে লক্ষ করত তো দেখতে পেত অনিকেতবাবুর সিগারেট থেকে বিশেষ ধোঁয়া উঠছে না। ঠোঁটে ওটা আলতো করে ধরে রেখেছেন তিনি। রুমি কাগজের মোটা খবরগুলোতে চোখ বুলোবে : ইকোয়েডরে আবার ভূমিকম্প, কিয়োটোতে জলপ্লাবন। না ক্ষয়ক্ষতি বিশেষ কিছু হয়নি। সুপ্রতীক আসবে, চেঁচিয়ে খবরগুলো পড়বে তখন রুমি।

সে কি ক্ষয়ক্ষতি হয়নি? আশ্চর্য!

—হলেই বা এখানে কী! রুমি আলগা গলায় বলবে—আমাদের আছে সাইক্লোন আর পথ দুর্ঘটনা।

রুমি এবার উঠে যাবে। সুপ্রতীক বাবার সিগারেট থেকে নিজেরটা জ্বালিয়ে নিতে চাইবে, সেই সময়টার জন্যে সামান্য আগে থেকেই প্রস্তুতি নেন অনিকেতবাবু। তুষের

আগুনের মতো জ্বলতে থাকে সিগারেটের মুখ। ধোঁয়াটা পুরো ছেড়ে দিয়ে দু আঙুলের ফাঁকে সেটাকে সন্তর্পণে ধরে রেখে কোনও একটা হাজারবার পড়া জার্নাল আবার পড়বেন অনিকেতবাবু। সুপ্রতীকের মুখ চোখ কাগজে আড়াল। সে কিছুই বুঝতে পারবে না।

টী-মেশিন থেকে প্রত্যেকে এক এক কাপ চা নিয়ে মুখোমুখি বসবেন এবার। মৌজ করে। চমৎকার শান্তিময় আবহাওয়া। পারিবারিক প্রভাত।

রুমি আজকাল প্রায়ই জিজ্ঞেস করছে—রাতে ভালো ঘুম হয়েছিল তো বাবা? গতকাল এ প্রশ্ন শুনে বড় বড় সরল চোখে তাকিয়ে ছিলেন অনিকেতবাবু— ঘুম? মানে? ঘুম হবে না কেন?

—না তাই বলছিলাম।

জিজ্ঞেস করার সময়ে রুমির চোখ দুটো চায়ের কাপের ওপর থেকে আধখোলা হয়ে ভেসেছিল। ঝিনুক-ঝিনুক চোখ। দেখেও যেন দেখলেন না সেই ঝিনুকের পেটের মতো দৃষ্টি।

সুপ্রতীক পরশু বলল—তুমি এবার সকালের দিকে চা-টা বন্ধ করে দাও বাবা।

একটু গরম দুধ খেলে শরীরটা ঠিক থাকবে।

অনিকেতবাবু আকাশ থেকে পড়ে বলেছিলেন—দুধ? দুধ মানে? ও দু-ধ! দুধ কথাটা জীবনে প্রথম শুনলেন অনিকেতবাবু।

—অন্তত পক্ষে চায়ে চিনিটা খেও না—সুপ্রতীক তাঁর দিকে চেয়ে বলেছিল।

—চিনি দুধ না হলে তাকে আর চা বলে না মাই চাইল্ড? বেপরোয়া সাহসের সঙ্গে সুপ্রতীকের চোখে চোখ রাখলেন তিনি। মাই চাইল্ড বলতে পেবে একটা অদ্ভুত আত্মপ্রসাদ। সুপ্রতীক তাঁর ছেলে যদি চাইল্ড হয়, তা হলে তিনি কী? আর যাই হোন, নিশ্চয়ই দুগ্ধমাত্রসার দ্বিতীয় শৈশবগ্রস্ত নন।

চা-টা শেষ করে স্প্রিং-এর মতো উঠে দাঁড়ান অনিকেত।

—চলি রুমি, চলি রে সুপ্রতীক। আমাকে আবার লেখা-টেখাগুলো নিয়ে বসতে হবে। কেউ কোনও সাড়া শব্দ করে না। এই নীরবতা এক হিসেবে স্বস্তির। মাথা খুঁড়ে কোনও আইডিয়া-টিয়া বার করতে হয় না তাঁকে। আবার অস্বস্তিরও। তবে কি ওরা তাঁর লেখা-টেখাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে না? নাকি বিশ্বাসই করছে না! ভেতরে ভেতরে দমে গেলেও তিনি চেহারার ওপর সেটা ফুটতে দ্যান না। স্প্রিং-এর মতো চলনভঙ্গিটা বজায় রেখে তিনি ওদের সামনে দিয়ে চলে এলেন। ওরা আড়াল হতে একটু আলগা দিলেন। নিজের ঘরে এসে পর্দাটা টেনে দিয়ে সোয়াস্তি।

জানলার পাশে আরামকেদারা। এই আরেকটা দাদুর আমলের জিনিস। ভাঙে না, মচকায়ও না। কুচকুচে আবলুশ কাঠের জিনিস। নরম গদি দেওয়া। সেই গদির গায়ে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে জানলার বাইরে চোখ রাখলেন তিনি। তাঁদের পনেরো তলা, পাশের ব্লকটা সতেরো তলা। সতেরো তলা টপকে আকাশরেখা দেখতে পেলেন অনিকেত। দেখতেই থাকলেন। দেখতেই থাকলেন। কী সুন্দর। কী অপূর্ব সুন্দর! কী চমৎকার এই জীবন ব্যাপারটা। আর কিছু না। শুধু সুস্থ সবল হয়ে বেঁচে থাকাটাই একটা...কী দুর্লভ সৌভাগ্য?

পাশের ব্লকটাতে ওরা ছাদ-বাগান করেছে। একটা করবী গাছ। সরু সরু বাঁকা কুকরির মতো পাতার মধ্যে থেকে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল ফুটে থাকে। সবুজে লালে নবীন। এখন, এই শীতেও সবুজ জাগিয়ে রেখেছে গাছটা। একটু খুঁজলে দেখা যাবে দুটো ব্লকের মাঝখানের জমিতে গজিয়ে ওঠা তিনটে বট্‌ল পাম। দুধ সাদা গা। ওপর থেকে বসে সব দেখা যায় না। কিন্তু স্মৃতিতে ভাসে মাথায় সবুজ পালক। গাছেরা কখনও বুড়ো হয় না। ওরা যতদিন খুশি আকাশ দেখে, মাটি থেকে খাদ্য নেয়, বাতাস থেকে শ্বাস নেয়, এবং অতি মূল্যবান অক্সিজেন পৃথিবীকে দিতে থাকে। দেয় বলেই না গাছপালার এতো দাম, এতো আদর। এই যে সব গগনচুম্বী বাড়ি। তাদের প্রতি গুচ্ছে নির্দিষ্ট সংখ্যক বৃক্ষ আছে। আছে ঝোপ জাতীয় গাছ। ঝকঝকে তকতকে। ছোট চারা যখন পোঁতা হয় তখন চারদিকে বেড়া দেওয়া হয় ভক্তিভরে। গাছ সব সময়ে জীবন দিচ্ছে, তাই গাছ দেবতা। দিতে হবে, সবসময়ে কিছু-না-কিছু দিয়ে যেতে হবে। 'বি প্রোডাকটিভ, অনিকেত! বি প্রোডাকটিভ।' বুকের ভেতরে ব্যাটাচ্ছেলে এস. সি. ডি.-টা আবার বলছে। চমকে প্রায় আরামকেদারার আশ্রয় থেকেও পড়ে যাচ্ছিলেন অনিকেতবাবু।

তাড়াতাড়ি টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। মোটা নোটবই। লাইব্রেরি থেকে আনা রেফারেন্স। বেশ কিছু পত্র-পত্রিকা। ভেতরে মার্কার দিয়ে সব ওলটানো আছে। বিশ্ব রাজনীতির ওপর জনসংখ্যার প্রভাব নিয়ে একটা তথ্যবহুল প্রবন্ধ লিখছেন তিনি। লিখছেন মানে ছেলে-বউয়ের কাছে বলেছেন যে লিখবেন। আসলে কলম চিবোচ্ছেন। ভালো লাগছে না মোটেই।

পঞ্চান্ন বছর বয়সে অবসর নেবার পর ঠিক পনেরোটা বছর কেটে গেছে। গোড়ায় গোড়ায় অনিকেতবাবু খুব উৎসাহের সঙ্গে লেখা-জোকা ধরেছিলেন। বিজ্ঞাপন-সংস্থার সঙ্গে কাজ কারবার করতে হত, তাই চেনা-শোনা ছিল কিছু কিছু। লেখার অভ্যেস। আইডিয়া নিয়ে নাড়াচাড়া করার অভ্যেস এগুলোও ছিল। নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতেন। ছাপতো। রোজগারও হত। আত্মতৃপ্তিও হত। পেনশন তো পাঁচ বছর অন্তর শতকরা দশভাগ করে কমে যায়, কাজেই এই উপরি আয়ে নাতির জন্য দামি খেলনা, রুমির জন্য একটা ভালো পারফিউম কি সুপ্রতীকের জন্য একটা শৌখিন সিগারেট লাইটার—এই জাতীয় উপহার কিনে বাড়ির হাওয়ায় খুশির ঝলক এনে দেওয়া যেত। এমন ছোটাছুটি করে দোকান বাজার করতেন, হই-হই করে করে আড্ডা মারতেন ছেলের বন্ধুদের সঙ্গে, দুপুরবেলাও কাজে-কর্মে বেরিয়ে থাকতেন যে, ছেলে-বউ-নাতি প্রতিবেশীরা কেউই বুঝতে পারত না তাঁর বয়স হচ্ছে। মাঝে মাঝে সুপ্রতীকের বন্ধু অর্বুদ বলত কাকাবাবু আপনার চুলগুলো কাঁচাপাকা না হলে কেউ বুঝতেই পারত না আপনি অবসর নিয়েছেন। আপনি আমাদের থেকেও জোয়ান।

তা সে যাই বলুক, বললেই তো আর তিনি জোয়ান হয়ে যাচ্ছেন না। কঠিন সত্য হল এই : তিনি অবসরপ্রাপ্ত, দেশের সাম্প্রতিকতম নিয়ম অনুযায়ী পঞ্চান্ন বছরেই। তাঁর রাজনৈতিক অধিকার নেই, অর্থাৎ তিনি ভোট দিতে পারেন না, কোনও আদালতে বিচারও চাইতে পারেন না। তিনি ঠিক নাগরিক যাকে বলে তা নন পুরোপুরি। যেটুকুও বা নাগরিকত্ব আছে ক্রমশই খোয়াচ্ছেন, খোয়াতে থাকবেন। এখন যে কোনদিন, বুড়ো

অকর্মণ্য বলে বোঝা গেলেই সরকারি বৃদ্ধনিবাসের টিকিটটি তাঁকে কেউ ধরিয়ে দেবে। ছেলে বউই দেবে, ওরা যেমন প্রাকটিক্যাল! আর ওরা না দিলেও প্রতিবেশী আছে, বন্ধু বান্ধবের ছেলে-পুলে আছে, পুলিশ আছে। নেই কে?

কিন্তু আজকাল অনিকেতবাবুর এই দৌড়ঝাঁপ আর ভালো লাগছে না। রাতুলটা যতদিন ছোট ছিল, ভাল জমত। কিন্তু দেখতে দেখতে সেও এখন সতেরো আঠারো বছরের হয়ে গেল। তারও বাইরের জগৎ হয়েছে, গোপনীয়তা হয়েছে। তার নিজের জগতের মধ্যে আর চট করে প্রবেশ করা যায় না। করার চেষ্টা করলেই বুঝতে পারেন সুর বাজছে না।

—কী রে রাতু, কী পড়বি ঠিক করলি? মেডিসিন?

—কোন্ মেডিসিন? রাতুল মুখ তুলে জিজ্ঞেস করে। ছোট্ট রাতুল তাঁর চিকিৎসা করতে খুব ভালোবাসত। ড্রপার দিয়ে ইঞ্জেকশন দিত। পিপারমিন্টের ট্যাবলেট খেতে দিত। অকেজো গ্লাস বুকে পিঠে বসিয়ে হার্ট বিট দেখতো।

—কোন্ মেডিসিন মানে? অনিকেতবাবু ওর কথা বুঝতে পারেন না।

—মিলিটারি না সিভ্ল না পুলিশ?

—আজকাল এইসব আলাদা বিভাগ হয়েছে বুঝি?

ততক্ষণে রাতুল তাঁর চোখের সামনে থেকে হাওয়া হয়ে গেছে। যাবার সময়ে ছুঁড়ে দিয়ে গেছে সে কমটেক পড়বে।

কিংবা!

কী রে দাদু আজকাল কার সঙ্গে স্টেডি যাচ্ছিস? খুব মাই-ডিয়ার দাদু হতে চেষ্টা করেন তিনি।

—দিয়া, চই আর দাভিনা।

—তিনজনের সঙ্গে?—অনিকেত কেমন ভোম্বল মতো হয়ে যান।

—হ্যাঁ! রাতুলের অবাক উত্তর।—ও সব তুমি বুঝবে না দাদু।

ইদানীং অনিকেতবাবু দুপুরবেলা আর লাইব্রেরি যান না। নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে লেখা লেখা খেলা করেন। রুমিরা জানে তিনি একটা বিশাল বই লিখবেন। প্রবন্ধ-ট্রবন্ধ ছাড়াও। বিশাল বই যা নাকি সমাজতত্ত্বের কাজে লাগবে। এ রকম বই লিখতে পারলে আলাদা করে গ্র্যান্ট পাবেন লেখক। প্রোডাকটিভ কিছু করলে সরকার নানারকম সাহায্য দিয়ে থাকে। সন্দীপন দেশাই বলে এক ভদ্রলোক পরের পর বই লিখে যাচ্ছেন। অর্থনীতির ইতিহাস। এদেশীয় অর্থনীতি, বিশ্ব অর্থনীতি। আশির কাছে বয়স হল ভদ্রলোকের। এঁর সঙ্গে অনিকেতবাবুর একসময়ে খুব আলাপ ছিল। খুব সম্প্রতি এঁকে এঁর শেষ বইটির জন্য অভিনন্দন জানিয়ে ফ্যাক্স করেছিলেন তিনি। দেশাই তার জবাব দিলেন খুব ছোট্ট এবং অপ্রাসঙ্গিক। 'হোপ আই'ল ডাই ইন মাই ওন বেড।'

কিন্তু অনিকেতবাবু দরজাটা বন্ধ করে দ্যান দুপুরে। সন্তর্পণে জানলার পর্দাটা টেনে দ্যান। পাশের ব্লকের যে ভদ্রলোকের জানলাটা তাঁর মুখোমুখি? মনস্বী না কী যেন? বড্ড ইয়ে। কদিন আগেই গায়ে পড়ে বলেছিল 'কাকাবাবু আপনার যেন কত হল? দাঁড়ান দাঁড়ান, আপনার রিটায়ারমেন্টের ইয়ারটা.....'

অনিকেতবাবু ভীষণ উৎসাহের সঙ্গে হাত ঝাঁকিয়ে মাথা নেড়ে বলেছিলেন—

সিনেমা যাবে নাকি মনস্বী। বেশ ভালো একটা অ্যাডভেঞ্চারের ছবি এসেছে। লুনার পার্ক। বলো তো টিকিট কাটি। তুমি আমি আর রাতুল।

জানালার পর্দা টেনে দিয়ে একটা ভীষণ গর্হিত কাজ করতে থাকেন তিনি। দিবাস্বপ্ন দেখতে থাকেন : ধবধবে চুলের এক বৃদ্ধ। বারান্দায় বেতের চেয়ার পেতে সামনে কৃষ্ণচূড়া গাছের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। সময়টা ফাল্গুন চৈত হবে। ফুরফুর করে হাওয়া দিচ্ছে। তার বাইরেটা গরম ভেতরটা ঠাণ্ডা। হাওয়ায় বৃদ্ধের এলোমেলো চুল আরও এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। হাফ পাঞ্জাবি হাওয়ায় ফুলে ঢোল। বৃদ্ধবয়সের পাতলা চামড়ার ওপর বসন্তের হাওয়ার স্পর্শ, বড় সুন্দর! ছোট্ট একটি ছেলে বল লাফাতে লাফাতে এলো।

—দাদু তুমি বল খেলতে পারবে?

—না ভাই।

—তাহলে কুইজ? কুইজ করব?

—পারবো না ভাই।

—আচ্ছা তাহলে 'বসে আঁকো'।

—তাও পারবো না।

—তবে তুমি পারবেটা কী?

মৃদু হেসে বৃদ্ধ বলেন—মনে মনে পারি। এখনও এসবই মনে মনে পারি। চোখ বুজে ঘুম ঘুম এসে যায়। স্মৃতির ওপর এক পর্দা কাপড়। ক্ষীণভাবে অনিকেতবাবুর মনে হয়, কে? কে এই বৃদ্ধ?—তাঁর দাদু বোধহয়। আর গুণ্ডা ছেলেটা? তিনি, তিনিই নিশ্চয়। একাশি বছর বয়সে তাঁর এগোরো বছর বয়সের সময়ে খুব সম্ভব মারা গিয়েছিলেন দাদু। এই আরামচেয়ার, ওই ঘড়ি তাঁর। অন্য এক পল্লীর অন্য এক বহুতলের তিনতলায় থাকতেন তাঁরা। আবার ঘোর এসে যায় অনিকেতবাবুর।

রুমি, সুপ্রতীক, গায়ত্রী আর তিনি। রাতুলকে নিয়ে লম্বা পাড়ি দিয়েছেন। মোটরে। সুপ্রতীক চালাচ্ছে, রুমি তার পাশে। পেছনে বাকিরা। দুপাশে পাহাড়ি গাছ। সরল, দেওদার...এটা কোন্ জায়গা...দার্জিলিং? শিলং? মুসৌরি? হঠাৎ গাড়িটা ঘ্যাচ ঘ্যাচাং করে থেমে গেল। সুপ্রতীক নেমে পড়ে অনেক রকম চেষ্টা চরিত্তির করল। এমন কি রাতুলও। কিন্তু কিস্যু হল না। গাড়ি যেমন নট নড়ন-চড়ন তেমনি হয়ে আছে। তখন অনিকেতবাবু নামলেন। জাস্ট পাঁচ মিনিট। হাতের সাদা রুমালটা কুচকুচে কালো হয়ে গেল অবশ্য কিন্তু গাড়ি সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল। রাতুল বলছে তোমার হাতে যাদু লিভার আছে নাকি দাদু। রুমি বলছে—বাবা না থাকলে এই বিশ্রী জায়গায় রাত হয়ে আসছে...কী ঠাণ্ডা!

ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে দিচ্ছে রুমি। এটা বড় প্রিয় দিবাস্বপ্ন অনিকেতবাবুর। কখনও ঘটেনি। কিন্তু যদি ঘটে! এমন কেন সত্যি হয় না আহা। এ ছাড়াও আরও কত ভালো ভালো দিবাস্বপ্ন আছে অনিকেতবাবুর। কোন্‌টা রেখে কোন্‌টা দেখবেন? দেখতে দেখতে জমাট দুপুর ঘুম এসে যায়। ফুরফুর ফুরফুর করে নাক ডাকতে থাকে। হঠাৎ নাকে ফঁৎ করে একটা বেয়াড়া মতো আওয়াজ হতেই তীরবেগে উঠে বসলেন অনিকেতবাবু। বুকের ভেতরটা ধড়াস ধড়াস করছে। জানলার পর্দা টানা আছে তো ঠিক? দরজাটা

বন্ধ? হ্যাঁ। আছে। আছে।

অর্থনীতির ওপর প্রবন্ধ! হুঁ। রাজনীতির ওপর লোকসংখ্যার প্রভাব। মাথার মধ্যেটা রাগে চিড়বিড়িয়ে ওঠে মাঝে মাঝে। লিখতেই যদি হয় তিনি রম্য রচনা লিখবেন। আবার ফর্মের দিক থেকে রম্য হলেও তা হবে রুদ্র রচনা। মনের যাবতীয় ক্ষোভ, জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা সব প্রকাশিত হবার জন্যে তাঁর মাথার মধ্যে ফাটাফাটি হুটোপাটি করে চলেছে। কিন্তু এরকম কিছু লেখা মানে নাহক নিজের সর্বনাশ ডেকে আনা। ঠিক আছে না-ই বা প্রকাশ করলেন, শুধু নিজের তৃপ্তির জন্যেই তিনি লিখবেন। এই সংকল্প মনের মধ্যে উঁকি দেবামাত্র—রায়মহাশয় তাঁর কম্পুটারে কাগজ ভরলেন। একটু ভাবলেন, তারপর লিখলেন : জীবন সুন্দর, পৃথিবী সুন্দর, কিন্তু মানুষ কুৎসিত, সমাজ কুৎসিততর, শাসনযন্ত্র কুৎসিততম। যৌবনও কুৎসিত। যত বয়স হইতেছে, বুঝিতেছি যৌবনও কুৎসিত। কারণ, হ্যান্ডসাম ইজ দ্যাট হ্যান্ডসাম ডাজ। যে যৌবন বৃদ্ধের আত্মত্যাগের মূল্যে ফুর্তি কিনিয়া বাঁচিয়া থাকে তাহাকে ধিক। যে যৌবন বৃদ্ধের জীবন হইতে 'বসন্তের অধিকার' ছিনাইয়া লয় তাহাকে ধিক। যে সকল বৈজ্ঞানিক উন্নতি, প্রাযুক্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিবার সামাজিক পরিকাঠামো তোমরা প্রস্তুত করিতে পারো নাই, সে সকলের সঙ্গে তাল মিলাইবার চেষ্টা তোমাদের হাস্যকর। কারণ তাহা করিতে গিয়া মানুষের স্বাভাবিক অধিকারগুলি তোমরা ছিনাইয়া লইতেছ। এগুলি তোমাদের বেতালা বেসুরো আসুরিক কাণ্ড। জনসংখ্যা হু হু করিয়া বাড়িতেছে। তো আমরা কী করিব? আমাদের কাহারো ঘরে একটি দুটির বেশি সন্তান আসে না। কোথায় বাড়িতেছে, কেন বাড়িতেছে খোঁজ লও। খোঁজ আর লইবে কি? ভালো করিয়াই জানো সব। দারিদ্র্য, অপরাধ, অধিকার, কুশিক্ষা, প্রজাবৃদ্ধি সকলই তো পুষিতেছ? আর খাঁড়াটি তাক করিয়াছ সিনিয়র সিটিজেনের গলদেশ তাক করিয়া? যে নাকি সারা জীবন ধরিয়া তিল তিল করিয়া দিয়াছে?

ছাপা কাগজটার দিকে চেয়ে রইলেন অনিকেতবাবু। ভাষাটা যে দাদামশায়ের বেরোলো। দাদামশায় কেন কে জানে এই ভাষায় চিঠিপত্র লিখতেন। তাঁর কাছে রয়েছে কয়েকটা। ভাষাটার কেমন একটা বুড়ো বুড়ো বিজ্ঞ বিজ্ঞ গন্ধ। তাঁর মধ্যে কি দাদামশায়ের ভূত ঢুকল? ঢুকুক, তাই ঢুকুক। রাজনীতির ভূত ঢোকার চেয়ে তা শতগুণে ভালো।

অস্থির হয়ে পায়চারি করতে শুরু করে দিলেন তিনি। গত পঞ্চাশ বছরে মৃত্যুর হার লক্ষণীয়ভাবে কমে গেছে। শেষ এপিডেমিক এসেছিল এডসের। এ শহরের সমস্ত হাসপাতাল, নার্সিং হোমের ব্লাড-ব্যাঙ্ক, ইনজেকশনের ছুঁচ এডসের ভাইরাসে ভরে গিয়েছিল। সে সময়ে ইউ. এন. ও.-র শাখা ডাবলু. এইচ. ও. হাসপাতালগুলো অধিগ্রহণ না করলে কয়েক কোটি মানুষ মরে যেত। কিন্তু ডাবলু. এইচ. ও. তখন থেকে শক্ত হাতে হাসপাতালগুলো পরিচালনা করে চলেছে। সংক্রামক ব্যাধি তখন প্রায় নেই-ই বলতে গেলে। দেহযন্ত্র বিকল হলে চোখ থেকে শুরু করে হার্ট, কিডনি লাং সবই পাওয়া যাচ্ছে। চোখ থেকে মজ্জা পর্যন্ত সব কিছু ট্রানসপ্লান্ট হচ্ছে। মৃত্যুর হার তাই কমে গেছে। এদিকে জন্মের হার কমছে না। তা-ও আবার বিশেষ বিশেষ পকেটে বাড়ছে। কতকগুলি পল্লী থেকে কজন মানুষ বেরোয় হাতে গোনা যায়, আবার

কতকগুলি পল্লী থেকে পিলপিল করে মানুষ বেরোয়। দারুণ সস্তা হয়ে গেছে টেলিযন্ত্র। বেশির ভাগ মানুষের সাংস্কৃতিক খাদ্য এখন হিংস্র, কামোত্তেজক এন চ্যানেল। স্কুল কলেজে ড্রপ-আউটের সংখ্যা বাড়ছে। বেকার-ভাতা এসে গেছে। ভোটাধিকারের বয়স ক্রমেই কমছে। আঠার থেকে ষোল হল, এখন পনেরো।

বেলা তিনটের সময়ে অনিকেতবাবুর খিদে পেল। তিনি আভেনের হটচেম্বার থেকে বিরিয়ানি বার করে খেলেন। এই এক ঢং হয়েছে। সব কিছু নিউট্রিশন একত্র করে পনেরো মিনিটে স্বাস্থ্যপ্রদ এক পদ রান্না। চাইনিজ খিচুড়ি, থাই পোলাও, বিরিয়ানি আলা ফ্রাঁস। ক্লোল্ড চেম্বার থেকে কাঁচা সালাড বার করলেন তিনি। আজকাল আর একদম কাঁচা খেতে পারছেন না। সালাড-ড্রেসিংটা মেয়নেজ মনে হচ্ছে। সেটুকু চেঁছে পুঁছে খেয়ে তিনি হাজার স্কোয়্যার ফুটের ফ্ল্যাটটা পায়চারি করে বেড়াতে লাগলেন।

রাত্রে খাবার নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন দেখে রুমি জিজ্ঞেস করল—বাবার কি শরীরটা ভালো নেই!

—আজ অনেক বেলায় খেয়েছি, খিদে নেই।

—তোমাকে কতবার বলেছি টাইমটা মেনটেইন করো। রেগুলারিটিই হল গিয়ে আসল—সুপ্রতীক থমথমে গলায় বলল।

গ্রাহ্য করলেন না অনিকেতবাবু। গম্ভীরভাবে বললেন—লিখতে লিখতে খেয়াল ছিল না। এ কথায় কেমন হৃষ্ট হয়ে উঠল দুজনেই। রুমি এবং সুপ্রতীক।

রুমি বলল—খেতে ভালো না লাগে নাই খেলেন। একগ্লাস ট্রাংকুইলেট খেয়ে নেবেন শোবার আগে...

ওসব তোমরা খেও—বলে অনিকেতবাবু বিরক্ত, ক্ষুব্ধ, অন্যমনস্ক হয়ে নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন। আজ যেন কাউকেই গেরাহ্যি করছেন না তিনি।

এরা দুজনে অর্থপূর্ণভাবে চোখ চাওয়া-চাওয়ি করল শুধু।

অনেক রাত অবধি ঘুমোতে পারলেন না অনিকেতবাবু। কিন্তু জেদ করে কোনও ওষুধ বিষুধও খেলেন না। ট্রাংকুইলেট নামে পানীয়টাও না। মাঝরাত পার করে দু এক ঘণ্টার জন্যে ঘুমটা এসেছিল, তারপরই তাঁর দাদামশায় তাঁকে জানিয়ে দিলেন টং টং টং টং।

অনিকেতবাবু উঠে মুখ ধুলেন, ধড়াচুড়া চাপালেন। একটা আলোয়ান মুড়ি দিলেন সবার ওপর। তারপর নিঃশব্দে ফ্ল্যাটের দরজা খুলে, এলিভেটর চালিয়ে নিচে নেমে এলেন। রাত-দারোয়ান ঘুমিয়ে পড়েছে। শুনশান মাঘের রাস্তায় একেবারে হিমমণ্ডলে ডুব দিলেন অনিকেতবাবু। শীতে আড়ষ্ট হয়ে থাকা পা বাড়ালেন পার্কের দিকে।

কোণটা সবে ঘুরেছেন, নিঃশব্দে একটা ঢাকা ভ্যানমতো এসে দাঁড়াল তাঁর পেছনে, নিঃশব্দে লাফিয়ে নামল দুজন আপাদমস্তক য়ুনিফর্ম-পরা লোক। একজন ডান দিকে, একজন বাঁ দিকে অনিকেতবাবুর। তিনি ভালো করে কিছু বোঝার আগেই ভ্যানের ভেতরে চালান হয়ে গেলেন। তাঁর মাথার ওপর দিয়ে একটা ঘেরাটোপ গলিয়ে দেওয়া হয়েছে। —কে তোমরা? কী চাও? কী চাও? তিনি বৃথাই চেঁচাতে লাগলেন। কেউ কোনও উত্তর দিল না। সামান্য পরে তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর মুখে যে ঘেরাটোপটা দেওয়া হয়েছে সেটা সাউন্ড-প্রুফ। এবং তিনি ধীরে ধীরে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছেন।

এইভাবেই তাহলে ওরা অনিচ্ছুক বৃদ্ধদের বৃদ্ধাবাসে নিয়ে যায়!

যখন জ্ঞান হল, অনিকেতবাবু দেখলেন তিনি একটি চমৎকার আলোকিত ঘরে শুয়ে। তাঁর শয্যাটি মাথার দিকে এমন করে তোলা যেন তিনি আরামকেদারাতেই বসে আছেন। তাঁর চারপাশে বেশ কিছু ভদ্র ব্যক্তি দাঁড়িয়ে। দেখলে যেন মনে হয় ডাক্তার। সকলেরই হাসিমুখ। ঠিক এমন পরিবেশ অনিকেতবাবু আশা করেননি।

—এখন কেমন বোধ করছেন?

—ভালো—অনিকেতবাবু ক্ষীণস্বরে বললেন।

—খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন।

—কেন?

—রাস্তার মাঝখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন।

—তাই? অবাক হয়ে অনিকেতবাবু বললেন—আমি তো... আমাকে তো...

—হ্যাঁ আমাদের হেল্‌থ স্কোয়াডের ভ্যান ভাগ্যে ওখান দিয়ে যাচ্ছিল!

—'তাই?' অনিকেতবাবু দুর্বলভাবে জিজ্ঞেস করলেন—'আমি তো ভাবলুম....আচ্ছা আমার ছেলে বউ সুপ্রতীক আর রুমি রায়মহাশয় তেত্রিশের বি...'

—'আহা হা ওঁদের খবর দেওয়ার তো আর দরকার হবে না।'—একজন স্মিতমুখে বললেন 'আপনি তো ভালোই হয়ে গেছেন। জাস্ট একটা ব্ল্যাক আউট হয়েছিল। আমরা সব চেক-আপ করে নিয়েছি। আপনি বাড়ি যেতে পারেন।'

—একলা একলা মানে একটা গাড়ি...

—সব ব্যবস্থা আছে, আমাদের ভ্যানই যাবে।

—একটা প্রেসক্রিপশন মানে ব্ল্যাক-আউটটা...

ভদ্রলোকেরা স্নেহের হাসি হাসলেন—পৌঁছে যাবে, ভ্যানে আপনার সঙ্গেই পৌঁছে যাবে।

কোমরের কাছে চওড়া বেল্ট দিয়ে শয্যার সঙ্গে বাঁধা ছিলেন অনিকেতবাবু। তার থেকে অনেক তার বেরিয়েছে।

—হ্যাঁ একটা কথা হাসিমুখে একজন বললেন, আপনি যদি কাইন্ডলি একটা কাগজে সই করে দ্যান।

সামনে মেলে ধরা কাগজটায় অনিকেতবাবু দেখলেন তিনি স্বেচ্ছায় তাঁর কিডনি, হার্ট এসব দান করেছেন। আপত্তি কী? চোখদুটো তো আগেই দান করে রেখেছেন।

তিনি হেসে বললেন—জ্যান্ত থাকতে থাকতে আবার খুবলে নেবেন না যেন।

কথা শুনে ভদ্রলোকেরা সবাই হাসতে লাগলেন। দারুণ একটা রসিকতা করেছেন বুঝে অনিকেতবাবুও হাসতে লাগলেন। হাসতে হাসতেই সই করে দিলেন।

ব্যস্ আপনি মুক্ত। বেল্টটা ধীরে ধীরে খুলতে লাগলেন একজন।

উঠতে গিয়েই হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন অনিকেতবাবু। তিনি তো আর জানতেন না তাঁর হার্ট কিডনি, সব আগেই বার করে নেওয়া হয়ে গেছে। এসব এখন কাজে লাগবে কোনও অসুস্থ কিন্তু ভোটপ্রদানক্ষম তরুণের। এতক্ষণ তাঁকে যা বাঁচিয়ে রেখেছিল তা হল তাঁর মাথার কাছে রাখা যান্ত্রিক হার্ট, যান্ত্রিক কিডনি। তাঁর মুক্তির মুহূর্তেই সেগুলোর সুইচ অফ্ করে দেওয়া হয়েছে। এরা নিতে পারেনি শুধু তাঁর বৃদ্ধ,

অভিজ্ঞ ব্রেইনটা। নেবার কৌশল এখনও আয়ত্ত করে উঠতে পারেনি, পারবে কি না তা-ও বলা যাচ্ছে না। এমন কি পারলেও নেবে কি?

জীবনের শেষ ধ্বনি অনিকেতবাবু শুনতে পেলেন সন্দীপন দেশাইয়ের গলায়। সহ্যের অতীত ডেসিবেলে আওয়াজ তুলে বলছেন—হোপ আই'ল ডাই ইন মাই ওন বেড।

সফল মানুষ

ঢং করে একটা বাজল। ঘড়ির দিকে তাকলেন বড়মা, নীহার। তাকাল প্রতীপ। ঘড়ির কাঁটা টিকটিক করে এগিয়ে যাচ্ছে। এগিয়ে যাচ্ছে। দশের ঘর পেরিয়ে গেল। নিস্তব্ধ রাতের বুক চিরে এতক্ষণে গাড়ির আওয়াজ। বড় মা গলা খুলে ডাকলেন—'লাবু, লাবু, দরজাটা খুলে রাখ।' কম্পাউন্ডের ওধারে গেট খোলার শব্দ। প্রতীপ উঠে দাঁড়াল—'আমি যাচ্ছি বড়মা।' নীহার মাথায় আঁচল তুললেন। চোখ নিয়ে ফোঁটা ফোঁটা স্বস্তির জল পড়ছে। মুখ ফিরিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, কাউকে এ জল দেখতে দেওয়া যায় না। সিঁড়িতে মস মস শব্দ, বোসসাহেব দালান পেরিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন কোনদিকে না তাকিয়ে। দালানে বসে জুতো খুললেন না অন্য দিনের মতো। জুতো-টুতো পরেই ঘরে।

রাত নিশুতি। আর একটু পরেই দু'পহরের ঘণ্টা পড়বে। তার একটু পরে ভিজিল্যান্স পার্টির ছেলেদের চিৎকার শোনা যাবে। চিৎকার, হো হো হাসি, গান বা গানের নামে হল্লা। এতটা কম্পাউন্ড পেরিয়ে সেই চিৎকার, হল্লাবাজি বন্ধ কাচগুলোয় ধাক্কা দেয় শীতকালে। ভেতরে খুব একটা শোনা যায় না। কিন্তু গ্রীষ্মকালে জানলা খোলা রাখতেই হয়। তখন যতই বড় কম্পাউন্ড হোক না কেন, গাছপালার প্রাচীর থাক না কেন, অসভ্য চিৎকার মাঝরাতের ঘুম ভাঙিয়ে দেবেই। আজকে সারা পল্লী নিস্তব্ধ। মাঝরাতের শব্দ বোধহয় এই প্রথম এ বাড়ির আলো ও নিস্তব্ধতাকে সমীহ করে চুপচাপ।

নীহার ঘরে ঢুকলেন। টেবিলের ওপর হুইস্কির বোতল, গ্লাস, সোডা ওয়াটার নামাচ্ছেন বোসসাহেব। নীহারের উপস্থিতির ছায়া পড়েছে। তিনি চোখ তুলে তাকালেন না। মোটা শেল ফ্রেমের চশমা একইভাবে চোখ ঢেকে রইল। নীহারের মাথার কাপড় খসে গেছে। চোখে উদ্বেগ, তিনি বেরিয়ে এলেন। বড়মা দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে বললেন—'ও কীরে ছোট, ও যে এখন ছাই ভস্‌সো নিয়ে বসল।'

নীহার শুধু বললেন—'আমি একটু মাছ ভেজে নিয়ে আসি।' দ্রুত চলে গেলেন। বোসসাহেবের পরনে ধূসর রঙের স্যুট। টাইয়ের রঙ গাঢ় খয়েরিতে সরু সরু সাদা স্ট্রাইপ। ব্যাকব্রাশ করা চুল। সকালবেলা পরিষ্কার কামিয়ে বেরিয়েছেন। এখন রাত দেড়টায় নীলচে ছাপ উঠে গেছে মুখে। এইমাত্র তিনি ন দশ ঘণ্টা পরে বাথরুমে

গিয়েছিলেন। মুখে হালকা জল ছাপও তাই। কোটটা খুলে চেয়ারের পিঠে রেখেছেন। টাইয়ের ফাঁস আলগা করলেন। ঘরে মৃদু রাত-আলো। চড়াৎ করে সোডা ওয়াটারের বোতল খুললেন বোসসাহেব। গ্লাসে হুইস্কি ঢাললেন। লক্ষ করছেন হাতটা ঈষৎ কাঁপছে। কেন? এতক্ষণের উৎকণ্ঠার, কষ্টের ফল? সামনে সাদার ওপর লাল ডুরে শাড়ি। জল ডুরে, তার ওপর লাল ডুরে। চওড়া সরু। নীহার। একটা প্লেট এগিয়ে দিয়ে মৃদু গলায় বলছেন—'আগে কিছু মুখে দাও।'

বোসসাহেব বুঝতে পারছেন ওদিকে পর্দার আড়ালে বৌঠাকরুণ, তাঁর পিসতুত বৌদিদি যাঁকে তিনি দাদা চলে যাওয়ার পর থেকেই প্রতিপালন করছেন আজ কত বছর হল তার হিসেব নেই। এবং যিনি এই সংসারের সবার ভালমন্দের ভার নিজের নিঃসন্তান, শক্ত কাঁধে তুলে নিয়েছেন তারও আগে থেকে। প্রতীপ দরজা খুলে দিয়েছে। কাছাকাছি কোথাও আছে ঠিক। সামনে নীহার। সবার মুখে উদ্বেগ, প্রশ্ন সবই তাঁকে নিয়ে। তিনি গলা ঝাড়লেন। আওয়াজ বেরোচ্ছে না, বেরোবে না তিনি জানেন। প্লেট থেকে এক টুকরো মাছ ভাজা তুলে দাঁতে কাটলেন, অমনি ঝাঁপিয়ে এল চোদ্দো পনেরো ঘণ্টার পড়ে যাওয়া খিদে। সঙ্গে সঙ্গে পেটে বুকে মাথায় কেমন একটা অস্বস্তি। দ্রুত পেগ নিঃশেষ করলেন বোসসাহেব, আরেকটা, আরেকটা। অনেক দিন পর আরও একটা। ক্লান্তিতে সমস্ত শরীর ভেঙে আসছে। অথচ তিনি জানেন শুলে ঘুম আসবে না। বালিশের মধ্যে কেউ যেন কাঁকড়া বিছের দাঁড়া, মশার হুল সব তীক্ষ্ণ বস্তু ভরে রেখেছে। গত তিন চার মাস ধরেই এরকম চলছে। এত ক্লান্তি নিয়ে বিছানায় শুলেও এখন ঘুম আসবে না। তিনি আরেকটা ঢাললেন। আরও একটা।

বাইরে দালানে আলো জ্বলছে। পর্দার তলা দিয়ে কিছু কিছু পায়ের আনাগোনা বোঝা যাচ্ছে। শাড়ি পরা, থান পরা, পাজামা পরা পা। নীহার, প্রতীপ। প্রতীপ ঘুমোতে যায়নি। এবং বৌঠাকরুণ অবশ্যই। তিনিই পুলিশে ফোন করেছিলেন। সমস্তটা না হোক, কিছুটা না শুনে তিনি শুতে যেতে পারছেন না। প্রতীপ পায়চারি করছে। স্বস্তি বোধ করছে না। পর্দার তলায় তার পায়ের সিকিখানা দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ বোসসাহেব একটা সংকল্প অনুভব করলেন। প্রতীপই তাঁর উত্তরাধিকার। প্রতীপ পায়চারি করছে। গ্লাসটা নামালেন। মুখ মুছে নিলেন রুমালে। গম্ভীরস্বরে গলা তুলে বললেন—'খোকাকে একবার ডেকে দাও।'

নীহার চোখ তুলে শুধু তাকলেন ছেলের দিকে। প্রতীপ ইতস্তত করছে। বাবার সঙ্গে মাই-ডিয়ার হওয়া তো দূরে থাক, চোখে চোখ ফেলে কথা বলতে পর্যন্ত সাহস হয় না তার। ভীষণ সমীহ, শ্রদ্ধা, সামান্য কি একটু ঈর্ষাও? প্রতীপ ঠিক বোঝে না ক্ষোভও আছে কিনা। লালবাড়ির জীবনযাত্রা বোসসাহেবকে কেন্দ্র করে ঘোরে, প্রতীপকে নয়। যদিও সে একমাত্র। তাঁর খাওয়া-দাওয়ার সময় এবং রুচি অনুসারে রাঁধাবাড়া হয়। তিনি অনুমতি দিলে তার জামাকাপড়, টেনিস র‍্যাকেট, ক্যাসেট ইত্যাদি আসে। নিজের ঘরে নিজের পছন্দমতো ভিডিও দেখবার উপায় নেই। তিনতলার ঘরখানা তার নিজস্ব বটে। কিন্তু সেখানে গোপনীয়তা নেই কিছু। শোবার খাট, পড়ার টেবিল, ওয়ার্ডরোব, বইয়ের আলমারি, ব্যাস। ছোট একটা টিভি সেট। সেটাকে বাবা খুবই অতিরিক্ত মনে করেন। মা রোজ গুছিয়ে দিয়ে যায়। ড্রয়ার টেনে টেনে দেখে। কদিন আগেই

বলছিল,—'খোকা, টেবিলের ড্রয়ার বন্ধ রেখেছ কেন? চাবি দেখি, খোলো!' বাবার কড়া নির্দেশ। বাবা ডাকছেন। রাত আড়াইটে বেজে গেছে। বাবা বাড়ি ফিরেছেন প্রায় সতেরো ঘণ্টা পরে। বাবার সামনে টেবিলে হুইস্কি গ্লাস, গন্ধ আসছে এখান পর্যন্ত। বাবা প্রতীপকে ওইখানে ডাকছেন।

নীহার বললেন—'দিদি আপনি এবার শুতে যান। আর বসে থেকে কী হবে?

'—তাই যাই। কী হল খোকা, যা!'

'—যাচ্ছি।'

নীহার তাকে একটু ঠেললেন, বললেন—'আমি ঘরে যাচ্ছি। আমার সঙ্গে দেখা করে শুতে যাবি। যা, ডাকছেন!'

'যাই!' প্রতীপ বলল। বুকের ওপর আড়াআড়ি হাত। হলুদ পাঞ্জাবি, তার রাতের সাজ। প্রতীপ ঢুকল। হাত নামিয়ে পকেটে ঢোকাল, একটু পরে আবার বার করে আড়াআড়ি রাখল হাত। হাতগুলোকে নিয়ে কী করবে ও ভেবে পাচ্ছে না। বাবা হেলান দিয়ে বসে। চোখ বোজা। সামনে বোতল, গ্লাস। বোতলের অর্ধেকের বেশি খালি। সোডা ওয়াটারের ফেনা গড়িয়ে টেবিলের ঢাকনা অনেকখানি ভিজে গেছে। প্রতীপ একটু গলায় শব্দ করল। বাবা কি ঘুমিয়ে পড়লেন?

চেয়ারটা সে একটু নিজের দিকে টানল। তলায় রাবার লাগানো, শব্দ হল না। বোসসাহেব সোজা হয়ে বসলেন, বললেন, 'বোসো। সামনে নয়। একটু এপাশে সরে এসো। আমি বেশি ঝুঁকতে পারছি না।'

বাবা পাইপ ধরিয়েছেন। হাত একটু কাঁপছে। সে খুব সন্তর্পণে চেয়ারটা বাবার দিকে একটু এগিয়ে নিয়ে বসল। বোসসাহেব বললেন—'তোমার বয়স কত হল?'

'—ইয়ে, একুশ, একুশ বছর তিন মাস।' প্রতীপ বুঝতে পারছে না দিন ঘণ্টারও প্রয়োজন হবে কিনা।

'—কী পড়ছ?'

'—বি এসসি দিলাম।'

'—অনার্স কিসে?'

প্রতীপ জবাব দিচ্ছে না।

'—নেই?'

'—রেখেছিলাম, পরে পাইনি।'

'—কেন?' প্রতীপ মাথা নিচু করে থাকে। এই কেনর সঠিক উত্তর তার জানা নেই। শহরের এক নম্বর স্কুলে বরাবর পড়িয়েছেন বাবা। বাড়িতে টিউটর, বিভিন্ন বিষয়ের। তাছাড়াও—যোগ, আঁকা, নিয়মিত খেলাধুলো ক্লাবে। সবগুলোতেই বাবা জোর দিয়ে থাকেন। পাসটা করেছে। সহপাঠী আর শিক্ষকদের সে প্রিয়। স্কুল-টিমে সব সময়ে থেকেছে। টেনিসে, ক্রিকেটে। প্রতীপ কোনদিনও খুব ভাল কিছু হবার তাগিদ অনুভব করেনি। অন্য ছেলেরা যখন মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিকের আগে আলোচনা করেছে কার ডাক্তার হবার ইচ্ছে, কে ইঞ্জিনিয়ার হবে সিভ্‌ল, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, কে ম্যারিনে চলে যাচ্ছে, ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হচ্ছে কেউ, ন্যাশন্যাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমির পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছে কে, এম বি এ, চ্যাটার্ড, কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট,

ল', সিদ্ধার্থ হয়তো বলেছে—'প্রতীপ তুই জয়েন্টে বসছিস তো?' কথা কেটে রম্যজিৎ বলেছে—'ওর কী দরকার? ওর বাবার অতবড় ব্যবসা। একটু ল, একটু সায়েন্স, একটু কমার্স আর একটু হিউম্যানিটিজ...কী বলিস প্রতীপ?' রম্যজিৎ ভাল ছেলে। স্কুলমাস্টার-এর ছেলে। যেমনি দম্ভ, তেমনি কমপ্লেক্স। কিন্তু কথাটা বলেছে সত্যিই। প্রতীপ হয়তো এই জন্যেই কোনদিন আর কিছু পড়ার কথা তেমন করে ভাবেনি! আর বিজনেসের জন্যে তৈরি হওয়া। সেটা বাবা সময় হলে নিশ্চয়ই করিয়ে নেবেন। এই তার ধারণা। ইতিমধ্যে কোটিপতির ছেলে হয়েও দেড়শ টাকার বেশি হাত খরচ নেই। ট্রামে বাসে চড়ে যাতায়াত। বন্ধুদের নিয়ে পিকনিকে যাবার জন্য তিনটে গাড়ির একটা চাইতে হলেও তিনমাস আগে নোটিস দিতে হয়, কেন, কবে, কী বৃত্তান্ত। বোসসাহেব বললেন তোমার বয়সে আমি সংসারের দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছি। আই এস সি-তে চারটে লেটার পেয়েও পড়াশোনা কনটিনিউ করতে পারিনি। সময় ছিল না। উদয়াস্ত পরিশ্রম।

প্রতীপ কি বলবে বুঝতে পারছিল না। তার আর তার বাবার পরিস্থিতি যে তরুণ বয়সে একরকম থাকেনি, সেটা কি তার অপরাধ?

'—আমার জ্যাঠামশাই সে সময়ে তাঁর কারখানা বন্ধ করে দেবার কথা ভাবছিলেন। তাঁর তিন ছেলে, তোমার জ্যাঠামশাইরা কেউ ব্যবসায় মন দিচ্ছিলেন না। বরং লাভের টাকা থিয়েটার করে, আরও নানা খেয়ালে উড়িয়ে দিচ্ছিলেন। সেই সময়ে আমি, কারখানার সাত আনার অংশীদার ওটার পেছনে উঠেপড়ে লাগি। তখন আমার তোমার চেয়েও একটু কম বয়স।'

বোসসাহেব অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলেন। প্রতীপ উসখুশ করছে। বাবা কী বলবেন এবারে? নিশ্চয় ভীষণ গুরু গম্ভীর, গুরুত্বপূর্ণ কথা। সে ভেতরে ভেতরে বন্দুকের নলের মতো টান-টান হয়ে আছে। বোসসাহেব হেলান দিয়ে বসেছিলেন হঠাৎ সোজা হয়ে বসলেন, তারপর বললেন—'ঠিক আছে তুমি যাও, রাত হয়েছে। গুড নাইট।'

প্রতীপ হতবুদ্ধি। সেই সঙ্গে খানিকটা স্বস্তিও পাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত বাবা কোনও বক্তব্যে পৌঁছলেন না। কোনও নির্দিষ্ট তিরস্কার নয়, কোনও নির্দিষ্ট উপদেশ নয়, কোনও দায়িত্ব পালনের কথাও বললেন না। প্রতীপ হাঁফ ছেড়ে পায়ে পায়ে ঘরের চৌকাঠ পেরোল। ডান দিকে ঘুরলে বাবার ঘরটা পার হলে মার। ঘরের সামনে মা দাঁড়িয়ে, চুল একটু উসকো-খুশকো। সময়ে না ঘুমিয়ে চোখ-মুখ শুকিয়ে উঠেছে। নীহার বললেন—'কী বলল তোর বাবা?'

'—কিছুই না।'

'—কিচ্ছু না?' নীহার অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

'—তেমন কিছু না। আমি কী পড়ছি, বাবা আমার চেয়েও কম বয়সে কারখানার ভার নিয়েছিলেন, এইসব।'

'তাই বল্। কিছু না বলছিস কেন?' নীহারের মাথার কাপড় খসে গেছে। খোঁপা করা ছিল বিনুনি করে, খোঁপার দু'একটা কাঁটা খসে পড়ে গেছে। বিনুনিটা লম্বা হয়ে পিঠে পড়ে। তিনি পেছন ফিরে স্বামীর ঘরের দিকে চলে গেলেন।। নীহার বুঝেছেন বোসসাহেব ছেলেকে কী বলতে চেয়েছেন, পুরোপুরি খোলাখুলি বলতে পারেননি বা

চাননি। বুকে তাঁর উদ্বেগ বেড়ে গেছে। উনিশ বছর বয়স থেকে যে মানুষটা একটা কারখানার বিভিন্ন বিভাগ একরকম নিজের হাতে গড়ে তুলেছে, যে কারখানা মানুষটার প্রাণের চেয়েও বেশি, সেই কারখানা তিনি ছেড়ে দেবেন? তিনিই যদি না পারেন, তো অতটুকু ছেলে খোকন কি করে পারবে? তিনি উনিশ বছর বয়সে পিতৃহীন, সহায়হীন অবস্থার চাপে যা করতে পেরেছিলেন প্রতীপও তা পারবে? সময়ের, শিক্ষার, অভ্যাসের পরিস্থিতির তফাত যে অনেক!

বোসসাহেব ছেলেকে শুভরাত্রি জানালেন একরকম বাধ্য হয়ে। তাঁর আরও অনেক কথা বলার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু একটা জায়গায় এসে থেমে যেতে হল। তাঁর জ্যাঠামশায়ের তিন ছেলে সন্তোষদা, সরোজদা, সুভাষদা একদম শিশুকাল থেকে কোঁচানো ধুতি, গিলেকরা পাঞ্জাবি, সোনার চেন, হীরের আংটি দিয়ে মানুষ হয়েছে। ছেলেবেলায় তিনি দেখেছেন সুভাষদা খেতে পারছে না, বমি করে ফেলছে, জেঠিমার হুকুমে সুভাষদার খাস চাকর রামধনিয়া তাকে আবার নতুন করে খাওয়াচ্ছে। লিভার ফেটে মরে যাবার কথা। তা না গিয়ে সুভাষদা এখন এমন হয়েছে যে ঘাড় হেঁট করতে পারে না। বোস ইন্ডাস্ট্রিজ তাঁর জ্যাঠামশাই অতুল বোসের ব্যাপার। ডার্বি জিতে তিনি এই ব্যবসার পত্তন করেন। কিন্তু তাঁর প্রৌঢ় বয়সে, বড়মানুষের ছেলেদের হাতে পড়ে রমরমা ব্যবসার যখন হাড়ির হাল তখন একদিন সদ্যপিতৃহীন ভাইপো পৃথ্বীশকে ডেকে তিনি সাতআনা শেয়ার দিতে চান। সেই সংলাপ এখনও মনে আছে পৃথ্বীশ বোসের।

তারা থাকত লাহা কলোনির একটা ছোট দোতলা বাড়িতে। জ্যাঠামশাইরা ভূপেন্দ্র বোস অ্যাভেনিউ-এ বিশাল প্রাসাদে । তখন পৃথ্বীশ বাবার প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা দিয়ে একটা প্রিন্টিং প্রেস কিনে নিচের তলায় ছাপাখানা ফেঁদেছে। জ্যাঠামশায়ের তলব পেয়ে খুব অস্বস্তি হয়েছিল। ও বাড়িতে হুটহাট করে যাওয়া তাদের অভ্যাস ছিল না।

দোতলার দালানে জ্যাঠামশাই।—'কে রে পৃথ্বীশ ! আয়! আয়!' পৃথ্বীশ প্রণাম করে সামনের চেয়ারে বসল।

'—নিধিরাম। ছোট দাদাবাবুর জন্যে জলখাবার নিয়ে আয়। শুনলুম নাকি ছাপাখানা করেছিস।'

পৃথ্বীশ মুখ নিচু করে বসে আছে।

'—কী ছাপিস?'

'এই বিয়ে-টিয়ের কার্ড, হ্যান্ডবিল, বুকলেট।'

'—অর্ডার কেমন পাস?'

'—মন্দ নয়। মানে ভীষণ প্রেশার পড়ে।'

'—পড়তা পোষায়?'

'—আজ্ঞে হয়ে যায়।'

'—বাঙালি তো ওই একটি ব্যবসাই বোঝে। ছাপাখানা। কার্ড ছেপে বড়লোক হবি? হতে পারবি?'

একথার উত্তর দেয়নি পৃথ্বীশ । তার ভেতরে অদম্য জেদ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা। সে সব বাইরে প্রকাশের জিনিস নয়। জ্যাঠামশাই ছাড়বার পাত্র নন। আবার একই কথা জিজ্ঞেস করছেন।

'আজ্ঞে জায়গা খুঁজছি। আরেকটু ভাল করে বসতে হবে।'

'—বলিস কী?' জ্যাঠামশাই চমকে উঠলেন।

'—জায়গা পেলে নিয়ে নেবার মতো সঙ্গতি তোর হয়েছে?' প্রশ্নটা একটু অভব্য। কিন্তু উনিশ বছরের ভাইপোকে ষাটোর্ধ্ব জ্যাঠামশাই করতেই পারেন।

পৃথ্বীশ বলল—'তেমন হলে বাড়িটা বাঁধা দিতে হবে। তবে দু'তিন বছর সময় পেলেই শোধ দিতে পারব।'

—এত কনফিডেন্স?'

পৃথ্বীশ চুপ করে রইল। জ্যাঠামশাই হঠাৎ ঝুঁকে বসে বললেন—'বোস ইন্ডাস্ট্রিজ-এর সাত আনার শেয়ার নিবি?' পৃথ্বীশ চমকে উঠল।

'—চমকাচ্ছিস কেন? আমি তোর জ্যাঠা. দিতে পারি না কিছু? আমার বয়স হচ্ছে। ছেলেরা একেকটি ফুলবাবু। ডিরেক্টর নাম চাই, কাজের বেলা সব অষ্টরম্ভা। বোঝে না, বুঝতে চায়ও না। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি কয়েক বছরের মধ্যেই আমার অত সাধের ফ্যাক্টরিটা লিকুইডেশনে চলে গেছে। বিনা স্বার্থে নয়। তোকে শেয়ারটা দিচ্ছি ফ্যাক্টরি বাঁচাতে, তুই পারবি।'

—'আমি?'

—'হ্যাঁ তুই। কিছুদিন আমি যাব। সঙ্গে সঙ্গে থাকবি। দেখিয়ে দেব সব। তুই বুদ্ধিমান ছেলে, কিছুদিনেই বুঝে ফেলবি সব। কিছু বিশ্বাসী লোক এখনও আমার আছে। পেরে যাবি।'

জ্যাঠামশাইয়ের কারখানায় আধুনিক যন্ত্রপাতি। আধুনিক ব্যবস্থা দরকার ছিল। কিন্তু আসল সমস্যা ছিল শ্রমিক সমস্যা। বোস ইন্ডাস্ট্রিজে এখন শ্রমিকদের কোয়ার্টার্স, ফ্রি লাঞ্চ, ফ্রি মেডিক্যাল কেয়ারই শুধু নয়, তাদের ছেলেমেয়েদের জন্যে ভাল স্কুল হয়েছে। বছরে একবার কোম্পানির খরচে কোম্পানির উদ্যোগে বেড়িয়ে আনা হয়। বোনাস বেড়ে গেছে। আধুনিকতম যন্ত্রপাতি এনে ফ্যাক্টরি সাজানো হয়েছে আস্তে আস্তে। কাজের কষ্টও আর এখন আগের মতো নেই। উপরন্তু বিরাট হয়ে গেছে কারখানা, অফিস। এ সবই পৃথ্বীশ বোসের উদ্যোগে। অন্যান্য অংশীদারদের তীব্র বিরোধিতার মুখে করা। যখন ফলপ্রসূ হল এ ব্যবস্থা, তখন অবশ্য সকলেই মনে মনে স্বীকার করেছে পেতে হলে দিতে হয়।

আজ বা এখন বলা যায় কাল সকাল থেকে পৃথ্বীশ বোস এই শ্রমিকদের হাতেই আটক ছিলেন। তারা এমন হারে বোনাস চাইছে যা কোম্পানি দিতে পারে না। তারা এ দাবিও করছে, যে কোনও ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনে, যে কোনও ওষুধের দাম তারা কোম্পানি থেকে পাবে। এই অধিকারের তারা যথেচ্ছ অপব্যবহার করেছে ভূতুড়ে বিল এনে। আরও অপব্যবহারের পথ খোলসা করতে চাইছে। ক্যান্টিনে পঞ্চাশ গ্রাম করে দু'পিস মাছ বা একশ গ্রাম মাংস পেত, সেটাকে ডবল করে দিতে চাইছে। না চাইতেই যেসব সুযোগ সুবিধে পেয়েছিল তা এখানকার কোনও সংস্থার নেই। সে কথা জেনে বুঝেও এই অসম্ভব দাবি নিয়ে ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে ঘেরাও করার পেছনে, বোসসাহেব জানেন, তিনজোড়া হাত কাজ করছে। তাদের মালিকদের মধ্যে একজন ঘাড় ঘোরাতে পারেন না, জুতো জামা সব পরিয়ে দিতে হয়, আরেকজন একটা

থিয়েটার সংস্থার কর্ণধার, তাদের সমস্ত অপচয় ও অসাফল্যের আর্থিক দায় ঘাড় পেতে নিয়ে রেখেছেন, আর বড়জনের জীবনযাত্রার কথা ভদ্রসমাজে উচ্চারণ করা যায় না। কিন্তু এঁদের এবং এঁদের ছেলেদের প্রত্যেকের প্রচুর প্রচুর টাকার দরকার। রোজগার করা টাকা নয়, আকাশ থেকে বৃষ্টির মতো ঝরে পড়া টাকা, মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা টাকা। কোম্পানিতে পৃথ্বীশ বোসের প্রতিপত্তিতে এরা ক্ষিপ্ত। বোস ইন্ডাস্ট্রিজকে এঁরা কামধেনুর মতো ব্যবহার করতে চান। ছেলেরা সব জন্মে থেকেই শেয়ার হোল্ডার। মাঝে মাঝে গাড়ি হাঁকিয়ে আসে। যা নয় তাই ব্যবহার করে চলে যায়। অথচ ঘেরাওটা তাঁকেই হতে হল।

পৃথ্বীশ বোস চোখ বুজলেন : সামনে একটা পরিচ্ছন্ন সুরকির রাস্তা। দু'ধারে অল্প জমি সহ ছোট ছোট একতলা। পরিষ্কার হলুদ রং করা। দু'বছর অন্তর কোম্পানির খরচে রং করিয়ে দেওয়া হয়। জমিগুলোতে ফুল ফল, তরিতরকারির বাগান। বাঁশের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে স্বাস্থ্যবান একটি ছেলে। হাতে গাছ-কাটা কাঁচি। বড্ড ঝেঁপেছে লতাটা, তাই ছেঁটে দিচ্ছে। আর একটা বাড়ির দাওয়ায় ফুটফুটে একটি বাচ্চা স্টিলের বাটি থেকে পিঠে না কী খাচ্ছে। পরিষ্কার লুঙ্গি পরে, খোলা গায়ে হারুণ আলি তাঁকে সালাম জানাচ্ছে। হারুণের ঠিক পেছন থেকে একটা বাঁদরলাঠি গাছের পাশ দিয়ে শুক্লা ত্রয়োদশীর স্বাস্থ্যবতী চাঁদ উঠছে। ছাপা-শাড়ি পরা, নাকে নথ হারুণের বউ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, বলছে—'আপনি ফরিস্তা সাহেব, আল্লার দোয়া আমরা আপনার হাত দিয়ে পাই।' গাড়ি থেকে ওরা নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে হারুণের ছেলে সাবিরকে। দুরারোগ্য রোগে সাবির মৃত্যুর দুয়ারে এসে গিয়েছিল। কোম্পানি যা দেবার দিয়েছে। তার ওপর দিয়েছেন পৃথ্বীশ বোস নিজে। সাতমাস নাগাড়ে হাসপাতাল আর নার্সিং-হোমে থাকবার পর, সাবির ভাল হয়ে বাড়ি ফিরছে।

.এই সাবির, প্রতীপের থেকে সামান্য বড় আজকে ঘেরাওয়ের লিডারদের মধ্যে ছিল। হারুণ ছিল কিনা তিনি জানেন না। থাকলে আশ্চর্যের কিছু নেই। হারুণ মিস্ত্রি আর তার ছেলে সাবির তাঁর নিজের হাতে গড়া মানুষ। একটা পাস করা ইঞ্জিনিয়ারকে কাজ শিখিয়ে দেবে।

চুড়ির আওয়াজ অনেকক্ষণ থেকে বাজছে ঘরের নানা কোণে। এতক্ষণে রক্তাভ চোখ মেলে চাইলেন বোসসাহেব। নীহার বললেন—'রাত তো কাটতে চলল। এবার শোও। তোমার পাজামা এনেছি। জুতো খুলে দিচ্ছি,' নীহার নিচু হলেন।

বোসসাহেব বললেন—'সাবির সবচেয়ে সামনে ছিল।' নীহারের চোখে জল আসছে, বললেন, 'থাকগে তুমি ওসব নিয়ে ভেবো না।'

বোসসাহেব যেন শুনতে পাননি। বললেন—'পেছনের সারি থেকে কেউ গালাগাল দিল হারামির বাচ্চা।'

জুতোর ওপর নীহারের হাত থেমে গেল। শরীরটা শক্ত হয়ে গেছে। তিনি অনুচ্চ গলায় বললেন—'এই কথাটা মেজ বটঠাকুর প্রায়ই বলেন। যখনই যাই অন্তত বার দুই তাঁকে বলতে শুনবই।'

বোসসাহেব উঠে বসলেন—'তুমি তাহলে বুঝতে পেরেছ?'

'—পেরেছি।'

'—ওরা চাইছে কোম্পানি বিক্রি করে দিতে লাখোটিয়াদের কাছে। আমার সাত আনা, স্ট্রেংথ বেশি পারছে না।'.

'—কিন্তু এরপর?'

পৃথ্বীশ উঠে দাঁড়িয়ে জামা কাপড় বদলে নিলেন। আর একটি কথাও বললেন না। কলকাতার আশেপাশে এরকম অনেক প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি লাখোটিয়া, ধুধুরিয়া, জৈন, কাংকোরিয়ারা কিনে নিচ্ছে। কিছুদিন তাকে দোহন করে ছিবড়ে করে কসাইখানায় পাঠিয়ে দিচ্ছে। একটা অত সুন্দর ছবির মতো, চালু লাভজনক শিল্পোদ্যোগের ওই দশা হবে? তিনি থাকতে? তাই-ই তাঁর এত প্রতিবাদ। নইলে বড় তরফের ওরা নিজেদের অংশ বিক্রি করে দিয়ে চলে গেলে তাঁর কী? ভালই। বিছানায় পড়তে, সারাদিনে ক্লান্তি, হুইস্কি, শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্যের পর আরাম তাঁকে নিবিড় ঘুমের মহলে পাঠিয়ে দিল। নীহার ছাড়া ধড়াচুড়ো, বোতল, গ্লাস সব যথাস্থানে রেখে পাশেই নিজের ঘরে চলে গেলেন। শোবেন, কিন্তু তাঁর ঘুম আসবে না। এরপর? এই প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তরগুলো তাঁকে বাকি রাত জ্বালাতে থাকবে।

কার্যক্ষেত্রে কিন্তু দেখা গেল লাখোটিয়া বোসদের বড় তরফের থেকে অনেক বিচক্ষণ, বিবেচক। তারা পৃথ্বীশ বোসের জায়গায় হাত দিল না। লাখোটিয়ারা দুইভাই নিয়মিত অফিসে আসছে। কাজ-কাম দেখছে। কিন্তু তাদের অনেক দিকে অনেক ব্যবসা। সারাক্ষণ থাকতে পারছে না। বাকি সব যে যেখানে সে সেখানে বহাল। লেবার-ট্রাবল মন্ত্রবলে থেমে গেল।

এর মাসখানেক পরে বোসসাহেবের যেদিন ছুটির পর কাজে যোগ দেবার কথা, তার আগের রাত্রে প্রতীপকে ডেকে পাঠালেন বাবা। বললেন—'খোকা, তুমি কি আরও পড়াশোনা করতে চাও?'

'—না, তা ঠিক নয়।'

'—তবে আর সময় নষ্ট কোরো না, কাজ-কর্ম আরম্ভ করে দাও। কাল থেকে আমার বদলে তুমি অফিস জয়েন করছ। অ্যাকটিং ডিরেক্টর হিসেবে। আমি যত শিগগির পারি শেয়ার সব তোমার নামে ট্রান্সফার করে দেবার ব্যবস্থা করছি।'

নীহার এসে বললেন—'কী বলছ তুমি? ও কিছু জানে না। ও কী করে? তাছাড়া অতবড়...।'

বোসসাহেব বললেন—'ওয়ার্কস ম্যানেজার চ্যাটার্জি আছে। সেক্রেটারি মেনন আছে। ওদের কাছ থেকে কাজ শিখতে ওর মাস ছয়েকের বেশি সময় লাগবে না।'

'—কিন্তু ওর সারা জীবনটা সামনে পড়ে রয়েছে ঠাকুরপো, এখনই...' বড়মা বললেন।

'—জীবনটা যত তাড়াতাড়ি আরম্ভ করা যায়, ততই তো ভাল বউঠাকরুণ।'

'—তো তুমি হাতে করে শেখালে হত না?'

'—আই কান্ট গো ব্যাক।'

প্রতীপ নিজেকে প্রস্তুত করার সময় পেল না।

আইনঘটিত যা-কিছু কাজ শেষ হয়ে যাবার তিনদিনের মাথায় বোসসাহেব নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। স্ত্রীকে চিঠি লিখে রেখে গেছেন—'নীহার, আমি নিরুদ্দেশ

হইনি। বহাল তবিয়তে জীবিত এবং সঠিকানা আছি। তোমরা আমার জন্য অযথা মন খারাপ কোরো না। অনর্থক ছোটাছুটিও কোরো না। আমি নিয়মিত চিঠি দেব। তোমাদের সংবাদও নেব। ভাবনার বিন্দুমাত্র কারণ নেই। ধরো পাশা খেলায় হেরে গেছি। অজ্ঞাতবাস দরকার হয়ে পড়েছে। এক জায়গায় বসে থাকলে তো চলবে না, তাই এখন ভ্রাম্যমাণ কিছুদিন। মাত্র কিছুদিন।'

এই চিঠি পড়ার পর নীহার তাঁর বড়জাকে এবং ছেলেকে বিশেষ করে নিষেধ করে দিলেন—চাকর বাকর কেউ যেন জানতে না পারে, বোসসাহেব তাদের না বলে কোথাও গেছেন। তিনিও পৃথ্বীশ বোসের স্ত্রী। অত সহজে ভেঙে পড়ার পাত্রী তিনিও নন। ছেলের এখন নতুন জীবন আরম্ভ হয়েছে। প্রতিদিন সে হা-ক্লান্ত, দিশেহারা হয়ে বাড়ি ফিরছে। একদিক থেকে মা, আরেকদিক থেকে জ্যাঠাইমা তার দু'পাশে দুই স্তম্ভের মতো দাঁড়িয়ে। সত্যেন চ্যাটার্জি এবং মেনন তো আছেই। লাখোটিয়া ভাইরাও একুশ বছরের খুদে ডিরেক্টরকে সসম্মানে সব কিছু শেখাবার ভার নিয়েছে। তাদের ব্যবসার জাল অনেক দূর ছড়ানো। এই কোম্পানির গুড-উইলের মূল্য তারা জানে। ব্যবসা লাটে ওঠাতে তারা চায় না। ব্যতিক্রমী দুই ভাই।

বোসসাহেবের যে কথা সেই কাজ। প্রায় প্রতি সপ্তাহে তাঁর চিঠি আসে। কলকাতা জি পি ও-র ছাপমারা। তিনি ভাল আছেন, প্রেসার নববুই-একশ চল্লিশ, ব্লাড-সুগার নিয়ন্ত্রণে। পাঁচ কেজি ওয়েট কমে গেছে। ভীষণ ব্যস্ত। মুসুর ডাল কীভাবে সাঁতলাতে হয়। রাঙালু ভাতে দেবার সময়ে খোসাসুদ্ধু দিতে হয় আলুর মতো? না খোসা ছাড়িয়ে? প্রতীপের খাওয়া-দাওয়াগুলো আরও নিয়মিত হওয়া দরকার। বৌঠাকরুণ ওষুধগুলো ঠিক খাচ্ছেন কিনা। ড্রাইভার মোহিতবাবুকে প্রতীপ যদি মনে করে যেন শ'দেড়েক টাকা মাইনে বাড়িয়ে দেয়। ইত্যাদি ইত্যাদি।

চিঠি পড়ে মনে হয় বোসসাহেব তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। স্বপাক আহার করছেন। চিঠির ছাপ দেখে মনে হয় কলকাতায় ঘাপটি মেরে বসে আছেন। আর খবর রাখবার ধরন দেখলে মনে হয় এই বাড়িরই ছাতে বাসা করেছেন। প্রতীপের দিনটা কেটে যায় যেন ঘোরের মধ্যে। তার সময় নেই। নিজস্ব সময় নেই। কারও কথা ভাববার সময় নেই। তার মাথার ওপরে একটা বিশাল প্রাসাদ বসিয়ে দিয়ে গেছে কে। প্রাসাদের মধ্যে গোলক ধাঁধা। সে সেই গোলকধাঁধার মধ্যে চোখ বাঁধা অবস্থায় ঘুরে মরছিল প্রথমটায়। তারপর দেখল তার হাতে একটা সুতো বাঁধা, সুতো ধরে ধরে গোলক ধাঁধার অন্ধ গলির বাইরে আসা যায়। তারপর দেখল অন্ধতা অজ্ঞানের। জ্ঞানাঞ্জন শলাকার ছোঁয়া লাগতে লাগতেই ক্রমশ পুবালি রোদ সে ভালই দেখতে পাচ্ছে। এখন লাখোটিয়ারা তার ওপর খুব নির্ভর করে। সে নাকি সারা পশ্চিমবাংলার কনিষ্ঠতম ম্যানেজিং ডিরেক্টর। সবচেয়ে খুশির কথা প্রতীপের ছোটবেলার বন্ধু আবীর সেন এসে যোগ দিয়েছে বোস ইন্ডাস্ট্রিজ-এ।

রেলই ওদের প্রধান ক্রেতা। সেবার রেলওয়ে মিনিস্ট্রির সঙ্গে কথাবার্তা বলতে প্রতীপ দিল্লি গেল। সঙ্গে আবীর। একটা মস্ত বড় গোলমাল পাকিয়ে ছিল। সেটা সমাধান হল, মিটল। আবীর বলল—'প্রতীপ, সত্যি বলছি তোর মধ্যে এত এলেম ছিল জানতাম না। এই ক'বছরে তুই যা খেটেছিস, বোধহয় দশ বছরের কাজ করে

ফেলেছিস। অফিসে টেলিফোন করে দিয়েছি। চল দু'জনে একটু ঘরছাড়া দিকহারা হয়ে ঘুরে আসি। কিছু ছুটি আমরা উপার্জন করেছি।'

প্রতীপ বলল—'দিল্লিতে থাকতে থাকতে বলতে পারতিস, কত যাবার জায়গা ছিল।'

আবীর বলল—'চ আমাদের দেশে নিয়ে যাই তোকে। চিরকাল শহরে থাকিস। পলিউশন-ফ্রি আকাশের তলায় দু'দিন কাটালে বেশ তাজা ঝরঝরে হয়ে যাবি।'

প্রতীপ বলল—'গ্রাম দেখবার শখ আমার অনেক দিনের। ইলেকট্রিসিটি নেই বলে তেমন গা করি না।'

'—শহরে তাহলে ইলেকট্রিসিটি আছে বলছিস?'

'—তা যা বলেছিস'—প্রতীপ হাসল।

বাস থেকে নেমে ছোট্ট একটা নদী। খেয়া পার হয়ে পাকা রাস্তা। বোঝাই গরুব গাড়ি। ভ্যান, চলেছে। বিরাট দিগন্ত। বিশাল আকাশ। এত সবুজ, এত তাজা, এত মুক্ত যে সত্যিই প্রতীপের মনে হল তার ক্লান্তির খোলসটা শরীর মন থেকে খসে পড়ে যাচ্ছে। পাকা রাস্তা থেকে খানিকটা ভেতরে হেঁটে আবীর সেনের দেশের বাড়ি। আবীরের জ্ঞাতি কাকা-কাকি বাড়ি আগলে থাকেন। ওদের দেখে যেমন আশ্চর্য, তেমন খুশি হলেন। রাত্তির বেলায় আলো জ্বলতে দেখে ওরাও ভীষণ খুশি। আবীর বলল—'বায়ো গ্যাস, না?' কাকা মিটিমিটি হাসলেন। বললেন ডেয়ারি আর পোলট্রি দেখবি কাল সকালে। সব একেবারে বিজ্ঞানসম্মত। কত যে শিখেছি! শিখছি!'

পরদিন কাকিমা কাঁচকি মাছের চচ্চড়ি এবং পুকুরের শোল মাছের কালিয়া করেছিলেন, বেগুনেব ভর্তা, কচি ঢেঁড়স দিয়ে পোস্ত চচ্চড়ি। তরি-তরকারির স্বাদ কী। শুনে কাকিমা হাসলেন, বললেন থলি ভর্তি করে দেব, যদি নিয়ে যাও বাবা।

মাঘ শেষের দুপুর, ঘরে বসে থাকতে ভাল লাগল না। কাকা দুটো সাইকেল জোগাড় করলেন। তিনজনে মিলে বেরিয়ে পড়ল। যেতে যেতেই ক্রমশই সবুজ, আরও সবুজ। শৃঙ্খলা, আরও শৃঙ্খলা। সুরকির রাস্তার দু'ধারে সটান সব পেঁপে গাছ দাঁড়িয়ে আছে। কাকা বললেন—'এটা হল কল্পতরু ফার্ম এরিয়া। পেঁপে তো দেখতেই পাচ্ছিস, কাঁঠাল ধরে গাছের প্রায় গোড়া থেকে, এ মরশুমে অন্তত তিনশ কলমের আম গাছ ফল দেবে মনে হয়। বউল এসে গেল বলে। লঙ্কাদা এসব জায়গার ছিরি ফিরিয়ে দিয়েছেন।'

'—লঙ্কাদা?' আবীর অবাক হয়ে বলল—'অদ্ভুত নাম তো?'

'—গত দু'বছর সূর্যমুখী লঙ্কা ফলিয়েছেন রেকর্ড। কোয়ালিটি কোয়ান্টিটি দুই-ই। সেই থেকে লঙ্কাদা নাম হয়ে গেছে। আমার গুরু।'

দিগন্ত অবধি আলুর খেত। কিছু কিছু লোক মাঠে কাজ করছে। কাকা বললেন — 'ওই তো লঙ্কাদা টোকা পরে কাজ দেখছেন, চল্ তোদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।'

কোথা থেকে ব্যাকুল কোকিল আর বউ-কথা-কও-এর ডাক ভেসে আসছে, চারদিক সবুজে-খয়েরিতে ঝকমক করছে, প্রতীপ দেখল মাঠের মধ্যে থেকে একটি অর্ধবিস্মৃত আকৃতি উঠে দাঁড়াচ্ছে। তার বাবা। খাকি রঙের হাফ-প্যান্টের নিচ থেকে দুটো মজবুত মেহগনি পা। মুখটা রোদে পুড়ে পুড়ে গাঢ় তামাটে হয়ে গেছে। বলিষ্ঠ, মেদহীন কাঠামো। ডানহাতখানা নেড়ে কর্মীদের কিছু নির্দেশ দিচ্ছিলেন। প্রতীপকে সামনে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন।

আবীর বলল—'এ কী? কাকু না?' সে কস্মিনকালেও প্রতীপের বাবাকে কাকু বলে ডাকেনি। 'তোর বাবা' কিম্বা আঙ্কল, যিনি অনেক দূরের মানুষ। কিন্তু এখন সামনা সামনি তার এই ডাকটাই বেরোল।

হাসি মুখে পৃথ্বীশ বোস জিজ্ঞেস করলেন—'তুই কি জেনে? না, না জেনে? চাটুজ্জেটা তো আচ্ছা...'

প্রতীপের চোখে জল এসে গিয়েছিল এতদিন পর বাবাকে অটুট দেখতে পাওয়ার আনন্দে। বাবা হঠাৎ এসে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

'—বিষ্টুবাবু, এটি আমার ছেলে। কিছুদিন এদের একটু ধাঁধায় ফেলে রেখেছিলাম।'

ততক্ষণে বোস ইন্ডাস্ট্রিজ-এর ছোট বোস বাবার গায়ের তাজা ঘাম আর মাটির গন্ধের সঙ্গে নিজের চোখের জল মিশিয়ে ফেলছে। এত আকস্মিক! এত অতর্কিত।

বাবা সেটা বুঝেছেন। অতীতের বোস সাহেব বুঝতেন কিনা কে জানে! এখানকার লঙ্কাদা বুঝেছেন। বলছেন—'আমি জানতাম তোর কোনও অসুবিধে হবে না, এখনই তো তুই পৃথ্বীশ বোসের এক কাঠি বাড়া হয়ে গেছিস!'

বাবা আগে কখনও তাকে তুই বলতেন না। কাউকেই না।

বাবার পেছন পেছন একটা লাল টালি ছাওয়া মেটে বাংলোয় ঢুকল প্রতীপ। বাঁশের জাফরি, গ্রাম-শিল্পীর হাতে আঁকা ম্যুরাল দেয়ালে, অজস্র তরুলতার ফুল ফুটেছে। মেহেদির বেড়ার পাশ দিয়ে বসন্তবউরি হেঁটে গেল একটা। বাঁশের চাঁচারি না কী দিয়ে বোনা গোল মোড়ার ওপর শিমুল তুলোর গদি। বসতেই প্রতীপের সামনে বিছিয়ে গেল অতুল ঐশ্বর্যে ভরা সুখদা বরদা মলয়শীতলা গ্রামভূমি।

'—আসলে লোহা লক্কড় ঘাঁটতে ঘাঁটতে জেরবার হয়ে গিয়েছিলাম, বুঝলেন না?' আবীরের কাকাকে বোঝাচ্ছিলেন বাবা, একটু অপ্রতিভ, তাঁর পরিচয়টা এভাবে প্রকাশ পেয়ে যাওয়ায়।

কিন্তু প্রতীপের মনে হচ্ছিল ও সব লোহা-লক্কড় টক্কড় কিছু না। সবুজ-নীলের টানা-পোড়েনে তিনি এই যে একখানা নতুন রকমের নকশা বুনতে বসিয়েছেন, এটাও যদি কোনও কারণে ধাক্কা খায় পৃথ্বীশ বোস দ্বিতীয়বার ফিরে তাকাবেন না। ভেতরের গড়ার তাগিদ মেটাতে দুঃসাহসী মানুষটি পৃথিবীর শেষ প্রান্তেও চলে যেতে পারেন দরকার হলে। আসলে তাঁর ব্রোন্‌জ রঙের মুঠি দুটো এক অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় সৃষ্টিকরের, যিনি একই সঙ্গে আসক্ত এবং মুক্ত।

কাক-জ্যোৎস্না

এই পাখিটাকে বোধহয় কেউ পছন্দ করে না। কেউ না। পাখি বলে মনেই হয় না এটাকে। জমাদার পাখি তো জমাদারই। জঞ্জাল সাফ করতেই পয়দা হয়েছে। পাখি এখনও নয়। 'পাখি' শব্দটার মধ্যে কেমন পাখি-পাখি ভাব আছে না একটা? আহা-আহা করে মন! আয়রে পাখি ন্যাজঝোলা,খেতে দেবো ঝাল ছোলা, খাবি দাবি কলকলাবি খোকনকে নিয়ে বেড়াতে যাবি!

আদর করে প্রতিশ্রুতির বোল বানাও, যেন শিশুও যে, পাখিও সে। শিশুতে পাখিতে, শিশুর আদরে পাখির আদরে এক হয়ে যায়।

পাখি যখন আচমকা উড়ে যায়? ডানার তলায় লুকোনো রঙের সওগাত দিয়ে যায়। যদি কাছের ডালে এসে বসে? ডাল দুলবে আবেশে, আয়েসে, ছন্দে, আনন্দে। মাছরাঙা-টাঙার মতো শাঁ-আঁ-আঁৎ করে যদি এক লপ্তে ঝাঁপ দিয়ে চলে যায় এতটা? তবে রোদ্দুরে নীলা, রোদ্দুরে চুনি, রোদ্দুরে পান্না। তাতা থই থই/তাতা থই থই, তাতা...

পাখি, আহা পাখি-রে!

আয় বেনে-বউ, বসন্ত বৌরি...ময়ূর ময়ূরী...পান কৌড়ি!

মরি ! মরি!

রূপের বাহার যার নেই তার দ্যাখো নামের বাহার! ভঙ্গির বাহার!

টপাস টপাস করে ডিগবাজি খাচ্ছে ডাহুক জলের ওপর? ব্যাপারটা হল শিকার ধরা। ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়। কিন্তু কেমন একটা আস্ত ছেলে-ভুলোনো কমেডি তৈরি হয়ে যাচ্ছে। কিংবা ছড়া। ছড়ার ছন্দ।

টপাক টপাস

গপাক গপাস।

আর ঘুঘু। কী অসামান্য ওর ধূসর কোমলিমা! ওর মৃদু ময়ূরকণ্ঠী কণ্ঠ, পেলব রেখায় আঁকা সুগোল মুণ্ড, ওর টলটলে ফোঁটা-চোখ!

ডাকটা! ডাকটা! ঘুঘুর ডাক!

তুমি বসে আছো। তোমার ভেতরে ভালো খবর, পানাহারে বেশ তৃপ্ত তুমি, আপনজন পাশে বসে রয়েছে। মুহূর্তে সব লুপ্ত হয়ে যাবে গোধূলি-সন্ধির আবছায়ায়। না না, সে নেই। কোনও দিনও ছিল না। স্বপ্নে ছিল হয়ত। তার বেশি কোথাও নয়। পাওয়া তোমার হয়নি নটরাজ। কোন্ সুদূর, অনাগত আগামীর দিনে-রাতে পাওয়া তোমার অনাসন্ন হয়ে এলিয়ে আছে।

কঃ। খঃ!

জানলার পাটের ওপর ছরকুটে পায়ে দাঁড়িয়ে, চোখ টেরিয়ে, ঘাড় বেঁকিয়ে ডাকছে কাকটা।

ওরে কাক, এখানে তোর কাঁটা-পোঁটা-তেল পটকা ওইসব কুৎসিত আমিষগুলো থাকে না, থাকে না। এখানে বই, এখানে খাতা, এখানে কলম। এসব তুমি বুঝবে না

বাপা!

ওহ্, তাই বল্। চুরির তালে? এই স্নিগ্ধ স্লিম নীল জটারটার দিকে চোখ পড়েছে তাহলে? না ওই তন্বী শুভ্রা পেপার কাটার? কোন্‌টা তোর নোংরা বাসায় নিয়ে যেতে চাস?

হুশ, হুশ, হু-উশ্!

বেশ একটা আমেজ এসেছিল, চলে গেল ঝপ করে। ফিউজ। নটরাজ ফিউজ। নটরাজ সিন্‌হা বেকার। তিন বছর হল। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ? হয়েছে হয়েছে, কার্ড হয়েছে। সি. এস. সি.? আবেদন গেছে। খবর নেই। কোনও খবর নেই, দৈনিক কাগজ দেখে বিজ্ঞাপনের জবাব? প্রচুর, প্রচুর। পোস্ট আপিসের ফালাও কারবারটা নটরাজ সিন্‌হার জন্যেই চলছে। সর্ববৃহৎ কাস্টমার, পোস্ট আপিসের।

আত্মীয়-প্রতিবেশীদের মাথায় স্বভাবতই ঝুড়ি। ছোট বড়। রাস্তায় ঘাটে, বাসে ট্রামে দেখা হলেই হন্তদন্ত হয়ে ঝুড়ি নামিয়ে দিচ্ছে। উপদেশের ঝুড়ি।

—আরে কম্প্যুটার শেখ, কম্প্যুটার শেখ। কিছু না হোক হাতখরচাটা উঠে যাবে!

—কেটারিং। এখন কেটারিং টেকনলজির যুগ। একটু মন দিয়ে লেগে থাক। লাগে তাক না লাগে তুক।

—তোর তো বেশ লেখার হাত ছিল নট। একটা ছোটখাটো কাগজ দিয়ে কেরিয়ার আরম্ভ করতে পারতিস! ছুঁচ হয়ে ঢুকতিস আর ফা—ল হয়ে বোরোতিস! বুঝলি তো?

উচ্চস্তরের গাম্ভীর্য বিকীর্ণ করতে করতে ওই চলে যাচ্ছে শৌভিক। সদ্য সদ্য চাকরি পেয়েছে। আফটার শেভের গন্ধ ভুরভুর করছে। নটরাজের থেকে দু বছরের জুনিয়র। বাপী! রথতলার বাপী! ইয়ুথ ক্লাবে সবচেয়ে বেশিক্ষণ থাকতো, ফাই-ফরমাশ খাটত! আজকাল আসে না, খাটে না, চলার ছাঁদ বদলে গেছে। ও-ও পেয়ে গেছে। এমন কি রেমির বোন রিয়া, যে সর্বক্ষণ ফেউয়ের মতো পেছনে লেগে থাকত? সে-ও হাত উলটে কবজি ঘড়ি দেখে বলছে—'ওহ্ সময় নেই নটদা, অফিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে। চলি...।'

ইতিমধ্যে বাড়ির অভিভাবক দাদা বলছে ক্কঃ, খ্বঃ। অফিসে বেরোতে বলছে অফিস থেকে ফিরে বলছে, চান করে মাথা মুছতে মুছতে, খেয়ে দেয়ে আঁচাতে আঁচাতে, ঘুম পেলে হাই তুলতে তুলতে, চোখ টেরিয়ে, ঘাড় বেঁকিয়ে, ছরকুটে হয়ে দাঁড়িয়ে, গলার ভেতর থেকে অচেনাতর, অচেনাতম গমক বার করে বলছে ক্কঃ বলছে খ্বঃ। অর্থাৎ খুব খুব খারাপ। আর দাদার শ্রীমতী বউদি? বউদি মুখ ফুটে কিছু বলছে না অবশ্য। ভাতের পাশে ডাল, ডালের পাশে থোড়, থোড়ের পাশে বড়ি, বড়ির পাশে খাড়া—অক্লান্ত নিয়মানুগত্যে সাজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে দুবেলা। থালার পাশে এক চিমটি ছাই। দেখতে পাচ্ছে নটরাজ। তৃতীয় চক্ষু দিয়ে। দূর দূর ছেই ছেই, শুনতে পাচ্ছে তৃতীয় কর্ণ দিয়ে। চা-পাঁউরুটি-টোস্ট নিয়ে সকালে সাত তাড়াতাড়ি দরজার পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে বউদি রোজ। কিছু বলছে না। চুপচুপ হাতে ধরিয়ে দিয়ে সড়সড় করে চলে যাচ্ছে তেঁতুলে বিছে। বলছে না কিছু। কিন্তু তার হয়ে জানলার পাটে বসে থাকা ওই কাক না কাকিনী, শকুনি না গৃধিনীটা বলে দিচ্ছে।—খ্যা খ্যা খ্যা খ্যা খ্যা।

সন্ধে। আলো জ্বলে। ওপরেও আলো। নীচেও আলো। জড় আলো, যার ব্যবস্থা মাইকেল ফ্যারডে করেছিলেন। আর চেতন আলো, যার ব্যবস্থা করেছে বা করেছেন অজ্ঞেয় ঈশ্বর স্বয়ং। বাচ্চাদের মিস। আলো যাচ্ছে ঘরের বাইরের সরু বারান্দা দিয়ে, শুক-সারিকে পড়াতে। দাদার ছেলে-মেয়ে। আলো যাচ্ছে, পরদা তুমি উড়ে যাও, কপাট তুমি খুলে যাও, চশমার লেন্স্ তুমি টেলিস্কোপের লেন্স্ হয়ে যাও। হলুদ ডুরে শাড়ি ঝলকে গেল, চমকে গেল। ক্ষুরধার বারান্দা-পথে বিজুরি-আখর।

গেছে, গেছে। পরদা উড়ে দরজার মাথায় লটকে গেছে। খোলা কপাট। চৌকাঠে আলো। চোখে সোনালি ফ্রেম। পরো না আলো, ও ফ্রেম পরো না। নাকের দু পাশে ডোব-ডোব গর্ত হয়ে যাবে। শেল পরো আলো, সাধারণ শেল।

—এ কি? এমন করে চুপচাপ বসে আছেন যে?

—পা নেই।

—পা নেই? কী হল? মচকেছেন?

—উদ্বেগ, স্নেহ, শঙ্কা। বাঃ! এভাবেই হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে শামুক এগিয়ে যাবে।

হেসে ফেলেছে। —ওহ্ পা মানে দাঁড়ানোর পা, পারেনও বটে আপনি—তো হবে! শিগগিরই হয়ে যাবে।

—বলছেন?

—বলবো না কেন? সবারই তো হয়!

—লাখে লাখ শিক্ষিত বেকার। সবারই তো হয়! বললেই হল!

—হয়ে যায় তো দেখি! অন্তত যাদের হয়, তাদের দলে আপনি।

—বাঃ প্রফেসি? না উইশফুল থিংকিং?

—দুই-ই।

—ধন্যবাদ। সুক্রিয়া। —আজকাল হিন্দিটা বেশি চলছে।

চলে যাচ্ছে আলো। আবার সব ফিউজ করে দিয়ে চলে যাচ্ছে। বউদির ঘরে, শুক-সারির পড়ার টেবিলে আলো জ্বালতে চলে যাচ্ছে।

আধা-ফরসা রঙটা। ভালো খেতে টেতে পেলে, দু চার টিউব ক্রিম-টিম মাখতে ফাখতে পেলে এই রঙেই মার্বেলের গ্লেজ দেবে। অতএব ক্রিম মাখে আলো। খেতে পায়। জামতাড়ার বাংলোর হাতায় দুটো বেতের চেয়ারে দুজনে বসে থাকে। নীল-গোলাপি ম্যাকসির লেসের পাড় আলোর মার্বেল পায়ের পাতা ছুঁয়ে চুপটি করে শুয়ে আছে। বেয়ারা ফ্রায়েড চিকেন আর চিকিত চিকিত করে কাটা আনারসের চাকতি রেখে গেল। কোথায় যেন এই কম্বিনেশনটার কথা শোনা গেছিল। পালিশ-করা আঙুলে একটাই লাল-কমলা পাথর। কী ওটা? কী আর! পাথর নয়, প্রবাল। সমুদ্রের তলায় থাকে। মাঝে মাঝে উঠে আসে আলোরা সাজবে বলে। ফিগার আঁকড়ে ধরে থাকে, কী যেন বলে ওই শাড়িকে? ধনেখালির মোড়ক ছাড়িয়ে সেই কী যেন বলে শাড়ি স্বপ্নরঙিন নেশায় মেশা সে উন্মত্ততা আলোর অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে দিচ্ছে নটরাজ। বেগুনি না গোলাপি কী বলে এ রঙদের? এরা কোনও চেনা-জানা নামের খাঁচায় ধরা পড়তে চায় না। বনের পাখি এসব রঙ, এসব শাড়ি, বলে—খাঁচায় ধরা নাহি দিব। বলে—কেবলি বনগান গাব। তাই মোটা কালো বিনোদ বেণী ঢেউ খেলিয়ে খেলিয়ে

এলিয়ে যাচ্ছে। কাঁধ পিঠ সমস্ত ঢেকে চেয়ারের আশে পাশে পেছনে সামনে লুটিয়ে যাচ্ছে রাজকন্যের মেঘবরণ কেশ। ঝড়ের দোলা লাগল মেয়ের আলুথালু বেশ গো। আলুথালু...। ছুটছে আলো, ছুটছে। ঝড়ই তাকে ছুটিয়ে নিয়ে যায়। দুরন্ত বাসনার ঝড়। কার বাসনা? কার আর? নটরাজের।

আলোর মুখের কাট গ্রীসিয়ান। স্লিম, মডেলমার্কা আজকালকার রমণী নয়। চিরকালের। দীর্ঘ, কিন্তু অতি-দীর্ঘ নয়। সুডৌল। চোখের তারা দুটো সামান্য ওপর দিকে করে দাঁড়াও আলো! হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। এথিনা, গ্রীক দেবী এথিনা।

এথিনা রান্নাঘরের ফোড়নগন্ধী ইঁদুরে অন্ধকারে পিঁড়ি পেতে বসে ডেঙ্গর ডাঁটা চিবোচ্ছে। ভাবা যায়? লুঙ্গি, গামছা, দাঁত মাজনের লাল পাউডার, পোড়া কড়া, পোড়া চাটু, ডাল-ঝোল তেল ব্যাড়বেড়ে হাতা-চামচ, টিনের দরজা, ধরা জল খরচের কিপটে আওয়াজ, ধপাস ধপ ধপাস ধপ, কাঁথাকানি কাচিতং, ধরে গেল, হাফ লিটার সবে ধন মাদার ডেয়ারি ধরে গেল। ধর ধর ছোট খোকাটাকে ধর, যাঃ মুখে পুরে দিল। জ্যান্ত আরশুলাটাকে মুখের ভেতর...ম্যাগো! খোল। খোল মুখ! ভ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ। ভাবা যায়?

এথিনা, তোমাকে আমি নিয়ে যাবো তোমার স্ববেদীতে। আক্রোপোলিস। বেশি নয়, একটি ভক্ত একান্ত থাকবে তোমার। তুমি শুধু বীরাঙ্গনা মুদ্রায় দাঁড়িয়ে প্রেমকরুণ শুভদৃষ্টিটা তার দিকে পাঠিয়ো। আরও থাকবে ভক্ত। মনুষ্য ও দেবগণ। কিন্তু তারা বাহ্য। তারা তোমার ভঙ্গি দেখতে পাবে। অঙ্গ দেখতে পাবে না। দেখতে পাবে ঘুরে ঘুরে চূড়াকার কেশের বাহার, দেখতে পাবে না চোখের নিভৃত নজর।

কিংবা তুমি ওড়ো, আলো ওড়ো। তোমায় আমি ওড়ার পোশাক পরিয়ে দিলুম। বেশি দূর উড়ান দিতে হবে না, ময়ূর আমার! বেলে পাথরের স্থাপত্যের পটভূমিটা খুঁজে পেতে যা দেরি। তারপর পেখম মেলে দাঁড়াও। ঝর ঝর ঝর ঝর আওয়াজ তুলে নাচো, ময়ূর নাচো। বাঁচো।

—আপনি এখনও ওইভাবেই বসে? পা খুঁজে পাননি?

—ধ্যান করছি।

—বাঃ ধ্যান খুব ভালো জিনিস। কিন্তু ট্যুইশানি আরও ভালো। হাতে আছে কটা। ভালো টাকা দেবে। করবেন?

—তো আপনি করছেন না কেন?

—আমি স্পেশালাইজ করেছি বাচ্চাদের লাইনে।

—তা এরা কি বাচ্চার বাপ?

—উঃ, পারেনও। বাপ না হোক, দাদা-দিদি। বি.এ. হনস, এম.এ, আপনার তো প্রচুর নোটস আছে।

—সে সব নোটস আমি একজন ছাড়া কাউকে দেবো না।

—দিতে যাবেন কেন? ব্যবহার করবেন।

—সেই একজন যে কে জিজ্ঞেস করলেন না তো।

—জানি। আমার পরীক্ষার পড়া করার সময় নেই। সকালে তিনটে, সন্ধেয় দুটো রোজ। জোড়া জোড়া বাচ্চা সব। কখন পড়ি বলুন?

হুশ্। পাখি উড়ে গেল।

কিন্তু, কী বারতা রেখে গেল ও? বি.এ. অনার্স, এম.এ, ছাত্র-ছাত্রী? ভালো টাকা? সত্যিই তো? প্রচুর ভালো নোটস আছে। রয়ে গেছে। চাকুরি যখন হচ্ছে না, উপার্জন করতে দোষ কী? এটা কেন এতদিন মাথায় আসেনি?

অতঃপর নটরাজ দিনের পাখি। রাতের পাখি। পুরাতন সাইকেলটা কাজে লাগছে, কাঁহা কাঁহা মুলুকে চলে যাচ্ছে নটরাজ। মাস গেলে পকেটে কড়কড়ে কাঁচা নোট। মাস গেলে বউদির হাতে সেভন হানড্রেড থোক।

দাদা মুখ ধুচ্ছে।—খ্ খি?

রিশেষ কিছু নয় দাদা, ট্যুইশানি।

বউদি বলল—তা হোক। লক্ষ্মীর আবার জাত কী? মা সদাই মা।

আপন খাঁচায় ফিরে এসে এবার নটরাজের খি-খি করার পালা। হাতের নোট-গুলো সাজায় আর হাসে—মা? অ্যাঁ? তোরা শেষ পর্যন্ত মা বনে গেলি? যা ববাবা।

ক্রমশ দশ হাজারি হয়ে তবে দম নেয় নটরাজ। সেবন্তীর বাড়ি জনা দশ একত্রে পড়ে। নিয়াজ হাসানের বাড়ি আরও দশ। রাজিন্দর সুরানার ঘরটা আরও বড়। ওদের সব ঘরই হলঘর। ওখানে একসঙ্গে বারো জন। আর নটরাজের মাটি ভাপাবার সময় নেই। কে বলল খ, কে বলল খা, শোনার সময় নেই। লাইব্রেরি যাচ্ছে রেগুলার। জিরক্স করছে তাড়া তাড়া। বিতরণ হবে। মোটর সাইকেল কিনেছে, লাল হেলমেট, কোচিং যাবে। ফেল্টপেনের সেট। খাতা কারেকশন করবে। নটরাজ একাই একখানা চলমান য়ুনিভার্সিটি।

ভালো উপরিও আছে প্রফেশনে। রেজাল্ট বেরোলে উপহার আসতে থাকে নানান কিসিমের। চিত্রাংশু দিয়ে গেল 'মিথ্স্ অ্যান্ড লেজেন্ডস', সুমনা এনেছে বিদেশি কলম, মাইকেল জ্যাকসন নিয়ে হাজির সুশোভন, মিতারা দশজনে মিলে কিনে এনেছে এনসাইক্লোপিডিয়া ছ-ভল্যুম। সুরানা রবীন্দ্র রচনাবলী রাজসংস্করণ।

ফুরফুরে চুল সাবধানে আঁচড়ে তাম্রলিপ্ত জিনস্ আর ক্রিম টি শার্ট পরিধান করে অতএব নটরাজ সেবন্তীর বাবার বাড়ি যায়। শ্রেষ্ঠ উপহারটি তিনিই দেবেন। দশহাজারি টিউটরের লালচে গাল, কালচে চুল, চকচকে খোলনলচে, ধুন্ধুমার মোটর সাইকেল, কথাবার্তায় সাবলীল দখল সেবন্তীর মতো সেবন্তীর বাবাকেও টানে। নামি বিজ্ঞাপন কোম্পানির দামি চাকরি তাঁরই সৌজন্যে হাঁকড়ায় নটরাজ। এবং শেহ্নাই বাজে।

নটরাজ সিন্হা, যে একদিন নিজের পা খুঁজে পাচ্ছিল না, বাম্পার ড্র-এর ফার্স্ট প্রাইজখানাই সে পেয়ে গেছে লটারিতে। সে এখন শ্বশুরপ্রদত্ত সুবিশাল যোধপুরী ফ্ল্যাটে থাকে। মামাশ্বশুর প্রদত্ত কনটেসা হাঁকায়। ঘরে ঘরে অত্যাবশ্যক ভোগ্যপণ্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রাগুলি পিসি শাশুড়ি মাসি শাশুড়িরা যুক্তি করে উপহার দিয়েছেন। সেইখানে চিনে মিস্ত্রির তৈরি সেগুন কাঠের ফার্নিচারে অঙ্গ রেখে অফিসান্ত কাজকর্ম সাঙ্গ করেন বাদশাহ। চেহারায় আরও চেকনাই। চুলে আরও গ্লেজ। চলনে আরও উড়ান। বলনে আরও পালিশ।

কোনও কোনও উইক-এন্ডে বাদশা-বেগম সামাজিক হয়ে যান। বেলিয়াঘাটার

পুরনো পাড়ায় যান। পুরনো বাড়ির চটা ওঠা ফাটা-চাতালে দুটি চাতক পক্ষী। চাতক? না গায়ক?

দাদা ডাকেন—কুহুঃ।

বউদি ডাকেন—পিউ কাঁহা।

প্লেটে খাবার সাজাতে সাজাতে ডাকেন, খাবার তুলতে তুলতে ডাকেন, চা করতে করতে ডাকেন, সেই একই বউদি, যিনি অসামান্য প্রতিভায় টাকাকে 'মা' বলেছিলেন। পাড়ার জ্যাঠামশাই এসে যান। এসে চেঁচিয়ে বলেন—তিনি বরাবর জানতেন নট এলেমদার ছেলে। খাটো গলায় আবার বলেন—অন্তত হাজার পাঁচেক যদি...বাড়িটা বড্ড আটকে গেল কি না...।

পাড়ার ঝগড়াটি ধনেশগুলো কী মন্ত্রে সব শিস দেওয়া বুলবুল-দোয়েল হয়ে গেছে। গেরস্থ পায়রাগুলো যারা নিজের নিয়ে থাকত, কদাচ গণ্ডির বাইরে পা ফেলত না, তারা সব কুতূহলী শালিখ হয়ে কদম কদম বেড়ে আসছে। নটরাজের অভিমুখে।

শুক-সারিকে ব্যাটবল নিয়ে মাঠ থেকে ফিরতে দেখে দপ করে মনে পড়ে গেল।

—তোরা আজকাল টিউটরের কাছে পড়িস না?

—পড়ি তো! টিউটোরিয়াল হোমে।

বউদি বলল—এক-এক সাবজেক্টের এক-এক টিচার রাখবার সঙ্গতি নেই ভাই আমাদের। অগত্যা টিউটোরিয়াল।

কোথাও কোনও প্রতিশ্রুতি দেওয়া নেই। কারুর মনে কোনও সন্দেহ ঘুণাক্ষরেও দানা বাঁদেনি। তবু...তবু জিজ্ঞেস করা গেল না। কেমন বাধো বাধো ঠেকল।

বউদি নিজেই কী ভেবে বলল—তা ছাড়া আলোকে দিয়ে হায়ার ক্লাসটা ঠিক হয় না। ওর তো দাদাটি আবার মারা গিয়ে বসে আছে। বাপের সংসার, দাদার সংসার সমস্ত ওর ঘাড়ে। অগুনতি ট্যুইশানি করে।

দেখা হবার কথা নয়। অগুনতি ট্যুইশানি করে যখন। তবু একদিন দেখা হয়ে গেল। বাই-পাস ধরে এসে বিজন সেতু দিয়ে গড়গড়িয়ে নেমেছে কনটেসাটা, বালিগঞ্জ স্টেশনের মুখে দু নম্বর থেকে নেমে এলো আলো। মোটা ফ্রেমের চশমা। পুরু কাচের ওধারে চোখ গলে গেছে। শিঁটোনো। কেমন কালিঝুলি মাখা। শাড়িটা যেন বড্ডই বড় হয়েছে। কাঁধের ওপর দিয়ে সামনে এসে অর্ধেক আলোকে ঢেকে দিয়েছে। কেমন উড়োখুড়ো।

—এ কি আলো? এখানে? চিনতে পারো?

চশমাটা বারবার ঠিক করে অবশেষে ঘাড় ঝাঁকিয়ে এক চোখে তাকিয়ে রইল আলো।

বলল—ক্কঃ।

—আমি নটরাজ। নটরাজ সিন্‌হা।

—ক্কঃ, ক্কঃ, হক্ষ।

—এ কি? এত কাশছ? ওষুধ খাও।

—খাই তো! চলি, খুব দেরি হয়ে গেছে।

আলো আঁটসাঁট করে বড় কাপড়টা জড়িয়ে পরেছে। চটিটাও বোধহয় বড়। কেমন

ঘষড়াতে ঘষড়াতে চলে গেল।

অনেক রাতে সেবন্তী ঘুমে, বাড়ির কাজের লোকগুলি ঘুমে, সেবন্তীর ছেলে ঘুমে। কা! কা! কা! বিস্মিত, ব্যথিত, বিপন্ন ডাকাডাকি চরাচরে। ঘুম চটে যায় নটরাজের। জানলা থেকে ফিকে জোছনার প্রপাত দৃষ্ট হয়। অগত্যা নিশিডাকে বারান্দায়। সৌর প্রকৃতির যাদুদণ্ড জোছনার গায়ে ভোরালো আলোআঁধারি ছুঁইয়ে দিয়েছে। আর, বুঝি দুখনিশি ভোর—এই বিভ্রমে পাগলের মতো ডেকে ডেকে ফিরছে কাকেরা। সেই কাকই তো? ছরকুটে পা...কালিঝুলি...উড়োখুড়ো...?

কা? কা? কা?

কাকের গলায় এমন আর্দ্র, সুদূর, মন-শূন্য করা জিজ্ঞাসা আগে কখনও শোনেনি সে। কাক না ঘুঘু। তফাত করা যায় না।

শুনঃশেফ

আমার নাম যতি। জ্যোতি নয়। যতি। বর্গীয় জ আর অন্তঃস্থ য-এর মধ্যেকার এই তফাতটা আমার জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ। কেন যে এই তফাত তা নিয়ে খুব অল্প বয়সেই আমার মধ্যে একটা আবছা কৌতূহলের জন্ম হয়েছিল। আমার সঙ্গে আমাদের ক্লাসে আরেক জ্যোতি পড়ত। সে বর্গীয় জ-য়ের জ্যোতি। মাস্টারমশাইরা দুজনকে তফাত করবার জন্যে আমাকে ডাকতেন ওয়াইতি। অবিকৃত জ্যোতি নামের সম্মান আমার সহপাঠীই পেতো। এবং তাই নিয়ে একটু বড় হতে পা হতেই সে কলার তুলতে শুরু করে। আরেক দল মাস্টারমশাই ছিলেন, তাঁরা আবার বলতেন, 'জ্যোতি দা ব্রাইট' আর 'যতি দা ডার্ক'। স্কুলে পড়ার ওই বয়সে যখন ঠ্যাং সবে বেখাপ্পা রকমের লম্বা হতে শুরু করেছে, গাল খসখস করছে, কপালে গালে দু চারটে ব্রণ উঁকিঝুঁকি মারছে, সেই লজ্জাকর, মুখচোরা সময়ে 'যতি দা ডার্ক' কিম্বা 'ওয়াইতি' ডাক আমাকে যে কী ভয়ানক আত্মগ্লানির কটাহে নিক্ষেপ করত তা একমাত্র আমিই জানি। মাস্টারমশাইরা একজনও আমায় পছন্দ করতেন না। প্রাণপণে পড়া মুখস্থ করলেও না। অঙ্ক সব মিলে গেলেও না। হাতের লেখা ভালো করেছিলুম অনেক অভ্যেস করে করে, কিন্তু তাতেও তাঁদের অপছন্দের নিরেট দেয়াল ভেদ করতে পারিনি। কিন্তু অভয়পদ স্যারের যেন আমার ওপর একটা বিজাতীয় ঘৃণা ছিল। কেমন একটা আক্রোশ কাজ করত ওঁর আমার প্রতি সব ব্যবহারের পেছনে। উনি পড়া জিজ্ঞেস করবেন বলে বিশেষ করে ওঁর ক্লাসের পড়া ভালো করে তৈরি করে যেতুম। ভেতরের সমস্ত কাঁপুনি সংযত করে সঠিক, সুন্দর উত্তর দিচ্ছি, উনি মাঝপথে থামিয়ে দিডে ছড়া কেটে উঠতেন 'আতা গাছে তোতা পাখি, ডালিম ডাছে মৌ।' ক্লাসে ইতস্তত হাসি শুরু হত। আমি লজ্জায়, ক্ষোভে বেগনি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতুম।

এই অভয়পদবাবু একদিন সু-মেজাজে থাকায় এবং বাইরে তুমুল বৃষ্টি হওয়ায় ক্লাসে গল্পগুজব হচ্ছিল, হঠাৎ উনি বললেন—'একটা থট-রীডিং-এর ম্যাজিক দেখবি? 'যতি দা ডার্ক, ওঠো বাবা!' আমি উঠে দাঁড়াতে কিছুক্ষণ শ্যেন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ডান হাতের দুটো আঙুল মুখের সামনে ঘোরাতে লাগলেন, তারপরে বললেন—'যতি দা ডার্কের তো দেখছি তিন তিনটে দিদি আছে!' 'সত্যি? সত্যি?' আশেপাশে সবাই আমায় জিজ্ঞেস করতে লাগল। আমি কথা বলতে পারছিলুম না, ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলে বসে পড়েছিলুম। আমি থাকি শিকদার বাগান লেনে। অভয়পদবাবু আসতেন বরানগর থেকে, আমাদের বাড়ির কারও সঙ্গেই কোনও সম্পর্ক ছিল না। থাকবার কথা নয়। তবু অভয়পদবাবু কী করে আমার তিন দিদির কথা জানলেন? ধূর্ত চোখে আমার দিকে চেয়ে ছিলেন অভয়পদবাবু। যেন আমার তিন দিদি থাকা ব্যাপারটা খুব দূষণীয়। প্রায় অশ্লীল। ব্রণ ওঠার মতোই অশ্লীল। তখন অভয়পদবাবু প্রত্যেকটি শব্দ চেটেপুটে খেতে খেতে বলছেন—'এই যতেটা না জন্মালেও কোনও ক্ষেতি ছিল না। এই ধরনের ছেলেপুলেরাই বাপ-মায়ের চক্ষুশূল হয়ে থাকে।' অভয়পদবাবু এই চূড়ান্ত ঘোষণাটি করবার পর টিফিনের ঘণ্টা পড়ে গেল। মনে হল সহপাঠীরা ঘৃণা এবং ভয়ের দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইতে চাইতে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমার শিরদাঁড়া দিয়ে হিমের স্রোত, গলা শুকিয়ে কাঠ, হাত পা কাঁপছে, কোনক্রমে নিজের বইখাতা ব্যাগে ভরে সবার শেষে ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে অনুভব করলুম—আমার শুধু বাবা-মা কেন, একজন বন্ধুও নেই। এই বিশাল জগতে আমি একদম একা।

টিফিনের পয়সায় সেদিন কিছু খেলুম না। আইসক্রিম কেনবার ছল করে স্কুল গেটের বাইরে বেরিয়ে এলুম। তারপর এদিক ওদিক দেখে বড় রাস্তা পার হয়ে দেশবন্ধু পার্কের দিকে হাঁটা দিলুম।

দুপুরবেলাটায় দেশবন্ধু পার্ক ফাঁকা-ফাঁকা থাকে। আমার একটা প্রিয় কলকে ফুলের গাছ ছিল, গাছটায় তলায় বসে হাঁটুর ওপর মাথা রেখে প্রথমটায় খানিকটা গরম চোখের জল বেরিয়ে যেতে দিলুম। তারপর প্রতিজ্ঞা করলুম আর স্কুলে যাবো না। বাড়ির থেকেও নিজেকে আস্তে আস্তে মুক্ত করে নেবো। সত্যিই তো, আমি যে বাবা-মার চক্ষুশূল এ বিষয়ে কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই সন্দেহ থাকতে পারে না। বাবা অত্যন্ত রাশভারী, কড়া প্রকৃতির মানুষ। এতদিন ভাবতুম অনেক বড়, প্রায় বুড়ো বলেই বাবা আমার সঙ্গে কথা বলেন না, এখন বুঝতে পারছি তা নয়, আসলে চক্ষুশূল, আমি চক্ষুশূল। চোখ বুজে মনে করবার চেষ্টা করলেই দেখতে পাচ্ছি ওই তো বাবা দাদাকে ডেকে কি বললেন, ওই তো দিদির সঙ্গে, মেজদির সঙ্গে, ওই তো এমন কি ছোড়দির সঙ্গেও বাবা কথা বলছেন!

কই দিনের পর দিন যায়, বাবা সোজাসুজি, মুখোমুখি আমার সঙ্গে তো কথা বলেন না। বড় জোর—'পড়াশোনা কেমন হচ্ছে?' কিম্বা 'কোথায় চললে?' আর মা? মা আমাকে দিনের মধ্যে সাতবার দোকানে পাঠায়। 'এই হারুর দোকান থেকে একটু গরম মশলা নিয়ে আয়' এই আবার 'দৌড়ে যা তো যতি, তোর বাবার দই আনাতে ভুলে গেছি।' এক ঘণ্টাও যাবে না, লন্ড্রি থেকে দাদার শার্ট-প্যান্ট আনতে হবে। অমনি একপাতা সেফটিপিন, ভুলুর জন্যে একটা পেনসিল, ফরমাশের আর শেষ নেই। যে

অনুপাতে মা আমাকে খাটায় সেই অনুপাতে আবদার রাখে কি? রাখে না। বিশ্বকর্মার সময়ে ঘুড়ির লাঠাই-মাঞ্জার পয়সা মাপা-মাপা। দোলের সময়ে পেতলের পিচকিরি আজও হল না। একটা ভালো ক্রিকেট-ব্যাট মা আজও দিচ্ছে, কালও দিচ্ছে। নেমন্তন্ন বাড়িতে যাবার সময়ে সর্বদা সঙ্গে যাবে ভুলু, মায়ের কোলপোঁছা। আমার অবশ্য নেমন্তন্ন বাড়িতে যেতে একটুও ভালো লাগে না। কিন্তু ভোজের দিকটাও তো আছে! মাকে কোনদিন বলতে শুনিনি 'যতি আজ আমার সঙ্গে চল্'।

সেইদিন থেকে আমি স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিলুম। ঠিক সময়মতো খেয়ে দেয়ে, স্কুল-ব্যাগ পিঠে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাই। তারপরে কোনদিন দেশবন্ধু পার্ক, কোনদিন গড়ের মাঠ। কোনদিন গঙ্গার ধার চলে যাই। কিন্তু ভীষণ দীর্ঘ সময়। কাটতে চায় না। লোকেরা কিরকম সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চায়। আমার মনে হয় যে যেখানে আছে সবাই বুঝতে পারছে আমি স্কুল পালিয়েছি। সবচেয়ে মুশকিল হয় বইয়ের ব্যাগটা নিয়ে, ওইটা দেখলেই লোকে ধরে ফেলে আমি স্কুলের ছেলে। সেই জন্যে কোথাও বসার চেয়ে আমার মনে হয় হাঁটাই ভালো। হাঁটতে হাঁটতে বহুদূর চলে যাই। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল, রেস কোর্স, খিদিরপুর, চিড়িয়াখানা। চিড়িয়াখানার ভেতরে ঢুকে সময়টা বেশ কেটে যায়। বাঘের গায়ে কটা ডোরা, সিংহী কটা হাই তুলল, ভালুক কতবার দাঁড়াল, কতবার পড়ে গেল, ভোঁদড় যখন মাছ ধরে ডাঙায় ওঠে, মাছটা কিভাবে মুখের মধ্যে ঝটপট করে এইসব দেখতুম কেমন অন্যমনস্ক হয়ে।

একাধিকবার মুশকিলেও পড়লুম। চিড়িয়াখানায় মন দিয়ে শিম্পাঞ্জির খিঁচুনি দেখছি, পিঠের ওপর একটা ভারী হাত পড়ল—'যতি না?' মুখ ফিরিয়ে অস্পষ্টভাবে চিনতে পারলুম ভদ্রলোককে। বাবার কেমন ভাই হন। বিজয়ার পর সপরিবারে আসেন বছরে একবার।—'স্কুল থেকে এসেছ?' নিজেই সমাধান করে দিলেন সমস্যার। আমি তাড়াতাড়ি বললুম 'হ্যাঁ।' 'কোথায় আর সব ছেলেরা? টিচার?' আমি বললুম 'ওইদিকে আছে।' 'দেখো আবার, হারিয়ে যেও না।' বাবার ভাই এগিয়ে যান। আরেক দিন পাঁচ নম্বর বাসে চড়েছি, লেকের দিকে যাবো। লেডিজ সিট থেকে এক ভদ্রমহিলা ডেকে বললেন—'এই যতি, যতি, জায়গা খালি হচ্ছে এইখানে বোসো।' আমি দূর থেকেই যথাসম্ভব হাত নেড়ে বোঝালুম আমি বেশ আছি। ভদ্রমহিলা আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। আমি ওঁকে চিনতে পারছি না, কিন্তু উনি আমাকে ঠিকই চিনেছেন। দূর থেকে বিশেষ কিছু বলতে পারছেন না, কিন্তু ওঁর খুব সন্দেহ হয়েছে। এখন দুপুর একটা, আমার পিঠে স্কুল ব্যাগ। এই ব্যাগটাই হয়েছে আমার কাল। যতটা পারি ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যাবার চেষ্টা করি, তারপর স্টপ আসতেই নেমে পড়ি। সামনে যে গলি পাই, তারই মধ্যে ঢুকে পড়ি, ইশ্ ভুল হয়ে গেছে, ভদ্রমহিলা প্যাঁট প্যাঁট করে দেখছেন। রাস্তা পার হয়ে উলটো দিকের গলিতে ঢোকা উচিত ছিল। অনেকটা সময় গলিটার মধ্যে ঘোরাঘুরি করে যেই বেরিয়েছি, দেখি ভদ্রমহিলা রাস্তার ওদিক থেকে আসছেন হনহন করে। আমার চোখে চোখ পড়ে গেল। চোখ পাকিয়ে বললেন—'একদম নড়বে না, পালাবে না।' কাছে এসে একটা হাত পাকড়ে ধরে বললেন—'তুমি রমলাদির ছেলে যতি না? আমাকে চিনতে পারছো না? সুপ্রভাত কাকা...রথীন...' আমি বললুম—'আপনাকে আমি চিনি না। আপনি কে আমি জানি না। আমার নাম যতি নয়।'

—'যতি নয়? তাহলে তখন যতি বলে ডাকতেই বাসের মধ্যে সাড়া দিলে যে!'

—'আমার নাম ব্রতী। আমি শুনেছি ব্রতী।'

—'তাহলে আমাকে দেখে বাস থেকে নেমে পড়লে কেন? এই গলির মধ্যে ঢুকেছিলে কেন? লুকোবার জন্যে নয়?'

আমি বললুম—'আমি একটা ঠিকানা খুঁজছি। খুব দরকার। আমার বাবার খুব অসুখ, মা পাঠিয়েছে, এক জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ি। তাই...।'

—'মিথ্যে কথা বলা হচ্ছে? বাবার অসুখ? মা পাঠিয়েছে? কী নাম তোমার বাবার?'

গা-ভর্তি ঘৃণা নিয়ে আমি উচ্চারণ করলুম—'অভয়পদ মজুমদার।' এতো চট করে বললুম যে ভদ্রমিহলা থতিয়ে গেলেন। বললেন 'কী ঠিকানা খুঁজছ? তোমাকে একেবারে রমলাদির ছেলে যতির মতো দেখতে। না, যতি এতোটা কালো নয়, এতো রোগাও নয়।'

'যাক কী ঠিকানা যেন খুঁজছিলে?'

আমি বললুম—'পঁচিশের এক বকুলবাগান রো না রোড গুলিয়ে ফেলেছি, বাড়িটা দেখলেই আমি চিনতে পারব।'

ভদ্রমহিলা বললেন—'কিছু মনে কোরো না। আমার এক আত্মীয়ার ছেলের সঙ্গে তোমার খুব মিল। যাও তোমার দেরি করিয়ে দিলুম। আমারও দেরি হয়ে গেল।' হাতঘড়ির দিকে একবার চেয়ে উনি আবার বাস স্টপে গিয়ে দাঁড়ালেন, আমি বকুলবাগানের মধ্যে সেঁধিয়ে যেতে থাকলুম।

সারা কলকাতা, দক্ষিণেশ্বর থেকে লেক কালীবাড়ি পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতুম। কিন্তু পথও আমায় টানত না। কোনও কিছুকেই আমার বিন্দুমাত্র আকর্ষণীয় বলে মনে হত না। এই সমস্ত বাড়ি ঘর ইঁট-কাঠের দৈত্য সব, গলি রাস্তা, মোড় অজানা এক জনহীন গ্রহের। জনহীন। এত মানুষ বাসে ঝুলতে ঝুলতে যাচ্ছে, ফুটপাতে ভিড় করে যাচ্ছে, দোকানবাজার গমগম করছে কিন্তু আমার মনে হত কেউ নেই। কেউ কোত্থাও নেই। যেন সিনেমা দেখছি। টিকিটের পয়সা জমিয়ে জমিয়ে এক এক দিন কোনও হলে ঢুকে পড়তুম। সারাদিন ঘোরা, খাওয়া-দাওয়া নেই, পর্দার হট্টগোল কান ফাটিয়ে দিত, তুমুল নাচ-গানের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আমার কোমর, উরু সব ব্যথা করত, রক্ত অস্বস্তিকর রকমের গরম হয়ে উঠত, সস্তার সিট, চারপাশ থেকে অশ্রাব্য খিস্তি, সিটি বেজে উঠছে, পর্দার নাচিয়ে মেয়েটির পেটের দিকে আঙুল দেখিয়ে পাশের সীটের লোক বলত—'কী খোকা পছন্দ হয়?' জবাব না দিলে ছাড়ত না। 'ইস্কুল পালিয়ে তো দেখতে এসেছো, পছন্দটা বলতে দোষ কী; আমার সঙ্গে মেলে কিনা দেখতুম।' বলে লোকটা খা খা করে হাসত। পান গুণ্ডি খাওয়া কালো মাড়ি কালো দাঁত দেখা যেত। আমার ভেতরটা গুলিয়ে উঠত। ইনটারভ্যালের সময়ে উঠে পড়ে বাড়ির দিকে হাঁটা দিতুম। হেঁটে হেঁটে সময় ভরানো। কোনও কোনও দিন সময়ের ঠিক রাখতে পারতুম না। হা-ক্লান্ত হয়ে আগে আগেই বাড়ি ফিরতুম। মা বলত—কী রে! আজ সকাল-সকাল ছুটি হয়ে গেল?'

—বলতুম, 'হ্যাঁ, একজন টিচার মারা গেছেন।'

—'কোন্ টিচার রে! আহা! ছেলে মেয়ে আছে!'

গম্ভীরভাবে বলতুম 'পুরনো টিচার। আমি ঠিক চিনি না।'

একদিন খুব দেরি হয়ে গেছে, পা টিপে টিপে বাড়ি ঢুকছি, নীচের দালানে মৃদু আলো জ্বলছে। সিঁড়ির ওপর থেকে একটা খুব জোরালো নারীকণ্ঠ ভেসে এলো। কেমন চেনা-চেনা।

—'না রমলাদি, তোমার যতিকে আজ আর দেখা হল না। বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে। আসলে কি জানো, পাঁচ নম্বর বাসে ক মাস আগে একটা যতির মতো ছেলেকে দেখলুম। পিঠে ব্যাগ। আমি 'যতি, যতি কোথায় যাচ্ছো' বলে ডাকতে নেমে বকুলবাগানের মধ্যে ঢুকে গেল। তো আমিও নেমে ছেলেটাকে পাকড়েছি। কী ভুল দেখো। ছেলেটার নাম ব্রতী। বাবার হঠাৎ স্ট্রোক হয়েছে। জ্যাঠার বাড়িতে খবর দিতে এসেছে। বরাগনরে থাকে, স্কুলের টাইমে এসেছে বকুলবাগান। তা ছেলেটাকে ছেড়ে দিলুম। কিন্তু তারপর মনে হল স্কুলের ব্যাগ কেন পিঠে? আর ধরতে পারলুম না। সেই থেকে মনটা খচখচ করছে।'

ভদ্রমহিলা সিঁড়ি দিয়ে নামছেন। আমি তৎক্ষণাৎ দালানের অপর প্রান্তে, সিঁড়ি দিয়ে নেমে উঠোন, উঠোনের ওদিকে কলতলা, তাব মধ্যে।

মিনিট দশেক পরে আস্তে আস্তে বেরিয়ে ওপরে উঠছি, মা রান্নাঘরের থেকে বেরিয়ে বলল—'কি রে যতি, আজ এতো দেরি যে?' উঃ আমি আর বানাতে পারি না, পারি না।

—'ড্রিল সার ডিটেন রেখেছিলেন,' যা মুখে আসে তাই বললুম।

—'ডিটেন রেখেছিলেন? কেন? মার ভুরু কুঁচকে উঠল।

—'ড্রিল পারিনি, তাই।'

—'ড্রিল কি মুখস্থ করা যায় না পারলে ডিটেন করবে? আস্পদ্দা তো কম নয়!' মা বিরক্ত মুখে গজগজ করতে করতে ভেতরে ঢুকে গেল। দোতলায় উঠতে মেজদি বলল—'হ্যাঁরে যতি, স্কুল থেকে ফিরেই কলঘরে ঢুকেছিলি কেন রে?'

—'বাথরুম পেয়ে গিয়েছিল।'

মেজদি বলল—'দিদি দেখেছিস যতিটা কী ভীষণ কালো আর রোগা হয়ে গেছে?'

দিদি বলল—'তাই তো বুলু, ঠিক বলেছিস তো! হ্যাঁরে যতি, আজকাল তো আমার কাছে সংস্কৃত দেখাতে আসিস না ! দাদার কাছে অঙ্ক-ইংরিজি দেখাতে তো দেখি না?'

আমি উত্তর দিচ্ছি না দেখে দিদি এগিয়ে এসে আমাকে ঝাঁকানি দিল—'কী রে, কথা বলছিস না যে? এ কি? তোর হাতগুলো কী ময়লা রে? কী নোংরা তুই, ছি। ছি।'

মা নিচে থেকে ডাকল, 'যতি, জলখাবার খেয়ে যা!' লুচি ভাজার গন্ধ আসছিল। আমি সিঁড়ির দিকে পা বাড়াতেই দিদি বলল, 'সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে খেতে বসবি যতি।' খেতে বসে কিন্তু আমার বমি পেতে লাগল। কোনক্রমে একটা লুচি গলাধঃকরণ করে আমি উঠে পড়লুম। মা অবাক হয়ে বলল, 'তোর জন্যে টাটকা ভেজে তুললুম, না খেয়ে উঠছিস্ যে! আমারই ঝকমারি হয়েছিল দেখছি...'

'ভালো লাগছে না'—কোনমতে বলে আবার সিঁড়ি দিয়ে উঠছি, দেখি দুই দিদি তখনও সিঁড়ির মাথায় গুলতানি করছে। আমাকে উঠতে দেখে দিদি কী যেন বলতে

বলতে আমার দিকে এগিয়ে এলো। আর আমার ভেতর থেকে কতদিনের ঘেন্না, কষ্ট, রাগ, দুঃখ, খালি পেটে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরার অনিয়ম, সমস্ত হড়হড় করে বমি হয়ে বেরিয়ে আসতে লাগল। ভীষণ কষ্টে আমি সিঁড়ি টপকে নিচে পড়তে থাকলুম। প্রচণ্ড লাগল মাথায়, তারপর সব কালো।

মাথাটা পরিষ্কার হতে চোখ মেলে দেখি অনেক জোড়া চোখ আমার ওপর। মাথার যেখানটায় লাগছে সেখানে ঠাণ্ডা কিছু চেপে ধরেছে কেউ। চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিচ্ছে কেউ। চোখ মেলতে দেখে মা আতঙ্কিত গলায় বলল—'যতি, যতি, ও যতি, বমি করে অমন অজ্ঞান হয়ে গেলি কেন? খুব লেগেছে মাথায়? গা-টা গরম গরম লাগছে। কখন থেকে শরীর খারাপ হল?'

মা একটানা বকেই যাচ্ছে, বকেই যাচ্ছে। দিদি বলল, 'মা, ওকে এখন কথা বলিও না। দাঁড়াও ওর জামা-টামাগুলো পালটে দিই। কী বিশ্রী গন্ধ বেরচ্ছে। বুলু বালতি করে জল নিয়ে আয় তো?' আমার নড়া-চড়া করার ক্ষমতা নেই। কথা বলবার চেষ্টা করলেও বলতে পারছি না। শরীরটা যেন কাঠের মতো শক্ত। আমি দেখতে পাচ্ছি বমিতে মাখামাখি কাঠের মতো আমার শরীরটা মেঝেতে পড়ে আছে। সেটাকে ঘিরে মা আর দুই দিদি। মেজদি জল নিয়ে এলো, খোসা ছাড়াবার মতো করে জামা-কাপড় ছাড়িয়ে নিচ্ছে দিদিরা, মুখটা কাত করে ভাল করে গামছা ভিজিয়ে ধুয়ে দিচ্ছে মুখ। আমার চোখ দুটো কড়িকাঠের দিকে চেয়ে আছে। গাযে পাউডার দিয়ে দিল মেজদি। কোমরের ওপর চাদর চাপা দিয়ে দিদি আমার প্যান্ট খুলে নিল। পাজামা পরিয়ে দিল। পায়ের পাতাগুলো ঘষে ঘষে মুছিয়ে দিচ্ছে। কী বিশ্রী দেখতে আমাকে। ঠিক একটা পোড়া কাঠের টুকরোর মতো। কানগুলো মস্ত বড় বড়, লতপত করছে। মাথার পেছনের চুল খাড়া খাড়া। ঠোঁটের ওপর মুখের কালি যেন গাঢ় হয়েছে। এমন স্পষ্টভাবে নিজেকে আমি কী করে দেখতে পাচ্ছি? চোখের ওপর একটা আয়না ধরা আছে নাকি? তারপর দেখলুম মা ভয়ার্ত গলায় বলছে—'বুলু, ডাক্তার ডাক, ও ওরকম কড়িকাঠের দিকে চেয়ে রয়েছে কেন? ও সাড়া দিচ্ছে না কেন? যতি, ও যতি!' আমি তখন বললুম— 'মা যতি মানে কী, আমার নাম যতি কেন? তোমরা সবাই কেন আমার ওপর এতো বিরূপ? কেন, আমি কী করেছি মা? দেখতে পেলুম—মা আমাকে ঝাঁকাচ্ছে আর কাঁদছে—'যতি, যতি রে, অমন করে চেয়ে আছিস কেন? আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস না?' বুঝতে পারলুম মা আমার কথা আদৌ শুনতে পায়নি। তখন আমার খেয়াল হল আমি মাকে কথাগুলো বললুম রাস্তার দিকের জানলার কাছ থেকে, যদিও আমার কাঠের মতো শরীরটা পড়ে আছে দরজার কাছে মেঝেয়। দুই দিদি আর মা শরীরটাকে অনেক কষ্টে তুলে তক্তাপোশে শোয়ালে। দিদি বলল—'মা কেঁদো না, পড়ে গিয়ে এরকম হয়েছে। কী যে মুশকিল, দাদার এখনও পাত্তা নেই। বাবা কখন আসবে কে জানে, বুলু তুই ও বাড়ি থেকে টুলটুলকে ডেকে নিয়ে ডাক্তারবাবুর কাছে যা।' মেজদি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'টুলটুলকে আর ডাকবার সময় নেই, আমি যাচ্ছি।' মেজদি এক ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। জানলার কাছ থেকে আমি আমার চোখ দুটোকে প্রাণপণে বুজিয়ে চেষ্টা করতে লাগলুম, মা ভীষণ ভয় পাচ্ছে। ক্রমাগত কাঁদছে আর দুর্বল গলায় বলে যাচ্ছে—'যতি, যতি রে। আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস না! কী

হবে এখন, শীলা, কী হবে?' দিদি ক্রমাগত আমার শক্ত হাতে পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে আর বলছে—'মা চুপ করো, কাঁদছ কেন, অসুখ-বিসুখ মানুষের হয় না?'

আস্তে আস্তে জানলার কাছেই আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। হঠাৎ খেয়াল হল ঘরে বাবা, ভুলু, দাদা, ডাক্তারবাবু, পেছনে ছোড়দি, মেজদি। ডাক্তারবাবু আমার নাড়ি দেখছেন, বাবার পরনে এখনও কোর্টের পোশাক। বাবা আমার পায়ের কাছে বসেছেন। পা দুটো নিজের কোলে তুলে নিয়েছেন। আমি শুনতে পাচ্ছি—বাবা তারস্বরে বলে চলেছেন 'নারায়ণ নারায়ণ, দুর্গে দুর্গতিনাশিনী, এ কী বিপদ মা!' আর কেউ আসতে পারছে না। বাবার ঠোঁট নড়ছে কি নড়ছে না। জানলার ধার থেকে এখন আমি ঘরের মাঝখান অবধি সরে এসেছি।

—'কী রকম দেখলেন অবিনাশদা?'

—'আবে প্রেশার ভীষণ লো। একটা ফিটের মতো হয়েছে মনে হচ্ছে। ইনজেকশন দিচ্ছি একটা।'

খাটের পাশে দাঁড়িয়ে আছি আমি। একটু হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারব কান্নায় ভিজে-মুখ মাকে। চোখ ছলছল করছে দিদির এতক্ষণ একলা একলা সমস্ত দায়িত্ব বহন করে। মেজদি উদ্বেগে ঝুঁকে আছে, ভুলু ভয়ের চোটে মুখে একটা আঙুল পুরে দাঁড়িয়ে রয়েছে খাটের মাথার দিকে। বাবা। অনেক দূরের মানুষ এখনও, যতির পা কোলে করে জপ করে বলছেন? দাদা কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, মুখ শুকনো। আমি প্রত্যেককে ছুঁয়ে ছুঁয়ে জিজ্ঞেস করলুম—আমার নাম যতি কেন? যতি মানে বিরতি, ক্ষান্তি। বড় বিরক্ত হলে মানুষ তবে ক্ষান্তি চায়। বাবা মা আমি তোমাদের ভীষণ বিবক্ত করেছি, উত্ত্যক্ত করেছি, আমার হাত থেকে তোমরা মুক্তি চাও আমি জানি। এই তো তোমাদের কত আদরের বড় ছেলে রয়েছে গোপাল। শান্ত, সৌম্য মুখ চোখে সোনালি চশমা। তোমাদের সাধ পূর্ণ করতে কত জলপানি পায়, কত বড় বড় বই পড়ে, কত জানে। ওই তো তোমাদের বড় আদরেব বড় মেয়ে শীলা, কী সুন্দর ফর্সা। ঠিক মায়ের চেহারা পেয়েছে বলে সবাই। বি. এ. পাশ করে গেল গত বছর। যতি কোনদিনও পারবে না। তোমাদের মেজ মেয়ে বুলু, বাড়ির আবেক ছেলের মতো, সব দিকে নজর আছে, সে-ও কত যত্নের। বিকেলবেলা মা যখন তিন মেয়ের চুল বেঁধে দেয়, তখন বোঝা যায় কত যত্নের, কত ভালবাসার মেয়ে সব। চমৎকার গান করে, বড় বড় বই পড়ে, ভাল ভাল পাশ করে। আর সব থেকে ছোট ভুলু, ও তো আদরের দুলাল। সব সময়ে মায়ের পায়ে পায়ে, মায়ের কোল-পোঁছা, কোলেরটি। এই চাঁদের হাটে যতি? ক্ষেমা দাও মা, বড় ঘেন্না, মুখে ব্রণ, বারো বছরেই গোঁফ উঠছে। কাঠি কাঠি পা, কোন কিছু মাথায় যেতে চায় না, ভালো লাগে না কিছু, আমি আর স্কুলে যাবো না। শরীরের যন্ত্রগুলোর মধ্যে দিয়ে শিরশিরে হাওয়ার মতো শব্দগুলো ফিসফিস করে বেরোল।

বাবা বললেন—'অবিনাশদা, ও কিছু বলল?'

ডাক্তারবাবু ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন—'যতি, কিছু বলছো?'

আমি পাঠাচ্ছি আমার বার্তা, আমার শরীর সেটা কিছুতেই ধরতে পারছে না।

ডাক্তারবাবু বললেন—'ও শুধু গোঙাচ্ছে।' তিনি ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ বার করলেন।

দিদিরা বলে আমি নাকি বুভুক্ষুর মতো ঘুমিয়েছিলুম, একটা হা-ঘুম, যো-ঘুম

মানুষের মতো। একবারও নড়িনি, একবারও পাশ ফিরিনি। কী করে নড়বে? আসলে আমি তো কড়িকাঠের কাছে। ঘরে মৃদু সবুজ আলো জ্বলছে। মা আমাকে ছুঁয়ে শুয়েছিল। বাবা অন্য ঘর থেকে মাঝে মাঝে এসে দাঁড়াচ্ছিলেন। বেশ খানিকক্ষণ ধরে আমার বুকের ওঠা-পড়া দেখে মাকে জিজ্ঞেস করছিলেন—'কী গো? কী বুঝছ? ও ঘুমোচ্ছে না অজ্ঞান হয়ে আছে!'

মা বলছিল কাঁদো-কাঁদো গলায়—'আমি তো সেটাই বুঝতে পারছি না। শীলু, তোর কী মনে হচ্ছে?'

'ও ঘুমোচ্ছে মা, ডাক্তারবাবু ইনজেকশন দিয়ে গেলেন না?'

—'তারই এফেক্ট বলছিস?' বাবা যেন হাঁফ ছেড়ে বললে।

—'তাছাড়া কী? তুমি শুতে যাও।'

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙলো না। দুপুরেও না। বিকেলে যখন পশ্চিমের জানলা দিয়ে রাঙা রাঙা রোদ ঘরের মেঝেয় এসে পড়েছে তখন আমার ঘুম ভাঙল। ঠিক সেই সময়টায় ঘরে কেউ ছিল না। আমি জেগে উঠে বুঝতে পারিনি ওটা বিকেল। ওপর থেকে দেখলুম একটা শূন্য ঘরে তক্তাপোশের বিছানার ওপর যতি শুয়ে আছে। গায়ের চাদরটা কোমরের কাছে। ঘরে রোদ। আমি ভাবলুম ভোর হয়েছে। পশ্চিমের জানলা দিয়ে যে সকালবেলার রোদ আসতে পারে না অতএব আমার খেয়াল ছিল না। বিশেষত আমি। আসল আমি রয়েছি কড়িকাঠে, উপুড় হয়ে দেখছি ঘরটা। কিন্তু পাশের বাড়িতে ঝাঁটার শব্দ জানলার ঠিক বাইরে টিউবওয়েলে, সকালে একটা মস্ত লাইন পড়ে যায়। তার হট্টগোল, চেঁচামেচি—এই সব মেশানো থাকে সকালের হাওয়ায়। সেগুলো পাচ্ছিলুম না, তাই কেমন গা ছমছম করছিল। এ যেন অন্য কোথাওকার সকাল। একা, আমি একা। পাশ ফেরবার চেষ্টা করলুম, যেন একটা পাথরকে নাড়াচ্ছি এমনি শক্ত, ঠাণ্ডা হয়ে আছে শরীরটা। ছোড়দি ঘরে এলো। ছোড়দির মাথায় কষে আঁট করে বাঁধা দুটো মোটা মোটা বিনুনি। একটা খয়েরি রঙের ডুরে শাড়ি, খয়েরির ওপর হলুদ ডুরে, ছোড়দির মুখে আলতো পাউডার, কপালে টিপ। এখন অর্থাৎ সকালে ছোড়দির চুল ভিজে এলো থাকবার কথা, মুখ তেলতেলে, স্নিগ্ধ। আমার বিভ্রম আরও বেড়ে গেল। কিরকম মনে হল আমাকে ফেলে রেখে ওরা সবাই কোথায় চলে যাচ্ছে। ছোড়দি বোধহয় নিজের কিছু জিনিস ভুলে গিয়েছিল তাই একবারটির জন্য ফিরে এসেছে। যাক, তাই যাক। আমি এখন সব শেষের জন্য প্রস্তুত। যা ঘটার তো তা ঘটবেই। হঠাৎ মাথার মধ্যে মায়ের অর্ধেক কান্না অর্ধেক মমতামাখানো ডাক শুনতে পেলুম, 'যতি। যতি রে!' ঘাড় সামান্য বেঁকিয়ে ছোড়দির দিকে চাইলুম। ছোড়দি আমার পাশে বসে পড়ে ঝলক ঝলক হেসে বলল—'উঠেছিস? একখানা ঘুম দেখালি বাবা! কটা বাজে জানিস? সাড়ে তিনটে। বিকেল সাড়ে তিনটে। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা ঘুমোলি। দাঁড়া দিদি মেজদিকে ডাকি।' এইবারে, এই ছুতোয় ও চলে যাবে, প্রাণপণ চেষ্টায় আমি ছোড়দির আঁচলে একটাই দুর্বল টান দিলুম—'বোস না ছোড়দি।' 'বাঃ তোকে মুখ ধুতে, জামা কাপড় ছাড়তে হবে না? খেতে হবে না? আগে মুখ ধুয়েই খেতে হবে। কিরকম চিঁচিঁ করছিস দেখছিস না?'

ছোড়দি ছুটে চলে গেল। আমার দিদি খুব গম্ভীর প্রকৃতির, দায়িত্বশীল, মায়ের চেয়েও যেন বড়, মেজদিও কতকটা তাই। কিন্তু ছোড়দি টুলটুল কথায় কথায় হাসে। হাসলে ছোড়দির ঝকঝকে দাঁত দেখা যায়, সামনে পেছনে বাতাস লাগা গাছের মতন ছোড়দি দোলে। ছোড়দির অদ্ভুত অদ্ভুত কথা আছে, আদরের ডাক আছে, সিঁড়ি দিয়ে লাফ দিয়ে দিয়ে নামতে নামতে বলে—'মাং, দিদিং খিদিং পেয়েছেং। কখনং হবেং? ক্রিপস-মিশনং ব্যর্থং ব্যর্থং। অর্থাৎ ও ইতিহাস পড়ছিল, ক্রিপসমিশনের ব্যর্থতার কথা পর্যন্ত পড়েছে। আর পারছে না, এবার ওকে খেতে দিতে হবে। ভুলুকে ও কখনও বলে ভুলিওকাস দা সেকেন্ড। কখনও ভুল ভুলাইয়া, কখনও সাদাসিধে ভুল-মহারাজ। শুধু বলে না, চটকে চটকে উৎখাত করে দেয় একেবারে, যতক্ষণ না ভুলু 'ওঁমা। ওঁ দিদি দেঁখোঁ না' বলে নাকি সুর ধরছে। অমন যে গম্ভীর দাদা এম এসসি করে রিসার্চ করছে, চোখে সোনালি চশমা, তাকেও ছোড়দি ছেড়ে কথা কয় না। কখনও বলবে 'গোপাল গো-বিন্দ মুকুন্দ গৌরে' কখনও বলবে 'এই যে গ্যাপেলিও গ্যালিলিও আঁকটা কষে দিন তো!' দাদার একটা অদ্ভুত শাসন আছে। বাঁ হাত দিয়ে, দাদা ন্যাটা তো! বাঁ হাতের শুধু তর্জনী দিয়ে গালের ওপর চড়াৎ করে মারে। ভীষণ লাগে। আমি অনেকবার খেয়েছি ছোড়দিও খেয়েছে। যে দাদার কাছে পড়তে যাবে সে-ই একবার না একবার খাবে। ওইরকম এক আঙুলের চড় খেয়েও ছোড়দি এক হাতে গাল চেপে বলবে—'উফফ্ এ কী চড়কোভস্কি রে বাবা, মাথাটা যে গোগোল গোগোলো-ভিচ হয়ে গেল। আঁকগুলো প্যাঁক প্যাঁক করে পালিয়ে যাচ্ছে!' ছোড়দি সবে শাড়ি ধরেছে। তাই ছোড়দিকে আমার কেমন অচেনা লাগে। বড্ড বেশি মেয়ে মেয়ে! আর মেয়ে দেখলেই আমি কুঁকড়ে যাই। মেয়েরা আমাকে দেখলে হাসে, নিজেদের মধ্যে কীসব চুপিচুপি বলাবলি করে, মেয়েদের ছায়া আমি পারতপক্ষে মাড়াই না। ছোড়দিটা ইদানীং ফ্রক-স্কার্ট ছেড়ে সেই ভয়ঙ্কর মেয়েদের দলে ভর্তি হয়েছে।

দরজা দিয়ে গামলা-মগ-গামছা-তোয়ালে আরও কী কী নিয়ে মেজদি-ছোড়দি ঢুকল। মেজদি বলল—'যতি, নিজে নিজে দাঁত-টাঁত মাজতে পারবি তো?'

আমি দেখলুম কনুইয়ে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে উঠতে পারছি। মুখ-টুখ ধুয়ে ছোড়দির কাঁধে ভয় দিয়ে কলঘরে যাচ্ছি, ছোড়দি বলল—'জটিয়াবাবা কথা বলছিস না কেন রে? রাগ করেছিস আমার ওপর?' আমার চোখ জ্বালা করছে। কলঘরে ঢুকে চোখের জল লুকোই। দোতলায় ধরা জল। কল থেকে যদি জল পড়ত তো কলটা খুলে রেখে আমি খানিকটা শব্দ করে কেঁদে নিতে পারতুম। নিজের এই সব প্রবৃত্তিতে আমার নিজের ওপর ঘেন্না আরও বেড়ে যায়। ছেলেরা, আমার বয়সের ছেলেরা কাঁদে না। দাদাকে দেখেছি, ফার্স্ট ক্লাস ফসকাতে ভীষণ মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু দিদিদের মতো কান্নাকাটি করেনি। কেমন গুম হয়ে ছিল অনেকদিন। যখন জ্যাঠামশাই মারা গেলেন, বাবা জ্যাঠামশাইকে ভীষণ ভালোবাসতেন, শ্মশান থেকে এসে দাঁড়ালেন—মুখটা যেন ঝলসে গেছে। সেই কালচে ভাব বাবার মুখে এখনও আছে। কিন্তু কাঁদতে দেখিনি। আমি যে কোনমতেই আমার বাবার মতো, দাদার মতো নই, হতে পারছি না—এটাই প্রমাণ করে মানুষ হিসেবে আমি কত নিকৃষ্ট। ভালোবাসবার মতো, পছন্দ করবার মতো আমার মধ্যে কিছু নেই। মেজদি দরজায় টোকা দিচ্ছে: 'যতি, হল? সাড়া দে একটা।' অনেক কষ্টে

গলা পরিষ্কার করে বললুম—'যাচ্ছি।' নিজের গলাটা নিজের কানেই হতকুচ্ছিত লাগল। তিন চারটে স্বর বেরোচ্ছে যেন। কী করে আমি তাড়াতাড়ি করব। জুতোর মধ্যে পা-গলানোর মতো আমার নিজেকে যে শরীরের মধ্যে গলাতে হয়!

বাবা বাবা আমার সঙ্গে কথা বলছেন! বা বা। কী ভীষণ ভয় পাই বাবাকে, সম্ভ্রম করি। আমার মতো একটা অবাঞ্ছিত উৎপাত, কুরূপ, নির্গুণের সঙ্গে বাবা আলাদা করে কী কথা বলতে চেয়েছেন? ভয়ানক ভয়ে প্রায় মাটির সঙ্গে মিশে আমি দাঁড়িয়ে আছি।

'বোসো যতি'—বাবার চেম্বার এটা। রাত নটা। সবেমাত্র শেষ মক্কেল, সেইসঙ্গে মুহুরি কাকা চলে গেলেন। অতবড় গদিওলা চেয়ারে আমার হালকা শরীরটা রাখতে আমার ভয় করছিল। এতো হালকা আমি...যদি আবার...।

—'শরীরটা এখন কেমন বোধ করছো?'

মুখ নিচু করে বলি—'ভাল।'

সত্যিই মাসখানেকের ওপর আমি বাড়িতেই আছি। অহরহ ফলের রস, দুধ, ছানা, ডিম খাচ্ছি। তাকিয়ে দেখি আমার বাইরের চেহারাটা একটু একটু চকচকে হয়েছে বটে। চোখের সেই গর্তে-বসা ভাবটা নেই আর। গাল-টালগুলো অত কালো নেই। চুল কাটা হয়নি অনেকদিন। মাথার পেছনের কতকগুলো চুল কিরকম খাড়া থাকত। এখন সেগুলো বসে গেছে। চুলগুলো বড় হয়ে ঘাড়ের কাছে কেমন একটু পাকিয়ে গেছে। কিন্তু এ সবই তো বাইরের। ভেতরে আমি প্রায় সেই একইরকম কৃষ্ণকায়, কাষ্ঠকঠিন, নির্বান্ধব, যতি দা ডার্ক। রাতের আঁধার, সবুজ বাতির লক্ষ্মণের গণ্ডির প্রান্ত থেকে রোজ উঁকিঝুঁকি মারে। আমার আসল জায়গা, আমি জানি, সবুজ আলোর বৃত্তের ওপারে, ওই অন্ধকারে, অজানায়। যা পাচ্ছি, আমার প্রাপ্য বলে পাচ্ছি না, নারীজাতির চরিত্রে অসীম করুণা, তাই তার থেকে আমার মতো অভাজনও কিছু পায়। নিজস্ব কোনও গুণে নয়।

বাবা গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন—'খোঁজ নিয়ে জানলাম গত তিন চার মাস তুমি স্কুলে যাওনি, কোয়ার্টারলি পরীক্ষাটাও মিস করেছ, কেন?' কেনটা বাবা খুব ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করলেন যেন বাবাকে আমি যতটা লজ্জা পাচ্ছি, ভয় করছি, বাবা তার চেয়েও ভয় লজ্জা আমাকে পাচ্ছেন। আমি কিছুই বলতে পারছি না। যে চেয়ারে আমি বসে আছি, তারই পাশে আমি দাঁড়িয়ে আছি অসহায়, উদাসীন।

—'পড়াশোনা করতে ভালো লাগছে না যতি? তোমার প্রোগ্রেস তো খারাপ নয়?'

এই সময়ে দাদা বাড়ি ফিরল। সে টেবিলের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে গেল। বাবার দিকে একবার, আমার দিকে একবার চাইছে। চোখে খুব দুশ্চিন্তা। সুইং-ডোরটা খুলে আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে এলো বড়দি। পেছনে মেজদি, ছোড়দি, মা-ও। ওরা কি আড়ালে কোথাও অপেক্ষা করেছিল? দিদি বলল—'যতি, আজ তোকে বলতেই হবে স্কুলে তোকে কে এমন কী বলেছে যে স্কুলে যাবার নাম করে...' মেজদি বলল—'যতি, তোকে যদি বদমাশ লোকে ধরত। তুই যদি হারিয়ে যেতিস...ও কি রে তুই কাঁদছিস?' আমার চোখ দিয়ে নিঃশব্দে জল পড়ছিল ভীষণ জ্বালা করে। আমি দেখতে পেলুম মা আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে, ছোড়দি কাঁদছে। বাবা বললেন—'ঠিক আছে। শরীরটা ঠিক করে নাও। দেখি কী করা যায়।'

আমি তখন উঠে দাঁড়াচ্ছিলুম। পাতালের দেবতা আমাকে দু-হাতে ফিরিয়ে

দিচ্ছিলেন। তাই আমার হাতে হাত, পায়ে পা, চোখে চোখ, কানে কান সব খাপে খাপে বসে যাচ্ছিল। কাটা দরজাটা দিয়ে ভেতরবাড়িতে যেতে যেতে শুনতে পাচ্ছিলুম বাবা আস্তে করে বলছেন—'আর মনটা যতি, মনটাকেও ঠিক করো। শক্ত সমর্থ।' বাবা হয়ত আর বলেননি, কিন্তু গুনগুন করছিল আমার কানের সন্নিকটে বাবার গলা—'মন, মন, মনটা যতি, মন।'

সমুদ্র

ছেলেবেলায় আমরা ছিলুম গরিব। কিন্তু একদম ছোটদের ঐশ্বর্য সম্পর্কে ধারণাটা বড়দের মতো নয় বোধহয়। তাই আমরা ভাইবোনেরা, অন্তত আমি আর বিনু জানতুম না যে, আমরা গরিব। বাবা গলা ছেড়ে হা হা করে হাসতেন। মা ছিলেন সন্ধ্যাপ্রদীপের শিখার মতো। আর, আমাদের বাড়ির যে অংশটা আমাদের ভাগে পড়েছিল সেখানে মাঠের মতো দালানের এক অংশ।

আর বিরাট উঁচু সিলিং-এর তিনখানা ঘর, আর জালিঘেরা ব্যাডমিন্টন খেলা যায় এমন বারান্দা—এরকমটা আমাদের কোনও বন্ধু-বান্ধবদের বাড়িতে আমরা দেখিনি। আসবাব ছিল কতকগুলো—আড়ে দীঘে মহাকায় এক আলমারি, ভীষণ ভারী একটা দেরাজ, পেতলের টপওয়ালা টেবিল আর পাঁচ ছ'খানা অদ্ভুত আকারের চেয়ার। পায়াগুলো তাদের গড়িয়ে-আসা ঘন গুড়ের মতো। কালচে লাল মেহগনি পালিশ। সবার ওপরে, আমাদের সবচেয়ে প্রিয় ছিল দালানে আমার চেয়েও বড় মাপের একটা সাদা পাথরের পরীর মূর্তি। সে ডানা গুটিয়ে মুখ একটু নিচু করে নামছে। একটা পা মাটিতে, আর এক পা এখনও শূন্যে, শূন্যে-তোলা পায়ের আধখানা ভাঙা। একটা পা অমন ভাঙা বলেই যেন পরীটা ছিল আমাদের খুব কাছের মানুষের মতো, যার জন্যে মন খারাপ হতে পারে।

কতদিনকার জিনিস সব, হিসেব জানি না, কখনও এসবে পালিশ চড়েনি, ঘর-দোর কখনও রঙ হতে দেখিনি, কিন্তু সব কিছু ঝকঝক তকতক করত। বাবা মা আর দিদি মিলে ঝেড়ে ঝুড়ে সব কিছু এমনি রাখতেন। বাইরের থেকে বাড়িটাকে দেখিয়ে যদি বন্ধুদের বলতুম—'এই আমাদের বাড়ি', তাহলে তারা মূর্ছা যাবার জোগাড় হত—'তোরা এই বাঘ-বাড়িতে থাকিস? তোদের বাবা রাজা না কিরে?' একথা বাবা-মার সামনে বলার জো ছিল না। বললেই বাবার হাসিমুখ আঁধার হয়ে যেত, মায়ের মুখের চেনা আলোর শিখাটা দপ করে নিবে যেত আর পরে কোনও সময়ে দিদি কোনও একটা হাতের কাজ সারতে সারতে আনমনে ধমক লাগাত 'বলার আর কথা পাস না, না রে টুনি? হুঁ, রাজা? রানী! রাজকন্যে হবার খুব শখ, না রে? ভগবান জানেন, রাজকন্যে হবার শখ আমার মোটেই ছিল না। রাজকন্যেদের রাজ্যে দৈত্য এসে সব পাথর করে দিয়ে যায়। রাজকন্যেকে উঁচু জলটুঙ্গি ঘরে জন্মের মতো ঘুম পাড়িয়ে রেখে দেয়

সোনার কাঠি রুপোর কাঠি মাথায় পায়ে রেখে, জাগায় শুধু নিজের আকাট-বিকট মুখখানা দেখবার জন্যে। রাজকন্যে কি হতে আছে? আমার ভাই বিনুকে চুপিচুপি জিজ্ঞেস করতুম—'হ্যাঁ রে বিনু, দিদি আমাকে বকল কেন রে! বাবাকে রাজা বললে বাবা কেন রাগ করে রে?' বিনু আমার থেকে বয়সে ছোট হলে কি হবে, বুদ্ধিতে ছিল অনেক পাকা, বলত—'তুই জানিস না টুনি! আমাদের ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা এই এত বড় বাড়ি, বাগান, ঠাকুরদালান সব করে গেছিলেন। ঠাকুর্দার ঠাকুর্দাকে সবাই রাজা বলত।'

—'তো কি? ভালো তো!'

—'দূর বোকা, ভালো কোথায়! মদ খেত তো ঠাকুর্দাদের সববাই। কেউ কোনও কাজ করত না। খালি পায়রা ওড়াত আর বেড়ালের বিয়ে দিত আর সায়েবদের পা চাটত। তাই তো আমাদের আজকে এই দুরবস্তা।'

বিনুটা সে সময়ে বাংলায় ভীষণ ভালো হবার চেষ্টা করছে। 'দুরবস্তা' তো কোন্ ছার 'অকুতভোয়', 'অদূরদস্যিতা' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেও ঘন ঘন স্কুলের মাস্টারমশাইদের মূর্ছার কারণ হচ্ছে। যাই হোক, বিনুর কথাবার্তা থেকে আমি বোকা মেয়ে খালি এইটুকু উদ্ধার করতে পারতুম, রাজা হওয়াটা খুব খারাপ, রাজারা খুব খারাপ লোক হয়, বোধহয় আমাদের পাড়ার হাতকাটা তেঁতুলদার চেয়েও খারাপ।

একমাত্র দুটো সময়ে আবছাভাবে বুঝতে পারতুম—আমরা গরিব, আমাদের যথেষ্ট পয়সা কড়ি নেই। পুজোর সময়ে আর বেড়াতে যাবার মরসুমে। পুজোর সময়ে আমাদের ঠাকুরদালানে ডাকের সাজ পরা দুর্গা প্রতিমা পুজো হত, সারা কলকাতার লোক ভেঙে পড়ত ঠাকুর দেখতে, কিন্তু আমাদের দুটোর বেশি তিনটে জামা হত না। মা সারা ভাদ্র-আশ্বিন, সেই পঞ্চমীর দিন পর্যন্ত হাত মেশিনে সেলাই করত। বাড়ির সব্বার সায়া, পাঞ্জাবি, ব্লাউজ, ফতুয়া, ফ্রক, জাঙিয়া, শার্ট, প্যান্ট। শুধু নিজেদের নয়, সেই রায়বাড়ির বাসিন্দা নানান রকমের কাকা জ্যাঠাদের পরিবারের। এই ডাঁই জামা-কাপড়ের মধ্যে থেকে একটা অপূর্ব থাক-থাক দেওয়া সোনালি রঙের খড়মড়ে ফ্রক বার করে হয়ত আমাকে ডেকে বলত 'টুনি দ্যাখ দিকি নি পছন্দ হয় কিনা!' আমি দৌড়ে আসতুম, অমন জামা পছন্দ না হয়ে পারে? বলতুম—'মা এটা অষ্টুমীর দিন পরবো তো? ষষ্ঠী, সপ্তুমী, নবুমী, এগুলো? মা আবার সেই ডাঁইয়ের মধ্যে হাত চালিয়ে একটা সাধারণ ছিটের সাদা-সিধে ফ্রক বার করে বলতো—'এইটা ষষ্ঠীর দিন পরবি।'

—'আরে?'

—'আবার কি? দেখছিস না কতজনের কত ফরমাশ, এই সব সেরে আর কখনও করতে পারি? নড়া ব্যথা হয়ে গেল যে রে!'

এমনিতে খুব মাতৃভক্ত হলেও, আমি নড়া-ব্যথার কথায় ভুলতুম না। কেঁদেকেটে একসা করতুম। কারণ আমার চোখের সামনে তখন ভাসছে খুড়তুত দুই বোন পুতুল-বীথির পাঁচ দুগুণে দশটা করে ফ্রক, কোনটা ফ্রিল দেওয়া, কোনটার কুকুরের কানের মতো কলার, কোনটাতে সিল্কের ওপর মিকি মাউস, এক একটায় একেক রকম চমক। তাদের পাশাপাশি আমি ওই সোনালি অর্গ্যান্ডির ফ্রক পরে রো—জ।

—'কেন তুমি এত জনের এত জামা করবে? কেন খালি আমার বিনুর আর দিদির

আর তোমার আর বাবার করবে না! কেন? কেন? কেন?' আমার সেই নেই-আঁকড়া কান্নার মধ্যে মা সেলাই-কলের ওপর গালে হাত দিয়ে চুপটি করে গম্ভীর মুখে বসে থাকত। দিদি জোর করে আমাকে সেখান থেকে তুলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করত, আর ঠিক এমনই সময়টা বাবা এসে দাঁড়াতেন—'কী হল? টুনি এতো কাঁদছে কেন? ও কি, বুলা, টুনিকে ওমনি করে এক পা ধরে টানছিস কেন?'

—'দ্যাখো না বাবা, টুনি মাকে কাজ করতে দিচ্ছে না, পুজোর আর ঠিক পনেরো দিন বাকি! এ সবই তো আমাদের শেষ করতে হবে, না কি।'

দিদি মাকে সাহায্য করত। বোতাম বসানো, বোতাম-ঘর করা, হেম-সেলাই করে দেওয়া, সিল্কের জিনিস তৈরি করার সময়ে টানটান করে ধরে বসে থাকা, স-ব। বাবা সমস্ত শুনে গম্ভীর হয়ে যেতেন। পরদিন দুপুরবেলা গলদঘর্ম হয়ে কোথা থেকে ফিরে এসে ডাকতেন—'টুনি-ই, টুনটুনি-ই, টুন-টুনটুনি-ই!' আমি ছুট্টে যেতে হাতে একটা বাক্স ধরিয়ে দিয়ে বলতেন—'দ্যাখো তো টুনি, পছন্দ হয় কি না!' বাক্সের ভেতর থেকে বেরোত সাদা-ধবধবে সুইস-সিল্কের লেস-দেওয়া স্বর্গীয় ফ্রক, তার জায়গায় জায়গায় ছোট্ট ছোট্ট এমব্রয়ডারির ফুলের গোছা।

ফ্রকটা তুলে নিয়ে তার ভেতরে নাক ডুবিয়ে আমি শুধু সেই গন্ধটুকু নিতুম প্রাণ ভরে, হারিয়ে যেতুম গন্ধটার ভেতর। আমি তখন একটা খুশির পুতুল, ডুবে যাচ্ছি সুখের সাগরে। আর ঠিক সেই সময়ে মা এসে দাঁড়াত—'এ কি গো? এ ফ্রক কোত্থেকে আনলে? এ যে অনে-ক দাম! কোত্থেকে?'

—'নিউ মার্কেট।'

—'ইসস্স! কত নিল?'

—'সুন্দর কিনা সেটা বলো আগে! অত দাম দাম করছ কেন?'

—'সুন্দর তো বটেই! দামটা কত সুন্দর সেটাও আমার জানা দরকার!'

—'পঁয়তাল্লিশ টাকা।'

—'কী বললে? পঁয়তা-ল্লিশ টাকা? এতে যে ওর তিনখানা ফ্রক হয়ে যেতো গো! কোথা থেকে...'

—'আঃ, চুপ করো না এখন!'

'এর পরেও আছে জুতো, মোজা, রিবন, পুজোর কদিনের নানা বায়না...' মা কথা শেষ না করে চলে যেত।

রাত্তিরে দিদি গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলত—'টুনি, বাবার না একটা খুব দরকারি জিনিস কেনার ছিল, সেটা বাদ দিয়ে তোর অত দামি ফ্রকটা কিনে এনেছে। তুই কাল বাবাকে বলবি ফ্রকটা ফেরত দিতে, বলবি ওটা তোর পছন্দ নয়, হ্যাঁ?'

—'কি করে মিছে কথা বলব? আমার যে জামাটা খুব পছন্দ দিদি? বাবা দরকারি জিনিসটা অন্য টাকা দিয়ে কিনুক না!'

দিদি বলত—'বলবি সাদা জামা আমার পছন্দ না, তুই আর জামা নিবি না!'

আমি তখন কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলতুম—'তোমরা সবাই বিচ্ছিরি। আমার জামাটা এত পছন্দ, তবু ওটা অপছন্দ বলতে বলছ। পুতুল, বীথি, পরী, দীপু, মঞ্জু সবাই একেক দিন একেকটা জামা পরবে। সব্বাই। খালি আমি...'কথা শেষ করতে পারতুম না,

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকতুম। কান্নার আওয়াজে মা ঘরে ঢুকে বলত—'বুলা। টুনি কাঁদছে কেন রে? বকেছিস?'

—'দ্যাখো না মা' আমি নাকেকান্না চড়াবার আগেই দিদির হাত কঠোরভাবে আমার মুখ বন্ধ করে দিত, মা একটুখানি দাঁড়িয়ে থেকে বলত—'বুলা, ওকে বকিস না। ছেলেমানুষ...'

পুজোর কদিন ভারি মজা। বুড়ির মাথার পাকা চুল, হাওয়া মেঠাই, পাঙ্খা বরফ, লম্বা বেলুনের চ্যাঁ চোঁ, গ্যাস বেলুন। ঠাকুরদালানে ঝাড়বাতির নিচে ডাকের সাজ পরে ঠাকুর ঝলমল করছে। কোনও একজন কাকিমা ডেকে বলছে—'টুনি এই সিল্কের জামা তোকে কে দিল রে?'

—'কে আবার দেবে? আমার বাবা।' বাবার গর্বে ঝকমকে মুখ আমি দৌড়ে হারিয়ে যাচ্ছি বন্ধুদের ভিড়ে আমার ডাকের সাজে। সাদা ধবধবে সিল্ক, তাতে সরু লেসের পাড়, চকচকে সুন্দর লজেন্স-লজেন্স গন্ধঅলা এমব্রয়ডারির নানান রঙের ফুলের গোছা। 'টুনি—টুনি-ই', বীথি ডাকছে বুঝি। 'কি সুন্দর তোর এই জুতোটা!' 'আইরিন এর নাম। বাটার নতুন জুতো, বাবা কিনে দিয়েছে। আমার বাবা!' সগর্বে বলতে বলতে আমি দৌড়ে নামব, ঠাকুরদালানে চামড়ার জুতো পরে ওঠা বারণ। তার সামনের চত্বরে হাজার মুখের মেলা, তারই মধ্যে কোনও কোনও চোখ আমার ওপর, আমার ফ্রকের ওপর আটকে যাবে, কেউ হয়ত বলে উঠবে—'ফ্রকটা কী সুন্দর, দেখেছো? মিনুকে এই রকম একটা...'

নতুন কস্তাপেড়ে শাড়ির আঁচল মাথায় দিয়ে, পায়ে-আলতা মা চলে যাচ্ছে ঠাকুরদালানের দিকে। হাতে পেতলের ভারী থালায় কত কি রহস্যময় পুজোর জিনিস। বাবা কোরা কাপড়ের খুঁট গায়ে জড়িয়ে ঠাকুরমশাইয়ের পেছনটিতে বসে, বিনুর হাত থেকে ফিরোজা রঙের গ্যাস বেলুনটা হুউশ্‌শ্‌শ্‌! ধনেখালির হলুদ ডুরে শাড়ি পরে দিদি এসে দাঁড়াচ্ছে। আমার দিদি, আরও অনেক দিদি। খুড়তুত, জাঠতুত, পাড়াতুত। কেউ সিল্ক, কেই অর্গ্যাণ্ডি, কেউ বেনারসীই। মহা সমারোহে সন্ধিপুজো শুরু হয়ে গেল। সেই ধুমধামের সন্ধিপুজোর ধুনো-গুগ্‌গুলের চোখ-আঁধার করা আবছা পর্দার মধ্যে থেকে ঘোমটার ভেতর মায়ের ভক্তিনম্র, অনিন্দ্য মুখখানা মাঝে মাঝে দেখা দিয়েই হারিয়ে যাচ্ছে। কে যেন বলছে—'বুলার শাড়িটা বড্ড খেলো। পুজোর কাজে নষ্ট হয়ে যাবে বলে পরেছে না কি রে? কে যেন তার জবাব দিচ্ছে—'দুর, কোথা থেকে দামি শাড়ি পাবে!' ...কথাগুলো তাদের পুরো অর্থ নিয়ে আমার ছোট্ট মাথায় ঢুকছে না, কিন্তু শরীরে কেমন একটা অসোয়াস্তি, রাগে দুঃখে আস্তে আস্তে কান গরম, মাথা ফাঁকা! আমার দিদির শাড়িটা খেলো! মানে বাজে? কেন? কত সুন্দর দেখাচ্ছে যে দিদিকে! শাঁখে ফুঁ পাড়ছে দিদি সমানে, গালগুলো গোল টোপর হয়ে ফুলে উঠছে, কপাল, নাক, থুতনি সব দুগ্‌গা ঠাকুরের মতো লাল!' 'কোথায় চললি টুনি?' কে যেন পেছন থেকে বলছে চেঁচিয়ে। ঢাক বাজছে ঢোল বাজছে তুমুল হুল্লোড়ে, কাঁসর বাজছে কাঁই না না কাঁই না না। আমি গরিব, আমরা গরিব, দিদির শাড়িটা খেলো, বিনুর হাফ-প্যান্ট ঝলঝলে, বাবার খালি গায়ে কোঁচার খুঁট, এই পুজো, এই হই-চই এসব পুতুল বীথিদের জন্যে, মঞ্জু-দীপুদের জন্যে, মাধুদি, নীলমাসি, নতুন কাকিমা, গীতালিদিদের

জন্যে। আমি চলে যাচ্ছি সাদা সিল্কের ফ্রকের ঠাট্টা শুনতে শুনতে আমাদের উঁচু ঘরের অসীম নিঃশব্দ পরিসরের মধ্যে আমার কান্না লুকিয়ে ফেলতে।

পুজো ফুরিয়ে গেলে আবার সব ভুলে যাই। তখন দিদির অনেক যত্নে তুলে-রাখা মলাট দেওয়া বই স্কুল ব্যাগ, টিফিন-কৌটোয় ঘুগনি, বাবার কাছে অঙ্ক-ইংরিজি, বিকেলবেলায় মণিমেলা, দিনগুলো সব একে অপরকে হারাবার জন্যে দুদ্দাড় ছুটত, আমিও তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতুম। আর সারাদিন ছোটার ক্লান্তিতে, আনন্দে রাতের কোলে, মায়ের কোলে দিদির কোলে ঢলে পড়তুম অবাধ সুন্দর শীতল-বিস্মরণের অথই দিঘিতে।

কিন্তু গরমের ছুটি, পুজোর ছুটি, বড়দিনের ছুটির সময়ে গরিব-বিছেটা আবার আমায় কটাস কটাস করে কামড়াত। পুজোর সময়ে না হয় সব শরিকে মিলে মল্লিকবাড়িতে বিখ্যাত একশ বছুরে পুরোনো পুজো, কোথাও যাওয়া যাবে না। গরমের ছুটিতে না হয় বাবার আপিস, বড়সায়েব কিছুতেই ছুটি দিতে চায় না, কিন্তু বড়দিন? তখন যে কলকাতায় ঝুড়ি-ঝুড়ি কমলালেবু, থইথই করছে আকাশনীল। এখানে সেখানে চড়ুইভাতি! স্কুলের বন্ধু মিতালি বলত—'তনিমা, তোরা শীতে কোথাও যাবি না? আমরা এবার গিরিডি যাচ্ছি। উশ্রী জলপ্রপাত আছে, খু-উ-ব সুন্দর জায়গা!' কেয়া বলত—'আমরা যাচ্ছি হাজারিবাগ, জঙ্গল দেখব, বাগানে লুকোচুরি খেলব আর রোজ মুরগি, রোজ...।' শিপ্রা বলত—'দূর, হাজারিবাগ, গিরিডি ওসব তো হাতের কাছে, ট্রেনে চড়লি নেমে পড়লি। কোনও মজাই নেই। আমরা যাবো, দু-রাত্তিরের পথ, দিল্লি! লালকেল্লা দেখব, কুতুবমিনার দেখব, তাজমহল দেখব চাঁদের আলোয়, বাবা বলেছে।'

আমি অবাক হয়ে ভাবতুম কুতুবমিনার! কুতুবুদ্দিন আইবক তৈরি করেছিলেন, ইলতুতমিস শেষ করেন সেই কুতুবমিনার! লালকিল্লা! যার ভেতরে ময়ূর সিংহাসন, দেওয়ান-ই-খাস, দেওয়ান-ই-আম!। ওসব তো পুরনো-হয়ে যাওয়া ইতিহাস বইটার পাতায় থাকে! দেখা যায়! ওদের দেখা যায়! আর তাজমহল? 'কালের কপোল তলে শুভ্র সমুজ্জ্বল সেই তাজমহল? সেইটা দেখবে শিপ্রা? যে রোজ ইস্কুলে আমার পাশে গা ঘেঁষে বসে থাকে, আমার ঘুগনি খায়, আমাকে গোলাপ জাম খাওয়ায়, সেই শিপ্রা?'

'বাবা! বাবা! এবার বড়দিনের ছুটিতে আমরা কোথায় যাবো?' বাবা অবাক হয়ে চেয়ে বলতেন—'অ বুলা। দেখতো ছোট্ট টুনটুনি পাখিটা কী যেন কিচির মিচির করছে।'

—'না বাবা, সত্যি বলো না, শিপ্রারা যাচ্ছে, মিতালিরা যাচ্ছে। সবাই যাচ্ছে যে!'

—'সবাই চলে যাচ্ছে? তাহলে তো সারা কলকাতাটাই গড়ের মাঠের মতন ফাঁকা হয়ে যাবে রে! সুদ্ধু আমরা কজন? বেড়াব, খালি বেড়াব।'

—'হুঁউ—ঠাট্টা নয়, বলো না!'

দিদি হঠাৎ তার বাটনা-বাটা হলুদ হাত ছোট লাল গামছায় মুছতে মুছতে এসে দাঁড়িয়েছে।

—'বাবাকে বিরক্ত করছিস কেন রে টুনি। দেখছিস না হিসেবের কাজ করছে!'

বাবাকে, মাকে ভয় পেতুম না, কিন্তু দিদিকে বিলক্ষণ।

—'ও দিদি, বাবাকে বলো না বড়দিনের ছুটিতে আমাদের দিল্লী নিয়ে যাবে!

লালকেল্লা দেখব, তাজমহল...বলো না।'

দিদি গম্ভীরভাবে বলত—'তোর কোন্ বন্ধু যাচ্ছে?'

—'শিপ্রা তো! শিপ্রা যাচ্ছে!'

—'তাই ওমনি তোকেও যেতে হবে? লোকে যা যা করবে তোকেও ঠিক তাই তাই করতে হবে? বাঃ। লোককে নকল করে যারা তাদের কী বলে জানিস?'

ভয়ঙ্কর কিছু বলে নিশ্চয়ই। আমি আর কথা বাড়াতে সাহস পাই না। কিন্তু কান্না গিলে নিতে নিতে ভাবতে থাকি—দিল্লি যাওয়াটা তো খারাপ কাজ নয়। কোন মতেই নয়। তাহলে? রাত্তিরে ঘুমের ঘোরে মায়ের গলা শুনি—'সত্যি, কাছাকাছি, খুব কাছাকাছি থেকেও যদি...' দিদির গলা—

—'তুমি চুপ করো তো মা! এই করতেই বাবার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে...ছোটরা তো ওরকম অবুঝপনা করবেই...!' আবার ঘুমিয়ে পড়ি। ছোট্ট একটা বিছে বুকের ভেতরে নিয়ে। বিছেটা কুটুস কুটুস কামড়াবে, গর্তের মধ্যে সেঁধোবে, আর ঘুমের মধ্যে কে যেন বলতে থাকবে তোদের টাকা পয়সা নেই, তোরা কি করে...তোর বাবার টাকাপয়সা নেই, তোরা কি করে...। ট্রেনের চাকার ঘ্যানঘেনে আওয়াজের মতোই সারা রাত সেই শব্দগুচ্ছ আমার আধ-ঘুমন্ত অভিমানী মাথার মধ্যে গুমগুম করে বাজবে। আমি যাচ্ছি, আমি ট্রেনে চড়েছি ঠিকই। কিন্তু সে ট্রেন দিল্লি যায় না, হাজারিবাগ যায় না, উশ্রী যায় না, এক নিদারুণ দুঃখের দেশে, নেই-নেই গরিবের দেশে নিয়ে যায়। সেখানে বাবাদের টাকা থাকে না, দিদিদের শাড়ি খেলো হয়, খাটো শাড়ি সেমিজ পরে রাতুল-চরণে-আলতা মায়েরা অবিশ্রান্ত ঘুরে বেড়ায় কাজের পাকে।

সেবার কিন্তু বাড়িতে ভারি একটা আনন্দের ব্যাপার ঘটল। বিদেশি টিকিট মারা নীলচে নীলচে চিঠি আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝেই আসত। একদিন ওই রকম একটা চিঠি নিয়ে বাবা ঝলমলে মুখে দালানের শেষে রান্নাঘরের মুখে এসে দাঁড়ালেন—'ওগো শুনছো। ফুটকুন আসছে যে!'

মা তোলা উনুনে দুধ বসিয়েছিলেন, উঠে দাঁড়িয়ে আরও ঝলমলে মুখে বলল—'ফুটকুন ঠাকুরপো? সত্যি!'—'হ্যাঁ গো! সব্বাই। ফুটকুন। স্টেলা, ছেলেমেয়ে।' মা ব্যস্ত হয়ে বলল, 'আমাদের এখানে? সে কি গো? মেমসায়েব...তার সাহেব মেম ছেলেমেয়ে...কোথায় থাকবে? কী খেতে দেবো!'

বাবা হাসিমুখে বললেন—তবে শোনো ফুটকুন কী লিখেছে, 'প্রিয় মেজদা, এবার দেশের এবং আমাদের বাড়ির সাবেকি পুজো দেখাতে ফ্যামিলি নিয়ে দেশে যাচ্ছি। তোমার কাছেই থাকব। অন্য কোথাও তো আমাদের জায়গা হবে না! আমাদের থাকা নিয়ে একদম উদ্বিগ্ন হবে না। আমি লাউশাকের চচ্চড়ি খাব মটর ডালের বড়া দিয়ে, লাউচিংড়ি, পটল ভাজা, মৌরলামাছের বাটি চচ্চড়ি...যদি সম্ভব হয়, আর এরা খায় আলুসেদ্ধ, বাঁধাকপি সেদ্ধ, বীন আধসেদ্ধ, কাঁচা টোম্যাটো, কাঁচা গাজর। শুধু জলটা একটু ফোটানোর ব্যবস্থা করবে। পুজোটা কাটিয়ে আমরা একটু বাইরে বেরোব। তারপর ফিরে আসব। তিন সপ্তাহের ছুটি। মেজবউদির চরণে আমার প্রণাম দিও। বুলা কত বড় হল? তোমার ফুটকড়াই দুটোকে তো আমি দেখিইনি। ইতি তোমাদের ফুটকুন।'

দিদিও ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। হাসিমুখে বলল—'আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি বাবা,

তুমি ভেবো না। সাহেব কাকা আর স্টেলা-কাকিমা থাকবে আমাদের ঘরে, তোমাদের ঘরে থাকবে লীলা আর সুভাষ, বৈঠকখানার তক্তপোশে বিনু আর তুমি, মেঝেতে বিছানা করে আমি মা আর টুনি।'

বাবা বললেন—'দেখলে তো, হয়ে গেল! খুলা না হলে কিছু হয়!' বলে বাবা মধুক্ষরা দৃষ্টিতে দিদির দিকে চাইলেন।

জন্মে থেকে, বোধহয় আঁতুড়ঘর থেকে শুনছি—সাহেবকাকা, সাহেবকাকা, ফুটকুন ফুটকুন! এ বাড়ির এক ছেলে, আমাদের জাঠতুত, না খুড়তুত, না কী কাকা, ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়ে নাকি আর ফেরেননি, ওখানেই মেম বিয়ে করে রয়ে গেছেন। তাঁর সাহেব ছেলে, মেম মেয়ে। তাঁর বাবা রেগেমেগে তাঁকে ত্যাজ্য করে দিয়েছেন। নিজের লোকেদের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, খালি মেজদা-মেজবউদি বলতে সাহেবকাকা অজ্ঞান। নিয়মিত চিঠি লিখে খোঁজখবর নেন, সে বোধহয় আজ সতেরো আঠারো বছর হয়ে গেল। সেই সাহেবকাকা, মেমকাকি আসছেন।

আমার আর বিনুর তো বুক গুড়গুড় করতে লেগে গেল। বাবা কোথা থেকে টাকাকড়ি জোগাড় করে বাথরুমে একটা কমোড আর একটা ছোট্ট বেসিন বসালেন। আমি আর বিনু চুপিচুপি হেসে গড়াগড়ি খাই। সাহেব মেমরা উবু হয়ে ড্যাশ বসতে পারে না। চেয়ার চাই। তাকে বলে কমোড। হিহি! হিহি! আমাদের হাসি আর ফুরোতেই চায় না। তবে হাসির মধ্যে মধ্যে একটু ভাবনাতেও পড়ে গেছি। সাহেব দাদা-দিদিদের সঙ্গে কথা বলব কী করে? দু ভাইবোনে মুখস্থ করতে থাকি—হোয়াট ইজ ইয়োর নেম? মাই নেম ইজ মিস টানিমা মল্লিক, মাই নেম ইজ মাস্টার বিনায়ক মল্লিক। হোয়্যার ডু ইউ লিভ? আই লিভ অ্যাট জোড়াবাগান ইন ক্যালকাটা। তারপর বাসস্থানের প্রশ্নোত্তরটা দরকার লাগবে না বুঝে দুজনে আবার হাসত থাকি। হুইচ ক্লাস ডু ইন রীড ইন? আই রীড ইন ক্লাস ফোর, আই রীড ইন ক্লাস থ্রি। বলতে বলতে বিনুটার ধৈর্য শেষ হয়ে যায়, সে হাত পা ছুঁড়ে বলে ওঠে হ্যাট, ম্যাট, ক্যাট, কুট, শুট, দ্যাট, র‍্যাট, ফাই, হাই, নাই, হাউ, কাউ, হাঁউ, মাউ, খাঁউ বলতে বলতে দুপাটি দাঁত বার করে, বগলে রবারের বল নিয়ে দে ছুট। বাবা একদিন শুনে ফেলে হেসে বাঁচেন না, বললেন—'তোদের অত ইংরেজি বলতে হবে না, তোরা বাংলাতেই কথা বলবি, হাড়বড় না করে একটু স্পষ্ট করে, ধীরে ধীরে বলবি, তাহলেই বুঝতে পারবে। সাহেব নাম হয়ে গেলে কি হবে! ফুটকুন কোনও দিন সাহেব ছিল না। হবেও না।'

চিকচিকে সিল্কের শাড়ি পরা, ঘাড়ের কাছে নুটু-নুটু খোঁপা বাঁধা স্টেলাকাকিমা চারদিকে তাকিয়ে বললেন—'এতো উঁচু গর, এর্কম আর্কিটেকচার, বিউটিফুল, স্ট্যাচুজ, এ তো ক্যাস্‌ল-এ থাকে। তুমরা এ বাড়ি পাবলিক শো-এর জন্য ওপন করে ডাও না কেনো? আমাদের ওখানে কোতো এর্কম বাড়ি ডিউক, ব্যারনরা পাবলিকের জন্যে ওপন করে দিচ্ছেন, তাইতে মেইনটেনান্সের খরচা উঠে আসে।'

ফুটকুনকাকা চায়ে চুমুক দিতে দিতে বললেন—'স্টেলা তুমি আর এখানে তোমার ইংরিজি পাটোয়ারি বুদ্ধি নাই খেলালে। ইতিহাসের পাতা এখানে জীবন্ত হয়ে রয়েছে ডারলিং, মিউজিয়ম হয়ে নেই।'

স্টেলাকাকিমা বলেন—'পাটুয়ারি কী বললে? কুনও গালি নোয় তো!'

খাবার দিকে তাকিয়ে একচোখ টিপে ফুটকনুকাকা বললেন—'কী যে বলো! তোমাকে বাংলা গ্রামারটা এখনও শেখাতে পারলুম না। বারোয়ারি পুজো বলছিলুম না। আমাদেরটা যদিও মল্লিকবাড়ির পুজো, এখন বারোয়ারিই হয়ে গেছে। কতজন শরিক এখন মেজদা?'

কথা ঘোরাতে পেরে ফুটকুনকাকা খুব খুশি। বাবা বললেন, 'সাঁইত্রিশ জন।'

লীলাদি বলল—টুনি! হাউ কিউট : শী ইজ এ লিটল রেড রাউডিং হুড?

ওরা কেউ কিছুতেই সেদ্ধ খাবে না। সুভাষদা তার বাবার কথা শুনে বলল—'ড্যাড বোরাবোর একটু সেলফিশ থাকছে। আমরা সোব কাবো।' স্টেলাকাকিমা বললেন—'মেড্ডি, কালি জাল ডিও না।'

এইভাবেই বিশাল বাড়ির অলিগলি কানাচ-কানাচ লম্বা-চওড়া দালান, জমাদারের ঘোরানো সিঁড়ি, তিন চারটে ফুটবল খেলার মাঠের মতো ছাদ আর এ কোণে ও কোণে বিস্ময়বালক-বিস্ময়বালিকা এঞ্জেলের মূর্তি, দেওয়ালিগিরি, প্রাচীন পট, ফটোগ্রাফ এবং সর্বোপরি দুর্গাপুজো দেখতে দেখতে আমাদের ফুটকুন কাকাদের পরিবারের সঙ্গে ভীষণ আলাপ হয়ে গেল। আমার দিদি বুলা, লীলাদির ভীষণ বন্ধু, সুভাষদার সঙ্গে বিনুর গলায় গলায় ভাব, দুজনে খালি ছাতে উঠে ঘুড়ি ওড়ায়, আর বেড়ায়। উত্তর কলকাতার সব প্রাচীন সরু গলি ঘুঁজি, সুভাষদার দেখা চাই! আর আমি স্টেলাকাকিমার আদুরে। তিনি খালি বলেন 'মেড্ডি তুমার এই টুনি ডল আমি নিয়ে যাবো।'

মা বলে—'যাও না নিয়ে। যা কিচিরমিচির করে!'

—'সত্যি কিন্তু। তোখোন আর নো করতে পারছে না।'

মা হাসত। আমি ভাবতুম ভালোই তো! ফুটকুনকাকাদের কি সুন্দর বাগানঅলা বাড়ি। তার ওপর দিকটা কুটিরের মতো। কেমন চিমনি, ফায়ার প্লেস, কুকুর, পরিষ্কার রাস্তাঘাট। বাকিংহাম প্যালেস, টেমস নদী, টিউব ট্রেন। আমি যাবো, লীলাদির মতো টুকটুকে ফর্সা হয়ে যাবো, মেমসাহেব একেবারে, কত জামাকাপড়, কত বেড়ানো... ভালোই হবে বেশ।

ফুটকুনকাকা বললেন—'পুজোর পর টিকিট কাটছি গোপালপুর অন সী। তোমরা সক্কলে আমাদের সঙ্গে চলো।' বাবা হাঁ হাঁ করে উঠলেন—'একাদশীর দিন থেকেই অফিস ফুটকুন, কোনও উপায় নেই।' মা হেসে বলল—'তবেই বোঝ, তোমার দাদাকে দেখাশোনা করবার একটা লোক চাই তো! তুমি বরং বুলা, বিনুকে নিয়ে যাও।'

লীলাদি বলল—'বুলা, য়্যু মাস্ট টেক আ হলিডে।'

দিদি হেসে বলল—'পরের বার লীলা, পরের বার, ডোন্ট মাইন্ড!' আমি জানি দিদি যাবে না। দিদি ভীষণ ঘরকুনো। অবশেষে অনেক আলাপ আলোচনার পর ঠিক হল আমি আর বিনু যাবো। মহানন্দে আমাদের বাক্স গুছোনো হল। আমার আর বছরের সাদা সুইস সিল্কের ফ্রক তো, এখনও তেমনি সুন্দর আছে। সোনালি অর্গান্ডির ফ্রকটাও। তারপর স্টেলাকাকিমা আমাদের জন্য কত রকমের জামা এনেছেন, তাদের বলে ড্রেস। বিনুকে আর চেনা যাচ্ছে না। আমিও যখন লম্বা স্ল্যাক্স পেন্টুল আর নকশা-করা টপ পরে ছোট চুলে পনি টেল বেঁধে ফিটফাট হয়ে গেলুম, দিদি আদর করে বলল—'দ্যাখ তো টুনি, এবার তোকে কেমন ছবির বইয়ের খুকুর মতো দেখাচ্ছে!' আমি

আর বিনু মহা গর্বে উৎফুল্ল হয়ে দু পকেটে হাত গুঁজে ট্যাকসিতে উঠে পড়লুম। ভীষণ তাড়া। ওদিক থেকে মিতালি ছুটতে ছুটতে আসে—'তনিমা, তনিমা কোথায় যাচ্ছিস রে?'

—'সমুদ্র দেখতে, সমুদ্র। গোপালপুর অন সী।' আলো-আলো মুখে বলতে থাকি।

ট্রেন চলেছে স্লুইশ্‌শ করে, শব্দ নেই। মোটা গদির মধ্যে ডুবে যাচ্ছি। কী সুন্দর ঠাণ্ডা। দু হাত জড়ো করে বুকের কাছে ধরেছি। লীলাদি অমনি গোলাপি রঙের তিনকোনা শাল আমার গায়ে জড়িয়ে দিল। তার কোনও ওজন নেই, অথচ কী সুন্দর গরম। কাচের বাইরে কিছু দেখা যায় না। খালি আমাদেরই ছবি। কামরার মধ্যে আলো, স্টেলাকাকিমার লালচে সাদা মুখ, লীলাদির লাল ব্লাউজ, কালো স্কার্ট, সুভাষদার সোনালি চশমা, বিনুর ফটফটানি। কামরা জুড়ে ওদের অবিশ্রান্ত উত্তেজিত ইংরেজি, যার একবর্ণ বুঝতে পারছি না। বাস্কেট থেকে নাম-না-জানা সুগন্ধের খাবার, স্পেনসেস নামের হোটেলের নাম লেখা বাক্স, তারপর একটা পুরো বাক্স জুড়ে দুলতে দুলতে ভুলতে ভুলতে ঘুম। ঢুলতে ঢুলতে কখন জাগি, কখন আবার ঘুমের মধ্যে গুলিয়ে যাই, নিজেই জানি না। এমন ঘুম কখনও ঘুমোইনি। এমন দোলা কখনও দুলিনি। এমন জাগাও কখনও জাগিনি। সিঁদুরের গোলার মতো সূর্য। মাঠের পরে মাঠ, ডোবা, খাল, বিল, নদী, নালা ঢকাঢক ঢকাঢক, পুল, সূর্য পানকৌড়ি, সাদা বক, কালো ফিঙে, সূর্য, মাঠগুলো দূরে সরে যায়, আবার কাছে চলে আসে। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্য।

বিনু চলেছে, টুনি চলেছে, টুনি চলেছে, বিনু চলেছে। লীলাদি কোলে বইয়ের পাতায়, বিনুর হাতে লঞ্জেসছানা, মেমকাকিমা সাহেবকাকা, সুভাষদাদা, খবর পড়ে, লাফিয়ে নামে লাফিয়ে ওঠে, টুনি চলেছে অনেক দুরে, বিনু চলেছে অনেক দূর, পুরনো শহর পুরনো বাড়ি, নোংরা গলি, ধ্যাত্তেরিকা, ঘ্যাঁঙর ঘ্যাঁঙর চরকা ঘ্যাঁঙর, ইদুজ্জোহা ইদ-উল-ফিতর, টুনি-বিনুর পেরথম টুর, দেখতে দেখতে বেরহামপোর।

হোটেলের গাড়ি এসেছে টুনিদের নিয়ে যেতে। মস্ত বড় ভ্যান গাড়ি যেতে যেতে অবশেষে তার চাকা বসে যায় বালিতে। টুনিতে বিনুতে চুপিচুপি বলাবলি করে—ঠিক যেমন ট্রেনের গদিতে ওরা ঢুকে যাচ্ছিল, তেমনি গাড়িটা বালির গদিতে ডুবে যাচ্ছে। বলতে বলতে ওরা হেসে ওঠে। ফুটকুনকাকু বলেন—'হাসলি কেন রে টুনটুনিটা?' কাকিমা বলেন—'ছুটোরা শুদুশুদু হাসে, কোনও কেনো নাই।' তারপর হঠাৎ দিগবলয়ে এক অবাক দৃশ্য, অবাক শব্দ। টুনি-বিনু বিস্ময়ে চুপ, একদম চুপ। সুভাষদা লাফিয়ে নামছে। হু হু করে ছুটে যাচ্ছে ক্যামেরা নিয়ে। কাকিমা দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন—'ওহ ইটস ওয়াণ্ডারফুল।' লীলাদি বলে—'ইটস বেটার দ্যান ব্রাইটন।' ফুটকুনকাকা টুনি-বিনুর দিকে তাকিয়ে এক চোখ টিপে বলেন—'দেখতে হবে তো, কাদের দেশের সমুদ্দুর!'

সেই হোটেলটাও অবাক। অবাক তার ঘরদোর, বাথরুম, বিছানা, জানলা, বারান্দা, তার লাউঞ্জঘর, খানাপিনা পামগাছের সারি। কিন্তু সবার থেকে আশ্চর্য ওই সমুদ্দুর। তার সামনেটা যেন গঙ্গাজলের সঙ্গে সাবানের ফেনা মেশানো, আরেকটু দূরে অদ্ভুত সবুজ, যেন তার তলায় আলো জ্বলছে, তার তারপর নীল, নীল চিকচিকে ময়ূরকণ্ঠী নীল। বালির পাড়ে কত বালিয়াড়ি। মাথায় বসে সবুজ নীল, নীল সবুজ। ডিঙি ভেসে যায়। ভেসে ফিরে আসে। দূরে ট্রলার। এখানে চান করো না, পাথর আছে। বিনু শুনছে

না, সুভাষদার সঙ্গে কালো পাথরের ওপর বসে বসে হাসতে হাসতে ঢেউ খাচ্ছে। টুনির অত সাহস নেই। সে কাকুর ছোট প্যান্টের কিনারা ধরে জলে নামে। হুশ্ করে মাথার ওপর দিয়ে ঢেউ চলে যায়, উঠতে না উঠতে আবার ঢেউ। সারাদিন, সারা বিকেল। সেই বিশাল পারাবারের তীরে টুনিরা করে খেলা। অদ্ভুত খোলা পোশাক পরে, সাদা-হাত সাদা-পা, লীলাদি, মেম-কাকিমা, বালির ওপর রোদ পোয়ায়, জলে নেমে যায়, ভালুকের মতো রোঁয়াওলা নরম তোয়ালে জড়িয়ে উঠে আসে, মাথায় কেমন চুল-ঢাকা টুপি।

খেলতে খেলতে কাছাকাছি হলে বিনু কুলকুল করে হাসে—'দ্যাখ টুনি আমরা কেমন বিলেতে এসেছি।' টুনি যদি বলে—'ভ্যাট!' বিনু তখন আঙুল তুলে দ্যাখায়—'ওই দেখ কত্ত মেম, কত্ত সায়েব।' সত্যি। বালুবেলায় স্টেলাকাকিমা লীলাদির মতোই আধশোয়া হয়ে থাকে কত মেম, চোখে সানগ্লাস, ঢেউয়ের মাথায় লাল-নীল ছোট প্যান্ট পরে নাগরদোলা খায় কত সাহেব! টুনিরা কাঁটা চামচে খায়, কোলে ন্যাপকিন পেতে। ঠিক কেয়ারফুলের মতো ন্যাপকিন গেলাসে থাকে। গাল না ফুলিয়ে, শব্দ না করে খেতে শিখিয়েছে লীলাদি। বেয়ারারা সেলাম করে। তাদের মাথায় পেখমঅলা টুপি। কিন্তু যখন খুব বেশি বিলেত বিলেত লাগে তখন টুনি হাঁ করে ফুটকুনকাকার আর বিনুর তামাটে মুখের দিকে চেয়ে থাকে। রাত্তিরবেলায় লীলাদির পাশের খাটে শুয়ে সমুদ্রের গর্জন শোনে। কেমন অচেনা, অজানা, বিলেত-বিলেত। টুনি কি সত্যি-সত্যি তবে নিজের দেশ, নিজের শহর কলকাতা ছেড়ে বহুদূরে বিলেতে চলে এসেছে? ভোরবেলায় ঘুম ভেঙে যায়, জানলা দিয়ে থই-থই জল দেখা যায়। হুশ্‌শ্‌শ্ করে বালির ওপরটা ফেনায় সাদা করে দিয়ে ফিরে যাচ্ছে। ব্যালকনিতে বসে লীলাদিদের হ্যাটম্যাটক্যাটের মধ্যে বসে বসে ব্রেকফাস্ট। কিছু-কিছু এখন বুঝতে পারা যায়।

ফুটকুনকাকা—'কী স্টেলা, লীলা, এখন কেমন লাগছে?'

কাকিমা—'খুব ভালো। ফীলিং অ্যাট হোম।'

কাকা—'তাহলে বলো জোড়াবাগান তোমাদের ভালো লাগেনি।'

কাকিমা—'জোরাবাগান ইজ অল রাইট। কিন্তু এখানে এসে শাড়ি খুলে ফেলতে পেরে, আর অত লোকের কিউরিয়সিটির বাইরে এসে আমার স্বস্তি হচ্ছে।'

লীলাদি—'আসলে ড্যাড, ভালো লেগেছে, কিন্তু বিদেশে অ্যাডভেঞ্চারের মতো।

ফুটকুনকাকা—'তাহলে বুঝে দ্যাখো, তোমাদের জন্যে সারা জীবন বিদেশে পড়ে থাকতে আমার কেমন লাগে! আর এই এক সপ্তাহের কলকাতা-মল্লিকবাড়িই বা আমার কেমন লেগেছে!'

কাকিমা—'আয়্যাম রিয়ালি সরি ফর য়্যু।'

সুভাষদা—'আমি ঠিক করেছি গ্রাজুয়েশনের পর ইন্ডিয়া টুর করব, ইয়োরোপ নয়। ওই সব সরু সরু গলি আর বড় বড় ছাদ আমাকে দারুণ ফ্যাসিনেট করেছে। মানুষরাও। আঙ্কল, আন্টির মতো মানুষ আমি দেখিনি। সাধারণ মানুষেরাও অদ্ভুত। কিছু কিছু লোক আছে জাস্ট একটা ল্যাকির মতো, কেউ কেউ আবার দেখবে যেন গড, কুকুর-বেড়াল কিংবা ইন্যানিমেট অবজেক্টের মতো মানুষও দেখেছি।'

ফুটকুনকাকা—'তোমরা বিনু-টুনির সঙ্গেও কথা বলো। ওরা লেফট-আউট ফীল

করবে।'

লীলাদি—'ওঃ, তাও তো বটে। টুনি, এখানে তুমার কেমন লাগছে?'

টুনি—'ভীষণ ভালো।'

—'বিনু তুমার?'

বিনু—'আমি বড় হয়ে বিলেত যাবো। বিলেতটা তো এখানকার মতো?'

সুভাষদা—'সোবটা আছে না বিনু। কিছু কিছু আছে।'

ফুটকুনকাকা (হেসে)—'ভালো, সুভাষ আসছে ইন্ডিয়ায়, বিনু যাচ্ছে ইংল্যান্ডে। বেশ একটা ইয়ুথ এক্‌স্‌চেঞ্জ প্রোগ্রাম করা যায়। টুনি, লীলা, তোমরা কি করবে, বলো? ওহ্‌ লীলা তো আবার...'

এবার ওরা চারজনেই কোন লুকোনো কারণে ভীষণ হাসতে থাকছে। বিনু কিছু না বুঝে হাসতে হাসতে ব্যালকনির রেলিং-এর দিকে ছুটে গেছে। টুনির হাতে মিল্‌ক শেক, গোঁফে ফেনা লেগে গেছে, ন্যাপকিন দিয়ে মুছিয়ে দিচ্ছে লীলাদি। গোপালপুরের এই বিলেত অবশেষে তার কাজুবাগান, বালিয়াড়ি, আরামের হোটেলবাড়ি এই সব নিয়ে দূরে সরে যাচ্ছে। দূরে সরে যাচ্ছে নীল সমুদ্দুরের ওপর কালো কালো কাস্তের মতো ডজনে ডজনে নৌকা, রাত্তিরে কালো জলের ওপর বাতিঘরের ঘুরে ঘুরে টর্চ ফেলা, ট্রলারের আলো, ঢেউয়ের মাথায় ফসফরাসের নাচ। পড়ে থাকছে অনেক পেছনে গোপালপোর অন সী, বেরহামপোর নীল সমুদ্দুর, সবুজ সমুদ্দর, টুনির চোখ গলছে চুপিচুপি। ফিরে চলেছে, ফিরে যেতেই হয়, নজর-মিনার থেকে হাওয়া-বেলুন ওড়ানো দেখা আর হবে না, আর হবে না ঢেউয়ের চূড়ায় পৃথিবীর রানী হওয়া, জলকন্যে হওয়া, বিশাল সমুদ্দুর চলে যাচ্ছে, কাছে চলে আসছে পুরনো শহর, পুরনো বাড়ি, পুরনো জীবন। ছেঁড়া মলাট, ফাটা বেঞ্চি, কালির দাগ। খ্যাংরা ঝাঁটা ঝুরো গোঁফ, টাকমাথা, টিউবলের ঘটাং ঘটাং, হ্যাঁচচো হাঁচি, ফিচকে হাসি। মোড়-জটলা, বস্তি-ঝগড়া, সরু গলি।

টুনি-বিনুকে নিয়ে বাঘবাড়ির চওড়া সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন ফুটকুনকাকা। ধরা গলায় বলছেন বাবার হাত ধরে—'আসছি মেজদা, আবার কবে দেখা হবে জানি না।'

লীলাদি বললে—'থ্যাংস ফর দা ওয়ান্ডারফুল এক্সপিরিয়েন্স জেটিমা, বুলা আই'ল মিস ইউ।'

কাকিমা বললেন—'মেডডি, আমাদের ওকানে চোলে আসুন একবার।'

সুভাষদা বলল—'বিনু-টুনি উই মাস্ট মীট সুন।'

নেমে যাচ্ছে সবাই। এবার ট্যাক্সি। তারপর এয়ারপোর্ট হোটেল। তারপর প্লেন।

এখানে এখন জালি-ঘেরা বারান্দায় নতুন শীতের উসুম-কুসুম সকাল। এখানে এখন মোটা মোটা কত কালের পুরনো কড়ি-বরগার নিচে নতুন টুনি নতুন বিনু। আর পুরনো মা, পুরনো দিদি, পুরনো বাবা। বিনুর হাতে ঝিনুক থলি, টুনির মাথায় বেতের টুপি। বাবার কাঁধে কোঁচার খুঁট, মা হাসছে, দিদি হাসছে চিকন হাসি, বাবা ডাকল—'বিনু! বিনু।' হাতের থলি খলবলাচ্ছে বিনায়ক। বাবা ডাকছে—'টুনি-ই, টুনটুনটুনি-ই।' বাবার ছড়ানো দুই হাতের মাঝখান দিয়ে ঝপ্‌পাং করে ঝাঁপিয়ে পড়ছে টুনি। বাবার খোলা

বুকের সঙ্গে সেঁটে গেছে টুনির মাথা, টুনির কান। কান পেতে শুনছে পুরনো বুকের মধ্যে গুমগুম গাগুম গুম। অবিকল সেই গভীর ডাক। অথই সমুদ্রের। নীল সমুদ্র। সবুজ সমুদ্র। ভেতরের এক অপরূপ অন্ধ আলোড়ন ঢেউ হয়ে ছুটে আসছে। অবিশ্রান্ত, কোজাগর। ভেঙে পড়ছে। টুনির গালের বেলাভূমি তাই ফেনায় ফেনা।

বলাকা

সত্যপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় ওরফে কর্নেল চ্যাটার্জীর বয়স আটান্ন পার হল দুই হপ্তা আগে। কেউ বলবে না। চোখের দৃষ্টি তীরের মতো, পড়ার জন্যে ছাড়া চশমা লাগে না। দাঁড়ান সটান, চলেন সোজা, কপালে একটি, একটিমাত্র ভাঁজ। অনুভূমিক, ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক। চোখ বা ঠোঁটের পাশে কাকের পা নেই। পঞ্চাশ পার হয়েছেন কিনা সন্দেহ হয়। ষাটে জীবনে দ্বিতীয়বার অবসর নেবেন।

ইতিমধ্যেই নানান জায়গা থেকে আগাম ডাক আসছে, তারই মধ্যে যে-কোনও একটাকে বেছে নেবেন। নিজের সময় এবং পছন্দমাফিক। যৌবনের তেজ আর কর্মক্ষমতা, প্রৌঢ় বয়সের অভিজ্ঞতা ও প্রাজ্ঞতা এ সবের প্রয়োগের দিন শেষ হতে তাঁর এখনও অনেক দেরি। এ কথা তিনি একাই বোঝেন না, বোঝে যারা আশে-পাশে অর্থাৎ সংসারে, সমাজে, কর্মক্ষেত্রে কাছাকাছি রয়েছে তারাও। ছিলেন মিলিটারিতে। চিন-ভারত যুদ্ধে একটানা দু মাস নিঁখোজ থাকার পর ফিরে এলে মায়ের কান্নাকাটি, ঠাকুরমার টানা তিন দিন 'জল স্পর্শ করব না' ইত্যাদির পরও সেই রোমাঞ্চকর চাকরিটি ছাড়েননি। অ্যাডভেঞ্চারের নেশা তাঁর রক্তে। এখন আছেন বাণিজ্যিক সংস্থায়। এখানকার অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ আলাদা। অনেকটা দাবা খেলার মতো। এখানে কর্নেল মনের সাধে ঘোড়ার চালে কিস্তি মাত করে চলেন। কিন্তু জীবনযাপনের কায়দায়, চলায় ফেরায়, সর্বোপরি শিকারের নেশায় কর্নেল চ্যাটার্জী এখনও মিলিটারি লোক রয়ে গেছেন। হাতটা কেমন নিশপিশ করে। এখনও লক্ষ্য স্থির আছে তো? নিশানা? কিছু করতে পারবেন এখনও দরকার হলে? ঘুমের মধ্যে তীর ছোঁড়েন। বন্দুক বাগিয়ে ধরেন। ঘুমের মধ্যে নিক্ষিপ্ত তীর, বন্দুকের গুলি, প্রায়ই পাশের মানুষটির বুকে পিঠে গিয়ে বিঁধত।

'উঃ! উঃ! কী রে বাবা।' ঘুমের মধ্যে সে কাতরে উঠত। কর্নেলের ততক্ষণে হয় ঘুমটা একেবারেই ভেঙে গেছে, তিনি পাশের মানুষটির আঘাত লাগা জায়গাটা ডলে দিতে দিতে বলছেন, 'এইটুকুতেই জখম হয়ে গেলে? আরে বাবা, সম্মুখসমরে তো কখনও যাওনি, যাবেও না!' আর আধো-ঘুম অবস্থায় থাকলে তিনি মটকা মেরে পড়ে থাকতেন। কিছুটা ঘুম ফিরিয়ে আনার জন্য, কিছুটা বা লজ্জায়। এখন পাশের জায়গাটা শূন্য। খুব আশ্চর্যের কথা, এখন কর্নেলের ঘুমের মধ্যে তীর-ছোঁড়ার রোগটা সেরে গেছে। গত দেড় বছরে একবারও, অন্য কারণে হলেও এই কারণে জেগে ওঠেননি।

চাঁদমারি নেই বলেই কী? কথাটা মনে করে দুঃখের মধ্যেও কর্নেলের হাসি পেলো। চাঁদমারিই বটে। শেষ দিকটায় অতসী কঞ্চির মতো রোগা হয়ে গিয়েছিল। শুধু বক্ষ এবং নিতম্ব সামান্য গুরুভার। ছোট্ট মুখটা ভরাট। কপালে একটা নীল শিরা। কেউ বলত অলক্ষণ, কেউ বলত রাজরানী হবার লক্ষণ। কোনটাই মেলেনি। অলক্ষণ? অর্থাৎ বৈধব্য? তিনি এখনও বহাল তবিয়তে বেঁচে আছেন। সে-ই বরঞ্চ অত্যন্ত অসময়ে তাঁকে যেন একটু অস্বস্তিতে ফেলে চলে গেল। আর হবো হবো করেও তিনি কিছুতেই কোম্পানিতে এক নম্বর হতে পারলেন না। চেয়ারম্যান সাহেবের স্তাবকমণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করতে পারেননি বাঙালি হওয়ার দরুন। দ্বিতীয়ত, তাঁর কর্মক্ষমতা, মৌলিকত্ব ইত্যাদি বহুজনের ঈর্ষার বস্তু হয়ে পড়েছিল। কাজেই রাজা, যুবরাজ হওয়া আর হয়ে উঠল না। তবে এ-যুগের বাণিজ্য সংস্থার চেয়ারম্যান যদি বিক্রমাদিত্য হন, তাহলে তাঁর নবরত্নসভার একজন তিনি। নিজের ক্ষমতা ও প্রতিভাবলে হয়েই আছেন। কিন্তু বরাহমিহিরের স্ত্রীকে তো আর কেউ রাজরানী বলবে না। সুতরাং অতসীর কপালের নীল শিরাটা জ্যোতিষীদের সব রকম গণনাকে হারিয়ে দিয়েছে, বা বলা ভালো, ভুল প্রমাণিত করেছে। ক্ষীণতার কারণে ইদানীং কর্নেল স্ত্রীকে অতসী না বলে বেতসী বলে ডাকতেন।

কলকাতা নামক বিকট শহরটির থেকে অন্তত একশ কিলোমিটার দূরে এই নির্জন বনবাংলা বানিয়েছেন তিনি। মাসের দুটো সপ্তাহান্ত অন্তত কাটিয়ে যান। বাংলার গ্রাম যেরকম হয় তার চেয়ে একটুও কম বা বেশি ভালো না জায়গাটা। কিন্তু সব রকম ময়লা, আবর্জনা, অগোছালোপনা, দৈন্য ঢেকে যায় সবুজে। শীতের কটা দিন ধরণী মলিন, কিন্তু আকাশ অথৈ নীল। যেন প্রশান্ত মহাসাগর। রোদ যেন কাঁচা হলুদ বাটা। বাটি উপুড় সেই নীল চাঁদোয়ার দিকে তাকিয়ে থাকো, দেখবে খুশিয়াল মেঘদের পশ্চিম-মেঘ পর্ব। আর দেখবে পারাবতের খেলা। বিকেল বেলার ছাদে দিনশেষের রাঙা মুকুল আকাশ দেখতে এলে আরও দেখবে টানা কুন্দফুলের একটি মালা সমানভাবে দুলতে দুলতে চলে যাচ্ছে। যাযাবর হাঁস না বকেদের দল—বকের পাঁতি। কর্নেলের বনবাংলার থেকে সোয়া কিলোমিটারের মধ্যে রয়েছে একটা বিরাট ঝিল। এলোমেলো তার তটরেখা। কোথাও বাঁধানো পাড় নেই। কচুরিপানার দাম কখনও কখনও ভেসে আসে। আবার ভেসে চলে যায়। ধোপায় কাপড় কাচে, জেলেতে মাছ ধরে, কিছু কিছু লোক চান করে, কিন্তু গাগরিভরণে কাউকে যেতে দেখা যায় না। দূরবীন চোখে নিয়ে কর্নেল দেখেছেন অনেক সময়ে কচুরিপানার দামের পাশ কাটিয়ে তরতর করে পানসি চলেছে। কোমর জলে নেমে খ্যাপলা জাল ফেলে প্রচুর কুচো মাছ তুলছে অল্পবয়সী জেলের ছেলে, কুচকুচে হাতে জ্যান্ত রুপোর কুচিগুলো তুলে পরখ করছে। তারপর সবসুদ্ধ কাঁধে ফেলে চলে যাচ্ছে খুশকদমে। শহরে কর্মজীবনের এবং জীবনযাত্রার একটা ধনুকের ছিলার মতো টানটান ভাব আছে। সব সময়ে শরীরের স্নায়ুতন্ত্রী চড়া সুরে বাঁধা থাকে। যাকে বলে টেনশন। সব সময়ে গেল গেল ভাব। গাড়ি চালাতে চালাতে সামনে 'বাবু, ও বাবু, দিন না' এসে গেল। ঘ্যাঁচ ব্রেক, সেই সঙ্গে দরদর ঘাম, অরেকটু হলেই চলে গিয়েছিল লোকটা চাকার তলায়, গাড়ির চালক জনগণের হাতে, গাড়ি পুলিশের হেপাজতে। ট্যাঁ ট্যাঁ ফোন—'শিগগিরই চলে এসো, মিঠু, হ্যাঁ মিঠুর...

বোধহয় গ্যালপিং হেপাটাইটিস।' 'চেষ্টার ত্রুটি হবে না,' 'নাঃ তোমার তো ডক্টর দাশগুপ্তর সঙ্গে খুব জানাশোনা।' 'আরে বাবা পেলে তো। সব সময়েই ডাক্তাররা আজকাল কনফারেন্সে বিদেশে... দেখছি...।' বুকের মধ্যে টিপটিপ, মিঠু...মিঠু বড়দার একমাত্র নাতনি, ঝুলঝুলে চুল, তুলতুলে মুখ, গ্যালপিং...হে..পা টাইটিস! 'হ্যাললো চ্যাটার্জী' 'কে?' 'হিতৈষী। কংগ্র্যাচুলেশনস।' 'হোয়াট ফর?' 'ফর রিমেইনিং; হোয়্যার ইউ ওয়্যার।' শিট! ফোনটাকে এবার শোবার ঘর থেকে দূর করে দেবেন।

—'দুধে গন্ধ কেন রে? এই গোবর্ধন!'

—'কৌটোর দুধ সাহেব। বাজারে দুধ নেই।'

—'কেন? গরুমোষরাও স্ট্রাইক করেছে নাকি?'

—'খাটাল হঠাও আন্দোলন হচ্ছে না সাহেব! গোয়ালারা তাই...'

...'দমাদ্দম আওয়াজ কিসের, শেষ রাত্তিরে?' জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলেন পাশের ছ তলাটার ওপর থেকে ভাঙা শুরু হয়েছে। ডেমলিশন অর্ডার হয়ে গিয়েছিল, অনেক দিন। ফ্লু-এ ঠিক যেদিন তাঁর সারা রাত মাথায় বোমা পড়েছে আর শেল ফেলেছে, সেই রাতের পর ভোরে প্রথম ঘুমঘোরের সময়টাই ডেমলিশন অর্ডার কার্যকরী করা শুরু হয়ে গেল। এরই নাম শহুরে টেনশন। তাঁদের বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়ির হাতা বেশ খানিকটা। তারপর গাড়ি-বারান্দা। ভেতরের ঘরগুলো উঁচু উঁচু বড় বড়, তবু সে সমস্ত পেরিয়ে, দীর্ঘদিনের অপরিষ্কৃত আবর্জনা-স্তূপের গন্ধ, মিছিলের স্লোগান, রাজনৈতিক বক্তৃতা, পুজোটুজোর হই-হল্লা সবই প্রবেশ করে। তাই এই নির্জন বনবাংলা। শরীর-মন শিথিল, চিন্তাভারমুক্ত, শহুরে ক্লেদ-বর্জিত থাকে কিছুক্ষণ। অতসীরও খুব পছন্দ হয়েছিল বাংলোটা। বিশেষত এই ঝিলের জন্য।

আরও একটা শরীর-মন ঠাণ্ডা করার, চাঙ্গা করার জায়গা আছে তাঁর। সল্ট লেকে। রীমা তরফদারের বাড়ি। রীমা আর রীতা দুই বোন একসঙ্গে একা থাকে। তাদের বাড়ি কর্নেল চ্যাটার্জী চাঙ্গা-ঠাণ্ডা হতে যান মাঝে মাঝে। কোনও নির্দিষ্ট সময় নেই। হঠাৎ একটা ফোন করে দেন আগে থেকে। না হলে ওরা অপ্রস্তুতে পড়তে পারে। অন্য কেউ যদি চাঙ্গা হতে এসে থাকে! রীমা রীতা কর্নেলের অনেক দিনের অভ্যাস। যেহেতু মেজাজসাপেক্ষ এই দেখাশোনা, তাই রোমাঞ্চটা এতদিন পরেও চলে যায়নি। কবে রীতা আর কবে রীমা এটাও একটা মেজাজ অনুযায়ী শেষ মুহূর্তের নির্বাচনের ব্যাপার। সেখানেও তাই রোমাঞ্চ। এক পাশে রীমা, দোহারা সুন্দরী, সপ্রতিভ, বাকপটু, কিন্তু যাকে বলে গ্রেসফুল, অন্য দিকে রীতা, অনেক অল্পবয়স্ক, উচ্ছল,, অশ্লীল, মাদক, সুন্দরী নয়, কিন্তু উত্তেজক। ওখানে ঝিল নেই, আকাশ নেই, বিশৃঙ্খল সবুজ নেই, আছে মরসুমি ফুলের কেয়ারি-করা বাগান, সুইমিং পুলে স্ট্রীপটিজ।

আকাশে ঝটপট ডানার শব্দে চমকে মুখ তুলে তাকালেন কর্নেল চ্যাটার্জী। বকের পাঁতি। খুব নিচু দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। এখন আর কুন্দ ফুলের মালা নয়। গলার লম্বা, পেটের ফোলা, ডানার ঢেউখেলানো চওড়া—সবই দেখা যাচ্ছে। অস্পষ্ট ক্লাক ক্লাক ডাক অবধি শোনা যাচ্ছে। কর্নেল অবাক হয়ে দেখলেন প্রথম মালার পেছনে আরও মালা আসছে, আরও আরও, ছেঁড়া মালা, গোটা মালা। তারপর অদূরে ঝিলের চারপাশটায় সাদা সাদা ফোঁটা পড়তে শুরু করল। ঝিলের একধারটা একেবারে সাদা

হয়ে গেছে। বকগুলো কোন্ সুদূর থেকে এসে তাঁর বনবাংলার সংলগ্ন ঝিলের চারদিকে নেমে পড়েছে। আশ্চর্য তো! তিন বছরের ওপর এ বাড়ি তৈরি হয়ে গেছে, এ দৃশ্য তিনি এখনও দেখেননি। এই বছর এই প্রথম এরা এখানে এলো, না কী? বাইনোকুলার চোখে লাগালেন কর্নেল। ঝিলের ওপরে এখনও বকের দল এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়েনি। এখনও বেশ প্যারেডের ভঙ্গিতে আছে, কেউ কেউ অতি মনোহর ভঙ্গিতে শরীর লম্বা করে ডানা ঝাড়ছে। রোটারি ক্লাব বছরে একবার করে আন্তঃস্কুল পি টি প্রতিযোগিতা করে। মেম্বার হিসেবে এগুলো তাঁকে দেখতে হয়, দেখতে খুব ভালোও লাগে। সাদা গেঞ্জি আর মেরুন শর্টস পরে ছেলেরা মাটিতে সহস্রদল পদ্ম হয়ে যাচ্ছে। আবার নতুন ফর্মেশন। ভারতবর্ষের মানচিত্র। মেয়েরা বেঁটে বেঁটে ডিভাইডেড স্কার্ট আর আলগা ব্লাউজ পরে পিয়ানোর সুরের তালে তালে লাল বলটা এক জনের থেকে আরেক জনের কাছে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে পাঠিয়ে দিচ্ছে। পায়ে নাচের ছন্দ। হাত আর মাথা একদিকে বেঁকিয়ে পাঠাচ্ছে বলগুলো, মাঝে মাঝে একেকটি মেয়ে লাফিয়ে ধরছে বল, ব্লাউজের হাতা উড়ছে পাখনার মতো, অবিকল ওই বক না হাঁসগুলোর মতো। মাথার ওপরে আবার আওয়াজ ক্লাক ক্লাক। চোখ তুলে তাকালেন কর্নেল। ইউনিফর্ম-পরা এক দল স্কুলের মেয়ের মতো উড়ে যাচ্ছে বলাকা। ছাই-সাদা ইউনিফর্ম।

হঠাৎ বহুদিন আগে দেখা এইরকম এক ঝাঁক স্কুল-গার্লের কথা মনে পড়ে যায়। তুলনাটা আজ এতদিন পর একটা বিদ্যুচ্চমকের মতো মনে এলো। তখন মনে হয়নি। সিক লিভে বাড়িতে। প্রতিদিন এই রকম একটা ঝাঁক রাস্তা পার হত। প্রথমে মনে হত সবগুলো এক, আস্তে আস্তে আলাদা করতে পারলেন। কোনটা রোগা, কোনটা মোটা কোনটা দোহারা, কোনটা বেঁটে, কোনটা মাঝারি, কোনটা লম্বা। কেউ দোদুল বেণী, কেউ বব-কাট, কেউ ফর্সা, কেউ কালো, কেউ শামলা। দেখতে দেখতে দেখতে দেখতে চোখ আটকে গেল। আর নড়তে চাইল না। অনবদ্য অনুপম। —'অতসী, এই অতসী, তোর জোগ্রাফির খাতাটা আমায় একবার দিবি!'

—'নে না! এতে আর বলবার কি আছে?'

—'মুখার্জি আঙ্কল বকবেন না তো।'

—'বকবেন কেন?'

—'উনি কপি করা পছন্দ করেন না। শেষকালে যদি ভূগোলেতে গোল।'

—'ধুত্ আমার বাবা, আমি বুঝব, তুই নে।'

দু চারদিন বন্ধুদের স্কুল-ফিরতি হাস্যালাপ থেকে ধরে ফেলা গেল অতসী মুখার্জি, মেয়েস্কুলের ভূগোলের সার অমলেশ মুখার্জির মেয়ে। তখন মার কাছে গিয়ে হ্যাংলাপনা—'দেখেছি পথে যেতে তুলনাহীনারে।' মার চোখ ড্যাবডেবে খুশিতে। সংলাপ আরম্ভ হয়।

অমলেশ মুখার্জি—'দেখুন, অতসী আমার একমাত্র সন্তান।'

মিসেস চ্যাটার্জী—'সী ইজ দা বেস্ট স্টুডেন্ট, দিস স্কুল হ্যাজ এভার প্রোডিউস্ড্।'

অমলেশ মুখার্জি—'মাতৃহীন সন্তান। প্রাণপণে মানুষ করছি। আমার ইচ্ছে ও ডাক্তার হয়। কিংবা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস। এখনই বিয়ে...'

মিসেস চ্যাটার্জি—'বেশ তো। ও স্কুলটা পাস করুক। আমাদের বাড়ি থেকেই

পড়তে পারবে। মা নেই, মা পাবে। আপনিও ছেলে পাবেন।'

সুবিখ্যাত চ্যাটার্জি বংশের গৃহিণী মিসেস চ্যাটার্জি কন্যা প্রার্থনা করছেন জোগ্রাফির টিচার অমলেশ মুখার্জির কাছে, যিনি স্ত্রীলোকহীন সংসারে সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, উচ্চাশী কিশোরী কন্যাকে নিয়ে ভেতরে ভেতরে ব্যতিব্যস্ত। নিজের বা মেয়ের বাড়ি ফিরতে একটু দেরি হলেই ঘর্মাক্ত হয়ে যান দুর্ভাবনায়, অসুখ করলে অসহায়। নিশ্চয়ই ভেবেছিলেন। অনেক ভেবেছিলেন। মেয়ের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। অনেক কথা। যতই বুদ্ধিমতী হোক, যতই উচ্চাশী হোক, সপ্তদশী বই তো নয়। সুতরাং মিসেস চ্যাটার্জির জয়। কর্নেল চ্যাটার্জির জয়। অভিজাত, বনেদী পরিবারের জয়। বৈভব এবং আভিজাত্য ছিল বংশে, বুদ্ধিবৃত্তি এবং সত্যিকারের সৌন্দর্য যোগ হল। এতদিন বাড়িতে রমণীকুল বলতে সোনা এবং হিরেয় মোড়া আলুসেদ্ধ ছিল, এবার এলো স্নিগ্ধ তন্বী দীপশিখা। বিয়েবাড়িতে হই-চই পড়ে গেল। কর্নেল চ্যাটার্জির বুক ক্রমশই ফুলছে। উচ্চমাধ্যমিকে একগাদা লেটার। ন্যাশনাল স্কলারশিপ। জয়েন্টে দুটোতেই সুযোগ ডাক্তারি, এঞ্জিনিয়ারিং।—'তুমি তো বরোদা চলে যাচ্ছো, আমি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়ে যাই?'—'আমি কি একা থাকবো, বরোদায়? দু বছর? ছুটি পাবো না, তার পরই ফ্রন্ট।'—'কিন্তু আমি তাহলে কী করে পড়ব?' 'আরে বরোদায় কি আর কলেজ নেই? ভর্তি হয়ে যাবে।' 'ডাক্তারি? সম্ভব হবে কি করে?' চোখের আলো দপ করে নিবে গেল।

সপ্তদশী অষ্টাদশীদের কুমারী শরীর নতুন জাগে। ঠিক ফোটার পূর্ব মুহূর্তের কুঁড়ির মতো। সোহাগে, অভ্যস্ত, শিক্ষিত, নিপুণ হাতের যত্নে সেই দীপশিখা জ্বালাতে কতক্ষণ। 'বলো, বলো তুমি আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে?' অস্পষ্ট অব্যক্ত কণ্ঠের গোঙানি 'আমি যে কী করি? কী করি? চার পাঁচটা তো বছর...' 'চা-র, পাঁ-চ বছর, নাহ্ অতসী তুমি আমায় একটুও...' পেছন থেকে মুখের ওপর হাত চাপা।

বরোদা। মিলিটারির জিপে করে অতসী কলেজ যাচ্ছে। ইতিহাস পড়ছে। টুকটাক শিখে নিচ্ছে, বাংলো সাজাবার কায়দা, এনটারটেইন করার কায়দা, অফিসার্স ক্লাব, উইমেনস ক্লাবের পার্টি। 'হ্যালো মিসেস চ্যাটার্জি, য়ু আর সো চা-র্মিং, লেটস হ্যাভ এ ডান্‌স।' দূর থেকে সকৌতুকে দেখছেন কর্নেল। উদ্ধার করবার জন্য এগিয়ে যাচ্ছেন না। ওর নাকের ওপর এখন নিশ্চয় চিরঞ্জীব সুদের হালকা হুইস্কি আর কড়া তামাক মিশ্রিত নিশ্বাস। খুব অনিচ্ছুকভাবে পা ফেলছে অতসী। তাঁর সঙ্গিনী মিসেস তলোয়ারকর অবশ্য খুব স্মার্ট। শী ইজ এনজয়িং হারসেলফ। তাঁর নিশ্বাসের গন্ধ মাদাম তলোয়ারকরের ভালো লাগছে। তীব্র পুরুষালি গন্ধ।

গ্র্যাজুয়েশন হতে না হতেই গোল্ডি এসে গেল। সোনালি রঙের বাচ্চা। তাই চম্পক। সে মা যে নামেই ডাকুক না, বাবার আদরের নাম গোল্ডি। 'আহ্ কি বিশ্রী একটা কুকুরের মতো নামে ডাকো।' 'কিস্যুই জানো না, অতসী, আমি ঠিক একেবারে সঠিক নামে ডাকছি।' গোল্ডি সাইকেল চড়ছে, গোল্ডি এয়ার গান চালাচ্ছে, গোল্ডি মারপিট করছে, গোল্ডির মা তার নানান স্বপ্নের কথা বলে চলেছে, রূপকথার মাধ্যমে, উপকথার মাধ্যমে। সোনালি রঙের গোল্ডি বলে—'এই ট্র্যাশ গল্পগুলো তুমি কোথায় পেলে মাম্মি। গোস্টস? হাঁড়ি উপুড় করলেই মিস্টি ঝরবে? মারমেইড, এ সমস্ত

আজগুবি'—'কেন? তোর জিরো জিরো সেভেন, টিনটিন এসব আজগুবি নয়?' 'আজগুবি কেন হবে? ডিফিকাল্ট। কিন্তু অসম্ভব নয়।' বাবা ছেলে একসঙ্গে বলে ওঠে। কর্নেল চ্যাটার্জি বিজয়ীর হাসি হেসে বলেন 'গোল্ডি ইজ হিজ ফাদার্স বয়, নট হিজ মাদার্স বেবি।' গোল্ডি চলে গেল দেরাদুন। চোখ ভর্তি জল, অতসী বলল—'আমি কী করবো, বলে দাও'—'সোশ্যাল সার্ভিস করো, মিসেস তলোয়ারকর যেমন করেন।' 'ধুত্ ওকে সোশ্যাল সার্ভিস বলে? আমাকে একটা মেয়ে দাও।' মেয়ে কি ইচ্ছে করলেই দেওয়া যায়। অনেক কিছু ইচ্ছে করলেই কেড়ে নেওয়া যায়, কিন্তু হাজার চেষ্টা করলেও কিছু কিছু জিনিস দেওয়া যায় না। কর্নেলও দিতে পারলেন না। দুবার নষ্ট হয়ে গেল। শেষেরটা আকার পেয়ে গিয়েছিল একটা। ফর্সা, গার্লচাইল্ড। অতসীর সে কী বুক ফাটা কান্না। সেই একবারই। তারপর অতসী শুকোতে থাকল। অতসী ছায়াময়ী হতে থাকল। মিলিটারি থেকে রিটায়ারমেন্ট নিয়ে যখন তিনি এই শহরে, উঁচুর দিকে ওঠার কাজে ব্যস্ত, তখন অতসী বালিগঞ্জ প্লেসের বিশাল বাড়িতে প্রেতিনীর মতো প্রায় কায়াহীন শূন্য চোখে ঘুরে বেড়ায়। রাজ্যের কুকুর আর বেড়াল জড়ো করেছে, রাস্তার ভিখারি বাচ্চা ডেকে ডেকে খাওয়ায়। বিশেষত মেয়ে দেখলেই। অতএব রীমা রীতার দরকার হল। গোল্ডি ছুটিতে এসে বলে—'মা, কুকুর পুষবে তো ভালো কুকুর পোষো, পেডিগ্রি দেখে, কোত্থেকে এই খেঁকি-নেড়িগুলো জড়ো করেছো?' শান্ত, কিন্তু কেমন একরকম দৃঢ় চোখে চেয়ে অতসী বলে 'আমি যদি থাকি ওরাও থাকবে।' গোল্ডি গার্ল ফ্রেন্ডকে হিরো হন্ডার পেছনে বসিয়ে হু হু করে ছুটে চলে যায়। মাঝরাত্তিরে সামান্য মাদকের গন্ধ মুখে নিয়ে কর্নেল বাড়ি ফেরেন। অতসী, ক্ষীণা, অস্বাভাবিক সাদা বেতসী শোবার ঘরের দরজা খুলে কেমন একরকম চোখে তাকায়, তারপর সযত্নে কর্নেলের জামাকাপড় খুলে বাথরুমের বালতিতে ফেলে এসে, নাইট সুট পরিয়ে দেয়। শুইয়ে দেয়। দরজাটা বন্ধ করবার শব্দ পান কর্নেল। তারপর ঘুমিয়ে পড়েন। সকালে উঠে বুঝতে পারেন পাশটা সারা রাত খালিই ছিল।

'অতসী-ই, বেতসী-ই' কর্নেল চ্যাটার্জি ডাকছেন। নিঃশব্দে চৌকাঠের ওপর এসে দাঁড়িয়েছে অতসী। টাইয়ের নটটা নিজে নিজেই বাঁধতে বাঁধতে আয়নার মধ্যে দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে মুখে নির্মল হাসি নিয়ে কর্নেল বলছেন—'মদ্য তো আমি আগেও পান করেছি, তখন তক-বিতর্ক করতে, তোমার সঙ্গে যুক্তি-তর্কে আমি কখনোই পারতাম না, আফটার অল ইউ ওয়্যার দা ব্রাইটেস্ট স্টুডেন্ট ইয়োর স্কুল হ্যাড সো ফার প্রোডিউসড। কিন্তু এত রাগ তো করতে না।'

আয়নার মধ্যে দিয়ে অতসী চেয়ে আছে। কোনও কথা বলছে না।

'—কি হল? কিছু বলো? দাও-দাও, টাইটা ঠিকঠাক করে বসিয়ে দাও তো!' আফটার শেভের বোতলটা হাতড়াচ্ছেন কর্নেল। মুখ তুলতে তুলতে বলছেন—'কই দিলে না?'

কাকে বলেছেন? আয়নার মধ্যে প্রতিবিম্ব অদৃশ্য হয়ে গেছে।

—'অতসী! অতসী!' রোববারের মরা মরা দুপুর। অতসী চৌকাঠে।

—'চলো আজ তোমার বাবাকে দেখে আসি। চট করে তৈরি হয়ে নাও। সাবিরকে গাড়ি বার করতে বলে দিয়েছি।' অতসী চৌকাঠে এখনও দাঁড়িয়ে।

—'কি হল? যাও!'

—'আমি গতকালই ঘুরে এসেছি।'

—'সে কি? বলোনি তো! সাবির বলেনি তো!'

—'সাবিরকে নিইনি।'

—'সে কি? তোমার এই শরীর, কি ভাবে গেলে। ট্যাক্সিতে?'

—'বাসে।'

—'সে কি? কেন?'

—'বৃদ্ধাবাসে গাড়ি নিয়ে ঢুকতে লজ্জা হয়'—অতসী আর দাঁড়ায়নি।

বাবা যখন অথর্বপ্রায়, শাশুড়ি মৃত, এত বড় বাড়িতে কর্নেল, তাঁর পত্নী এবং ভৃত্যকুল ছাড়া আর কেউ নেই, সে সময়ে কর্নেল-পত্নী বাবাকে এখানে নিজের কাছে এনে রাখতে চেয়েছিলেন। কর্নেল হেসে বলেছিলেন—'এই জন্য তোমার বুদ্ধির তারিফ করতে পারি না অতসী, সংসারে থার্ড পার্সন কখনও আনবে না। বাইরে, অন্য বাড়িতে রেখে তুমি বাবার যত খুশি সেবা-যত্ন কর না! টাকার অভাব হবে না'

কাচের মতো চোখে চেয়ে অতসী বলছে—'আমার তো কোনও টাকা নেই!...বাবার একমাত্র আমিই আছি..'

—'তোমার টাকা নেই! তোমার টা...নাহ্ অতসী, আই অ্যাম ড্যাম্‌ড।'

শহরতলির কোন বৃদ্ধাবাসে জায়গা হয়েছে ভূগোল-শিক্ষক মিস্টার অমলেশ মুখার্জির। তাঁর নিজের সঙ্গতিমতো।

এ সপ্তাহে দেখে গেলেন। পরের সপ্তাহে প্রস্তুত হয়ে আসবেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে, ডানায় হাওয়া কাটার একটা মোহময় সু উ শ্ শ্ শ্ শব্দ শুনতে শুনতে ভাবলেন কর্নেল। অনেক অনেক দিন শিকার হয়নি, কোনও লক্ষ্যভেদ হয়নি। বন্দুকগুলোয় মরচে ধরছে। সাফ করতে হবে ভালো করে। নাকি তীর ধনুক? আর্চারি? এই বিশেষ খেলাটিতে তাঁর বড্ড সুনাম ছিল এক সময়ে। সব সময়ে এক নম্বর।

ফেরবার সময়ে হাইওয়েতে পড়ে মাথায় এলো কথাটা। দুইয়েরই পরীক্ষা হয়ে যাক। তীরন্দাজ এস. পি. চ্যাটার্জি আর বন্দুকবাজ এস. পি. চ্যাটার্জি। সাবিরকে বলতে হবে ওর বউকে নিয়ে আসবে। হাঁসের মাংস পাকায় চমৎকার! একবার খাইয়েছিল। অবশ্য খাওয়াটা জরুরি নয়, জরুরি হল নিশানার পরীক্ষা। গোল্ডিটাও খুব ভালো করছে। ডিফেন্স অ্যাকাডেমিতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ একদম ঠিকঠাক লেগে গেছে সব। যেখানে যা লাগবার। গোল্ডিকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হবে না।

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে, মরা বিকেলের আলোয় ছাদে রিভলভিং চেয়ার নিয়ে বসলেন কর্নেল চ্যাটার্জি। পাশে তাঁর পরিষ্কৃত পাখি মারা বন্দুক, আর গোল্ডেন রিভ্রিভার। সাড়ে চার বছর বয়সের দুর্দান্ত আর এক গোল্ডি। বাচ্চাটাকে দেখে প্রথমেই তাঁর অতসীর কথা মনে পড়েছিল। 'কি একটা কুকুরের মতো নামে ডাকো ছেলেটাকে!' আহা, একেও গোল্ডি বলতেই ইচ্ছে করে তাঁর। কিন্তু ছেলে বাড়ি ফিরে বাবার কাণ্ড দেখে কিছু মনে করতে পারে। যতই যুক্তিনিষ্ঠ, যতই প্র্যাকটিক্যাল হোক। কর্নেল চ্যাটার্জি একে স্কাড বলে ডাকেন, যদিও মনে মনে বলে ফেলেন—গোল্ড, গোল্ডি।

ওই চলে গেল প্রথম সারি। ওরা গিয়ে বসবে ঝিলের ধারে, গাছের ওপর বাসা বাঁধবে, ছোট ছোট টিলা সাদা করে বসে থাকবে। বন্দুকটা হাতে তুলে নিলেন কর্নেল—ডোন্ট কিল এ সিটিং বার্ড। পাখিগুলো অর্ধবৃত্তাকারে উড়ে যাচ্ছে। তাদের কাজল পরা চোখের মতো ডানায় এখন নিচের দিকে টান। একটা...দুটো...তিনটে ...চারটে...দলছুট...চতুর্থটা সামান্য দলছুট। তাতেই নিশানার সুবিধে হয়ে গেল। বুম্‌ম্‌ম্‌...ঘুরতে ঘুরতে লাট খেতে খেতে পড়ছে। যতই নিচে নামছে গতিবেগ বাড়ছে। একদম অব্যর্থ লক্ষ্য। কোথায় লেগেছে গুলিটা তিনি এখনও জানেন না। লক্ষ্য ছিল পেটটার ওপর। ওই জায়গাটাই সবচেয়ে নধর তো! স্কাড ছুটছে, ছুটুক। তিনি তীর-ধনুক তুলে নিয়ে পেছন পেছন ছুটেছেন। পরনে শর্টস, হাফ-হাতা সোয়েট শার্ট, পায়ে হান্টিং শ্যু। ঝিলের কাছটা কাদা জলা। ওখানে এখন পাখিদের মেলা বসে গেছে। ওরা বোধ হয় বুঝতেই পারেনি ওদের একজন সঙ্গী কম পড়ে গেছে। এখন ঝিলের পানা, শ্যাওলা, গেঁড়ি, গুগলি, কুচো মাছ খেতে ভারি ব্যস্ত। কাদার মধ্যে ক্লাক ক্লাক করছে মেলাই।

কিন্তু এখানেও তিনি বসা পাখি মারবেন না। সেই যে শরীরটাকে লম্বা করে দিয়ে অসম্ভব সুন্দর ভাবে ডানা ঝাপটায়। সেই সময়ে, সেই সময়ে ছুটে যাবে অর্জুনের তীর। একটা বিশাল তেঁতুল গাছের পাশে দাঁড়িয়ে শরসন্ধান করলেন কর্নেল, উঠছে, একটা পাখি উঠছে, টানছেন, তিনি ছিলা টানছেন, হঠাৎ কনুইয়ে টান পড়ল : চমকে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলেন লুঙ্গির মতো করে ধুতি পরা মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক।

—'কী করলেন? কে আপনি? হাউ ডেয়ার য়ু?' কর্নেল চ্যাটার্জি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে টকটকে লাল হয়ে গেছেন।

—'আমিও আপনাকে ওই একই প্রশ্ন ফিরিয়ে দিতে পারি। হাউ ডেয়ার ইউ?' সংযত কিন্তু দৃঢ়কণ্ঠে বললেন ভদ্রলোক।

—'এই নির্জন ঝিলের ধারে শামখোলগুলো কতদূর থেকে এসে জিরোতে বসেছে। ঝিলের সৌভাগ্য, আমাদের সৌভাগ্য, আপনারও অশেষ ভাগ্য যে এমন দৃশ্য দেখতে পেলেন। ওরা যেমন চায়, তেমনভাবে হাসতে দিন, খেলতে দিন, বাসা বানাতে দিন, বিশ্রামান্তে নতুন শাবক-দল নিয়ে দূরে আরও দূরে উড়ে যেতে দিন, যেখানে ওদের প্রাণ চায়। কী রাইট আছে আপনার ওদের হত্যা করবার?' ভদ্রলোকের চোখমুখ ক্রমশ তপ্ত হয়ে উঠছে। কর্নেল কিচ্ছু বলতে পারছেন না।

—'এ ঝিলে হঠাৎ শামখোল আসছে, সরকারের কাছে খবর চলে গেছে। শিগগিরই পাহারা বসবে।' ভদ্রলোক আর দাঁড়ালেন না। হনহন করে চলে গেলেন। নইলে দেখতে পেতেন স্কাড তীরবেগে ছুটে এসে কর্নেলের পায়ের কাছে মৃত পাখিটাকে ছুঁড়ে দিচ্ছে। সাদা লম্বা গলা। যৌবনাগমে ধবধবে বুক, বক্র চঞ্চুসমেত মুখটা ডান দিকে নেতিয়ে আছে। ডানা দুটো দুদিকে অসহায়ভাবে ছড়ানো, একটা ভেঙে ঝুলছে। ওইখানেই তাহলে লেগেছিল গুলিটা। খুব সামান্য এক ফালি রক্তের ধারা ডানায়। কর্নেলের চোখে কেমন ধাঁধা লেগে গেল। সাদা শাড়ি পরে কাত হয়ে পড়ে রয়েছে এক বিদ্ধ নারী। এক হাত ছড়ানো, আরেকটা লাল-মাদুলিপরা হাত কনুই থেকে ভাঁজ। দুটি পায়ের পাতা দুদিকে। শেষ শয়ন।

নন্দিতা

'শুনছো? শুনছো? ওঠো না গো একবার!' মাঝরাত্তিরে নন্দিতার ঠেলাঠেলিতে ঘুমটা একেবারে কাচের বাসনের মতো খানখান হয়ে গেল।

'হলটা কী?' ধড়ফড় করে উঠে বসল শুভেন্দু। বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। জানালাগুলো বেশিরভাগই বন্ধ। তা সত্ত্বেও ধারাবর্ষণের তুমুল শব্দ কাচ কাঠ সমস্ত অনায়াসে ভেদ করে ফেলছে।

ভোঁতা, ভারী শব্দ একটা! ভরা শ্রাবণের মধ্যরাত। জ্বালাময় মাঝ-বর্ষার দিনাবসান। ধরিত্রীরও। তার বুকে অবিরাম জীবনধারণের লড়াইয়ে ক্ষতবিক্ষত মানুষগুলিরও। অন্তত্পক্ষে শুভেন্দুশেখরের তো বটেই। গতকাল সকালে ট্রেনেই ফিরেছে তিনদিনের ঝটিকা ট্যুর সেরে, তারপর গেছে অফিস। সেখানে ট্যুর-ক্লান্ত বলে কোন বিশেষ বিবেচনা স্বভাবতই মেলেনি। সন্ধেয় বাড়ি ফেরার লগ্ন থেকেই ঘুমটা আসছিল নেশার মতো। একটা চমৎকার আমেজ, তাকে আরও চমৎকারভাবে জমিয়ে দিল বেশি-করে গাওয়া ঘি-ঢালা নাতিগাঢ় মুগের ডালের খিচুড়ি আর পাটিসাপটার মতো কি জানি কিসের পুর ভরা দুর্দান্ত ওমলেট। বর্ষারাতের সেই জমজমাট ঘুম এইভাবে কেউ ভাঙায়? ঠেলে ঠেলে! অল্প ঠেলায় হল না দেখে ধাঁই ধাঁই করে রামধাক্কা মেরে?

'শুনতে পাচ্ছো না?' নন্দিতা কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল।

'কী শুনতে পাবো?' ঘুমে ভারী, বিরক্ত গলায় শুভেন্দু বলল।

'কুকুরটা কী ভীষণ কাঁদছে!' অন্ধকারে মনে হল নন্দিতাও কাঁদছে। গলার স্বরটা যেন আধা-বিকৃত।

অবিরাম বর্ষণের ভারী আওয়াজ ভেদ করে এই সময়ে কোনও চতুষ্পদ প্রাণীর ডাক শুনতে পাওয়া গেল। করুণ সাইরেনের মতো ধাপে ধাপে সুরে চড়ল ডাকটা, তারপর আবার খাদে নেমে এলো। কেঁউ কেঁউ কেঁউ কেঁউ কেঁউ, অতঃপর ভিন্ন রাগিণীতে শুরু হল আলাপ।

'ঘুমোতে না পারো, একটা কাম্পোজ খেয়ে শুয়ে পড়ো', শুভেন্দু আবার ঝুপ করে শুয়ে পড়ল।

'ঘুমোতে না পারার কথা হচ্ছে না'—নন্দিতা আর্তগলায় বলে উঠল—'কুকুরটা যে ভয়ানক কাঁদছে। ওকে এই দারুণ বৃষ্টির মধ্যে ছাদে বেঁধে রেখে দিয়েছে। তা ছাড়া...নন্দিতার কথা শেষ হল না, শুভেন্দু প্রায় খেঁকিয়ে উঠল 'তো আমি কী করবো?' কথাগুলো কেটে কেটে প্রত্যেকটাতে বেশ খানিকটা রাগ ভরে ভরে সে বলল। কদিন ধরে এ এক মহা উৎপাত শুরু হয়েছে। তাদের দোতলা বাড়ির পরেই একটা ছোট জমি ঘেরা পড়ে আছে। তারপর এক পুলিশ ইনসপেক্টরের বাড়ি। ভদ্রলোকের খুব জন্তু-জানোয়ারের শখ। খরগোশ, গিনিপিগ থেকে আরম্ভ করে ছাগল, গরু, এমন কি বাঁদর পর্যন্ত পোষা হয়ে গেছে। তা পুষুন, কেউ আপত্তি করছে না। কিন্তু পোষা প্রাণীগুলোর কোনও যত্নই ওঁরা করেন না। খরগোশ, গিনিপিগগুলোকে গুণ্ডাগুলো এসে এসে খতম করে গেল। ছাগলিটা যে কদিন দুধ দিল, দিল। তারপর ভদ্রলোক স্বহস্তে তাকে কেটে খেয়ে ফেললেন। গরুটা বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে দিবারাত্র হাম্বা হাম্বা করত, গলার দড়ি

কখনও খোলা হত না, তার কী গতি হল তাদের কারুরই জানা নেই। আর বাঁদরটার লক্ষ্য ছিল এ পাড়ার যতেক গৃহস্থ-বাড়ি। নিজের মালিকের কাছ থেকে যথেষ্ট খেতে পেত না কিনা কে জানে, কিন্তু পাড়ায় হেন বাড়ি নেই যেখান থেকে সে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ভোজ্য সংগ্রহ না করেছে। ক্লাইম্যাক্স হল শুভেন্দুর শার্ট পাঞ্জাবির বোতাম ভক্ষণ। কেউ কিছু বলতে সাহস পায় না। পুলিশের দারোগা, ওরে বাবা, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। তবে ইদানীং ভদ্রলোক যা শুরু করেছেন সত্যিই সহ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে। একটার পর একটা দারুণ সুন্দর দামী কুকুর আনছেন আর অযত্ন-অবহেলা দিয়ে কয়েক মাসের মধ্যেই মেরে ফেলছেন। শুভেন্দু আর অতশত জানবে কোত্থেকে, নন্দিতাই জানায়। জানালায় দাঁড়িয়ে প্রাণপণে ইশারা করে শুভেন্দুকে ডাকে—'দেখো দেখো দেখে যাও।' দারোগার বাড়ির উঠোনে একটা ছোট ডোল, তাতে গিন্নি এঁটো কাঁটা সব এনে ফেলে দিলেন, তারপরেই ডাক দিলেন 'আঃ আঃ টমি, আঃ আঃ!' আপাদমস্তক টান-টান চব্বিশ পঁচিশ ইঞ্চি উঁচু একটা গ্রে-হাউন্ড অপরূপ ভঙ্গিতে এগিয়ে এলো। ভদ্রমহিলা তাকে এঁটোকাঁটাগুলো খাওয়াবার জন্যে ক্রমাগত তাড়না করছেন, আর অভিজাত বংশীয় গ্রে-হাউন্ডটা ক্রমাগত তার লম্বা সরু চকচকে মুখটা ফিরিয়ে নিচ্ছে। গ্রে-হাউন্ডটা বোধহয় মরে গেল তবু পাত-কুড়োনো মুখে দিল না এবং কুকুরটা মরে গেল তবু তার মালিকরা তাকে তার যোগ্য খাদ্য দিলেন না। একটা চমৎকার স্প্যানিয়েল গেল আপাদমস্তক ঘা হয়ে। চুলকোতে চুলকোতে কুকুরটা যেন ক্ষেপে যেত একেক সময়ে। সারা শরীর থেকে খাবলা খাবলা লোম উঠে, দগদগে ঘা নিয়ে প্রচণ্ড লাফিয়ে উঠে সামনের থাবায় মুখ দিয়ে শুয়ে পড়ল, উঠল না আর। কোথা থেকে ভদ্রলোক এতো সুন্দর সুন্দর পেডিগ্রি-ডগ জোগাড় করেন কে জানে। পুলিশের লোক, কোথা থেকে আর! মিনি-মাগনা পায় বলেই বোধহয় আরও এতো অচ্ছেদ্দা। কী জিনিস পেয়েছে জানেই না। লেটেস্ট হচ্ছে একটা ডালমেশিয়ান। অপরূপ কুকুর। নন্দিতা জানলার কাছ থেকে নড়েই না—'দ্যাখো দ্যাখো, কী সুন্দর ঘুরে বেড়াচ্ছে!' সাদার ওপর কালো কালো গোল গোল ছিট, আবার ভালো চামড়ার কলার, এবার বোধহয় দারোগার মক্কেল কলার সুদ্ধুই উপহার দিয়েছে। কুকুরটা খুব সম্ভব পূর্ণ বয়স্ক। পোষ মানতে চাইছে না। পোষ মানাবার উপায় হিসেবে দারোগাবাবু থার্ড-ডিগ্রি প্রয়োগ করেছেন। 'টমি—কাম হিয়ার।' ভদ্রলোকের সব কুকুরই টমি! টমি আসছে না, লম্বা হিলহিলে চাবুকের বাতাস কাটার শব্দ সুইশ্‌শ্‌শ। নন্দিতা কানে আঙুল চেপে বসে পড়ে। 'টমি সিট ডাউন।' এবারও টমি আসছে না, আবারও চাবুক নামছে। এবার নন্দিতা জ্ঞানশূন্য হয়ে জানলার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে—'অ মেসোমশাই, মেসোমশাই'। তার তীক্ষ্ণ সরু গলাও ভদ্রলোকের মোটা কানে পৌঁছতে দেরি হচ্ছে! অবশেষে অবাক হয়ে দারোগা মেসোমশাই মুখ তুলে তাকিয়েছেন। কস্মিনকালেও নন্দিতা তাঁর স্বামীর সঙ্গে মাসি-বোনঝি সম্পর্ক পাতায়নি। অতএব অবাক।

'মারবেন না, প্লীজ, অমন করে মারবেন না!' আকুলি-বিকুলি করতে থাকে নন্দিতার চোখের কোলে টলটলে জল। অতশত হয়ত দেখতে পাচ্ছেন না মেসো, কিন্তু কেমন হতবুদ্ধি হয়েই হাতের বেতটা ফেলে দিয়ে উঠে যাচ্ছেন। উঠোন ছেড়ে ভেতরে। ঘরের আশ্রয়ে।

সেই অবাধ্য ডালমেশিয়ানেরই এখন এই দুর্গতি হয়েছে। দোতলার ছাদে উপর্যুরস্ত বৃষ্টির তলায় আশ্রয়হীন। কোথাও ছুটে পালিয়ে যাবে তার উপায় নেই। বাঁধা। নন্দিতা অনেক কষ্টে চোখের জল চাপতে চাপতে বলল,'তুমি তো কদিন ছিলে না, জানো না। রোদে জলে ওকে একভাবে বেঁধে রেখে দ্যায়। নিজেরা নিশ্চিন্তে খাচ্ছে, দাচ্ছে, ঘুমোচ্ছে। আমরা ঘুমোতে পারছি না! খাবার মুখে রুচছে না! ওদের দেখো হেল-দোল নেই!' কেঁউ কেঁউ কেঁউ— আবার বৃষ্টি ছাপিয়ে কুকুরের ডাক ভেসে এলো! নন্দিতা বলল, 'ওর নিশ্চয় অসুখ করেছে, খুব কষ্ট হচ্ছে, যাও না একবার প্লীজ।'

শুভেন্দু অবাক হয়ে বলল, 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? ওদের পাড়ায় সবাই ভয় পায়, এড়িয়ে চলে, আমি মাঝখান থেকে কুকুর ডাকছে বলে এই রাত্তিরে গিয়ে কমপ্লেন করবো?'

'ওহ্, বুঝতে পারছ না, কুকুর ডাকছে বলে নয়!' নন্দিতার গলা যেন রুদ্ধ হয়ে যাবে 'কুকুরটা কষ্ট পাচ্ছে বলে। বৃষ্টিতে! রোগে!...' সে আর কিছু বলতে পারে না, ঝরঝর করে কাঁদতে থাকে।

শুভেন্দু বলে, 'একটা কুকুর কষ্ট পাচ্ছে বলে, এই দুর্যোগের রাত্তিরে তুমি আমাকে বাড়ি-ছাড়া করবে? জানো কত জন্তু-জানোয়ার, জন্তু-জানোয়ার ছেড়ে কত মানুষ নিরাশ্রয় ঠিক এখন, এই মুহূর্তে। বৃষ্টিতে উড়ে গেছে, কার খড়ো চাল, জল জমে ভেসে গেছে গেরস্থালি...'

শুভেন্দুর কথা শেষ হল না, হঠাৎ নন্দিতা দড়াম করে এক লাফ দিল বিছানা থেকে মাটিতে। ছুটতে ছুটতে গিয়ে দরজার খিল নামাল। তারপর বাইরে বেরিয়ে গেল।

অগত্যা শুভেন্দুকেও উঠতেই হয়। খোঁজ কোথায় টর্চ, কোথায় বর্ষাতি, কোথায় ছাতা! নিচে নেমে সে অবাক হয়ে দেখল সদর দরজা খোলা। হু হু করে বৃষ্টির ছাট ঢুকছে। নন্দিতা এই রাত্তির দেড়টায় জলের মধ্যে একাই বেরিয়ে গেছে।

কোনক্রমে বর্ষাতি টর্চ আর ছাতা সামলাতে সামলাতে প্রতিবেশীর বাড়ির দরজায় সে যখন পৌঁছল ততক্ষণে সে-বাড়ির দরজাও খুলে গেছে। চৌকাঠের এপারে সোঁপাটে ভিজে নন্দিতা, ওপারে টর্চ হাতে লুঙ্গি-পরিহিত ভুঁড়িয়াল দারোগা, 'দোহাই আপনারা কিছু করুন, কিছু করুন মেসোমশায়, কুকুরটা যন্ত্রণায় কতরাচ্ছে, ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে ওর, কিছু করুন!'

দারোগা বললেন, 'আপনি তো আচ্ছা জাঁহাবাজ মহিলা দেখছি। আমার স্ত্রী বলেন বটে জানলা থেকে যখন তখন স্পাইং করেন, আমার কুকুর আমি মারি কাটি আপনার কী? ইয়ার্কি পেয়েছেন?' শেষ কথাটা উনি শুভেন্দুর দিকে চেয়ে বললেন।

শুভেন্দুর ভেতরটা রাগে জ্বলে যাচ্ছে নন্দিতার ওপরও, দারোগার ওপরও। সে যথাসাধ্য মোলায়েম করে বলল, 'আসলে কি জানেন, আমার স্ত্রী কুকুর ভীষণ ভালবাসে, একটু দেখুনই না। এতো করে বলছে যখন।'

কড়া চোখে তার দিকে তাকিয়ে দারোগা হাঁক দিলেন— 'হারু, হারু, ঢ্যাপলা। ছাতা নিয়ে একবার ওপরে যা দিকিনি; দ্যাখ তো টমিটা কেন এতো চেঁচাচ্ছে!'

দুটো ছায়ামূর্তি ছাতা নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছে দেখা গেল। দারোগা বললেন, 'দেখুন মশাই, এক পাড়াতে থাকি, বিপদে আপদে নিশ্চয় একে অপরের সহায়। কিন্তু

পরের ব্যাপারে খামোখা এভাবে নাক গলালে মেয়েছেলে বলে মান রাখতে পারব না। আসুন আপনারা। আসুন এবার...।' গলাটা শেষের দিকে আরও কড়া।

এই সময় একটি ছায়ামূর্তি টর্চের আলোর বৃত্তের মধ্যে দৃশ্যমান হয়ে পরম সন্তোষের সঙ্গে বলল, 'বাবা, টমি আর চেঁচাচ্ছে না, কেমন দাপাচ্ছিল, কাটা পাঁঠার মতো, এখন চুপ করে শুয়ে পড়েছে।'

নন্দিতা ফিসফিস করে বলল, 'মরে গেছে। সে স্খলিত পায়ে পিছন ফিরে বাড়ির দিকে চলতে লাগল। বৃষ্টিতে ভিজে শাড়ি পায়ের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। দড়াম করে আছাড় খেল একটা। শুভেন্দু তাকে তুলে ধরে, কোনমতে বাড়ি নিয়ে আসে, সেই রাতে গরম জল করে ব্রান্ডি দিয়ে খাওয়ায়, পরদিন সকাল না হতেই টেটভ্যাকের খোঁজে ছোটে। হাঁটুর কাছে বেশ খানিকটা কেটে গেছে। দুটো স্টিচ। সে এক কাণ্ড!

নন্দিতা ডাকসাইটে কুকুর-প্রেমিক বলেই যে এমনটা ঘটল না তা কিন্তু নয়। নন্দিতা কুকুর দেখতে ভালবাসে, পুষতে মোটেই নয়। সে কোনও জন্তু-জানোয়ার পাখি-টাখি পোষবার আদৌ পক্ষপাতী নয়। ওসব আবদার তার নেই। বলতে গেলে কোনও আবদারই তার নেই। আপন খেয়ালে বইপত্তর, ক্যাসেট-ফিল্‌ম নিয়ে থাকে, ভালো ভালো রান্না করে, করে দু পক্ষের বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনকে খাওয়ায়। খুব মিশুকে। যেখানে যায় হেসে গল্প করে, মজা করে একগাদা বন্ধু বানিয়ে ফেলবে। এরকম একটা স্টিমার পার্টির জমায়েতে হাসি-খুশি উচ্ছল স্বভাবের প্রাণবন্ত মেয়েটিকে মাস্তুল ধরে পাক খেতে খেতে একটার পর একটা কবিতা আবৃত্তি করতে দেখেই একেবারে ঘাড়মোড় ভেঙে প্রেমে পড়ে গিয়েছিল শুভেন্দু। আর বিয়ের পর তো নন্দিতা একটা অভিজ্ঞতা। এত স্বতঃস্ফূর্ত তার আবেগ! ভালোবাসা ও আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ এমন জমকালো! এমন হৃদয়ের দু কূল ভাসিয়ে নেওয়া প্লাবনের মতো উত্তাল! যে শুভেন্দু মনে মনে গোপনে জানে এমনটা বোধ হয় আর হয় না। এবং সে অতি ভাগ্যবান! বিশেষত সে বাপ-মা মরা, মামার বাড়িতে এবং পরে হোস্টেলে মানুষ। স্নেহ-ভালোবাসা-আদরের জন্য কতটা কাঙাল সে ছিল, বিয়ের পর নন্দিতার প্রবল স্রোতে ভেসে যেতে যেতে ভালো করেই বুঝতে পারে। ওই এক দোষ, একে কী বলবে শুভেন্দু বুঝতে পারে না। খামখেয়ালি না সেন্টিমেন্টাল! না ওই পরের ব্যাপারে নাক-গলানোর আদিখ্যেতা! কী বলবে একে সে সত্যিই জানে না।

রোজই অফিস থেকে ফেরবার সময়ে এক বুক আনন্দ নিয়ে ফেরে শুভেন্দু। সে জানে যতই কলিগের সঙ্গে মনোমালিন্য হোক, ডিরেক্টর যতই বাঁকা চোখে তাকাক, গুচ্ছের নীরস অর্থহীন কাজের জন্যে তাকে যতই ছোটাছুটি করাক এরা, বাড়িতে তার জন্যে অসাধারণ কিছু অপেক্ষা করে আছে। দরজা খুললেই চমকে উঠবে হলুদ শাড়ি, শ্যাওলা সবুজ চুলের সেই মেয়ে কাজলবিহীন কাজলা চোখে এমন চাওয়া চাইবে, দাঁত ঝিকিয়ে এমন হাসি হাসবে যে সহস্র মানুষের সহস্র রকম দুর্ব্যবহার, হাজারখানা সমস্যার উদ্যত মুখ সব বাঁশির নাচনে সাপের ফণার মতো নুয়ে পড়বে। তারপর বেতের হালকা চেয়ারে মুখোমুখি বসে চা খাওয়া, ঝুপঝুপ সন্ধে নামছে, আলো জ্বলছে। সারাদিনের জমা কথা ফুটছে টুকটাক, দু একটা গানের কলি, একটা ধূপ জ্বেলে

দেওয়া। ঘাড় ফিরিয়ে একটু ভ্রূভঙ্গি—শুনতে এইটুকু কিন্তু এরই মধ্যে যে কী অসামান্য রস ভরা থাকে তা শুভেন্দু ছাড়া কেউ কি জানবে?

কিন্তু কোনও একদিন ওইরকম প্রত্যাশার সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে যদি হাসির চমক না দেখে? সারা শরীরে শোকের ছাপ, যেমন-তেমন মলিন শাড়ি, বিকীর্ণমূর্ধজা, মেঘে-ভরা আকাশের মতো বর্ষণোন্মুখ চোখ।

'কী হয়েছে নন্দিতা?'

'কিছু না। এসো।'

চা খাওয়া হয়, চায়ের সুগন্ধের সঙ্গে ফিলটার-সিগারেটের গন্ধ মিশতে থাকে। সন্ধে উত্তীর্ণ হয়ে যায়। যন্ত্রচালিত দুটো হাত ধূপ জ্বেলে দেয়। হাতের মধ্যে যেন কোনও আগ্রহ নেই। রাত্তির হয়, খাবার বাড়া হয়। কথা-বার্তা, হাসি-ঠাট্টা, চোখের-আঙুলের, ঠোঁটের আদর ছাড়া খাবার বিস্বাদ মনে হয়, কিন্তু বারবার জিজ্ঞেস করে করেও উত্তর পাওয়া যায় না।

'কী আবার হবে? কিছু না।'

রাত্রে বোঝে নন্দিতা জেগে আছে। কিন্তু কোনও গভীর শোকে সে অনমনীয়, তাকে এখন ছোঁয়া যাবে না।

পরদিন খবর জানল রাস্তায় বেরিয়ে। দু-তিন বাড়ি পরে থাকে অভিলাষদা, তার স্কুল-পড়ুয়া ন'দশ বছরের ছেলেটি মারা গেছে। একেবারে হঠাৎ। স্কুলেই অসুস্থ হয়ে পড়ে, বাবাকে তার অফিসে খবর দেওয়া হয়েছিল, বাবা আসতে আসতেই সব শেষ। কেন, কী বৃত্তান্ত ভালো বোঝাই যাচ্ছে না।

ক'দিন পরে শুভেন্দু বলে— 'চলো নন্দিতা, উট্রাম ঘাট থেকে ঘুরে আসি।' উট্রাম ঘাটে যেতে, জেটির ওপর দাঁড়িয়ে আঁচল ওড়াতে, গোল রেস্তোরাঁয় খেতে নন্দিতা ভীষণ ভালোবাসে।

কিন্তু নন্দিতা শূন্য চোখে চেয়ে বলে—'কী লাভ?'

'কিসের কী লাভ?'

'এভাবে কোথাও বেড়াতে গিয়ে? বা কিছু সে যাই হোক না কেন, করে? কী লাভ? টুবলুর মতো একটা কচি ছেলে যদি এভাবে বিনা বাক্যব্যয়ে... তো কী লাভ? তুমিই বলো?'

রাত্তিরে নন্দিতা গভীর শোকে গুমরে গুমরে কাঁদতে থাকে, যেন তার নিজেরই সন্তান গেছে।

আস্তে আস্তে মেঘ কাটতে থাকে, নন্দিতা স্বাভাবিক হয়, যদিও বৎসহারা জননীর এক গভীর, গভীরতর অসুখ সে যেন তার জীবনযাপনের ভেতরে চিরকালই বহন করে যাবে বলে মনে হয়। সবচেয়ে ভয় এবং আশ্চর্যের কথা এরও বেশ কয়েক মাস পরে শুভেন্দুর মাসতুত বোনের বিয়েতে নেমতন্নে গিয়ে, খাওয়া-দাওয়া হবার আগেই সে শুভেন্দুর হাত ধরে এসে,—'চলো এক্ষুনি চলে যাবো।'

'কেন? কী হল?' সুন্দর সিল্কের শাড়ি-পরা অলঙ্কৃত বউয়ের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে শুভেন্দু।

'শুনতে পাচ্ছ না শানাই বাজছে?'

'বিয়ে বাড়িতে তো শানাই বাজবেই।'

'আমি সইতে পারি না যে! টুবলু যেদিন চলে গেল, সেদিন সারা দিন সারা রাত দূর থেকে শানাইয়ের সুর ভেসে এসেছিল। আমার... আমি সইতে পারি না।'

টুবলুর মৃত্যু খুবই মর্মান্তিক। একশবার। কিন্তু টুবলুদের সঙ্গে নন্দিতার কোনও যাওয়া-আসাই ছিল না। টুবলুর সঙ্গে সে জীবনে দুবার কথা বলেছে কি না সন্দেহ।

অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে, নন্দিতাকে আগে থেকে কিচ্ছু না বলে বাড়ি পালটে ফেলার ব্যবস্থা করে শুভেন্দু। একটু শহরতলির দিকে। মস্তানি-ফস্তানি আছে নাকি একটু আধটু। কিন্তু চার ফ্ল্যাটের নতুন দোতলা বাড়ি। গেটে নন্দিতার পছন্দের মাধবীলতা থোকা থোকা দুলছে। নির্মল আকাশ দেখা যায়। রেললাইনের ধারে সাঁঝের বাজার বসে। সেখানে হরেক রকম টাটকা মাছ, সবজি পাওয়া যায়। একেবারে হাতের কাছে।

নন্দিতা প্রথমে গুঁইগাঁই করেছিল। তার আবার পুরনো বাড়ি, উঁচু উঁচু সিলিং, রাশি রাশি জানলা-দরজা, এ সব ভাল লাগে। সে ছাদে উঠে গনগনে রোদে কাপড় শুকোতে দেবে, আবার কালবৈশাখী এলে ঝড়ের হাওয়ায় উথালপাথাল হতে হতে কাপড় তুলে আনবে। দুমদাম দরজা জানলার আওয়াজ, ঘুলঘুলিতে চড়ুইপাখির বাসা, পাঁচিলের ফাটলে অশ্বত্থগাছ এ সবই তার ভারি পছন্দের জিনিস। কিন্তু শুভেন্দুর এক গোঁ। সে এ বাড়ি ছাড়বেই। বউয়ের খামখেয়ালের জন্যে নতুন বাড়িতে থাকতে পাবে না নাকি সে তাই বলে? আচ্ছা বউ তো তার! তখন নন্দিতা অগত্যা হেসে ফেলে। দৌড়োদৌড়ি করে সব গুছিয়ে তুলতে থাকে। কী ফেলে যাবে, কী নেবে, কী নতুন কিনবে তার হিসেব-নিকেশ করতে করতে একটা শালিখনী কি চড়ুইনীর মতোই মহা ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ওঠে। দেখতে দেখতে শুভেন্দুর বুকের ভেতরটা আনন্দে শিরশির করতে থাকে। 'নন্দিতা, আ-নন্দিতা অ-নন্দিতা' সে গলা ছেড়ে ডেকে ওঠে।

আগেকার পছন্দটাকে আঁকড়ে ধরে নতুনের সব কিছু বরবাদ করে দেবে এমন মেয়েই নয় নন্দিতা। নতুন বাড়িটা তার ভারি ভালো লেগে যায়। ফিকে লাইল্যাক রঙের দেয়ালে যামিনী রায়ের গণেশ-জননী টাঙাতে টাঙাতে সে দুদ্দাড় করে ছোটে প্লেনের আওয়াজ শুনে, জানলার গ্রিল ধরে চেয়ে চেয়ে দ্যাখে, বলে, 'ভালোই হল বলো। আজকাল এয়ারপোর্টে ঢুকতে যা খরচ, এত কাছ থেকে বেশ নিখরচায় প্লেন দেখা যাবে। কী আওয়াজ! যেন আমাদের বাড়িতেই নেমে পড়বে মনে হয়!' শুভেন্দু পায়ের ওপর পা তুলে মৃদু মৃদু হাসে। বিজয়ীর মতো।

'তুমি আর বড় বড় কথা বলো না! আসতেই তো চাইছিলে না!'

'তা অবশ্য সত্যি গো!' নন্দিতা কাঁচুমাচু মুখে অকপটে স্বীকার করে, 'আগের বাড়িটা আমার ভীষণ মায়াবী বাড়ি ছিল! পুরনো বলে আমি কেমন খারাপ বাসতে পারি না। অন্যে পছন্দ করছে না দেখলে আমার যেন আরও মায়া বসে যায়! এ বাড়িটা একটু নিচুও। কিন্তু দেয়ালগুলো? সাটিনের মতো! আর জানলা দিয়ে মাধবীলতার ভিউটা দা-রুণ।' অতএব সে খুব চটপট নতুন বাড়ি মনের মতো করে গুছিয়ে ফেলে। লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে, হেসে কুটোপাটি হয়ে, বরের গাল চটকে, কান কামড়ে। খুব তাড়াতাড়ি বাকি তিন প্রতিবেশীর সঙ্গে আলাপ-টালাপও সেরে ফেলে। সন্ধেবেলায় উৎসাহের চোখে দু

চার সিঁড়ি টপকে টপকে উঠতে উঠতে শুভেন্দু আহ্লাদে আটখানা হয়ে শোনে তার বাড়ির জানালা দিয়ে নির্ভুল ভাবে গান ভেসে আসছে—'পিয়া বিন রয়না নহী জায়'। সে বেল বাজিয়ে দরজা খুলতে না খুলতেই বলে ওঠে 'পিয়া বিন রয়না যাবার কোনও সম্ভাবনা আপাতত নেই। পিয়া হাজির।'

কিন্তু সবচেয়ে বিপজ্জনক নন্দিতামিটা তার বউ এখানেই করে ফেলল। এগুলোকে আজকাল শুভেন্দু নন্দিতামি বলে, আর কোনও নাম বা সংজ্ঞা খুঁজে না পেয়ে। সন্ধের শোয়ে এসপ্লানেড পাড়ায় ছবি দেখতে গিয়েছিল। একেবারে খেয়ে বাড়ি ফিরছে। দুজনেরই খুব মেজাজ খুশ। সারা রাস্তা বাসে বসে বসে ফিলম্‌টার পিণ্ডি চটকেছে দুজনে আর হেসে খুন হয়েছে। তাদের বাড়ি যেতে হলে একটা পাক খাওয়া গলি পড়ে। গলিটা এড়িয়েও যাওয়া যায়, তবে তাতে ভীষণ ঘুর হয়ে যায়। গলিপথে কিছুটা এগোবার পর একটা চাপা বচসার আওয়াজ শুনতে পেল ওরা, তারপরেই সামনে যেখানে মোড়, গলিটা দু-ভাগ হয়ে ডাইনে বাঁয়ে চলে গেছে সেইখানে টিমটিমে আলোয় একটা জটলা, কয়েকটা তীক্ষ্ণ গালাগাল তারপর একটা ছোরা ঝলসাতে দেখল ওরা। শুভেন্দু কিছু বুঝে ওঠার আগেই জ্যা-মুক্ত তির কিংবা বলা উচিত বুলেটের মতো বেগে নন্দিতা তার পাশ থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। শুভেন্দু দেখতে পেল উদ্যত ছোরা হাতে এক বিশাল চেহারার ঝাঁকড়াচুলো মস্তান, তার পেছনে আরও কিছু দলা-পাকানো লোক, অপরদিকে মাথা নিচু করে এক হাত ওপরে তুলে আঘাত এড়াবার ভঙ্গিতে এক ছোকরা। উভয়ের মাঝখানে লাল শাড়ি পরা নন্দিতা একটা ছোট্ট হাইফেনের মতো, কিংবা ছোট্ট একটা ফুলকির মতো। 'না, না খবরদার না' সে চিৎকার করে বলছে, 'খবরদার মারতে পারবেন না।' নিমেষের মধ্যে ছোকরা ডানদিকের গলি দিয়ে দৌড়তে দৌড়তে বেরিয়ে গেল, মস্তানের চোখে আগুন, ছোরা নেমে আসছে।

ব্যস, শুভেন্দু আর কিছু দেখেনি, জানে না। তার সামনে নিকষ আঁধার। যখন আবার দেখল, দেখতে পেল গলির মোড় শূন্য, সে বসে পড়েছে, নন্দিতা বলছে, 'কী হল তোমার? ওঠো! শিগগির বাড়ি চলো।' শুভেন্দু অবাক হয়ে দেখল তার বউ অক্ষত আছে।

কোনক্রমে বাড়ি ফিরে, দরজায় ভেতর থেকে একটা তালা লাগাল শুভেন্দু। ভারী একটা কৌচ এনে দরজায় ঠেস দিয়ে রাখল। নন্দিতা বলল, 'কী করছ?'

শুভেন্দু গম্ভীরভাবে বলল, 'এতে কিসুই হবে না। দু-চারখানা লাথিতেই ভেঙে পড়বে। তবু ডুবন্ত মানুষ তো কুটোগাছটাও আঁকড়ে ধরে।'

'তার মানে? কে লাথি মারবে?'

'কেন? ওই যাদের নোংরা কাজিয়ার মধ্যে তুমি তোমার নির্বোধ নাকটি গলিয়েছিলে? খুব ভাগ্য ভালো যে তোমাকেই খুন করেনি বা...'

নন্দিতা বলল—'তাই বলে, আমার চোখের সামনে মানুষ মানুষকে খুন করবে আর আমি কিছু বলব না তা তো হয় না, হতে পারে না।'

'আর যদি আক্রোশে তোমাকেই খুন করত?'

'খুন হয়ে যেতাম, কেউ না বাঁচালে।'

'আর যদি রেপ করত?'

'রেপই হয়ে যেতাম। নিজেকে রক্ষা করতে না পারলে বা কেউ না রক্ষা করলে!' তবে এসব ভাবিনি তখন, দেখেছিলাম দুটো মানুষ, একজনের হাতের ছুরি অন্যজনের ওপরে নেমে আসছে, মাঝখানে দু-আড়াই ফুটের মতো ফাঁকা জায়গা, ওইটুকু ছাড়া আর কিচ্ছু দেখিনি, কিচ্ছু ভাবিওনি।'

কী ভয়ানক! কী ভয়ঙ্কর ভয়ানক! এ মেয়েটা ভাবে না পর্যন্ত! শুভেন্দু ভাবল, এবং ভাবতেই থাকল, ভাবতেই থাকল। অফিস যাবার সময়ে বেরোতে বেরোতে ভাবে, বাড়ি ফেরবার সময়ে ফিরতে ফিরতে ভাবে। গলিতে কদাচ নয়। তথাপি ভয়। আর কিছু না হোক বাড়ি গিয়ে কী দেখবে এই ভেবে ভয়। যার জন্য এত ভয় ভাবনা সেই নন্দিতা কিন্তু একদম স্বাভাবিক। দোকান-বাজার যাচ্ছে, দরজা হাট করে খোলা রেখে বাসনওয়ালির সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছে, হাসি গান গল্প। দিব্যি আছে।

কদিন পরে শ্যামবাজারের মোড় থেকে বাসে উঠছে, হঠাৎ কাঁধের ওপর একটা ভারী হাত পড়ল। একেবারে চমকে উঠেছে শুভেন্দু।

'কী রে শুভ?'

মুখ ফিরিয়ে চেয়ে শুভেন্দু খুশিতে ফেটে পড়ল, 'আরে রমেন না?'

'চিনতে পেরেছিস তাহলে!'

ভিড়ের মধ্যে থেকে সন্তর্পণে তাকে বার করে আনতে আনতে রমেন বলল।

'তোকে কখন থেকে ডাকছি, গাড়ির মধ্যে থেকে শুনতেই পাচ্ছিস না। অনেকক্ষণ থেকে তোকে ফলো করতে করতে আসছি। চল্ ওইদিকে গাড়িটা পার্ক করেছি। শুভেন্দু একমুখ হেসে বলল—'কবে ফিরলি?'

'বছর খানেক। যতীন্দ্রমোহন অ্যাভেনিউয়ের মুখে চেম্বার করেছি। আয় না, দেখে যাবি। আমি অবশ্য এখন চেম্বার বন্ধ করে বেরোচ্ছি।'

শুভেন্দু বলল, 'ঠিকানাটা দে, অন্য একদিন যাব। আজ না। বউ বাড়িতে একা রয়েছে। জায়গাটা ভালো না।'

'বিয়ে করেছিস? কবে?' রমেন উৎসাহিত হয়ে উঠল।

'বছর তিনেক হল।'

'তো চল্, তোর বউ দেখে আসি। নেমতন্নটা তো একেবারেই মিস করে গেছি দেখছি।'

'যাবি? খুব ভালো হয় তাহলে।'

রমেন তার ক্রিম রঙের মারুতি ভ্যানের দরজা সরিয়ে দিল। তারপর বলল—

'আমি পিঠে হাত রাখতে ওরকম ঘাবড়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেলি কেন রে?'

'ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিলুম বুঝি?'

'হ্যাঁ, একেবারে চমকে উঠলি।'

'আর বলিস না, এই বউটা আমার মাথা খারাপ করে ছাড়বে।'

'কী ব্যাপার?'

গাড়িতে যেতে যেতে শুভেন্দু তখন ব্যাপারটা বলল। শুনে রমেন হাসতে লাগল।

অন্যদিন শুভেন্দুর ফিরতে ফিরতে সন্ধে হয়ে যায়। আজ রমেনের গাড়িতে অনেক তাড়াতাড়ি হয়ে গেল। দরজা খুলে দিল বাসনমাজার মেয়েটি। 'কে রে?' নন্দিতার গলা শোনা গেল। মেয়েটি চেঁচিয়ে বললে— 'দাদাবাবু।'

'ওমা, তুমি এতো সকালে!' বলতে বলতে শোঁ-ও-ও করে নন্দিতা এসে হাজির হল। পরনে চুড়িদার-কুর্তা। ওড়নাটা কষে কোমরের সঙ্গে বাঁধা। আঁটসাঁট করে একটা বিনুনি বেঁধেছে। পায়ে রোলার স্কেট। এ বাড়িতে কোথাও চৌকাঠ নেই, রোলার স্কেট পায়ে চড়িয়ে নন্দিতা ঘর থেকে ঘরান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

একবার শোঁ করে পেছনে গড়িয়ে আরেকবার দ্বিগুণ শোঁ করে সামনে গড়িয়ে এসে নন্দিতা রাজকীয় সালাম জানাল রোলার স্কেটের ওপর থেকে 'আইয়ে জনাব'। পরক্ষণেই পিছনে অপরিচিত মুখ দেখে ভড়কে গিয়ে পড়তে পড়তে টাল সামলে নিতে নিতে তার পশ্চাদ্‌পসারণ। একেবারে রান্নাঘরের মধ্যে 'ক্‌কী কাণ্ড!' একটু পরে খালি পায়ে ওড়না দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকে সে বলল। মুখে লাজুক-লাজুক হাসি।

রমেন বলল, 'কেন, বেশ তো ছিলেন, বাহনের ওপর থেকে নেমে এলেন কেন?'

নন্দিতা মুখ ঢেকে হেসে উঠল।

শুভেন্দু বলল, 'এই হল আমাদের রমেন। রমেন দা গ্রেট।'

'বাস? ওইটুকুতেই ইনট্রোডাকশন হয়ে গেল?' রমেন বলল।

'এর চেয়ে বেশি বলতে হবে না, বুঝলেন?' নন্দিতার হাসি-হাসি মুখ, 'আপনি প্রায়ই আমাদের দুজনের মাঝখানে বসে থাকেন, তা জানেন?'

'সুদূর লন্ডনে বাস করে আপনাদের মাঝখানে... আমি কি ভূত-টুত নাকি?'

'আরে, ও বলতে চাইছে তোকে নিয়ে আমাদের মধ্যে গল্প-সল্প হয়। এই আর কি!'

'তাই নাকি, বাঃ।' রমেন খুব খুশি হল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নন্দিতা দশভুজা হয়ে উঠল। প্রথমেই একদফা চা-বিস্কুট দিয়ে গেল। চা টা শেষ হতে না হতেই কিসের বড়া গরম গরম ভেজে এনেছে, তার সঙ্গে আবার চা। তার পরে ছানার পুডিং হাজির করল, সেটা শেষ হলে বলল— 'মুখটা মিষ্টিয়ে গেল না কি? কুচো নিমকি খাবেন?'

রমেন বলল, 'তাই বলি শুভটা রোগা-প্যাংলা ছিল বরাবর, এমন গায়ে-গতরে হয়ে উঠল কী করে? এই-ই তার সিক্রেট?'

নন্দিতা বলল—'ওসব বললে শুনছি না, আপনি আজ খেয়ে যাচ্ছেন।'

রমেনের সমস্ত আপত্তি হাওয়ায় উড়িয়ে দিল নন্দিতা। তারপর সে এই সদর দরজা খুলে ছুটে যাচ্ছে সম্ভবত বাজারে, এই আবার প্রতিবেশীর ফ্ল্যাটে, রান্নাঘরে যাচ্ছে একবার, পরক্ষণেই সে এসে বসছে, গল্পে যোগ দিচ্ছে। এমনি করে রাত নটা নাগাদ সে গা ফা ধুয়ে একটা জমকালো পোশাকি শাড়ি পরে, কপালে টিপ, পুরো চুল খোলা খেতে ডাকল ওদের। হাত বাড়িয়ে বিরিয়ানি দিচ্ছে ওদের প্লেটে, তখনই শুভেন্দু এবং রমেনও লক্ষ্য করল জিনিসটা। ডান হাতের তলার দিকে আড়াআড়ি একটা চওড়া লালচে দাগ।

—'ওটা কী? কী হয়েছে?' শুভেন্দু শিউরে উঠে জিজ্ঞেস করল।

হাত উলটে নন্দিতা-দাগটা দেখল, একটু অবাক হয়ে বলল, 'তাই জ্বালা-জ্বালা

করছিল। ও কিছু না।'

কিছুতেই সে আর কিছু বলল না।

'দারুণ খেলাম' রমেন হাত ধুতে ধুতে বলল।

'আবার যাতে আসেন তাই চেষ্টা-চরিত্র করে ভাল খাওয়ালাম।' নন্দিতার জবাব, 'বিরিয়ানি রাঁধলাম, জামদানি পরলাম আপনার অনারে, আর এই নিন।'

সে মুঠোভর্তি কাঁটালি-চাপা ফুল রমেনের দুহাতে উপুড় করে দিল। ফুলগুলো নিয়ে যাবার জন্যে একটা পলিথিনের প্যাকেটও এনে দিল রাবার ব্যান্ড সুদ্ধু।

রমেন বলল, 'রোলার স্কেট না পরেই তো আপনি হানড্রেড মাইল স্পিডে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন দেখলুম। ওটার দরকার হয়েছিল কেন?'

নন্দিতা চারদিকে কেমন বিহ্বল চোখে চেয়ে মৃদু হাসল, বলল— 'কেন জানেন না? শোনেন নি, সেই

"জলের কলে টিপ, টিপ
টিপ্ টিপ্
আমরা বলেছিলাম যাবো
সমুদ্রে।
নদী বলেছিল যাবে
সমুদ্রে।
আমরা বলেছিলাম যাবো
সমুদ্রে।
আমরা যাবো।"

বলতে বলতে মুখটা উলসে উঠল তার।

নিচে গিয়ে গাড়িতে উঠতে উঠতে রমেন বলল—'দারুণ কাটল রে সন্ধেটা। চলি। আবার দেখা হবে। তারপর স্টিয়ারিঙে হাত রেখে হেসে বলল— 'তোর বউটা একটা পাগলি।'

কী বলতে চাইল রমেন? শুভেন্দু ওপরে উঠতে উঠতে ভাবতে লাগল। তারপর থেকে প্রতি দিনই কাজের ফাঁকে ফাঁকে মাথার মধ্যে কথাটা তাকে আঘাত করে যায়— 'পাগলি, তোর বউ একটা পাগলি।' কেন এ কথা বলল রমেন? পাগলি কথাটা লোকে আদর করে বলে আপনজনকে। 'দূর পাগলি!' আবার বিরক্ত হলে বলে, 'কী পাগলামি করছো?' কিন্তু 'তোর বউটা একটা পাগলি।' কী প্রকৃত মানে এই কথার? শুভেন্দু তার বউ নিয়ে গর্বিত। তিন ঘন্টার মধ্যে লাফঝাঁপ করে বানিয়ে দিল, বিরিয়ানি, ফিশ তন্দুর, ফ্রায়েড চিকেন। নিজেই বাজার গেল, এ বাড়ি ও বাড়ি থেকে কী মালমশলা সংগ্রহ করল কে জানে, কিন্তু বানিয়ে তো দিল! অরেঞ্জ-চকলেট রঙের ওই শাড়িটা পরে কপালে লম্বা টিপ, আধ কোঁকড়া চুল খুলে যখন খাবার টেবিলে পরিবেশন করছিল? সম্রাজ্ঞীর মতো। ম্যাজিশিয়ানের মতো যখন হাতের মুঠো থেকে কাঁটালি চাঁপাগুলো বার করল? কিংবা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা ঠিক কথা বলার মতো করে বলে উঠে একটা চমৎকার ছোট গল্পের মতো শেষ করল শুভেন্দুর বাড়িতে রমেনের প্রথম আসার দিনটা!

অথচ প্রতিক্রিয়ায় 'তোর বউটা একটা পাগলি!' এ কথা কেন বললি রমেন? ভেবে বললি? হঠাৎ বিদ্যুৎচ্চমকের মতো শুভেন্দুর মনে পড়ে যায় নন্দিতার ডান হাতের সেই চওড়া কালশিটের দাগ, কদিন আগে যা লাল ছিল, মনে পড়ে যায় বৃষ্টির রাতে ছুটে যাওয়া, 'কুকুরটা কী ভয়ানক কাঁদছে গো!' মনে পড়ে যায় মস্তানের উদ্যত ছুরির তলায় লাল শাড়ি পরা স্ফুলিঙ্গের মতো নন্দিতাকে, শানাই ভাল লাগে না যার, শানাই শুনলে যে বিষাদের অতলান্তে তলিয়ে যায় সেই নন্দিতাকে। শুভেন্দু আর দেরি করে না।

অফিসে আজ খুবই দেরি হয়ে গেছে। তবু সে শ্যামবাজারের মোড় থেকে চট করে বাস ধরে না। চলে যায় যতীন্দ্রমোহন অ্যাভেনিউ। ডক্টর রমেন বাগচির চেম্বারে।

নিজের নাম পাঠিয়ে দিয়ে ওয়েটিং রুমে বসে শুভেন্দু। চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক একটি লাল-চোখ তরুণকে নিয়ে বসে আছেন। ছেলেটি যেন ঘুমঘোরে রয়েছে। ঘোর ভাঙলেই সে ভয়ঙ্কর কিছু একটা করে ফেলবে। আরও দুজন সঙ্গী রয়েছেন ভদ্রলোকের। বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মাঝে মাঝে এসে চুপি চুপি কথা বলে যাচ্ছেন। শুভেন্দুর পাশেই বসে আরেক জন, শুভেন্দুর থেকে বড় হলেও যুবকই। তাঁর সঙ্গে একটি খুব সুন্দরী বউ। এতো সুন্দর, কিন্তু যেন বিষাদপ্রতিমা। দেখলে মনে হয় নৈরাশ্যের সিন্ধু থেকে উঠে এল বুঝি। শুভেন্দুর বাঁ পাশে একটি অল্পবয়সী ছেলে। চোখে চশমা। ধারালো মুখ। সে শুভেন্দুর সঙ্গে যেচে আলাপ করল। —'কিছু মনে করবেন না দাদা, আপনি কার জন্য এসেছেন?'

শুভেন্দু কী বলবে ভেবে পেল না। সে কি সত্যি-সত্যিই নন্দিতার জন্যে এসেছে? নন্দিতা কি...

'এসেছি এক নিকট আত্মীয়ার ব্যাপারে', ধরি মাছ না ছুঁই পানি করে বলল শুভেন্দু।

'আপনি'?

'আমার নিজের জন্যে।' ছেলেটি খুব সুন্দর হেসে বলল, 'অনেকের ধারণা সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে খালি মনোরোগীরাই আসে। ধারণাটা ঠিক নয়। অনেক রকম ডিজঅর্ডার আছে জানেন তো? আমার কথাই ধরুন না কেন। দুবার ডাবলু বি সি এস দিয়েছি। র‍্যাঙ্ক ভাল আসেনি তাই আবার দিচ্ছি। এবার বুঝলেন...হয় এসপার নয় ওসপার। তো যা-ই পড়তে যাই মনে মধ্যে ঝমঝম করে কবিতা বাজে, এখান থেকে এক লাইন ওখান থেকে এক লাইন, ধরুন 'দাওয়ায় বসে জটলা করে পূর্বপুরুষেরা' কি 'তোমায় আজি রেখে এলেম ঈশ্বরের হাতে' কি 'অবর্তমান তোমার হাসি ঝাউয়ের ফাঁকে/আমায় গভীর রাত্রে ডাকে—ও নিরুপম, ও নিরুপম ও নিরুপম' বলতে বলতে ছেলেটি উত্তেজিত হয়ে উঠল। সটান উঠে দাঁড়িয়ে ভাবগম্ভীর গলায় আবৃত্তি করতে শুরু করে দিল যেন এটা মঞ্চ :

মন্দ ভাল নেইকো কিছুই, আকাশ মাথায়
বাউল-বাউলি দাঁড়িয়ে থাকায়,
নিম ঘোড়ানিম আকাশ ফুঁড়ে কৃষ্ণ-কিরিচ ফাঁসিয়ে রাখায়,
থই থই থই সমুদ্র জল তাথৈ তাথায়,
ওপর নিচে ডাইনে বামে আমার থেকেই আমায় ভাগায়...আমায়
ভাগায়...আমায় ভাগায়

শুভেন্দু আশেপাশে তাকাল। সবাই ভয়ের চোখে ছেলেটির দিকে তাকাচ্ছে। সুন্দরী মেয়েটির চোখ ভর্তি জল। লালচোখ ছেলেটি লম্বা সীটের ওপর শুয়ে পড়ছে। রমেনের অ্যাসিস্ট্যান্ট মেয়েটি এসে ডাকল, 'কৌস্তুভ সেনগুপ্ত।' কবি ছেলেটি তাড়াতাড়ি চেম্বারে ঢুকে গেল। শুভেন্দুর হঠাৎ ভয় করতে লাগল। ভীষণ ভয়। এ সব যেন তার চেনা। এ লাল চোখ সে দেখেছে 'খবর্দার মারতে পারবেন না' বলে যখন ঝলসে উঠেছিল। ওই বিষাদ-প্রতিমা নয়ন-ভরা জল, দিনে রাতে দেখতে দেখতে এক সময় সে মরিয়া হয়ে গিয়েছিল। আর এই রকম মিঠে হাসি, চোখ দুটো হঠাৎ উধাও হয়ে যাওয়া, এই রকম... ঠিক এই রকম... ঠিক! ভয়ে অধীর হয়ে উঠল সে। উঃ। কখন তাকে ডাকবে রমেন?

অ্যাসিস্ট্যান্ট মেয়েটি একটা ছোট্ট নোট পেপারে লেখা একটা চিঠি এনে দিল।

'শুভ, একটু বোস ভাই। পেসেন্টদের ছেড়ে দিয়েই তোর সঙ্গে বেরোব।'

রমেন, রমেন তুই জানিস না, শুভ তোর সঙ্গে মজা মারতে, ইয়ার্কি দিতে আসে নি। তার বাড়িতে ভীষণ বিপদ। খুব বিপন্ন একজনের জন্যেই আজ সে তোর কাছে ছুটে এসেছে।

ঠিক এক ঘণ্টা বারো মিনিটের মাথায় শেষ রোগীটি বেরিয়ে গেলে, শুভেন্দুর ডাক পড়ল।

'কী ব্যাপার বল্? চা খাবি তো? না কফি, মায়া একটু কফি বানাও ভাই।' অ্যাসিস্ট্যান্ট মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রমেন বলল।

'আরে দূর তোব কফি' শুভেন্দু বলল, 'আমি ভীষণ সমস্যায় পড়ে এসেছি।'

'তোর আবার কী সমস্যা? ফাস্ট ক্লাস আছিস!' রমেন পাত্তাই দিল না।

শুভেন্দু বলল, 'তোকে পষ্টাপষ্টি জিজ্ঞেস করছি রমেন, নন্দিতা আমার বউ কী অস্বাভাবিক, মানে অ্যাবনর্ম্যাল?'

রমেন ঝুঁকে বসে আশ্চর্য হয়ে বলল, 'সে কী? একথা কেন বলছিস?'

শুভেন্দু বলল—'সেদিন ওর ডান হাতে একটা লাল দাগ দেখেছিলি, মনে আছে? সেটা কী জানিস? স্কেলের বাড়ি। আমাদের নিচের ফ্ল্যাটের ভদ্রমহিলা মেরেছেন।'

'বলিস কী রে? এফ. আই. আর. কর, এফ. আই. আর. কর। ডেঞ্জারাস মহিলা তো!'

'আরে, আগে সবটা তো শোন!'

'বল, আয়্যাম অল ইয়ার্স।'

'নিচের ফ্ল্যাটের ভদ্রমহিলার একটি হাবাগোবা ছেলে আছে। বছর বছর ক্লাসে ফেল করে। তা করবে না তো কী? পেনসিল পেন খাতা-বই এ সবেরও শ্রাদ্ধ করে ছেলেটা!'

'করবেই! তার কি সেন্স আছে!'

'সেটাই। তো ভদ্রমহিলা ছেলেটাকে এরকম কিছু ঘটলেই আচ্ছা করে পেটান। তুই যেদিন গেলি সেদিন সকালে নাকি নন্দিতার ভাষায় অমানুষিক পেটাচ্ছিলেন। ছেলেটার চিৎকার শুনতে পেয়ে ও ছুটে যায়, দুজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্রহারে বাধা দেবার চেষ্টা করে, স্কেলের বাড়িটা ছেলের ওপরই নামছিল, নন্দিতার হাতের ওপর পড়ে।'

'তাই বল্' স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে রমেন বলল।

শুভেন্দু বলল, 'ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলা আমার কাছে গম্ভীর মুখে নালিশ করে গেলেন, আমার স্ত্রী ওঁদের পারিবারিক ব্যাপারে নাক গলাচ্ছে বলে। যখন নালিশ জানাচ্ছিলেন, তখন নন্দিতা বাজার গেছিল। ফিরে এসেছে, ওঁরা দেখতে পাননি। নন্দিতা চোখ গরম করে বলল, আপনারা যদি টুটুকে পেটানো বন্ধ না করেন আমি পুলিশে খবর দেব, হাতে হাতকড়া পরিয়ে ছাড়ব, জেনে রাখবেন। সে কী চেহারা রে, যেন বাঘিনী!'

রমেন হাসতে হাসতে বলল—'তো কী। ভালই করেছে তো! সন্তানের দ্বারা বাবা-মাকে ডিভোর্স করার আইনটা পাশ হয়ে গেলে ভালই হয়।'

শুভেন্দু বলল, 'আরও শোন', সে পূর্বাপর আজ অবধি যা ঘটে গেছে সবগুলো বলে গেল, তারপর অভিযোগের স্বরে বলল, 'তুইও তো প্রথম আলাপেই আমার বউটাকে পাগলি বললি। বলিস নি!'

—'বলেছিলুম বুঝি!' রমেন হাসতে লাগল। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, 'তা তোর কী বলার আছে বল্!'

'বলবার আর কী আছে? আমি তোর কাছ থেকে প্রফেশন্যাল ওপিনিয়ন চাইছি। অ্যাডভাইসও।'

রমেন হাতের আঙুলগুলো মন্দিরের মত চুড়ো করতে করতে বলল, 'দ্যাখ শুভ, আমাদের শাস্ত্রে বলে সেন্ট পার্সেন্ট নর্ম্যাল লোক খুব কম। আসল হল ব্যালান্স। মানে ভারসাম্য। এই ভারসাম্যটা যদি এদিক ওদিক হেলে একটু কম বেশি হয়ে যায় তো...মানে বুঝেছিস? এক চুলের তফাত!'

আতঙ্কিত চোখে তার দিকে চেয়ে শুভেন্দু বলল—'তা হলে?'

'ধুর—ঘাবড়াচ্ছিস কেন?' হালকা গলায় হেসে উঠল রমেন 'ঘাবড়াবার আছেটা কী? মেডিক্যাল সায়েন্স যে এত উন্নতি করল, প্রযুক্তি বিজ্ঞান যে আজ কোন্ চুড়োয় উঠে গেছে, এসব কি ঘাবড়াবার জন্যে? ম্যান ইজ অলমোস্ট গড নাউ। সামান্য... খুব সামান্য একটু মেডিকেট করলেই নন্দিতা ঠিক হয়ে যাবে। আমি তোকে বেস্ট ওষুধ দিচ্ছি আমার স্যাম্পল থেকে।' সে খসখস করে একটা প্রেসক্রিপশন লিখল, তারপর ড্রয়ার খুলে বেছে বেছে কয়েক পাতা ওষুধ বার করে দিল। দু রকম ওষুধ। খাওয়াবার নিয়মটা বলে দিল। তারপর বলল, 'তিন বছর বিয়ে হয়েছে বললি, না? এবার একটা বাচ্চা বানিয়ে ফ্যাল। দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে।'

অবাক চোখে চেয়ে নন্দিতা বলল—'ওষুধ? ওষুধ খাব কেন?'

'আরে খাওই না! আমি তো তোমার স্বামী, না শত্রু? বিষ ফিষ দেব?'

'না, তা নয়। তবে কন্ট্রাসেপটিভ পিল ফিল আমি আর খাচ্ছি না।'

সে তো নয়ই। এবার মেটার্নিটি হোম, কাঁথা, ভ্যাকসিনেশন, ওঁয়া ওঁয়া শুরু হয়ে যাবে, আমার দুঃখের দিন এল বলে।'

নন্দিতা হেসে ফেলে—'বাঃ বাঃ, কী হিংসুক!'

'এবার লক্ষ্মী মেয়ের মতো ওষুধটা খেয়ে নাও দিকি!'

'কিসের ওষুধ বলবে তো?'

নার্ভের, বাবা নার্ভের, নার্ভ শান্ত রাখবে। মন ঠাণ্ডা থাকবে, হবু জননীর আদর্শ

মানসিক অবস্থার সূচনা হবে।'

'সত্যি? কই দাও।' অনাবিল বিশ্বাসে নন্দিতা হাত বাড়ায়। সকালে, বিকেলে, রাত্রে। সকালে, বিকেলে, রাত্রে। সকালে, বিকেলে, রাত্রে।

তৃতীয় দিন অফিস থেকে সে ফোন করল রমেনকে।

'কেমন আছে রে, নন্দিতা?'

'পার্ফেক্ট। থ্যাংকিউ থ্যাংকিউ ভেরি মাচ।'

'নিজেকেই থ্যাংকসটা দে। তোর ডায়গনোসিস, আমার প্রেসক্রিপশন', রমেন বলে, 'ঠিক আছে, চালিয়ে যা এখন কিছু দিন।'

সন্ধেবেলায় অফিস থেকে ফিরলে দরজা খুলে দেয় পরিষ্কার ফিটফাট নন্দিতা।

দুজনে চা আর ডালমুট নিয়ে গল্প করে।

'জানো, আজকে নন্দিনীকে খুব দিয়েছি।'

'তাই?'

'সোজা বললুম—আপনি ভদ্রভাবে কথা বলতে জানেন না, আগে শিখুন, তার পরে বলবেন।'

'ওমা!'

'একেবারে চুপসে গেল, জানো? প্রোমোশনের চিঠি আমার হাতে। কী বলবে আর!'

'ঠিকই।'

'এবার বোসকেও ধরব। যত রদ্দি মার্কা টুর সব আমাকেই করতে হবে। বললেই বলবে ঠেসে টি এ বিল দেবেন কোম্পানিকে। ভালোই তো।' যেন আমি ফলস্‌ টি.এ. বিলের এক্সপার্ট। আমার ফ্যামিলি লাইফ বলে, প্রাইভেট লাইফ বলে কিছু থাকতে নেই। সব অপমানের শোধ এবার তুলব।'

'দাঁড়াও, প্রেশারের তিনটে হুইশ্‌ল হয়ে গেল' নন্দিতা চলে যায়। অনেকক্ষণ আসে না আর।

সান্ধ্য চান সারতে সারতে শুভেন্দুর হঠাৎ মনে হয় নন্দিতা তো কই 'নন্দিনীকে খুব দেওয়া'র প্রসঙ্গে উত্তেজিত হয়ে উঠল না। বলল না তো—'আহা, ওরকম রূঢ় ভাবে বললে কেন?' জিজ্ঞেসও তো করল না কিসের প্রোমোশন। কেন প্রমোশন!

কাজের মেয়েটি চলে গেলেই গোটা ফ্ল্যাটটাতে তারা একা। সেই সময়ে নন্দিতা কোন কোন দিন এসে তার কোলের ওপর ঝুপ্‌ করে বসে পড়ে, গলা ধরে দোল খায়। বলে—'জানো, তোমার ঘামে একটা কাটা ফলের মতো গন্ধ বেরোয়। প্লিজ, আরেকটু পরে চান-কোরো।' কাঁধের ওপর মুখ রাখে নন্দিতা। 'দেখো, ভিড় বাসে মেয়েদের সিটের সামনে দাঁড়ালেও, কখনও কোনও মেয়ে তোমার দিকে নাক কুঁচকে তাকাবে না। মেয়েদের আসলে নাকটাই খুব, বোধ হয় সবচেয়ে জোরালো। বুঝলে?' তারপর শুভেন্দুর নাকে নিজের নাকটা ঠেকিয়ে বলে— 'তাই বলে যেন তুমি আবার বাসে মেয়েদের কাছে এটা পরীক্ষা করতে যেও না। খবরদার।' চোখ পাকিয়ে তর্জনী তোলে নন্দিতা।

তা সেসব তো কই কিছুই হয় না! স্নাতক শুভেন্দু পত্র-পত্রিকা নিয়ে স্পোর্টস চ্যানেল খুলে বসে থাকে। সাহেবরা অক্লান্ত গল্‌ফ খেলে যায়। গলফ খেলে যায়।

সামনে দিয়ে নানান কাজে যাতায়াত করে নন্দিতা। কখনও কুশনের ওয়াড় পালটাচ্ছে, কখনও টেবিল মুছছে। টি.ভি.-র গায়ে চুম্বক লাগানো ছোট্ট মূর্তিটা ওপরের দিকে ছিল, নিচে সরিয়ে দিল। হেঁকে বলল একবার—'গান শুনবে? চালাব কিছু?' কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে নটার সময়ে টেবিলে ধোঁয়া ওঠা গরম খাবার। তারপর একটু টিভি দেখা। নিবিড় ঘুম। রাতে কোনও দিন হয়ত 'বলো হরি, হরিবোল' যায়। বাড়ি কেঁপে ওঠে হরিধ্বনির চোটে। শুভেন্দু জেগে যায়। এই বুঝি নন্দিতা ঝপাং করে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নাঃ। নন্দিতা নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। কোন দিন মাঝ রাত্তিরে রেললাইনের ধারে দু-দলের বোমাবাজির শব্দে রাত যেন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। নন্দিতা কাছে এসে কাতর গলায় বলে না—'ইস্‌স্‌ দেশটা দিন দিন কী হয়ে যাচ্ছে, কতগুলো টাটকা তাজা ছেলে এভাবে হারিয়ে যাচ্ছে।' নন্দিতার স্নায়ু খুব শক্ত শান্ত হয়ে গেছে। সে নিবিড় ঘুম ঘুমোচ্ছে।

এমনকি, অফিস যাওয়ার সময়ে খেতে বসে অনেক সময়ে শুভেন্দু টুটুর তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনতে পায়। ডাক্তার বলে দিয়েছে, ওর মস্তিষ্ক অপরিণত, ও পারবে না। তবু ওর মা ওকে ঠেঙাচ্ছে। শুভেন্দু উৎকর্ণ হয়ে থাকে। টুটুর জন্যে ততটা নয় যতটা নন্দিতার জন্যে। তার ভাব লক্ষ্য করে নন্দিতা নিঃশব্দে পাতে আর একটু ভাত তুলে দেয়, বলে, 'খেয়ে নাও। শুনে কী করবে? করতে তো পারবে না কিছু। ওদের ছেলে ওরা বুঝবে।'

কাছেই কারও বাড়ি বিয়ে, সকাল থেকে শানাই বাজছে, ভয়ে ভয়ে অফিস যায়, অফিস থেকে ফেরে শুভেন্দু। চোখের সামনে সেই সুন্দরী মেয়েটির ছবি ভাসছে। বিষাদ প্রতিমা, নয়ন ভরা জল। ভয়ে ভয়ে দরজায় বেল দেয়। সর্বনাশ, কেদারা ধরেছে এবার! কেদারা! কেদারা সইতে পারে না নন্দিতা। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে, বলে, 'টুবলু, আমার টুবলু চলে গেল, উঃ, ওকে তোমরা নিয়ে যেও না, নিয়ে যেও না। ফিরিয়ে দাও।' দরজা খুলে যায়। নন্দিতা শুভেন্দুর মুখের দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বলে, 'কী হল তোমার? শরীর খারাপ করছে? ভেতরে এসো। যা গুমোট চলছে।'

শরবৎ এনে দেয়। ভিজে গামছা দিয়ে কপাল, ঘাড়, হাত-পা সব মুছিয়ে দেয়। ফ্যানটা পুরোদমে চালিয়ে দিয়ে সামনে বসে থাকে। 'কী গো? ঠিক আছো তো? না ডাক্তার বলব!'

ওদিকে মন প্রাণ নিংড়িয়ে কেদারের সুর ওঠে নামে। নন্দিতা যেন বধির হয়ে গেছে।

রমেন ফোন ধরেছে—'হালো, হালো। শুভ? বউ ঠিক আছে তো?'

—'একদম ঠিক ভাই, একদম।'

'তো এইবার একটা... বুঝলি তো? শুধুই দুজন করিব কূজন আর নয়...'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, সে ঠিক আছে, বুঝেছি, বুঝেছি।'

চাঁদনি রাত। শ্রাবণের চাঁদ। যদি দেখা গেল না তো গেলই না। কিন্তু যদি দেখা গেল তো সে তার রুপোলি মদ দিয়ে তোমাকে মাতাল করে দেবে একেবারে। তখনই বোঝা যাবে এ চাঁদ নীল আর্মস্ট্রং-এর নয়, এ চাঁদ সুকান্ত ভট্টাচার্যেরও নয়। এ সেই আদি অকৃত্রিম কবি মহা-কবিদের রাকা শশী। চাঁদনি। হেনার উগ্র সুবাস সঙ্গে নিয়ে

সেই চাঁদনি ঘরের মধ্যে ঢুকছে। একটা ফিকে রঙের ফ্রিল দেওয়া দেওয়া রাত জামা, যেন ওই চাঁদেরই ফেনা! নন্দিতা ঘুমোচ্ছে। মাতোয়ালা শুভেন্দু মৃদু মথিত মন্দ্র স্বরে ডাকছে—'নন্দিতা, নন্দিতা, কই এসো।'

নন্দিতা কি জাগবে না? এমন ডাকেও জাগবে না? আবার ডাকে শুভেন্দু, আবার, আবার।

নন্দিতা জাগছে। খুলে গেছে তার চোখের পাপড়ি।

নন্দিতা আসছে। কিন্তু ও কী?

আসছে আহত জন্তুর মতো। গুঁড়ি মেরে। নিজেকে টেনে টেনে।

শিঙালের রাত-চেরা আকাঙ্ক্ষার ডাকে হরিণীর ঠ্যাঙের তুরুকে নয়। নিবে গেল বুঝি পৃথিবীর কোটরের সৃজনী আগুন। বাঁধের মধ্যে ঘুমিয়ে গেছে দুর্দান্ত নদী। না চাইতেই দু কূল ভরে আর দেবে না। তার পুরুষের বুকের তলায় নন্দিতা যান্ত্রিক, উদাস, অসাড় হয়ে থাকে। অবিকল এই পৃথিবীর মতো।

মিসেস তালুকদারের বন্ধু

মিসেস তালুকদারের কোনও বন্ধু নেই। কী করেই বা থাকবে? বন্ধুতা করতে গেলে নিকটত্ব চাই। ঘনিষ্ঠতা যদি নাও হয়, অন্ততপক্ষে একটা ন্যূনতম নিকটত্ব। কিন্তু মিসেস তালুকদারের সঙ্গে কারুর নিকটতাও নেই। অনেক দাম্ভিক, অনেক স্নব দেখা গেছে কিন্তু ওঁর মতো...। বিরাট নাকি কী কাজ করেন। ফরেন ব্যাঙ্কের বড় অফিসার-টার জাতীয়। চুল বাচ্চা মেয়েদের মতো বব-ছাঁট। চোখে রে-ব্যানের সান-গ্লাস। ঠোঁটে সবসময়ে লিপস্টিক, সরু ধনুক ভুরু। স্লিভলেস ব্লাউজ। একেক দিন একেক শাড়ি। মিসেস মুখার্জি, সোম, দস্তুর, অগ্রবাল, সানিয়াল, ডাট, চক্রবর্তী, বাসু, ঘোষদস্তিদার, ঢ্যাং, ভট্‌চারিয়া, চ্যাটার্জি, সেনগুপ্তা, রে সব্বাই একমত। হবে নাই বা কেন! এই সেন্ট অ্যালয়শাস স্কুলে ছেলেমেয়েদের ভর্তি করেছেন কেউ নার্সারির থেকে কে-জি থেকে। কারুর সন্তানের সেভেন। কারুর এইট হতে যাচ্ছে। এত বছর স্কুলে বাচ্চা নিয়ে আসা-যাওয়া। অনেকে আসেন দূর থেকে। বাচ্চা পৌঁছে স্কুল কম্পাউন্ডের একটা ছায়া-ছায়া কোণ দেখে বসে পড়েন। ক্রমে আরও দু-চার জন আসেন। গল্প জমে যায়, দারোয়ান বাহাদুরকে বকশিস করেন সবাই। তাকে ধরে-টরে গেট খুলিয়ে ফুচকা, ঝালমুড়ি, চটপটি আসে। বারোটা থেকে দুটো পর্যন্ত কেটে যায়। কাটাতে যখন হবেই...।

—তবু যদি রূপ থাকত। মিসেস সোম মন্তব্য করেন।

—যা বলেছ! অত সেজেগুজে থাকে তাই তবু দেখা যায় নইলে—

—গোরি সি হ্যায় না? ইসলিয়ে ইতনা ঘমন্ড্—মিসেস অগ্রবাল মন্তব্য করেন।

—ফর্সা হলে কী হবে মুখখানা তো ভেটকি মাছের মতো। মিসেস সেনগুপ্ত ঝাঁঝিয়ে ওঠেন, পুরু ঠোঁটে কড়া লিপস্টিক যা মানায়, আহা?

—গলায় পুঁতির মালা, লম্বা তিলকের মতো টিপ যেন ধিঙ্গি বোষ্টুমী। মিসেস দস্তুর কৌতূহল প্রকাশ করেন হোয়াট ইজ ধিঙ্গি বোষ্টুমী?

মায়েদের দলে একটা হাসির রোল পড়ে যায়।

বারোটা বাজছে। নার্সারি কে-জি-র ছুটি হল। পুঁচকি পুঁচকি বাচ্চাগুলো খাঁচা-ছাড়া পাখির মতো হাত মেলে দৌড়ে আসছে। ছেলেমেয়েদের দলের মধ্যে একটি ছেলে অন্যদের চেয়ে লম্বায় বড়, ধবধবে ফর্সা, কোঁকড়া চুল, ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে দেখে চারদিকে। তারপর বাহাদুরের কাছে গিয়ে কী বলে, মুখের মধ্যে আঙুল পোরা।

—দ্যাখ যেন ন্যালাখ্যাপা। —মিসেস সোম।

—বাচ্চাগুলোর মধ্যে দেখায় কীরকম? যেন লিলিপুটদের মধ্যে গালিভার।

—নার্সারিতে দু'বার কে-জি-তে দু'বার ফেল করেছে, তাহলেই বোঝ বয়সটা কী!

বাহাদুর এই সময়ে হুড় হুড় করে গেট খুলে দেয়। মিসেস তালুকদারের গাড়ি ঢুকছে।

গাঢ় সানগ্লাস। বেগুনি রঙের শাড়ি, মেরুন লিপস্টিক।

ব্লাউজ দেখে গা টেপাটেপি করেন মিসেস মুখার্জি ও মিসেস সোম।

ওটুকু না পরলেই পারত?

—লেকিন ফিটিং এক্সেলেন্ট হ্যায়। কঁহা সে বনাতি?

মিসেস অগ্রবালের চোখে মুগ্ধতা, লোভ।

—সত্যি, গায়ের চামড়ার ওপর যেন এঁকে দেওয়া মনে হয়।

—সুপার, মিসেস দস্তুরেরও প্রশংসাবাক্য শোনা যায়।

নামলেন, গটগট করে ছেলেটির কাছে গেলেন, ছেলেটার গোঁজ মুখ। কিছু চাইছে, আইসক্রিম কেনা হল। ছেলের হাতে দিয়ে, তাকে একরকম কোলে করেই গাড়ির পেছনে তুললেন। কোনওদিকে না চেয়ে উঠে গেলেন! ব্যস, হুস।

মিসেস সোমের দুই মেয়ে। একজন সেভেনে, অন্যজন এইটে। প্রতি বছর ফার্স্ট হয়। কৃতিত্বটা শুধু মেয়েদের নয়। মায়েরও। ভোর চারটের সময়ে উঠে মিসেস সোম মেয়েদের ডেকে দেন। ব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে শীতকালের দিনে চানের গরম জল করে একেবারে রেডি। নিজে চট্ করে চান করে মেয়েদের পড়ার টেবিলের পাশে বসেন। পেনসিল বেড়ে দেওয়া, হাতের কাছে খাতা বই জুগিয়ে দেওয়া, পুষ্টিকর ব্রেকফাস্ট বসে বসে খাওয়ানো, এগুলো শেষ করে পুজো। লক্ষ্মী, সরস্বতী, কালী, গণেশের পট। লক্ষ্মী ধন দেবেন, সরস্বতী বিদ্যা সবরকমের, কালী বিপদে আপদে। গণেশ সাফল্যের জন্যে। ভক্তিভরে পুজোটা সারেন মিসেস সোম। ইতিমধ্যে কাজের লোক এলে তাকে দিয়ে রান্নাটা করাতে হয়, সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের এবং নিজের লাঞ্চ-প্যাক। স্কুল বহুদূর, মিসেস সোম তিনজনের খাবার হটকেসে ভরে, বেতের বাস্কেটে করে সঙ্গে নিয়ে নেন। একেবারে মেয়েদের সঙ্গে বারোটায় লাঞ্চ খেয়ে তিনটেয় স্কুল ছুটি হলে তাদের নিয়ে বাড়ি। যদি বলো সেভেন এইটে পড়ে, মেয়েদের তো একা ছেড়ে দিলেই হয়! ছ'টার সময়ে ডিম-কলা-রুটি মাখন দিয়ে ব্রেকফাস্ট করে বাড়ি থেকে বেরোয়। আটটায় স্কুল শুরু। শেষ তিনটেয়। ভাতটা খাবে কখন? সেই কোন্ সকালে সামান্য জলখাবার তারপরও যদি স্কুলে লুচিফুচি টিফিন দেওয়া যায় শরীর থাকবে? বাঙালির মাছে-ভাতে

শরীর। কোনওটাই গরম ছাড়া খাওয়া যায় না। তাও মিসেস সোম মাছ হোক মাংস হোক ভাতের সঙ্গে মেখে, মাছের কাঁটা মাংসের হাড় ছাড়িয়ে আর উনুনে বসিয়ে গরম করে হটকেসে ভরেন। বারোটার সময়ে দুই মেয়ে আসবে খিদেয় ছটফট করতে করতে। দু'জনের হাতে দুটি তৈরি বাটি তুলে দেবেন মিসেস সোম। শেষকালে একটা আপেল কামড়াতে কামড়াতে মেয়েরা আবার ক্লাসে ছুটবে। তিনটে পর্যন্ত আবার গুলতানি। দিবানিদ্রা নেই, পত্র-পত্রিকা পড়ার অবসর নেই, কোথাও যাওয়া নেই, এই চলেছে মিসেস অঞ্জলি সোমের। মায়ের আত্মত্যাগ না হলে কি আর সন্তানের মঙ্গল হয়? চাই আত্মত্যাগ।

মিসেস পিঙ্কি অগ্রবাল একটি কচি মারোয়াড়ি মা। তাঁর ছেলে বান্টি দুর্ধর্ষ দুরন্ত। পড়াশোনায় মন নেই। টিফিনের ছুটি হওয়া মাত্র মায়ের কাছ থেকে বল নিয়ে মাঠে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার মা তার পেছনে ছুটে ছুটে তাকে খাওয়ান। অন্যান্য মারোয়াড়ি তনয়রা-তনয়ারা বাড়ি থেকে টিফিন আনারও ধার ধারে না। টিফিনের সময়ে ফুচকা, চটপটি, দহি-বড়া, আইসক্রিম এইসব খায়। মিসেস মুখার্জি গালে হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, আচ্ছা ভাই পিঙ্কি, তোমাদের ছেলেমেয়েদের অসুখও তো করে না। বারো মাস তিরিশ দিন এই খাচ্ছে।

সত্যি এক-একজনের স্বাস্থ্য কী? গাঁট্টা-গোঁট্টা, কেউ কেউ আবার ইয়া মোটা।

পিঙ্কি অগ্রবাল বাঙালিপ্রধান এক মাল্টিস্টোরিড-এ থাকেন, বাঙালিদের মতো হয়ে গেছেন, তাঁর একটি গোপন বাসনাও আছে, মিসেস মুখার্জির মেয়ে বান্টির সঙ্গে পড়ে, যথারীতি ফার্স্ট হয়। আর বান্টির কোনও ঠিক নেই। আজ থার্ড হল তো কাল লাস্ট বাট ওয়ান। একবার ফেল করতে করতে বেঁচে গেল। তা পিঙ্কি অগ্রবালের গোপন বাসনা হল, মিসেস মুখার্জির মেয়ে ঈশিতা মুখার্জির খাতা। খাতাগুলো যদি একবার পান! তাই তিনি এই বাঙালিনী সংঘের সভ্য হয়ে গেছেন, সব কথাতেই সায় দ্যান।

মিসেস মুখার্জির বিস্ময়ের উত্তরে তাই তিনিও বিস্মিত হন, মেরি সমঝমে তো নহি আতা বহিন। বান্টিকো তো ম্যায় সেরভর ভঁইস কা দুধ পিলাতি, ভুজিয়া ভি উও বহোৎ পসন্দ করতা, চাবল থুক থুককে ফেক দেতা। রোটি একঠো উসকো অন্দর জায় তো পূজা চড়াতি ম্যঁয় হনুমানজিকো। চল তো যাতা উনকি আশীরোয়াদ সে।

এইভাবেই মায়েদের সাধনা চলে। বা বলা চলে তপস্যা। এই তপস্যার প্রত্যক্ষ ফল মিসদের সঙ্গে ডাইরেক্ট ক্যানেকশন। পারস্পরিক আদান-প্রদান। ছেলেমেয়েদের পরীক্ষাসাগর সসম্মানে উত্তীর্ণ হওয়া এবং সারাদিনের মজলিশ। আড্ডা।

রোমাঞ্চকর ঘটনাও ঘটে। যেমন মিসেস তালুকদারের ছেলে বেধড়ক পিটুনি খেতে খেতে বেঁচে যায়। অনেক চেষ্টা করে ক্লাস ওয়ানে উঠেছে ছেলেটা। সাধারণত তার আদত মুখে আঙুল পুরে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকা। কিন্তু ওয়ানে পড়া বাচ্চারা প্রায় সবাই যুযুধান টাইপের। তারা তাকে তেমন থাকতে দেবে কেন? কেউ তার চুলে ফড়িং বেঁধে দেয়। কেউ তার পিঠে 'ডঙ্কি' লিখে দ্যায়, কয়েকজনে মিলে চারদিক থেকে হুক্কা হুয়া করতে থাকে। সমবেত মায়েরা ব্যাপারটা দেখে হেসে এ ওর গায়ে ঢলে পড়েন।

—পারেও ছেলেগুলো...মিসেস সোমের মন্তব্য। হাসিতে তাঁর শ্বাস আটকে যাবার অবস্থা।

খালি মিসেস দস্তুর, ডিগডিগে রোগা, বুক পিঠ সমান ফ্যাকাশে ফর্সা মিসেস দস্তুর বলেন দিস ইজ ন'ট প্রপার। দে শুড ডু সামথিং অ্যাবাউট ইট।

কিন্তু এই 'দে' যে কারা সে সম্বন্ধে তিনি কোনও ইঙ্গিত দ্যান না।

মিসেস মুখার্জী বলেন, থামুন তো। এই করতে করতেই দেখবেন ছেলেটা স্মার্ট হয়ে উঠবে।

স্মার্ট না হলেও প্রতিক্রিয়া হল। মিসেস তালুকদারের ছেলে একদিন রাগে সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল, সামনে ছিল রোগা দুবলা কৌশিক। দড়াম করে মাটিতে পড়ে, তার মাথা ফেটে কাঁচা রক্ত।

মায়েরা সব দৌড়ে কেউ জল আনলেন। কেউ অফিসে, কেউ প্রিন্সিপ্যালের কাছে খবর দিলেন। ছেলের দল ফর্সা। খালি মিসেস তালুকদারের ছেলে মুখে আঙুল পুরে এককোণে দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশ দিয়ে যেতে যেতে মিসেস সোম বললেন—শয়তান একটা।

মিসেস রে বললেন—আজ তোমার হবে!

প্রিন্সিপ্যালের আদেশে ক্লাসে যাওয়া এখন বন্ধ ওর। তিনি হসপিট্যাল থেকে কৌশিক ফেরার অপেক্ষায় আছেন।

মায়েরা দারুণ কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে বসে আছেন। কেনিংটা প্রিন্সিপ্যালের ঘরে হবে না সর্বসমক্ষে এই স্কুল কমপাউন্ডেই হবে এই নিয়ে গবেষণা চলছে।

এমন সময়ে বাহাদুর সরসর করে গেট খুলে দিল। মিসেস তালুকদারের গাড়ি। নেমে ছেলেকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বোধহয় একটু অবাক হলেন। গালে একটা আঙুলের টোকা দিয়ে প্রিন্সিপ্যালের ঘরের দিকে চলে গেলেন।

প্রিন্সিপ্যাল কঠিন চোখে তাকিয়ে আছেন, মিসেস তালুকদার বললেন—আপনাকে ডাক্তারের সার্টিফিকেট আর একটা চিঠি দিতে এলাম আমার ওয়ার্ডের ব্যাপারে।

—দেখি।

চিঠি এবং সার্টিফিকেট পড়ে প্রিন্সিপ্যাল সামান্য নরম চোখে চেয়ে বললেন—ইটস আ স্ট্রেঞ্জ কয়েনসিডেন্স মিসেস তালুকদার। আপনার ছেলেকে আমি আর একটু হলেই পাবলিক কেনিং করতে যাচ্ছিলাম। এই চিঠিটার ফলে...

শিউরে উঠে মিসেস তালুকদার বললেন—সে কী কেন?

—ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে ক্লাস ফেলোর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। ইটস্ আ ন্যাস্টি ক্র্যাক...

—ও তো এরকম...

—হি ইজ আ ক্রুয়েল টাইপ। আমি আগেও রিপোর্ট পেয়েছি।

—এরকম কিছু তো আমি জানি না। দেয়ার মাস্ট হ্যাভ বিন সাম গ্রেভ প্রোভোকেশন। আপনি প্লিজ খোঁজ করুন।

খোঁজ করাতে ক্লাস ওয়ানের মিস ডি সুজা, ক্লাস ক্যাপটেইন চিত্রেশ রঙ্গনাথন এবং কমপাউন্ডে বসে থাকা মায়ের দল মিসেস অগ্রবাল আদি একবাক্যে সাক্ষ্য দিল ইয়েস হি ইজ আ ক্রুয়েল টাইপ। ডি সুজা ক্লাস টিচার সবচেয়ে খারাপ রিপোর্ট দিলেন। মিসেস তালুকদারের ছেলে নাকি অন্যদের চিমটি কাটে, পেনসিলের খোঁচা দেয়

যেখানে-সেখানে, ব্লেড দিয়ে হাত পা কেটে দেয়। শুনতে শুনতে মিসেস তালুকদারের মুখ পাঁশুটে হয়ে যাচ্ছিল। সানগ্লাসটা কিন্তু একবারও নামাননি। কাজেই চোখের ভাব পালটেছে কি না দেখা গেল না।

খটখট করে হাই-হিল বেরিয়ে এল, ছেলের হাত ধরল গাড়িতে উঠে গেল। হুশ্‌শ্‌।

মিসেস চক্রবর্তী বললেন—ভাঙবে তবু মচকাবে না।

ওদিকে ছেলেকে বাড়িতে রেখে মিসেস তালুকদার আবার অফিসে ফিরে যাচ্ছেন। ব্যক্তিগত ব্যাপারে উতলা হয়ে অফিসের কাজের ক্ষতি যে করা চলে না এ বিষয়ে তাঁর জ্ঞান টনটনে। কিন্তু ব্রাবোর্ন রোডে উড়াল থেকে নামতে গিয়ে তিনি আরেকটু হলে একটা দুর্ঘটনা ঘটাচ্ছিলেন। মারমুখী পুলিশ, জনতা সব ঘিরে এসেছিল।

—কানা না কি? চোখে দেখতে পান না?

—সকালবেলাই মদ গিলেছে। এ সব ধরনের মেয়ে লোক...

যে মুটেটি পড়ে গিয়েছিল তাকে একশো টাকার একটা নোট বার করে দিলেন মিসেস তালুকদার। কিছু হয়নি। তিনি শেষ মুহূর্তে ব্রেক কষেছেন। কিন্তু ঘাবড়ে গিয়েই লোকটা রাস্তার পাশে পড়ে গেছে। সামান্য একটু ছড়েছে হাঁটুতে। পুলিশটি তর্ক করতে করতে ওঁর গাড়িতে উঠল। কিছুদূর গিয়ে তাকেও একটা বড় নোট দিলেন মিসেস তালুকদার।

চোখ থেকে কালো চশমাটা নামালেন মিসেস তালুকদার। টেবিলের ওপর রাখলেন ব্যাগ, কালো চশমা। টয়লেটে গেলেন। চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিলেন। মেক-আপ উঠে যাওয়া মুখখানা ফুটে উঠেছে আয়নায়। তিনি প্রসাধনের নানান সামগ্রী বার করে মুখে-চোখে ফ্যাশন, অহংকার, উচ্চপদস্থ গাম্ভীর্য, যান্ত্রিক নির্লিপ্তি সব এঁকে নিলেন। শুধু চোখদুটোকে কিছুতেই পালটানো যায় না। তাই ঘরে কেউ এলেই তিনি কালো চশমা পরে নেন।

—ইয়েসস্‌ হোয়াট ক্যান আই ডু ফর য়ু...।

বাড়ি ফিরতে সন্ধে। তিনখানা টিপটপ সাজানো শূন্য ঘর। নিজেই চাবি ঘুরিয়ে ঢুকেছেন মিসেস তালুকদার। তাঁকে কফি তৈরি করে দিয়ে তাঁর কম্বাইন্ড হ্যান্ড শান্তি চলে গেল। কফি পান করে চুপচাপ বসে রইলেন তিনি। একেবারে নিস্তব্ধ, স্থাণু, পা দুটো সামনে ছড়ানো, মাথাটা সোফার গায়ে হেলে আছে। চোখ দুটো বোজা।

দরজায় টুকটুক করে ঘা। প্রথমে উপেক্ষা করেছিলেন, আবার টুকটুক টুক। মিসেস তালুকদার দরজার চোখে চোখ লাগিয়ে দেখলেন একটি বেশ বেঁটে দীন চেহারার মহিলা, যদিও পরিপাটি করে ছাপাশাড়ি, লাল ব্লাউজ পরা। তিনি কালো চশমাটা পরে নিলেন, দরজাটা খুলে দিয়ে বললেন—কী চাই?

—আমাকে চিনতে পারছেন না বউদি? আমি লক্ষ্মী।

—ভেতরে এসো। কে বলো তো?

ভেতরে ঢুকে, আঁচল দিয়ে গলাটলা মুছে লক্ষ্মী বলল—আমি সেন্ট অ্যালয়ের আয়া। পুজোয় অত বখশিস করতেন আর চিনতে পারলেন না?

এতক্ষণে চিনতে পারলেন মিসেস তালুকদার। বললেন, ও, তুমি লছমি না?

—ওই হিন্দুস্তানিরা লছমি লছমি করে ডাকত। আমার নাম লক্ষ্মী, বউদি।

লক্ষ্মী বা লছমি কেন এখানে তাঁর বাড়ি এসেছে মিসেস তালুকদার বুঝতে পারলেন না। আর একটা বড় নোট খোয়াবার জন্যে তিনি প্রস্তুত হলেন। তাঁর পরিচিত জগতের সর্বত্র মিসেস তালুকদার নিজের অজ্ঞাতে যেন ক্ষমার অযোগ্য সব অপরাধ করে ফেলেছেন। গুনগার দেবার জন্যে তাঁকে সবসময়ে প্রস্তুত থাকতে হয়।

—বউদি খোকন কোথায়?

—ঘুমোচ্ছে।

—ভাল, ঘুমুক, ঘুমিয়ে নিক। বড় ধকল। বড্ড ধকল ওর ওপর দিয়ে যায় বউদি।

কত চাইছে এই লক্ষ্মী? কেন চাইছে?

—বউদি, আপনি একবার ভাল করে খোঁজ করলেন না?

—কিসের খোঁজ করব!

—ওই যা সব ডি সুজা, ছেলেরা, গার্জেনরা বলল খোকার সম্পর্কে? বিশ্বাস করে নিলেন।

মিসেস তালুকদার চুপ করে রইলেন।

—সেই ছোট্ট থেকে তো ওকে দেখে আসছি বউদি। ভগবান দয়া করেননি। এমনি করেই ওকে গড়েছেন বউদি। ওকে আপনাকে দগ্ধে দগ্ধে মারবেন বলে। ছেলেগুলো এইটুকুন টুকুন ছেলে সব কী পাজি। কী নিষ্ঠুর। ওর ওপর কী অত্যেচার করে ভাবতে পারবেন না।

মিসেস তালুকদার নড়েচড়ে বসলেন।

হঠাৎ লক্ষ্মী কেঁদে ফেলল—ও তো ঘুমুচ্ছে, আমার কথা বিশ্বাস না হয়, ওর পিঠের জামাটা ভাল করে তুলে দেখুন দিকি বউদি। কোথায় সে? আসুন।

লক্ষ্মী নিজেই বাড়ির কর্ত্রীকে তার শোবার ঘরে নিয়ে গেল।

অকাতরে ঘুমোচ্ছে খোকন।

সন্তর্পণে পিঠের দিকে জামাটা তুলল লক্ষ্মী। ফিসফিস করে বলল টর্চ আনুন, টর্চ আনুন একটা।

সারা পিঠময় আঁচড়ের দাগ। পুরনো, নতুন, উরুতে, আঙুলেও।

—এসব কী বউদি? দেখেননি?

—আমি ভাবি মারামারি করেছে। পড়ে গেছে—এইসব।

—না, না—লক্ষ্মী প্রতিবাদ করে উঠল—ওকে পেনসিল দিয়ে খোঁচায়, ব্লেড দিয়ে পিঠে কেটে দেয়, আঁচড়ে দেয়, অন্য অত্যেচারের কথা না-ই বললাম।

—ক্লাস টিচার জানে? কেঁপে উঠে বললেন মিসেস তালুকদার।

—ওই ডি সুজা? হাড় হারামজাদি বজ্জাত। সব জানে। ওকে দেখতে পারে না তো। প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের কাছে লাগায়। সেই নার্সারি থেকে লাগাতার এই চলে আসছে।

—ও তো আমায় কোনওদিন বলেনি? কেউ তো বলেনি।

—কে বলবে? ওইসব গার্জিন মায়েরা? ওদের কি মা বলে? না মানুষ বলে! ওই সোমগিন্নি তো প্রিন্সিপ্যালের পায়ে পড়েছিল। কী না ছেটে মেয়ে থার্ড হয়ে গেছে। সে নাকি ফার্স্ট না হলে দুঃখে আত্মঘাতী হবে। বেরাকেটে ফার্স্ট করিয়ে তবে ছাড়ল।

ওদের কথা ছাড়ুন। আর কে বলবে? আপনার খোকন? হা ভগবান তিনি কি ওদের বলবার মুখ দিয়েছেন? কে মারছে। কে গাল দিচ্ছে। কিচ্ছু বলবে না, বলতে পারবে না। আমি জানি বউদি। আমার যে ঠিক এমন একটি আছে। কত ওষুধপালা, কত ওঝা, কত পীরের থান করলুম বউদি, ওই একই ধারার রয়ে গেল। যত বড় হচ্ছে ততই আরও খারাপ। আমি পেটের ধান্দায় বেরিয়ে আসি, আশেপাশের ছেলেরা ওকে মেরে ছেঁচে দেয় বউদি। বাড়ি গিয়ে দেখি দাঁত দিয়ে রক্ত পড়ছে। মুখ নীল, জামা কাপড়ে নর্দমার কাদা... বলতে বলতে লক্ষ্মী ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগল।

—বউদি গো। আমি জানি আপনার চাদ্দিকে এই যে অ্যাতো সামিগ্রি এতো পয়সা-টাকা শাড়ি-জামা এসব কিচ্ছু না কিচ্ছু না। মনে সুখ নেই। ভয়ে, কষ্টে, লজ্জায় কাঁটা হয়ে আছেন। আমি সব বুঝি গো সব বুঝি।

মিসেস তালুকদারের কালো চশমা হঠাৎ খুলে যায়। বেরিয়ে পড়ে মার খাওয়া কুকুরের মতো দুটি চোখ। সন্ধ্যা ঘন হয়। আকণ্ঠ ওষুধ খেয়ে খোকন ঘুমোয়। বাড়ির কাজের লোক শান্তি পেছনের কারখানার লেদম্যানের সঙ্গে তুমুল প্রেম করে। শব্দ করে ট্রাক যায়, ট্রাক আসে। চিৎকার করে কোথাও তীব্র কামোত্তেজক স্বরে বাজতে থাকে মোকাবলা মোকাবলা লায়লা। মিসেস তালুকদার আর লক্ষ্মীমণি দাস মুখোমুখি বসে গুমরে গুমরে কাঁদতে থাকেন। সান্ত্বনাহীন।

পরমায়ু

কুঞ্জ মাঝির চক্ষু দুটি গেল। পুরোপুরি নয়। রোদ থাকলে চোখে একটা লালচে আভা ঠাহর হয়। মানুষজনের চেহারার আদলটুকুও ধরতে পারে।

—'কে গেলি? নারাণ? উঠে আয় দিকি একবার।'

—'সুবুচনীর মা নাকি গো? বউমার কাছে এয়েচ? বেশ বেশ।'

এই পর্যন্ত। সম্পন্ন চাষী। ঘরে চিঁড়ে, মুড়ি, সরষের খোল অপর্যাপ্ত। চিকিৎসার ত্রুটি হতে দেয়নি ছেলে। সদরে যেতে হলে নদী পার। সেভাবেই একে একে দুটি চোখেরই ছানি অস্ত্র হল। প্রথমে কালো ঠুলি, তারপর বেশি পাওয়ারের চশমা উঠল নাকে। কালো ডাঁটির। চলল ওইভাবে বছর ছয়েক। তারপর ধীরে ধীরে আবার সব আবছা হচ্ছে। দিনের বেলাতেই যেন মনে হয় সাঁঝ নেমে গেছে। ভুরুর ওপর হাত দিয়ে মানুষ ঠাহর করতে করতে সে বলে,—'কইরে রানি, বিমলি! গেলি কই? পিদ্দিম দিলি নে যে বড়!'

—'পিদ্দিম দোব যে পাখপাখালির ডাক শুনতে পেয়েছো? বলি অ ঠাকুদ্দা।'

—'তা পাইনি', ডিমের মতো চুকচুকে হয়ে আসা মাথাটি নাড়তে নাড়তে কুঞ্জ বলে। রান্নাশালের পেছন দিক থেকেই আরম্ভ হয়েছে তার ন কাঠা সাত ছটাকের বাগান। সন্ধের ছায়া নামলেই তার আম জাম জামরুল পেয়ারা গাছ সব ঘরফিরতি

পাখির প্রচণ্ড কলরোলে ঝমঝম করতে থাকে। তা সেও যেন আজকাল রূপনারাণ, কংসাবতী, মুণ্ডেশ্বরীর জল পার হয়ে তার তীব্রতা অনেকখানি হারিয়ে ফেলে তবে আসছে কুঞ্জ মাঝির ভোঁ লাগা কানে। কান দুটি তার আগে-ভাগেই গেছে। মেয়ের ঘরের নাতি সুজন বেশ লেখাপড়া করেছে, সে বলে ইস্টোন ডেফ।

যে ডাক্তার ছানি অস্তর করেছিল সেই দেখল আবার, দেখে-টেখে হাতের যন্তর নামিয়ে বলল—'চোখের নার্ভ সব শুকিয়ে গেছে তোমার বাবার। জরায়, বার্ধক্যে, বুঝলে কিছু?'

—'এজ্ঞে, তার কোন চিকিচ্ছে বার হয়নি?' পঞ্চাননের ভাবটা যেন চিকিচ্ছে বার হয়ে থাকলে সে তার বাপকে জেনিভা-টেনিভা পাঠাবে।

ডাক্তার বললে—'না। বার হয়নি। নার্ভগুলির পরমায়ু ফুরিয়ে গেছে। আর পঁচানব্বুই তো পার করল তোমার বাবা, অনেক তো দেখলও। দেখবে যে, এখন আর দেখবার আছেটাই বা কী। যেদিকে তাকাও খালি দুঃখ, দুর্দশা, দুর্নীতি।'

পঞ্চা বিড় বিড় করে বলে—'দেখতে চাচ্ছে যে। বড্ডই দেখতে চাচ্ছে ডাক্তারবাবু। বুঝেন না কেন, হাত বুইলে বুইলে মুখের চামড়াগুলো আমার তুলে নিচ্ছে বুড়ো।'

—'পঞ্চা! পঞ্চা! তুই পঞ্চুই তো রে!'

—'হ্যাঁ গো হ্যাঁ। তোমার সন্দ হচ্ছে কেন আজকাল?'

—'কানে শুনিনে বাবা। তোর ছেঁয়াটা গলা ভারী করে আমার ঠেঁয়ে টাকা পয়সা নিয়ে যায়। আজ এক কুড়ি, কাল দু'কুড়ি...'

—'ভোলো কেন? তার মুখ বুলোও?'

—'বুলুই তো!'

—'আমার যে খাটা-খোটা ফাটা বুড়োটে চামড়া, আর তারটা যে মিহিন টের পাও না?'

কুঞ্জ এইবার রেগে ওঠে।

—'তুই কতো বড়োটা হলি যে বুড়োটে চাম হবে? শুখো চাম তোর শত্তুরের হোক।'

এত দুঃখেও হাসি আসে পঞ্চাননের। যে বাপের পঁচানব্বুই পার হতে যায় তার ছেলের চামড়া এখনও কিশোর ছেলের মতো হবে? আবদার মন্দ নয়।

পঞ্চানন ঠাকুরের দোর-ধরা ছেলে। চারটি পর পর নষ্ট হয়ে অনেক কষ্টের ওই একটিই ছেলে কুঞ্জর। পাঁচ পাঁচ খানি ধুমসো ধুমসো মেয়ের পরে। মড়ুঞ্চে পোয়াতি বলে সে সময়ে পঞ্চুর মার কী অচ্ছেদ্দাটাই না হয়েছিল। চাঁদপানা মুখ দেখে বিয়ে দেওয়া; সেই বউ যদি পাঁচ ছ বছরেও গর্ভ না ধরে কি মরা ছেলের জন্ম দেয় তো তার খোয়ার কুঞ্জ কেন ধম্মোঠাকুরের বাবা এলেও আটকাতে পারবে না। তারপর যদি বা হল, হতেই থাকল। ধুমবো ধুমবো মেয়ে সব। একটু একটু করে বড় হয় আর গাছ কোমর বেঁধে নাকে নোলক, কপালে টিপ, কই মাগুরের মতো খলবলিয়ে খেলে বেড়ায়। কতখানি বয়েস পর্যন্ত কুঞ্জ মাঝির একার হাতে জমি, জিরেত, ক্ষেত, খামার হেলে-বলদ, গাই-গরু। চারটে-পাঁচটা মুনিষ দিন রাত হাঁ-হাঁ করছে। মুরুব্বু সুরুব্বু মানুষ খাটুনির ভাগটুকু না হয় সামলাল, কিন্তু ধরিত্তির মা যে তুষ্ট হয়ে সোনা তুলে দিচ্ছেন

হাতে তার হিসেব পত্তর সে রাখে কী করে? কোমরের গেঁজেতে পয়সাকড়িগুলো তার শুধু ঠুসে রাখাই সার। চালানের অভাবে কত আনাজপাতি তার ফি বছর নষ্টই হতে থাকত। এখন দেখো কেমন সব গোনা-গাঁথা। লাল খেরোর খাতা, কানে কলম, কড়া-ক্রান্তি হিসেব ছেলের, এক কানি এদিক ওদিক হবার উপায় নেই।

কুঞ্জ মাঝির শব্দহীন বর্ণহীন ভুতুড়ে জগতে পঞ্চুই একমাত্র মানুষ। মানুষটি মাঝে মাঝে তার মানসপটে দেবতাই হয়ে ওঠে। এক জমির থেকে তিন তিনটি ফসল অবলীলায় ওঠায় যে, ভ্যানগাড়ি কিনে বাগানের ফুল-ফুলুরি নিজ হাতে চালান দিয়ে মুঠো মুঠো টাকা আনে আর বাপের গেঁজে ভর্তি করে যে, সে ছেলে দেবতা নয় তো আর কী। কোমর ভর্তি টাকা, তা হোক না কোমর ভাঙা, চৌদিকে এমন টাল হয়ে থাকা সবুজ, না-ই বা চোখে দেখল এত সুখ শরীরে সইলে হয়। দুগ্‌গোপুর থেকে জল ছাড়লে দাওয়ায় উঠে আসে, সত্যি কথা। কদিন নৌকোর ওপর দোল-দোল দুলুনি। গরমেন্টের রিলিফ সরকার এসে বলে গেল—'আপনারা এ গ্রাম ছাড়ুন, এসব জল-নিকেশী জায়গা। আমাদের কিচ্ছু করবার নেই।' পঞ্চা গাঁয়ের পাঁচজনকে একত্তর করে বোঝাল, নিজের হাতে গড়া ভুঁই কেউ ছাড়ে?

এখন গরমের দিনে বউমা ঘন দুধের মধ্যে বাড়ির ভাজা ডবকা ডবকা মুড়ির ধামি উপুড় করে দেয়, তাতে কলমের আমের ঘন রস, গন্ধে নীল ডুমো মাছি ওড়ে। দুই নাতনি দু'দিক থেকে ঝাপটে ঝাপটে বাতাস করে। গ্রাস মুখে তুলে কুঞ্জ মাঝি হাপুস-হুপুস মা লক্ষ্মীর পেসাদ পায় যেন। লক্ষ্মী তো নয় গণেশ। সিদ্ধিদাতা গণেশ ঠাকুরটি তার মানুষের রূপ ধরে দাওয়ায় পায়ের খসখস শব্দ তুলে উঠে আসে, গামছা ঝাড়ে, বলে—'কী গো বাবা? খাচ্ছো ক্ষীর-মুড়ি? খাও, খাও বেশ করে খাও।'

রানি, বিমলা দুধার থেকে খিল খিল করতে থাকে।

—'হাসির কী হল? বলি, হাসির কী হল রে ছুঁড়ি? হ্যাঁ গো বাবাকে জামরুল দিলে না যে বড়! অমন ডাঁশা ডাঁশা জামরুল, চুবড়ি ভর্তি সব সাজানো রইল যে!'

মাথায় ঘোমটা, রানি বিমলার মা বেরিয়ে এসে বলে, 'তারপর পেট কামড়ালে?'

—'অবাক করলে, দাঁতে একটা ফুটো নেই, ফাটা নেই, বাটি বাটি ক্ষীর সাবড়ে দিচ্ছে, জামরুল খেলে পেট কামড়াবে? ছিটেলের ঘরের মেয়ে দেখছি?'

হিন্ডেলের বাটি ভর্তি জামরুল এনে বউ বসিয়ে দিয়ে যায়।

—'এক ছিটে জল দে রে রানি। মুখ কুলকুচি করি। নইলে মিস্টি মুখে জামরুলের সোয়াদ পাবোনি।'

কুলকুচি করে ঢকঢক গেলাস খানেক জল খেয়ে কুঞ্জ জামরুলের গায়ে হাত বুলোয়। আহা কী চিকন গো, এই নাতিনদের মুখের মতো। কামড় দিলেই রসের ফোয়ারা ছুটবে। তার দাঁতগুলি সব অটুট। দু-চারটি কষ ছাড়া ওই সব যাকে বলে একেবারে বিদ্যমান। সারা জীবন দাঁত দিয়ে আখ ছুলে চিবিয়ে খেয়েছে, মাংসের হাড় চিবিয়ে ধুলোগুঁড়ি করে দিয়েছে সে কি অমনি, অমনি। দাঁতের বাহার দেখলে এই বয়সেও লোকের চোখ ঠিকরে যাবে। চোখ দুটি আর কান দুটি যে কেন গেল? সেই সঙ্গে শালোর কোমর, তা কুঞ্জ আজও বুঝতে পারে না। আরও একটি জিনিস বোধের অগম্য তার। কার্তিক পড়তে না পড়তেই জাড় অমন জেঁকে বসে কেন? পোষ-মাঘে

সে রেজাই গায়ে দিয়ে ঘরে আংরা রেখেও শীতে ঠকঠক করে কেঁপে সারা হয়। জামা-কাপড়-শয্যে সব যেন জলে চুবিয়ে এনেছে। অথচ এই সিদিনের কথা, অঘ্রাণমাসের সন্ধেবেলায় মাঠের কাজ সেরে সে গাঙে ডুব দিয়ে এসেছে। নাতি এক বাঁদুরে টুপি এনে দেয় শহর থেকে। সেইটে পরে এখন জাড় খানিকটা সামলে-সুমলে আছে। এছাড়াও হচ্ছে তলপেটে একটা খামচানি ব্যথা। ডাক্তার বললে এ রোগকে বলে হার্নি। অস্ত্র করতে হবে। 'অস্তর! আবার অস্তর!' হাঁউ মাউ করে উঠেছিল সে, 'চোখের ওপর ছুরি চালিয়ে তো তার দফা নিকেশ করে দিলে, এবার পেটে ছুরি বসিয়ে আমারই কম্মো কাবার করতে চাও নাকি গো, ডাক্তারবাবু!'

ডাক্তার হেসে বলেছিলেন,—'কম্মো কাবার হবে না। কিন্তু যদি হয়ই, তো কি খুড়ো? অনেক দিন তো জীবনটা চেখে চেখে বাঁচলে। আর এই ঘিনঘিনে ব্যথা নিয়ে বাঁচতে ভাল লাগবে?'

কুঞ্জ অর্ধেক কথা শুনতে পায় না। এগুলি ঠিক শুনেছে। পঞ্চুকে হাতের ইশারায় কাছে ডাকে, বলে—'পঞ্চু আমাকে খবরদার টেবিলে তুলবিনি। বাড়ি নিয়ে চ। ঘিনঘিনে ব্যথা সে আমার, আমি বুঝব, ও শালোর ডাক্তারকে বুঝতে হবেনি।'

পঞ্চু হাসে,—'জোর করে কে তোমাকে টেবিলে তুলছে?'

ডাক্তারের পরামর্শমতো নিচ-পেটে পরবার বেল্টো কিনে দিয়েছে পঞ্চু, ঘুমের সময় আর প্রাতঃকৃত্যের সময় ছাড়া পেট সাপটে থাকে। এই তো সবেরই সুসার আছে, শুধু শুধু ছুরি-কাঁচি ইসব কী? শরীর থাকলেই রোগ-বালাই। তা যেমন রোগ তার তেমন ওষুদ! ঘাবড়ালে চলে? বুনো ওলের জন্যে চাই বাঘা তেঁতুল, নয় কী?

দুপুরবেলা দুই নাতিন বেশ করে তেল ডলে দেয়। পিঠটা বড্ড রুখু হয়ে যাচ্ছে। কুঞ্জ পিঠে তেল থাবড়ে দেয় হাত বেঁকিয়ে। পঞ্চুর বউ রাঁধে ভাল, তাকে বলে—'পুঁইডগা আর লাউ দিয়ে চিংড়িমাছ অনেক দিন রাঁধো না তো বউমা। বেশ চনকো চনকো চিংড়ি।'

বউ বলে—'চিংড়ি কই! পোকা মারার ওষুদে চিংড়ি হবার উপায় আছে?'

—'গুগলির ঝোল সে-ও তো অনেক দিন খাওয়াওনি; খেলে পরমাই বাড়ে তা জানো?'

রানি-বিমলা হাসির বেগ সামলাতে পারে না। এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে। রানি কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলে—'কার পরমাই বাড়ার দরকার পড়ল গো অ ঠাকুর্দা?'

—'কেন রে ছুঁড়ি? তোর, তোর বাপের, মায়ের, আমার...'

—'ওইটেই আসল কথা। তোমার পরমাইটাই আরও একটু নাম্বা করা দরকার।' রানির মা চোখ রাঙিয়ে তাকায়। তাদের বাবা ঠাকুর্দার সঙ্গে এ ধরনের তামাশা পছন্দ করে না। বলে, 'জানিস আমি বাবার কত বয়সের ছ্যালা। ও তো আমারই ঠাকুর্দার মতন!'

কুঞ্জ তেল-টেল মেখে আবার বলে—'আজকাল কি ছাতু আর হচ্ছে না বউমা। প্যাঁজ, রশুন, নংকা দিয়ে বেশ করে একদিন ছাতু রাঁধো তো। তোমার শাউড়ি রাঁধত। এক থাবা ছাতু দিয়ে এক থালা ভাত উঠে যেত।'

রানির মা বিরক্ত হয়ে সামনে থেকে সরে যায়। তিনকাল গিয়ে এককাল ঠেকেছে, কোথায় ধম্মোকথা কইবে তা না পুঁই-চিংড়ি, গুগলির ঝোল, ছাতু। ঘোর কলি একেই বলে। বুড়ো মানুষের মনেও ধম্মো নেই।

পঞ্চানন বুঝদার মানুষ। সে স্ত্রীকে বোঝায়—'বুঝো না কেন বউ। চোখ নাই, কান নাই যার, তার পরানের সবটুকুখানিই যে জিবে এসে ঠেকেছে গো। এর সঙ্গে ধম্মো অধম্মোর সম্পক্ক কি? কুঞ্জমাঝি কোনওদিন অধম্মো করে নাই। বুড়ো বয়সে নাই বা ভেক নিল।'

বউ গজগজ করে, স্পষ্টই বোঝা যায়, ধর্ম-অধর্মের ধারণায় সে তার স্বামীর মতে মত দিতে পাচ্ছে না। সে অসন্তুষ্ট গলায় বলে,—'যত অনাছিস্টি কাণ্ড।'

ফাগুন চোতে আকাশ যেন রক্ত-পলাশ! কাছে ভিতে জঙ্গল, বাগান, চরের মাটি, নদীর পাড়, এমন কি মেঠো হেটো রাস্তার দু'ধার অবধি সবুজে সবুজ! ন্যাড়া গাছের ডালে ডালে দ্যাখ-না-দ্যাখ কচি পাতা তিড়িং বিড়িং নেচে নেচে বার হয়ে যাচ্ছে। দুই বোনের এক লগ্নে বিয়ে দিয়ে সারল পঞ্চানন। বলল—'বাবা, তোমার একটুকখানি খালি খালি লাগবে। তোমার বউমার তো শতেক কাজ! তার মাঝে তোমার নাতিনদের মতো হাতে-হাতে মুখে মুখে তো বেচারি পারবে না! একটু বুঝো!'

যায় বলবার কথা সে বলল। এখন যার শোনবার কথা সে তো শোনেওনি। এমন দিনে রানি-বিমলা দুই বোন ঠাকুর্দাদার দুইপাশ থেকে পাকা চুল তোলবার ভান করত 'ও মা, মা, ঠাকুর্দা, কোথায় যাব গো! তোমার যে কাঁচা কালো চুল উঠছে গো,' খুশি হয়ে উঠত কুঞ্জ, অবাক নয় কোনমতেই। এটাই যেন স্বাভাবিক।

—'কটা? কটা? গুনে দেখ তো দিদি!'

—'একটা ছিঁড়ে তোমায় দেখাব?'

—'উ হুঁ হুঁ'—প্রবল প্রতিবাদ তুলত কুঞ্জ, 'পাঁচ কুড়ি পুন্ন হলে নতুন পাতার মতো নতুন চুলও গজায় রে, শরীল নতুন হয়ে ওঠে। দেখছিস না গাছপালায় সব পাতাপুতি হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে!'

—'তুমি দেখতে পাচ্ছ?'

—'তা একরকম পাচ্চি বইকি! বলরামচুড়োয় কেমন কালচে সবুজ পাতার টুপি এসেছে। মানুষেরও অমনি হয়!'

হাসি চেপে রানি বলত—'তাহলে ঠাকুর্দা তোমার চোখ-কানও আবার হবে?'

—'হবেই তো' দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় কুঞ্জর, 'আবার কোমর সোজা করে দাঁইড়ে লাঙল ধরবুনি? ছেঁয়াটা তো সদরে দোকান দিচ্ছে, না পয়সা জলে দিচ্ছে! পঞ্চার পাশে কে দাঁড়ায় দিদি! পঞ্চাটা আমার খেটে খেটে হেলে গেল।'

হেলে কিন্তু পঞ্চানন যায়নি। চোত মাসের সকাল ন'টা থেকেই কাঠ ফাটে। ভাঁটরোর গ্রামাঞ্চলটুকু সবুজে সবুজ, তবু একটুখানি ছায়া ছায়া। কিন্তু ভ্যানগাড়ি নিয়ে বাজার হাটে বেসাতি করতে গেলে নৌকোয় নদী পেরিয়ে আগে পড়বে মাঠ। তাতে আদিগন্ত কোথাও জিরেন নেই, বাস রাস্তায় একবার ঠেলে উঠতে পারলে ভ্যানগাড়ি শনশনাশন চলবে, তখন কোনও বড়সড় গাছের ছায়ায় দুদণ্ড গামছা ঘুরিয়ে হাওয়া খেয়ে নেওয়াও যেতে পারে। পঞ্চার গাড়িতে কাঁচকলার কাঁদি, কাঁটালি কলা, এঁচোড়,

থোড়, পাকা পেঁপে, কাঁচা পেঁপে, সজনে ডাঁটা, বেগুন, লঙ্কা, নেবু! সব কুঞ্জর বাগানের।

সন্ধ্যে ঘুরে গেল। তুলসীতলার পিদিমটি নিবু-নিবু। অন্ধকার ঘোর হচ্ছে। আনাচে কানাচে ঝিঁঝির প্রবল প্রতিপত্তিতে ঝিনিঝিনি খত্তাল বাজাতে শুরু করে দিয়েছে। কুঞ্জ বলল—'পঞ্চা যে এখনও এল না বউমা।' ছেলে বাড়ি না থাকলেই সে সন্ধ্যে থেকেই কোমর বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে ঘর বার করে।

বউ বললে—'বেরুতে একটু বেলা তো হল, মাংসটা কাটল, কুটল, রাঁধল, তবে না বেরুনো। গাড়ি চুড়ো করে আনাজপাতি নিয়ে গেছে বাবা। ভাঙা হাট অবধি না দেখে কি আর সে আসছে! তুমি খেয়ে নাও।'

—'খাব কী গো? ছেঁয়াটা আসুক।'

—'সে যদি আসে এখন তেতপ্পরে। চান না করে ভাতেও বসবে না। তুমি বুড়ো মানুষ। এখনই তো ঢুলছ দেখছি,...'

—'তালে দিয়েই দাও। মাংসটা আছে তো?'

মুখ টিপে হেসে বউ বলে,—'আছে গো আছে, আর কারুর না থাক তোমার আছে। তা চোতের গরমে দু'বেলা মাংস, খাবে তো?'

—'চোতের গরম? কোথায়? সাঁঝ হতে না হতেই তোমার চোত পালিয়েছে, ফুরফুর করে গাঙের হাওয়া দিচ্ছে এমন।'

দাওয়ায় পাতা করে বুড়োকে এনে গুছিয়ে বসিয়ে দিয়ে যায় বউ। কাঁসার বড় বাটিতে মাংস। আজ অনেক দিন পর গাঁয়ে খাসি কাটা হল, পঞ্চা তার নিজের ভাগ পাতা মুড়ে নিয়ে এসে নিজেই টুকরো টুকরো করেছে, নিজেই রেঁধেছে, কষে ঝাল দিয়ে। খেতে খেতে ঝালে টকাটক আওয়াজ তোলে কুঞ্জ। চোখ দিয়ে জল পড়ে। কিন্তু সোয়াদ কী? মুখ যেন ছেড়ে গেল।

ভাত-টাত ঝোল মেখে শেষ করে সবে দাঁত বসিয়েছে একখানা হাড়ের ওপর জুত করে, বাইরে লোকজনের আওয়াজ পাওয়া গেল। লণ্ঠন তুলে বউ সদরে আলো দেখায়। চার পাঁচজন জোয়ান লোক ভ্যানগাড়ি থেকে পঞ্চাকে নামিয়ে দাওয়ায় রাখলে। মাঠের মধ্যেই নাকি ভ্যানগাড়ি থেকে উলটে পড়েছিল। হাটফিরতি লোক দেখতে পেয়ে তক্ষুনি আবার হাসপাতালে নিয়ে গেছে, ডাক্তার দেখে বলেছে—ইস্টেরোক। হাসপাতালে ভর্তি করার জায়গা নেই। ওষুধ পত্র দিয়ে, ছুঁচ ফুঁড়ে, যা করবার করে ছেড়ে দিয়েছে। এখন কী কী খাওয়াতে হবে না হবে গোপাল কর্মকার পঞ্চার বউকে সব বুঝিয়ে বলছে।

হাড়টা এতক্ষণে ভাল করে ভাঙতে পেরে গেছে কুঞ্জ। ভেতরের রসটুকু জিভ সরু করে চুষতে চুষতে বলছে—'পঞ্চা এলি? সঙ্গে কে র‍্যা। নিধু নাকি? শালো খচ্চর তুমি খাসির রাঙের লোভে লোভে কুঞ্জ মাঝির ঘরে রাত দুপুরে সেঁদিয়েছ। তোমায় আমি চিনি নে?'

নিধু বললে—'খুড়োকে আর ভেঙে কাজ নেই।'

গোপাল বললে—'রাখ, রাখ, সেঞ্চুরি করতে যাচ্ছে, এখন আর হ্যান নেই ত্যান নেই ছাড়। বল্ বুড়োকে। হাড় ছেড়ে উঠুক। পঞ্চাদার অবস্থা একদম ভাল নয়। দেখলি

না চোখের পাতা টেনে টর্চ মেরেই ডাক্তার ছেড়ে দিল। রাত কাটবে না। সুজন, পরাণ সব খবর দে।'

ভোর রাতের দিকে পঞ্চানন অজ্ঞাত লোকে যাত্রা করল। বেচারির জ্ঞান আর ফিরে আসেনি। সরু-মোটা গলার হাহাকারে গগন ফাটছে। কুঞ্জবুড়ো দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে রয়েছে। সারা দিন একই ভাব। পাড়া ভেঙে সান্ত্বনা দিতে এল সব। মেয়েরা পড়েছে কুঞ্জর বউকে নিয়ে। বুড়োরা পড়েছে কুঞ্জকে নিয়ে। মাধব ঠাকুর পুরুতও বটে, জ্যোতিষীও বটে, বললে—'মুখ তোলো কুঞ্জ, কোমর সোজা করে তোমাকেই তো এখন দাঁড়াতে হবে গো!' কুঞ্জ কোনওমতে দুই ঠ্যাঙের মধ্যবর্তী গহ্বর থেকে ডিমের মতো মাথাটি তুলে বলে—'হাত পা আমার পাতা-পাতা হয়ে যাচ্ছে ঠাকুর, বুকের মধ্যেটা ঘোর যনতন্না, শরীলটা আর বশে নেই গো!'

—'আহা, অমন জলজ্যান্ত ছেলেটা ঠিক দুক্‌কুরে...গেল, শরীর আর বশে থাকে কুঞ্জ! তবে ছেলে তোমার দুপোয়া দোষ পেয়েছে। বিহিত করো, নইলে বাড়িতে আরও কটা অমঙ্গল অপঘাত কেউ আটকাতে পারবে না।'

বিকেল নাগাদ মড়া-পোড়ানিরা সব ফিরে এল। মটর ডাল দাঁতে কেটে, নিম ছুঁয়ে, আগুন ছুঁয়ে যে যার মতো ঘরে গেল। পঞ্চুর ঘরে বাতি জ্বলছে। বউ মেঝে আঁকড়ে শুয়ে। মাথার কাছে মেয়ে দুটি কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে। সুজন পরাণ দুই নাতি অনেক রাতে খুটখুট শব্দ পেয়ে ভূমিশয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। শোকাতাপা শরীর, ঘুম তো সহজে আসে না। যদি বা আসে একটু আওয়াজেই খান খান হয়ে যায়। পরাণের ওপর আবার নতুন দায়-দায়িত্বের দুর্ভাবনা। চাষবাসের বিশেষ কিছুই সে জানে না। তা বলে খুটখুট শব্দ এরই মধ্যে? চোর-ডাকাত সব বোধহয় জেনে গেছে, এখন থাকার মধ্যে এক অথর্ব বৃদ্ধ, এক সন্তপ্ত বিধবা আর এক উঠতি বয়সের অকাল কুষ্মাণ্ড যে নাকি বাপ-পিতেমোর ধারাও নেবে না, অন্য ধারা নিতে গিয়েও খালি মার খাবে। কুঞ্জমাঝির ভাষায় 'ছেঁয়া।'

দুজনে উঠে দাঁড়িয়ে পা টিপে টিপে ঘরের বাইরে আসে, লোহার ডাণ্ডা থাকে ঘরের কোণে, সেটাকে হাতে তুলে নেয় পরাণ। খুটখাট আওয়াজ আসছে দক্ষিণের দাওয়া থেকে। কুঞ্জর ঘরেই যতেক কাঁচা টাকা। নজর ওদিকেই হবে। দাওয়া ঘুরে পেছনে যেতেই দেখল চাঁদ চালের বাতা ছুঁয়ে দাঁড়িয়েছে। দাওয়া ফর্সা। ঠাকুর্দাদার ঘরের চৌকাঠে চোর হামাগুড়ি দিচ্ছে, তার বেঢপ ছায়া পড়েছে দাওয়ার ওপর।

—'তবে রে!' বিকট হাঁকড়ে উঠল সুজন।

চোরের কানে শব্দ পৌঁছেছে ঠিক। কিন্তু যতটা জোর হাঁক ততটা জোরে নয়। হাত থেকে ঠক করে কী যেন দাওয়ায় পড়ে গেল।

সুজন-পরাণ নিচু হয়ে বলল—'একি। কী করছ গো ঠাকুদ্দা, এই দুপুর রেতে।'

ফ্যালফেলে দৃষ্টি মাঝির দৃষ্টিহীন চোখে। ধরা পড়ার গলায় বলল—'এই যে দাদা দুটো ঘোড়ার নাল, বেশ কালো কালো ক্ষয়াটে। ঠাকুরমশাই বলে গেল কিনা তোর বাপ দোষ পেয়েচে, দিষ্টি পড়বে, তাই দোরে নাল দুটো বাবলার আটা দে সেঁটে দিচ্ছিলুম।'

তর্করত্নপাড়ার পুজো

মহাসপ্তমীর দিন ন'টা একুশের লোকালে কয়েকটি ছেলেমেয়ের একটি দল একটা অখ্যাত স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে এসে নামল। একখানা বেঞ্চি কোনমতে খাড়া আছে, ফেরিওলার হাঁক মিয়োনো, স্টেশন চত্বরে কোন ভিড় নেই এই পুজোর বাজারেও। দলের মধ্যে একটি ছেলে যেমন লম্বা তেমন মোটা। অপরজন বেশ ব্যায়ামবীর-ব্যায়ামবীর। ব্যায়ামবীর মোটার দিকে তাকিয়ে বলল—'চারদিকে তাকিয়ে দ্যাখ, ঠিক জায়গাতেই নেমেছি মনে হচ্ছে যে লম্বু, কী বল শিবানীদি?' এরা শিক্ষিত বেকার তরুণ-তরুণী। এদের ফটোগ্রাফি, গৃহসজ্জা, ফ্যাশন, ছবি-আঁকা, গান-বাজনা ইত্যাদি সব বিষয়েই অল্পবিস্তর জ্ঞান আছে, পড়াশোনার ডিগ্রি ছাড়াও। কিন্তু তিনবছর চেষ্টা করেও কেউ একটা মনোমতো চাকরি জোগাড় করতে পারে নি। তাই ওরা জোট বেঁধেছে। নিজেদের অন্ন নিজেরাই জুটিয়ে নেবে। ওদের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা-চওড়া মেয়েটি টিকেট-কাউন্টারে গিয়ে জিজ্ঞেস করল—'আচ্ছা, এখানে পুজো হচ্ছে কোথায় বলতে পারেন?'

—'পুজো?' বুকিংক্লার্ক মশাই চশমার ওপর দিয়ে চেয়ে বললেন—'কোথায়? না কোথায় কোথায়? হিসেব দেওয়ার সাধ্যি আমার নেই মা।'

পেছন থেকে একটি রিকশাঅলা হেঁকে বলল—'আসুন না দাদা-দিদিরা, আমি সব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেব। দুটো রিকশয় তিরিশটা টাকা লাগবে কিন্তু।'

মেয়েটি বাকি সবাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল—'চল, সেটাই ভাল।'

অবিলম্বে দুটো রিকশা এসে গেল। একটাতে বসেছে তিনটি মেয়ে। বড়সড়টি মাঝখানে। অন্যদুটি ছোটখাটো। তারা দু'পাশে। হুড নামানো সীটের দু'ধারে। ছেলেদুটি আরেকটি রিকশয়। নোদলগোদল লম্বু রিকশার তিনভাগ জুড়ে একাই। বাকি জায়গাটাতে কোনমতে বসে ব্যায়ামবীর বলল—'বাপ্‌স রে, বসা তো হল কোনমতে। এখন এই খোঁদল থেকে নামতে পারলে হয়। লম্বু তুই ডায়েট কর।'

লম্বু বলল—'জীবনের চার্মটাই যে তাহলে চলে যাবে রে।'

দু'চারটি ঠাকুর দেখতে দেখতেই কিন্তু ওরা সববাই হই হই করে উঠল। —'আরে এ তো আখচার দেখছি! এর মধ্যে নতুনত্ব কই? সেই কয়েকটা পুতুল বসানো আছে। মাথার ওপরে কাপড়ের চিত্তির-বিচিত্তির, লাউড-স্পীকারে লেটেস্ট ফিলমি গান। 'ধুর, আমরা পিওর গ্রামের পুজো দেখতে চাই ভাই। ও রিকশাওয়ালা!'

রিকশাওয়ালা বসন্ত বলল—'তাহলে দাদা-দিদিরা তর্করত্ন পাড়ায় চলুন।'

—'সে কোথায়?'

—'আরও মাইল তিন চার ভেতর দিকে।' বসন্ত তর্করত্ন পাড়ার পুজোর বিশেষত্ব ব্যাখ্যা করতে লাগল প্যাডেল মারতে মারতে।

তর্করত্ন পাড়ার সার্বজনীন মহাপূজার এবার সুবর্ণজয়ন্তী। পুজো প্রবর্তন করেন যাঁর নামে এই পাড়া, সেই গজানন তর্করত্ন মশাই স্বয়ং। জ্ঞানমার্গ আর ভক্তিমার্গ দুটোতেই রত্ন এবং বিশারদ পণ্ডিতমশাই। কিন্তু প্রথম যৌবনে পাওয়া ওই তর্করত্ন উপাধিটাই কেমন করে যেন তাঁর নামের সঙ্গে বরাবরের মতো জুটে গেছে। যেবার পদ্মশ্রী পেলেন সে আজ বছর কুড়ি আগেকার কথা, তখন থেকে জায়গাটা তর্করত্ন পাড়া নামে আখ্যাত

হয়ে আসছে।

অশীতিপর বৃদ্ধ। শুয়ে বসেই থাকেন। দেখাশোনা করে জটাই বুড়ি, যে আসলে জটাইয়ের মা। জটাই যেহেতু ক্ষ্যাপা, এক জায়গায় তাকে ধরে রাখা খুব শক্ত, সেহেতু জটাইয়ের মাকে পণ্ডিতমশাই আশ্রয় দিয়েছিলেন একদা একসময়ে। কেমন করে তার আখ্যা জটাইবুড়ি হয়ে গেল সেও এক গণমানসের খামখেয়ালের ব্যাপার। বোধনটি প্রত্যেকবার পণ্ডিতমশাইকে দিয়েই করানো হয়। এবার বললেন—পারবেন না। ক্ষীণ হাতটি তুলে ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন—'নির্বিঘ্নেই সব হয়ে যাবে, চিন্তা নাই।'

পূজা কমিটির নতুন সেক্রেটারি সত্যশরণ বলল—'প্রতিমা কেমন হল দেখবেন না পণ্ডিতমশাই, এবার একটু অন্যরকম হয়েছে যে।'—'আ...র প্রতিমা বাবা, চিত্তের মধ্যে তো তাঁকে বসিয়ে রেখেছি সেই কবে থেকেই। এখনও তো তিনি দেখা দিলেন না, অথচ পঞ্চাশটা বছর পূর্ণ হল গিয়ে!' পণ্ডিতমশাই ধুতির খুঁটে চোখ মুছলেন। প্রেসিডেন্ট জীবনধাবুর সঙ্গে সত্য চোখাচোখি করল। পণ্ডিতমশাই এতো র‍্যাশনাল মানুষ, তর্করত্ন বলে কথা, কিন্তু পঞ্চাশ বছর আগে যখন পূজাটি আরম্ভ করেছিলেন, তখন করেন এই আশা করে যে তাঁরও চোখে মাতৃদর্শন হবে, রামকৃষ্ণ ঠাকুরের মতো।

কলকাতা থেকে রিপোর্টার এসেছে শুনে সত্যশরণ যখন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল তখন ক্যামেরাম্যান লম্বুর তিন চারটে কোণ থেকে ফোটো নেওয়া হয়ে গেছে। সে আবারও ক্যামেরা তাক করছে। এবার পুজোর আয়োজনের ওপর। পুরুতমশাই পোজ দিয়ে বসে আছেন। পাড়াসুদ্ধু লোক হাতে পুষ্পাঞ্জলির ফুল নিয়ে ক্যামেরার রেঞ্জের ভেতরে আসবার জন্যে হুড়েহুড়ি করছে। সত্যশরণ কাছাকোঁচা সামলাতে সামলাতে বলল—'আপনারা নাকি আমাদের নিয়ে গল্প লিখবেন!' সত্যশরণের হাতদুটো কচলাতেই যা বাকি! শিবানী মেয়েটি রহস্যময় হেসে বলল—'ভাবছি!'

জীবনবাবু এগিয়ে এসে বললেন—'তা যদি বল মা, গপ্পো লেখবার মতোই! তবে একটা দিনে আর তর্করত্ন পাড়ার পুজোর কী-ই বা জানবে। কতটুকুই বা জানবে!'

—'তা বেশ তো,' পেছন থেকে স্টোনওয়াশ জীনস পরা ব্যায়ামবীর ছেলেটি এগিয়ে এল, কাঁধ নাচিয়ে বলল—'কদিন থাকলে স্টোরিটা পাব বলে মনে হয়?'

—'পুজোর কটা দিন অন্তত থাকো, দেখো, শোনো', ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললেন জীবনবাবু, 'তুমি বলছি বলে কিছু মনে কোরো না যেন, তোমার বয়সী ছেলে আছে আমার।'

ক্যামেরা গুটিয়ে মোটা ছেলেটি বলল—'বেশ বললেন তো মেসোমশাই! থাকো, দেখো, শোনো, কই খাও, দাও, শোও তো বললেন না।'

—'বলাটা বাহুল্য বলেই বলেন নি'—সত্যশরণ এগিয়ে এসেছে আবার—ব্যবস্থা হয়ে যাবে, কোনও অসুবিধে হবে না, পণ্ডিতমশাইয়ের বাড়ি অঢেল জায়গা আর খাওয়া তো পুজোর ভোগই আছে।'

বোঝাই যাচ্ছে শিবানীই দলনেত্রী। বলল—'কি রে শ্রীলা, শুক্লা, রাজি?'

ব্যায়ামবীর বলল—'হ্যাঁ ওই দুই পিটপিটেকে রাজি করাও, আমি আর লম্বু তো তোফা থাকব।'

পণ্ডিমশাইয়ের ব্রাহ্মণী মারা গেছেন বছর দশেক হল। ছেলে নেই। দুই মেয়ের দূর

দেশে বিয়ে হয়েছে, একটি বোধহয় সাগরপার। আর একটি মারাও গেছে। নাতি-নাতনিরা লায়েক হবার পর চোখে দেখেন নি পণ্ডিতমশাই। তিনখানা খাটপালঙ্ক বোঝাই বড় বড় ঘর পড়েই আছে। ঝাড়তে ঝুড়তে পাড়ার মেয়েরাও এসে জটাইবুড়ির সঙ্গে এসে হাত লাগাল। ওদের দেখাশোনার জন্যে আলাদা কোন ব্যবস্থাই করতে হল না। আজকালের ছেলেমেয়ে সব, ভীষণ স্বাবলম্বী। নিজেরাই চা বানায়, নিজেরাই লণ্ঠন পরিষ্কার করে তেল ভরে, চান-টান করে কাপড় মেলে দেয় উঠানের রোদ্দুরে। বলতে কি পণ্ডিতমশাই আর জটাইবুড়ির দেখভালটাও কদিন ওদের হাতেই চলে যায়।

এদের মধ্যে শিবানী একটু লেখা-জোকা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। বাকিরা তথ্যের খোঁজে কেউ পণ্ডিতমশাইয়ের কাছে, কেউ সত্যশরণের, কেউ জীবনবাবুর, কেউ বা গাঁয়ের গিন্নিবান্নিদের কাছে ফিট হয়ে আছে। বছর দশ বারো আগেও পণ্ডিতমশাই নিজেই করতেন পুজোটা। বোধন, অধিবাস, ঘটস্থাপন, ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাস, প্রাণপ্রতিষ্ঠা, আবাহন, কুষ্মাণ্ডবলি, কতসব খুঁটিনাটি! নতুন পুরুত অত জানেনও না, পারেনও না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তর্করত্নও অনেক নরম হয়ে এসেছেন, বলেন,—'তা চায়ের সঙ্গে একটি দুটি দিশি বিস্কুট খেয়ো, মন্ত্রগুলির সংক্ষিপ্তকরণে দোষ নাই। খালি মানসপূজাটি মন দিয়ে করবে।'

লম্বু জটাইবুড়ির ভাষায় ঘুরছে ফিরছে ফটক নিচ্ছে। গ্রামের ফটক, চণ্ডীমণ্ডপের ফটক, তর্করত্ন পণ্ডিতের ফটক, জটাইবুড়ির ফটক। একে অজ গ্রামের পুজো। উপরন্তু পণ্ডিতমশাইয়ের শুচিবাই। যদি বা লাউডস্পীকার চলে তো 'যা দেবী সর্বভূতেষু' আর ভক্তিগীতি। অল্প বয়সীরা এবার বলতে শুরু করেছে 'তেমন জমছে না সত্যদা, জমজমাট কিছু লাগান এবার!' সত্যশরণ খেঁকিয়ে ওঠে—'অন্য পুজোয় চারদিন ধরে এমন ভোগ পাবি?' সত্যিই, সবার পুজো। সবাই সাধ্যমতো চাঁদা দেয়। কিন্তু চারটে দিন প্রায় কারুর বাড়িই হাঁড়ি চড়ে না। সপ্তমীর দিন্না খিচুড়ি, অষ্টমীতে লুচি, নবমীতে পোলাও, আর দশমীর দিন সাদা ভাত। ভোগ রান্না হয় পণ্ডিতবাড়ি। পাড়ার বাছবাছা মেয়েরা গিন্নিরা রাঁধেন। দুপুর বারোটা একটা থেকেই দীয়তাং ভুজ্যতাম্। লম্বু এইসব প্রসাদগ্রহণেরও ছবি তোলে পটাপট।

শিবানী বলল—'ওদের জমজমাটের সাধটাই বা অপূর্ণ থাকে কেন? এই শ্রীলা, শুক্লা লাগা জলসা।'

সুতরাং অস্টমী-নবমী দুদিন সন্ধ্যাতেই দারুণ জলসা হল। বড় কাঠের পাটাতনে হুড়হুড় করে আলপনা দিয়ে ফেলল শ্রীলা আর শুক্লা, হাত লাগাল পাড়ার ছোট মেয়েরা। স্টেজ সাজিয়ে ফেলল কুমারের সঙ্গে পাড়ার ছোট ছেলেরা, বড় ছেলেরা। যে যা জানে শোনাল। গান, আবৃত্তি, কমিক, নাটক। কিন্তু মাতিয়ে দিল শুক্লা একাই। হেন গান নেই সে জানে না, যে যা ফরমাশ করছে অবলীলায় গেয়ে যাচ্ছে। অন্যরাও যে দোয়ারকি দিচ্ছে না তা নয়। কিন্তু সে একাই একশ। সে গান শুনে মাঝরাতে তর্করত্ন বিছানায় উঠে বসলেন—'কে গায়? আহা, নবমীতেই এমন পূর্ণিমার জ্যোৎস্না ছুটিয়ে দিলে কে গো?'

দশমীর দিন সকালে সব্বাইকার মন খারাপ করে দিয়ে ওরা চলে গেল। বক্স ক্যামেরায় তোলা একখানা ছবি ওরা পণ্ডিতমশায়ের হাতে দিয়ে বলল—'চলি তবে, কটা

দিন বড় ভালো কাটল।' ছবি হাতে অবাক হয়ে থাকে মানুষজন। এর মধ্যে কোথায় কী পেল, ছবি পষ্ট উঠে গেল কাগজে?

চলে গেল ওরা। একটা রিকশায় লম্বু আর কুমার। গালের ভাঁজে ভাঁজে হাসি। আর একটায় তিন মেয়ে। জানলা দিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখলেন পণ্ডিতমশাই। বড় ভালো লেগেছে ছেলেমেয়েগুলোকে। একটাই দোষ। প্রণাম করে না।

প্রতিমা বিসর্জন হচ্ছে। তর্করত্ন বহুকষ্টে সদরে এসে দাঁড়িয়েছেন। সামনে দিয়েই ওরা ঠাকুর নিয়ে যাবে। দর্শন হোক। কাঠের তলায় তলায় চাকা লাগিয়ে বিসর্জনের গাড়ি তৈরি হয়েছে। একটাতে ধরে না তাই দুটো। একটাতে দুর্গা-লক্ষ্মী-সরস্বতী, আর একটাতে কার্তিক-গণেশ। দেখতে দেখতে হঠাৎ হু হু করে কেঁদে উঠলেন তর্করত্ন পণ্ডিত। বিসর্জন শেষ করে যখন সবাই ফিরে এলো তখনও তিনি অশ্রুমোচন করে চলেছেন। একেবারে বিহ্বল।

মাতব্বররা সব্বাই আগে বিজয়ার প্রণাম করতে এসেছেন পণ্ডিতমশাইকে। এখানেই মায়ের শতনাম লেখা, এখানেই সিদ্ধির শরবতপান।—'কাঁদছেন কেন পণ্ডিতমশাই? আসছে বছর আবার হবে!'

সবাইকে অবাক করে দিয়ে পণ্ডিত বললেন—'কাঁদছি কি আর শোকে রে ভাই! কাঁদছি আনন্দে। তাঁকে চিনতে পারি নি। কিন্তু তিনি যে এসেছিলেন।'

—'কে এসেছিলেন?'

কাঁপা কাঁপা হাতে ছবিটি এগিয়ে দিয়ে পণ্ডিত চোখ মুছতে মুছতে বললেন—'দশ হাতে সেবা করে গেল অথচ প্রণাম করল না তাতে বুঝিনি, অলৌকিক গান শুনিয়ে গেল তাতেও বুঝিনি রে, তোদের প্রতিমার মতো ভাগে ভাগে চলে গেল মা, কই তখনও তো...' পণ্ডিত আবার চোখ মুছলেন।

সবাই দেখল—একটা আবছা আবছা ছবি। শিবানী দাঁড়িয়ে আছে হাসিমুখে দুপাশে শ্রীলা আর শুক্লাকে নিয়ে। সামনে হাঁটু মুড়ে বসে লম্বু আর কুমার। মাঝখানে শিবানীর কোলের কাছে চেয়ারে বসে পণ্ডিতমশাই।

হেসে-কেঁদে পণ্ডিত বললেন—'নাম শুনেও বুঝলে না জীবন? শিবানী-শ্রীলা-শুক্লা—মা জগজ্জননী লক্ষ্মী সরস্বতী। লম্বু হল গিয়ে লম্বোদর আর কুমার হল কুমারসম্ভবের কার্তিকেয়। ছদ্মবেশে এসে পুজো নিয়ে গেলেন মা, চিনতে পারিনি।'

কিছুকাল পরে কলকাতার এক মাঝারি বাংলা কাগজে 'তর্করত্নপাড়ার পুজো' নামে একটি ফীচার বেরোল, বেশ কিছু রঙিন ছবি সমেত। লেখকের নাম পঞ্চরত্ন ঠাকুর। কাগজটা এসেছে পোস্টে সেক্রেটারি সত্যশরণের নামে। সবাই মিলে ঠিক হল সেটা পণ্ডিমতশাইকে দেখানো হবে। তাঁর অদ্ভুত ভুলটা ভাঙানো দরকার।

সকালের রোদ ফটফট করছে। শীতের মৃদু হাওয়া। জানলা দিয়ে পণ্ডিতমশাইকে দেখা যাচ্ছে খাটো ধুতি পরে তেল মাখছেন। মুখে শিশুর হাসি। পঁচাশিতে পৌঁছে তর্করত্ন পণ্ডিত যেন হঠাৎ বড় রূপবান হয়ে উঠেছেন।

সত্যশরণ হঠাৎ কাগজখানা জীবনবাবুর হাত থেকে টেনে নিল, বলল—'থাক না জীবনকাকা, থাক।'

জীবনবাবু পণ্ডিতমশাইকে দেখছিলেন। সত্যর দিকে চাইলেন, বললেন—'ঠিক সত্য, ঠিক। যার যেমন পুণ্য সে তেমনই বুঝুক।'

অবস্থান

ওয়াজিদ? ওয়াজিদ আলি শা? খিদিরপুরে থাকেন বললেন না?—কেমন উৎসাহিত উত্তেজিত গলায় বলল খুকিটি। ছুট্টে গিয়ে আজকালের সব টেপটাপ হয়েছে, সেই একখান চালিয়ে দিল—বাবুল মেরা নৈহার ছুট হি জায়—ঘুরে ঘুরে মিহিন সানাইয়ের সুরে বাজতে লাগল টেপটা।

—ভাল লাগছে? আপনার ভাল লাগছে এই গান? জ্বলজ্বলে চোখে খুকি বলে।

কী করবে? মাথাটা তালে তালে নেড়ে দেয় সে। ভাল আসলে লাগছে না ততটা। কিন্তুক অত উৎসাহের আগুনে ফুস করে জল ঢালা যায় কি?

খুকি অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে থাকে।

—আপনার পূর্বপুরুষের লেখা গান। জানেন তো? নবাব ছিলেন ওয়াজিদ আলি শা। ঠিক আপনার নাম। এক্কেবারে হুবহু।

এত উৎসাহ, উত্তেজনা, গান-ফানের কিছুই বোঝে না সে।

—ওয়াজিদ নয় খুকি, আমার নাম ওয়াজির, ওয়াজির...। আলি নয়, শা নয়, মোল্লা—থেমে থেমে বলে সে। গলার আওয়াজটা বড়ে গোলামের মতো না হলেও বেশ জোয়ারিদার।

—মোল্লা? ওরে বাবা—খুকি যেন চমকে ওঠে।

—কেন? 'ওরে বাবা' কেন?

—সে আমি বলছি না—জেদি ঘাড় দোলায় খুকি।

—আমি বুজতে পেরেছি—ওয়াজির মোল্লা দাড়ির ফাঁকে হাসে।

—বুঝতে পেরেছেন তো?—খুকির গলায় সোয়াস্তি। বস্তুত দু'জনেই হাসে। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ষড়যন্ত্রীর হাসি।

—কিন্তু আপনাকে ওয়াজিদ আলি শা সাহেব বলেই ডাকব। কেমন?

—এটা কিন্তুক বুজলুম না খুকিসাহেব। ওয়াজির মোল্লা মন দিয়ে পাকা পুডিং, রজন জ্বাল দেয়। নুটি ঠিক করে মার্কিনের টুকরোর মধ্যে ঝুরো তুলো ভরে।

—খুকিসাহেব?—খুকিটি ভীষণ হাসি-হাসতে থাকে। লুটিয়ে লুটিয়ে পড়ছে একেবারে।

এত হাসি! ওয়াজির মোল্লা তার পালিশের নুটি নিয়ে অপ্রস্তুত। এত কিছু মজাদারি আছে নাকি কথাটায়! নাকি সিরেফ জওয়ানি। যৌবনই এমন বাঁধভাঙা হাসি হাসায়।

খুকির বাবা একটুকুন আগে অফিস চলে গেছেন। এবার মা যাচ্ছেন। নাম্বা নাম্বা ইস্ট্র্যাপের ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে খুটখুট করে ছ্যাকরা গাড়ির ঘোড়ার মতো, না না ছ্যাকরা গাড়ির ঘোড়া হতে যাবেন কেন? কত বড়মানুষ! এতগুলিন সামানে ল্যাকর পালিশ দিবেন। ব্যাপ্‌রে। সেন্টের গন্ধে ভেসে যাচ্ছে চাদ্দিক। চকচক কচ্ছে চামড়া। কত ল্যাকর কত জলুসের জান! ছ্যাকরা গাড়ির ঘোড়া কেন হতে যান! ইনি হলেন গিয়ে ভাল জাতের রেসের ঘুড়ি। যেমনটি কুইনের পার্কের পাশে ঘোড়দৌড়ের বাজির মাঠে দেখা যায়! অতটা নাম্বাই-চওড়াই নেই। তা না-ই থাকল।

উনি বললেন—অত কী বকবক্ করছিস খুকি। কাজটা হবে কখন?

—আমার হাত কামাই নেই দিদিসাহেব। নুটি চালাতে চালাতে মোল্লা বলে।

—তা হোক, খুকি, বড্ড বিরক্ত করছ!

—না মা। ইনি একজন বিশেষ মানুষ। হিস্ট্রির লোক। এঁর নাম জানো? ওয়াজিদ, ওয়াজিদ আলি শাহ্। খিদিরপুরে থাকেন।

—তা-ই-ই! ভীষণ অবাক আবিষ্কারের দৃষ্টিতে কর্ত্রী তাকলেন।—চেহারাটাও দেখেছিস!

খুকি আবার হাসতে থাকে!—তুমি তো আমজাদের চেহারার কথা ভেবে বলছ। আসল মানুষটা তো নয়! তোমার যা হিস্ট্রির সেন্স।

—আহা, আমরা লেম্যান তো ওইভাবেই জেনেছি! এ মিলটাও কি কম আশ্চর্যের!

ওয়াজির মোল্লা জানে না, কেন এই আশ্চর্য, কেনই বা আবিষ্কার। কিসের মিল। কেন মিল। ভুল নাম নিয়ে কেনই বা এত কচলাকচলি! তবে সে আর শুধরে দেয় না। কী দরকার! রুজি যাদের কাছে, একটু-আধটু ভুলভাল বলে তারা যদি খুশি থাকে, থাক।

—আমার মাকে দিদিসাহেব ডাকলেন কেন?

কর্ত্রী চলে যেতে খুকিটি আবার জিজ্ঞেস করে। প্রশ্নের তার শেষ নেই।

—কেন? ভুল হয়েছে কিছু?

—না, ভুল নয়। সবাই তো মা, বউদি এ সব বলে। ও, আপনাদের 'বউদি' নেই, না?

ওয়াজির মোল্লা কাঁধের কিনার দিয়ে চিবুক চুলকাতে চুলকাতে ভাবতে থাকে। —তাই তো? দিদিসাহেব কেন? এই ডাকগুলান মুখ দিয়ে আপ্‌সে বেরিয়ে যায়। এখন তার কার্যকারণ বাতলাও এই কৌতূহলী বালিকার কাছে। মাথায় সিন্দুর নাই। ঘোমটা নাই। খাটো চুল গুছি গুছি পিঠ ঝেঁপে আছে। ঝুলঝুলে দুল। গলায় ঝুটো পাথরের দেখনাই হার। হাতেই বা কী? একটা হাতঘড়ি। একটা কাঠ না কিসের বালা। এমন ধারা শো হলে মা ডাকটা ঠিক হয় না। দিদিই ঠিক। কিন্তু এসব কথা খুকিকে বলা যাচ্ছে না। সে খানিকটা প্রশ্নের উত্তর বেমালুম উড়িয়ে-এড়িয়ে বলে—সাহেব মানে একটা মান, একটা সন্‌ভ্রম, সন্‌ভ্রম, বোঝেন তো?

খুকি আবারও প্রচুর হাসে। সন্‌ভ্রম? কী বললেন? সন্‌ভ্রম?

খুকি বলতে ঠিক যতটা বাচ্চা হওয়া দরকার, এই খুকি কি ততটা? উলিথুলি চুল। চক্ষু দুটি ডাগর। তাতে ভাসে কৌতুক, কুতূহল, কোশ্চেন, ছোট্টখাট্ট, সবই ঠিক। কিন্তু খুকি খুকি শো থাকলেও এঁর সোমত্থ বয়স হয়েছে। ঢলঢলে কামিজ তবু বোঝা যায়। তা ছাড়াও, চলন-বলন ছোটন-দাঁড়ান, কাজ-কম্মের একটা গোছ ধরন সবই ওই কথাই বলে।

—তুমি ইস্কুলে যাবে না?

—আমি কলেজে পড়ি, সেকেন্ড ইয়ার।

—ওরে বাবা! সেকেন কেলাস একেবারে? তবে তো খুব ভুল হয়ে গ্যাছে খুকিসাহেব? তা আপনি কলেজে যাবেন না?

—টেস্ট হয়ে গেছে, এখন আর যেতে হয় না।

—বা বা—বাহবাটা কেন দিল মোল্লা তা জানে না।

শীতের বাতাসে বেশ আঁচ লেগেছে। শুখুটে শুখুটে দিনগুলো। পুরনো সামান সব ঘষেমেজে, বাটালি দিয়ে চেঁছে ফেলে, নতুনের সঙ্গে তাকে মানিয়ে-গুনিয়ে কাজ। দরজার এড়ো, ক্যাবিনেটের পাওট্ সব নতুন করে বাদাম কাঠ মাপসই করে করা। এখন আর সব মিস্তিরি জব্বর, গোপাল, মুন্না—সব কটিকে বিদেয় করে দিয়েছে। একটু একটু করে সাজিয়ে তুলতে হবে এখন সব। একা একা। অভিনিবেশ চাই তো না কী? শীতের শুখো থাকতে থাকতে সারতে হবে।

যবে থেকে একলা কাজ করছে আপন মনে, খুকিটি সেই ইস্তক সেঁটে আছে। অবিশ্যি সেঁটে বলতে ঠিক সেঁটে নেই। মাঝে মাঝে একেবারে অদর্শন হয়ে যায়। তারপর ঘুরছে ফিরছে, কাছে এসে বসছে, এটা ওটা নাড়ছে চাড়ছে। আর ফুলঝুরির মতো কোশ্চেন।

—আরে সব্বনাশ, ও ঢাকা খুলেন না, খুলেন না।

—কেন?

—ইস্প্রিট সব ভোঁ হয়ে যাবে। পড়ে থাকবে পানি। জল।

—জল? স্পিরিটে জল?

—একটু আধটু ভেজালি এই লাইনে সবাই দিচ্ছে খুকি, কাকে ফেলে কাকে ধরবেন?

—কী করে বুঝলেন জল আছে?

—এই দ্যাখেন,—নিজের মোটা মোটা খসখসে আঙুলগুলি মেলে ধরে ওয়াজির।

—চামড়া কেমন কুঁকড়ে উঠেছে দেখেছেন? এই হল গিয়ে পানির নিশানি। মনোযোগ দিয়ে দেখে খুকি।

—স্পিরিট শুদ্ধ থাকলে কি হত?

—পেলেন থাকত চামড়া—স্পিরিটের মধ্যে গালা ঢালে ওয়াজির।

—কী দিলেন ওগুলো?

—গালা, কুসমি গালা, খুকিসাহেব।

—কুসমি? কুসমি কেন?

—ডিমের কুসুম দেখেন তো? তলতলে কাঁচা-সোনা কাঁচা-সোনা বর্ণ? সেইমতো হল গিয়ে বাজারের সেরা গালা। ফার্নিচারে মারলে কাঠের ওরিজন্যাল রঙটিই ধরবে। এমন ঝিলিকদার হবে যে, এদিক থেকে লাইট মারলে ওদিকে পিছলে পড়বে।

—তা অ্যাত্তো সব হাঁড়ি-কুঁড়ি বাটি-ঘটি নিয়ে কী করছেন?

—খেলা করছি। রান্নাবাড়ি—ছোট ছেলেরা খেলে না?

—খেলাই তো।

—খেলা, কিন্তুক কেমন জানেন? পরাণপণের খেলা।

—কেন এর মধ্যে আবার প্রাণপণের কী হল?

—ও আপনি বুঝবেন না খুকিসাহেব। এ হল গিয়ে রং ফেরাবার খেলা। একেকটি খোরায় জানের একেকটি ধরে রাখছি।

—দেখি দেখি কেমন আপনার জানের রং।

—তো দ্যাকেন, এই রং মেহগনি, ডার্ক ব্রাউনের সঙ্গে ভুষো কালি, একটু এই

অ্যাতোটুকু সিন্দুর...

—সিন্দুর?

—বাঃ, আপনারা সাজেন আর আপনাদের ফার্নিচার সাজবেন না! সিন্দুরে, আলতায়, কাজলে, সুর্মায় সাজবেন বই কী! তারপর কাপড় পড়বেন ঝা চকচক!

—কী কাপড়? সিনথেটিক তো? নাইলন। এতক্ষণে খুকি খেলাটা ধরতে পেরেছে।

—না খুকিসাহেব, ওরে কি কাপড় কয়? পরবে বেনারসি, তসর, মুগা, বিষ্ণুপুরের বালুচরি।

—ওরে বাবা! কই বেনারসি, তসর এসব কই?

—বানাচ্ছি। খাপি মিহিন খোল। এমন গ্লেজ দেবে যে সিল্কের সঙ্গে তফাত করতে পারবেন না। চোখে ঝিলিক মারবে।

—সবই তো দেখছি একরকম!

—আরে সাহেব, সবই একরকম হলে কি আর এত ছাবাছোবার দরকার হত? এই দ্যাখেন এরে কচ্ছে ওয়ালনাট। বড় বড় হৌসে এই রং লাগায়। আই. সি. আই., আই. টি. সি., টাটা স্টিল...। ওয়ালনাটেরই কি আর একরকম ? তিন-চার রকম আছে খুকি। আপনারা হয়তো দেখে কইবেন মেহগনি। যে জন জানে সে জন বুঝবে।

খুকি একটা কাঠের টুকরো তুলে নিল, বলল—বাঃ, খুব সুন্দর তো ধরিয়েছেন রঙটা।

—ধরাব না? আপনার মা-বাবা এসে স্যাংশন দিবেন তবে না? কাঠের পিসে সবরকমের ধরতাই দিয়ে রাখছি।

—এতে কী দিয়েছেন?

—কিচ্ছু না, কুসমি গালার রসের সঙ্গে এই অ্যাট্টুকুনি বেগনি রং।

—তাতেই এই টিন্টটা এসে গেল?

—তাতেই। তারপর আছে ঘষামাজা। আপনারা মাথা ঘষেন না? একবার দুবার। তারপর মুখে কিরিম দাও, মোছো, আবার মাখো, আবার মোছো...এই সুন্দরীদেরও তেমনি। মাখবেন, তুলবেন, মাখবেন, তুলবেন। তবে না গ্লেজ আসবে। মুণ্ডু ঘুরবে দেখনদারের। এই তো সাইডটায় হাত দিয়ে দ্যাখেন।

—সত্যি তো! কী স্মুথ করে ফেলেছেন।

—আরও করব খুকিসাহেব। তারপর ফেরেঞ্চ চক মাখাব। পাউডার মাখবেন সোহাগি আমার।

তেমন তেমন লাগসই উপমাগুলো ওয়াজির মোল্লা খুকির সামনে বলা উচিত মনে করে না।—যত্ত চিকনচাকন হবে দেহখানি বিবির পালিশ তো তত্ত খুলবে! না কী?

তা এইটুকু শুনেই খুকির মুখ সামান্য লাল হয়। সে বলে ওঠে—দাঁড়ান, দাঁড়ান, আপনার চা-টা হল কি না দেখে আসি।

বড় গেলাসের চায়ে পাঁউরুটি ডুবিয়ে ডুবিয়ে তৃপ্তি করে খায় ওয়াজির মোল্লা।

—এ মা, বর্ডারগুলোতে কালো দিলেন কেন?

—উঁ হুঁ হুঁ। কালো নয়। কালো বলেন না। ও হল ডার্ক মেহগনি। যত শুকোবে তত খোলতাই হবে। হাসতে থাকবে। এই যে ভেতরে? সব ওয়ালনাট ফিনিশ দিইছি।

দেখে ন্যান, ধারে ধারে একটু অন্যতম রং চাই, বুজলেন? অন্যতম কিছু। আবার ধরেন আপনাদের শয়নের ঘরে একরকম, তো বসার ঘরে বিকল্প চাই। সবখানেই ওয়ালনাট মেহগনি হলে হবে না। রোজউড দেব ক্যাবিনেটটাতে, দেখবেন চোখ যেন স্তম্ভিত হয়ে থাকতে চাইবে। একেবারে বিকল্প।

খুকি অনেকক্ষণ ধরেই হাসছিল, বলল—আপনি লেখাপড়া জানেন, না?

—কই আর জানলুম খুকি।

খুকির বাবা এসে ডাকেন—মিস্ত্রি।

—জি।

—নতুন রং করা চেয়ারে বসলাম, গ্লেজ তো উঠে গেল।

—তা তো যাবেই সাহেব।

—সে কী! তাহলে এত কষ্ট করে খরচা করে পালিশ করার মানে কী!

—আহা এখনও তো ফিনিশ হয়নি। শেষ অস্তে ল্যাকার পালিশ চড়াব। চক্ষে ধাঁধা লেগে যাবে।

—গ্লেজ?

—উঠবে না সাহেব। দশটি বচ্ছর চোখ বুজে থাকতে পারবেন।

—পারলেই ভাল—সাহেব গটমট করে চলে যান।

—হ্যাঁ কী যেন বলছিলেন! খুকি সুযোগ পেয়ে কাছিয়ে আসে।

—কী আবার!

—ওই যে অন্যতম, বিকল্প...ভাল ভাল কথা বাংলা রচনা বই থেকে?

—ওই সেই কথা? এই যেমন ধরুন, খুকিসাহেব আপনারা আজকালের মেয়েরা সব ম্যাচিং দ্যান না? ফলসা রঙের শাড়ি, তো সেই রঙের সায়া, সেই রঙের জামা! মনে কিছু করবেন না, সরবো চেহারা লেপেপুঁছে খেঁদিবুঁচি লাগে।

খুকি আর হাসি সামলাতে পারে না।

—আপনি হাসছেন? আমি যখন এককেটি ফার্নিচার সাজাই, তাকে জামা পরাই, সায়া পরাই, কাপড় পরাই, তখন আমার ওই লেপাপোঁছা মনে ধরে না। একটা কিছু অন্যতম খুঁজি। কেমন জানেন? লাহা বাড়িতে কাজ করতে গেছলুম। সে কি আজকার কথা! সে এক অন্যতম কাল! তা সে বাড়ির মেয়েরা সব হুরী রূপসী। আশি নম্বর একশো নম্বর কাগজ দিয়ে ঘষে ঘষে ঘষে তবে তেমনতর তেলা চামড়া হয় খুকি, তারপর খালি সবেদা দিয়ে সাদা গালার পোঁচ, সর-হলুদ বাটা আর কমলালেবুর খোসা,—গ্লেজ কী! চোখ পিছলে যায়।

—পিছলে যায়? আটকে থাকে না? খুকি হাসি চেপে দুষ্টু প্রশ্ন করে।

—উঁহু, রজন পাইল দিলে চিটে হবে, ওইখানেই তো পালিশের সরবো কারিগরি।

—আহা পালিশ নয়, ওই লাহা বাড়ির সুন্দরীদের কথা কী যেন বলছিলেন?

—ও হ্যাঁ, তা ওনারা পরতেন ধবধবে সাদা খোলের কাপড়। তাতে ভোমরাকালো, কিংবা খুনখারাবি লাল রঙের পাড়। জামা পরতেন ছিটের। লালের মধ্যে হলুদ কালো সবুজ চিকিমিকি। আর সায়াটি থাকত ধোয়া গোলাপি।

—এ মা! কী বিচ্ছিরি!

হাঁ হাঁ করে ওঠে ওয়াজির মোল্লা।—না না। একেবারে বিকল্প। ওই যে সবটি লেপাপোঁছা, হল না, অন্যতম রঙের খোয়াব রইল, তাতেই রূপগুলি বিকল্প হয়ে উঠত। এই যে বর্ডার দিচ্ছি, একটা জমিনকে আলে আলে বেঁধে দিচ্ছি; এতে করে আপনার আপন হয়ে যাবে দ্রব্যটি। উদোম মাঠ নয়, যেটা বারোয়ারি। একটা ধরুন শস্যক্ষেত্র। কেমন? নয় কি?

খুকি এখন আর হাসছে না। অভিনিবেশ সহকারে শুনছে। একটু পরে সে উঠে গেল।

বাড়িটি চমৎকার সেজে উঠেছে। ওয়াজির মোল্লাসাহেব দেখছেন। ঘরের মধ্যে যেন চাঁদনি। এমনধারা চাঁদনিতে মানুষের প্রকৃত মুখটি এই ধরা পড়ে, তো এই পড়ে না। একঘর আলো, তা বুঝি তার কতকগুলান উঁচার দিকে মুখ। মানুষগুলিকে মনে হয় খোয়াবে দেখা হুরী পরী জিন জাদুকর। হ্যাঁ জাদুকরও আছে। মোল্লাসাহেব বড় আয়নায় দেখছেন, তিনি নিজেই যেন জাদুর মানুষ। ভুষো কালি আর শ্বেত গালাতে মিলে মিশে ছোট দাড়ি। হাতের কালচে চাম ইস্প্রিটের অ্যাকশনে উঠে উঠে যাচ্ছে, কাজের লুঙ্গি আর গেঞ্জিটি আলাদা করে রাখলেও ছাপছোপ পুরোপুরি এড়াতে পারেননি। পেন্টুলে একটু আধটু নানা রঙের পোঁচ লেগেছে। হলঘরটি যেন সিনেমা হল। তার মধ্যে ফার্নিচারে আলো ঠিকরোয়, ভাল গোমেদ পাথরের কাটিং যেন।

দুটো হাঁড়ি ওপর ওপর বসানো। ফর্সা পুরনো কাপড়ে বেঁধে দিচ্ছেন কর্ত্রী।

—মিস্ত্রিসাহেব, ছেলেমেয়ে বিবিদের দেবেন গিয়ে।

—কী আছে মা এতে? দাত্রী রমণীকে আজ মা ডাকতে ইচ্ছে যায়।

—লেডিকেনি আছে। আর রসগোল্লা...ভালবাসেন তো?

—হ্যাঁ মা...চমৎকার ভালবাসি সব।

—সন্ধে হয়ে গেল আজ শেষ দিনে আপনার...আর এই শাড়িখানা...পছন্দ হয়?

—আপনার পছন্দ হয়েছে মা—ওয়াজির চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখেন, দেখান।

—খু-ব। আবার দরকার পড়লে ডাকব আপনাকে।

—খোদা করুন, ডাকবার দরকার না হয় মালিক। বিশ বচ্ছরের কাম ফতে করে গেছি। রাখতে যদি পারেন। পানি আর রোদ্দুর এই দুই হল পালিশের দুশমন। পাতলা কাপড় দিয়ে মোলায়েম করে মুছে দেবেন, বাস। আর পাড়া-পড়োশন, ভাই-বহেন এঁদের কাছে যদি সুপারিশ করেন তো...আজকাল তো পালিশ লোকে করায় না, সব তেল রং আর পেলাস্টিক রং, হাউহাউ চিৎকার করছে। পালিশের কদর ওই বনেদি বাবুরাই করেন। বিকল্প কিছু...।

শাড়িটা প্যাকেট থেকে খুলে বার করেন মোল্লাসাহেব। ছাপের কাপড়। নানান রঙের হোরিখেলা। বিবি পরবেন ভাল। মোল্লাসাহেবের তত মনোমতো হয় না। কিন্তু তিনি বলেন, সুন্দর, চমৎকার। হেসে উঠছে কাপড়, আপনার এই বাড়ির মতো। সালাম, সালাম। কাঁধে ঝোলাঝুলি নিয়ে নিচে নেমে যান মোল্লাসাহেব।

—ও ওয়াজিদ আলি শা সাহেব...একটু দাঁড়ান, একটু দাঁড়ান। হাঁফাতে হাঁফাতে

ছোট্ট জমি দিয়ে ছুটে আসে খুকিসাহেব।

ঘাসের জমিতে সবুজ টিলটিল করছে। বেগুনি আভা সাঁঝের গায়ে। মিহি কাঞ্চন রঙের সিল্কের শাড়ি পরেছে খুকি। চওড়া জাম রঙের পাড়। ভেতরে জরির সুতো, কালো সুতো চমকাচ্ছে। আর জামাতে বেশ খলখলে হাসকুটে কালো, কালো না মেহগনি, বুঝি খুকিও ধাঁধা লাগিয়ে দিয়েছে। কোনও উৎসবে যাবে বোধহয়।

—'অন্যতম' হয়েছে?

হাসি দাড়ি বেয়ে টাপুর টুপুর ঝরে।

—হয়েছে, হয়েছে।

—আর 'বিকল্প'?

চতুর্দিকে হাতড়ান মোল্লাসাহেব। 'বিকল্প'টি কি ঠিক হল? 'বিকল্প' বলে কি তিনি সবসময় এক কথাই বোঝাতে চান? 'বিকল্প' মানে এখন, এখানে 'অবিকল্প'। সেরকমটি? হয়েছে কি?

খুকি রিনরিন করে হাসে। বোঝার চোখে তাকায়।

—বিকল্পটা ঠিক হল না, না শা সাহেব?

—হল না কি?—হাঁ হাঁ করে ওঠেন ওয়াজির মোল্লা—এখন এক্কেবারে বেগমসাহেবা। হানড্রেড পার্সেন। দু'জনেই ষড়যন্ত্রীর মতো হাসতে থাকেন। একটা যে রঙ্গ হয়ে গেল সেটা উভয়েই বুঝেছে। শিল্পীর চোখে বিকল্প অর্থাৎ অবিকল্প? তাও কি সম্ভব?

—আচ্ছা চলি বেগমসাহেবা...

—আবার আসবেন ওয়াজিদ আলি শা সাহেব...

ওয়াজিদ মোল্লা কিছু দূর চলে গিয়েছিলেন। ঘুরে দাঁড়ান।

—ওয়াজির নয় কিন্তুক। ওয়াজির...ওয়াজির মোল্লা। খিদিরপুরে বাস নয়, কাজ-কাম করি ওখানে, নাহারবাবুদের ফ্যাকটরিতে। সাকিন ন'পাড়া বাগনান, সাউথ ইস্টার্ন রেলোয়ে।

নিজস্ব শিল্পভাবনার অবিকল্প নিশানখানা কাঁধের ওপর প্রশান্ত গর্বে তুলে ধরে নতুন পাড়ার দিকে রওয়ানা দ্যান ওয়াজির মোল্লা। কোনও ইতিহাস, পুরাণ কিংবদন্তীর সঙ্গে অন্বিত হতে চান না। কিছুতেই।

বারান্দা

আলমারির গা-আয়নায় চুল আঁচড়ানো এক মহা ঝামেলার ব্যাপার। জলের ছিটে লাগবেই লাগবে। ঘোলাটে জলের ছিটে। পার্থর চুল খুব ঘন, একটু লম্বা। জলসুদ্ধ না আঁচড়ালে বসতে চায় না। এদিকে মায়ের কড়া হুকুম আছে, জলের ফোঁটা পড়লেই সঙ্গে সঙ্গে মুছে দিতে হবে। মা বলে, বসন্তের গুটির মতো দেখায়। আয়না জিনিসটা

পরিষ্কার করে মোছা কিন্তু কঠিন কাজ। এদিকটা ঠিক হল তো ওদিক দিয়ে ল্যাজ বেরলো। বাথরুমে একটা ছোটখাটো বেসিন আর আয়নার ব্যবস্থা যে কেন করা গেল না পার্থর মাথায় ঢোকে না। বললেই, মা বলবে—তুই করবি। এটা এমন কি একটা মহামারী ব্যাপার যে পার্থর জন্য অপেক্ষা করতে হবে! মা যেন বলতে চায়—তোর বাবা তোদের সবই করে দিয়েছে, ওই বেসিন আর আয়নাটুকুই যা বাকি। ওইটুকুই করে দেখা।

ধ্যাত্তেরি! যত শিগ্গির সম্ভব রাধুদার দোকানে একটা চোদ্দ ইঞ্চির বেসিন আর একটা আয়না-অলা ছোট ক্যাবিনেট দর করতে হবে। ওরাই মিস্ত্রি দিয়ে বসিয়ে দেবে। ট্যুইশনির রোজগার পার্থর নেহাত মন্দ নয়। তার জামাকাপড়, রাহা-খরচ, হোটেল-রেস্তোরাঁ, সিনেমা-থিয়েটার, ক্যাসেট-ট্যাসেট, এমন কি ছোটখাটো বেড়ানো পর্যন্ত সবই তাতে হয়ে যায়। উপরন্তু সে সব সময়েই কিছু না কিছু সঞ্চয়ের চেষ্টা করে যাচ্ছে। মায়ের হাতে মাঝে মাঝে কিছু দেয়ও। একটা বেকার ছেলের কাজ থেকে বাবা-মা আর কী আশা করতে পারে!

বাবা ঘরে ঢুকে বলল—তোর মাকে দেখেছিস? বাবার হাতে এক তাড়া খবরের কাগজ।

—এইটুকু তো কৌটোর মতো একটা জায়গা। যাবে আর কোথায়?—চিরুনির পেছন পেছন হাত-বুরুশ টানতে টানতে বলল পার্থ।

বাবা কী যেন বলবে বলে মুখ খুলেছিল। থেমে গেল আচমকা।

উত্তরের জানলা দিয়ে খুব শিরশিরে হাওয়া আসছে। সব কিছুর মতোই শীতও দেখা যাচ্ছে লেট হয়ে যাচ্ছে। কোথায় ডিরেইল্ড হয়ে পড়েছিল কে জানে! কত দিন টানবে তা-ও বোঝা যাচ্ছে না। পাশের জমিটাতে দুটো শিমুল গাছ ন্যাড়া হয়ে এসেছে। হলদে পাতা দু-চারটে লেগে আছে মাত্র। দেখতে দেখতে আরও একটা বছর কেটে গেল। কিচ্ছু হল না এখনও। সে কি তবে কনফার্মড বেকার হয়ে যাচ্ছে না কি! অচিন্ত্যদার মতো? গা-টা শিরশির করে উঠল। পুরনো পাড়ায় অচিন্ত্যদা ছিল উৎসাহী পাড়া-দাদাদের একজন। পুজোর চাঁদা, জলসা, কেউ মরলে শ্মশানবন্ধু জোগাড় করে কাঁধ এগিয়ে দেওয়া—সব বিষয়েই এক নম্বর। বি. কম-টম কিছু একটা পাস করলো বোধহয়। স্টেনোগ্রাফি, টাইপরাইটিং শিখলো, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নামও লেখালো। তখন পার্থরা স্কুলের নিচের ক্লাসে পড়ে। চারদিকে এত কম্পিউটার সেন্টার হয়নি। অচিন্ত্যদা বলত, চাকরি পেলেই চকলেট খাওয়াবে। কিন্তু চাকরির জন্য অনন্ত প্রতীক্ষা বেচারির আর শেষ হল না। ক্রমে এক বছর পুজো-মণ্ডপে ব্যস্ত পাড়া-দাদাদের মধ্যে অচিন্ত্যদাকে আর দেখা গেল না। কবে যে সে সব বিষয়ে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে, কবে যে তাকে হেপাটাইটিসে ধরেছে, সে যে খাচ্ছে না, বিছানা থেকে উঠছে না কেউই খেয়াল করেনি। অচিন্ত্যদা লোকচক্ষুর অগোচরেই মরে গেল। স্রেফ মরে গেল। একজন অত্যন্ত সাধারণ ছেলে যদি জীবন-দৌড়ে ক্রমে পিছিয়ে যায়, তবে? তবে সে বাতিল হয়ে যায় এইভাবে। তার চেয়ে এম.এ. পাশ করেছি, ল' পাশ করেছি এ সব গ্যাদা গুমোর না রেখে যা হোক একটা ব্যবসা ধরে ফেলা ভাল। জেরক্স আজকাল ভাল ব্যবসা। যে কোনও জিনিসের তিন-চারটে ফটোকপি চাওয়া ফ্যাশন হয়েছে

আজকাল। লাইব্রেরির বই পর্যন্ত আজকাল কেউ নোট করে না। সব জেরক্স। বাবাকে ফটোকপি মেশিন কেনার কথাটা সে বলেছিল ক'মাস আগে। তা বাবা বলল—এফ. ডি. ভেঙে, ব্যাঙ্ক লোন নিয়ে না হয় তোর মেশিন হল। কিন্তু বসবি কোথায়? একটা চার বাই আট-দশ ফুট দোকানঘরের ভাড়া-সেলামি এখন কত শুনবি?

বলেই বাবা বলেছিল—আহা, বাড়িটা বেচে দিলুম। থাকলে নিচের ঘরটাতে বসতে পারতিস!

পাঁউরুটিতে দ্রুত হাতে মার্জারিন লাগাতে থাকে পার্থ। ঘুম থেকে উঠতেই আজ দেরি হয়ে গেছে। আসলে আজ ট্যুইশানিতে যেতে হবে তার মনেই ছিল না। মাকে হাতের কাছে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। দ্বিতীয় কাপ চা-টা বোধহয় হবে না। না-ই হোক। সিংঘিদের বাড়িতে তো চা-টা দেবেই। টা যা দেবে সে-সব অবশ্য শৌখিন খাবার। সাবুর পাঁপর, সন্দেশ, রসগোল্লা, ডালমুট। ও সবে পেট ভরে না। তাছাড়া পড়াতে গিয়ে রোজ রোজ খেতে কেমন ঘেন্নাও করে তার। টিউটর বলেই হ্যাংলা, হা-পিত্যেশ মনে করিসনি বাবা। যাঃ, নিয়ে যা তোদের পাঁপর-সন্দেশ, অনেক খাওয়া আছে ও সব। তবে চায়ের কথা আলাদা, চায়ের যেমন কোনও ফুড-ভ্যালু নেই, তেমনি কোনও সময়-অসময়ও নেই। চা-টা সুতরাং চলতে পারে। ছাত্র-বাড়ির চায়েতেও অবশ্য চূড়ান্ত অবহেলা দেখিয়ে থাকে সে। খাতা দেখছে তো দেখছেই, লেকচার দিচ্ছে তো দিচ্ছেই। ছাত্র-ছাত্রী এক সময়ে বলবে—কী হল পার্থদা! চা-টা তো বরফ হয়ে গেল!

—ওহ হো, যাকগে। এদিকে দেখো, আবার সেই একই ভুল করছো...ঠাণ্ডা চা-টা এক চুমুকে খানিকটা খেয়ে মুখটা সামান্য বিকৃত করে কাপ নামিয়ে রাখে পার্থ।

—আরেক কাপ আনব? আনি?

—নাহ্, বেশি চা খাই না। এদিকে মন দাও তো দেখি...

এই আচরণ করে পার্থর নিজেকে বেশ বড় বড়, গম্ভীর-গাম্ভার প্রতিষ্ঠিত, মর্যাদাবান মানুষ বলে মনে হয়। নিজের কাছে নিজেকে মর্যাদার যোগ্য মনে হওয়াটা খুব জরুরি।

কেন এই বিশ্রী আত্মসচেতনতা? কবে থেকেই বা হল? চেষ্টা করেও এ রোগটা সে তাড়াতে পারছে না কেন?

মা ঢুকছে। এক কাপ দুধ এনে রাখল।

—কার এটা?

—তোর। আবার কার? পাউরুটিগুলো শুকনো খাচ্ছিস!

—বাবাকে দাও না!

কেমন আহত চোখে তার দিকে তাকাল মা। পরক্ষণেই চোখের ভাব বদলে গেল। একটু যেন কঠিন।

—খেয়ে নে।

বাবা তড়বড় করে ঢুকে বলল—রিপাবলিক ডে বলে তিনটে কাগজ দিতে কি তুমি বলেছ?

মা বলল—না তো! তুই বলেছিলি নাকি পার্থ?

—ঘাড়ে ক'টা মাথা আমার?

মার চোখে তিরস্কার। বাবা বলল—দেখো তো! কেউ বলেনি, অথচ একতাড়া কাগজ গুঁজে দিয়ে গেছে কোল্যাপসিবলের খাঁজে। দেখাচ্ছি মজা! এবার দাম দেব না এসব কাগজের!

এক চুমুকে দুধটা শেষ করে দরজার দিকে পা বাড়াল পার্থ, বলল—দ্যাখো, হয়ত দাদাদের অর্ডার ছিল, ওখানে দিতে গিয়ে এখানে দিয়েছে।

সিঁড়ি ভাঙতে লাগল সে। চারতলায় ফ্ল্যাট তাদের। তার কোনও অসুবিধে নেই। কিন্তু বাবার হার্টের গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে। অ্যানজাইনার ব্যথা হয়। বাবার পক্ষে এই চারতলার সিঁড়ি রোজ রোজ ভাঙা মোটেই ঠিক নয়। মায়ের হাঁটুর ব্যথা। শতকরা নিরানব্বই জন বাঙালি মহিলার এই আর্থারাইটিস জাতীয় কিছু একটা হবেই। তবুও চূড়ান্ত অদূরদর্শীর মতো বাবা এই ফ্ল্যাটটা কিনল। বাড়িটা তাদের পুরনো হয়ে গিয়েছিল, আপাদমস্তক সারানো মানে পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকার ধাক্কা, সেটা বাবার পক্ষে বার করা মুশকিল ছিল। সবই ঠিক। কিন্তু কথাটা হচ্ছে, বাড়িটা তো বাবা সে জন্যে বিক্রি করেনি! করেছে দাদার ম্যানেজমেন্ট পড়বার টাকা জোগাড় করতে। এই ছোট্ট ফ্ল্যাটটা কিনে দাদার পড়ার খরচটাও হয়ে যাবে বলে বাবা ঝট করে বাড়িটা ঝেড়ে দিল। দাদা এঞ্জিনিয়ারিং শেষ করতে না করতেই ভাল চাকরি পাচ্ছিল। তারাই কোনও সময়ে ওকে ম্যানেজমেন্টের কোর্স করিয়ে নিত, কিন্তু দাদার তর সইল না। সবচেয়ে দামি কোর্স করার জন্যে পরীক্ষা দিয়ে, ইন্টারভিউ দিয়ে একেবারে গেট সেট গো। দাদা চাকরি করলে যে সুরাহাটা হত সেটা তো হলই না, উপরন্তু অতিরিক্ত টাকার ধাক্কা। ঠিক কত টাকা, বাবা-মা তাকে বলেনি কখনও। কিন্তু লাখের যথেষ্ট ওপরে হবেই এ বিষয়ে তার কোনও সন্দেহ নেই। তাদের মতো পরিবারের ছেলের এই ধরনের গা-জোয়ারি উচ্চাকাঙ্ক্ষাব কোনও যুক্তি আছে!

বাবার যুক্তি ছিল—তীর্থ ওখান থেকে পাশ করেই বিশাল একটা মাইনের চাকরি পাবে। পার্থর বলার ইচ্ছে হয়েছিল—চাকরিটা তীর্থ পাবে বাবা, তুমি তো কিছুতেই পাচ্ছ না!

ইচ্ছে হলেও সব কথা বলা যায় না। পাঁচ বছর আগেকার কথা তার ওপর। বয়সটাও তো পাঁচ বছর কম ছিল! তবু কিছু কিছু বলতে সে ছাড়েনি। দাদাকেই বলেছিল—তোর একটা অ্যামবিশন পূর্ণ করবার জন্যে বাবাকে তার পিতৃপুরুষের বাড়ি বিক্রি করতে হচ্ছে, এটা তুই কেমন করে হতে দিচ্ছিস আমি জানি না দাদা।

দাদা অদ্ভুত একটা কথা বলেছিল, একেবারেই সেটা আশা করেনি কেউ, পার্থ না, বাবা না, মা তো না-ই।

দাদা বলেছিল—পিতৃপুরুষ তো আমারও, বাড়িটায় আমারও তো অংশ আছে!

বলে ফেলে খুব অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল দাদা—আমি প্রতিটি পাই পয়সা শোধ করে দেব বাবা, দেখো!

তা অবশ্য দিতে চেয়েও ছিল দাদা, বাবা এত বোকা, এত সেন্টিমেন্টাল যে নিল না। বোধহয় পিতৃপুরুষের বাড়িতে বড় ছেলের অংশ থাকার কথাটা বিঁধেছিল বুকে। হয়ত ভেবেছিল টাকাটা যদি ঋণও হয়, সে ঋণ শোধ না হলে ছেলের সঙ্গে সম্পর্কটা পোক্ত থাকবে। টাকাও হারালো, ছেলেও বাবা-মার থাকল না। টাকাটা থাকলে পার্থর

ফটো-কপি মেশিন ও আনুষঙ্গিকের একটা সুরাহা হত। কিংবা কে জানে, বাবা হয়ত এক ছেলেকে দিয়ে ঠকেছে বলে আর এক ছেলেকে আর দিতই না।

নিজেকে এক সময়ে খুব নীচ মনে হল পার্থর। বাবা এই সেদিনও খেদ করছিল, পুরনো বাড়িটা থাকলে তার একতলার রাস্তার দিকের ঘরটায় পার্থর ফটো-কপি মেশিন, ক্রমে ক্রমে অ্যামোনিয়া প্রিন্টিং মেশিন এ-সব বসতে পারত।

বাবা আসলে একেবারেই প্র্যাক্টিক্যাল নয়। বাড়িটা যতই পুরনো হোক, ছোট হোক, একটা গোটা বাড়ি। ছিলও কর্নার প্লটে। লোকেশনের একটা আলাদা মূল্য আছে। ফট করে যা পেল নিয়ে বেচে দিল। এই ফ্ল্যাটটা সাতশো স্কোয়ার ফুটের। দুটো ছোট ছোট শোয়ার ঘর বসার ঘর ছাড়া এক চিলতে খাবার জায়গা আর দক্ষিণে এতটুকু একটা বারান্দা। বিয়ে করে দাদার সুবিধেই হল আলাদা থাকবার। একই তলায় উলটোদিকের ফ্ল্যাটটা খালি ছিল। সেটাই ভাড়া নিয়ে আছে। তবে শিগ্‌গিরই দিল্লি কি বোম্বাইয়ে পোস্টিং পেয়ে যাবে। তারপর আর এই আবাসনে দাদা ফিরছে না। একথা বাবা-মা যদি না-ও জানে, পার্থ অভ্রান্তভাবে জানে।

সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে একটা বিশ্রী ঠোক্কর খেল পার্থ। কয়েকটা থান ইট সারি বেঁধে রাখা। ছিটকে পড়ছিল পার্থ। খুব সামলে নিয়েছে। তিনটি বালক ঢুকছিল গেট দিয়ে। শাঁ-শাঁ করে ছুটে এল।

—চোট লাগল? পার্থদা? পচা বলল।

—কে রেখেছে এখানে থান ইটগুলো?

—আমরা—অপরাধী গলায় বলল ওরা, ছাদ থেকে নামিয়ে আনছিলুম...উইকেট হবে...

—চমৎকার! তা আমাকেই তো আউট করে দিচ্ছিলি। সঙ্গে সঙ্গে এগুলো সরাতে কী হয়েছিল?

—দ্যাখো না, দ্যাখো না, তিনজনে কলবল করে ওঠে—হাওয়াই চপ্পল দিয়ে বেল বানাচ্ছি, রাজুটা ফালতু ফালতু তক্কো জুড়ল...

—কী তক্কো? পার্থ প্যান্টের ক্রিজ ঠিক করতে করতে বলল।

রাজু বলল—আচ্ছা পাত্থদা, মোহাব্বৎ ঔর প্যার, এক হী চীজ ক্যা? পচা বোলতা, প্রেম ভালোয়াসা হী এক। এক হী মত্‌লব। সচ্‌!

তৃতীয় খোকা মুন্না বলল, ওতো বলছে লভও এক।

মুন্না এ বাড়ির কেয়ার-টেকার কাম দারোয়ান মিশিরজির ছেলে। রাজু আর পচা ওর বন্ধু। দশ-এগারোর মধ্যে বয়স ওদের। শব্দগুলো ওদের মুখে খুবই কিম্ভূত শোনাচ্ছিল।

—তা তফাতটা কী? কী বলে মনে হচ্ছে? পার্থ কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল।

রাজু বলল—মোহাব্বৎ হচ্ছে দুখ, বহোৎ দুখ দেয়, লায়লা-মজনু জৈসা, ঔর প্যার মিঠা মিঠা। সুহাগ রাত বনায় গা, ঘুংঘট উতারেগা।

—আর প্রেম ভালবাসা?

—উও সব ফালতু কহানীতে থাকে। কোনও মানে নেই।

—বাঃ। আর লভ্‌?

এবার তিন বালক পরস্পরের দিকে কেমন অশ্লীল চোখে চাইল। দু আঙুল মুখের

মধ্যে পুরে সিটি দিল রাজু।

মুন্না ছেলেমানুষের গলা হেঁড়ে করে গেয়ে উঠল—লব্ তুঝে লব ম্যাঁয় করতা হুঁ।

রাজু বলল—বাস্। এহী চীজ।

পার্থ বলল—পথ ছাড়। যেতে দে।

—কে ঠিক বলল, বললে না?

—ওরকম বাজে সিটি-ফিটি দিলে বলছি না।

মুন্না বড় বড় চোখে চেয়ে বলল—ক্যা কসুর? অ্যাক্টিং তো!

—আরেক দিন বলব, আজ দেরি হয়ে গেছে—পার্থ পথে নেমে পড়ল।

বাস-রাস্তা, দুশ পনেরো নম্বরে গাদাগাদি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লাট খেতে খেতে অবশেষে সিট পাওয়া। একজনের পা মাড়িয়ে দেওয়া, কানা কিনা প্রশ্ন শোনা, হাওড়া ব্রিজে যথারীতি খানিকটা জ্যাম...চুপচাপ বসে থাকা অবশেষে হাওড়া ময়দান... পঞ্চাননতলার দিকে অভিযান। সারাক্ষণই পার্থর মনে রাজু-মুন্নার অভিনব ব্যাখ্যা ঘুরছে। প্যার মিঠা, মোহাব্বৎ বহোৎ দুখ দেয় আর প্রেম ভালবাসা ফালতু কহানীতে থাকে।

সবই কহানীতে থাকে বস্তুত। এবং সেই কাহিনী চিত্রের মাধ্যমে মূর্ত হলে তবেই তার একটা বোধগম্য অর্থ দাঁড়ায়। বোকা-বোকা প্রেম ভালবাসা, স্মার্ট-স্মার্ট প্যার-মোহাব্বৎ সবই কহানীর জিনিস, পুরাণে লোককথায় নৈর্ব্যক্তিক অবাস্তবতার আশ্রয়ে রয়েছে। এবং লভ? লভ কী? কোথায় দাঁড়িয়ে আছে? যেখানে যতেক মস্তানি, রোড-রোমিওগিরি, এমন .ক রেপ, মুখে অ্যাসিড-বালব্, ছাদ থেকে ঠেলে দেওয়া সব স-বই লভ এবং লভ্-জাত। লব্ তুঝে লব ম্যাঁয় করতা হুঁ।

রাজু-মুন্নারা ক্রমশই প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ, ব্যঞ্জনা, অনুষঙ্গ সম্পর্কে আরও আরও ওয়াকিবহাল হয়ে উঠবে। পার্থকে বা আর কাউকেই জিজ্ঞেস করতে হবে না, এমন দিন ওদের বেশি দূরে নেই।

ছাত্রী মধুমিতার বাবা একটা হাফ পাঞ্জাবি আর লুঙ্গি পরে নিজেদের বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বাজখাঁই গলায় প্রতিবেশীর সঙ্গে গল্প করছেন। ওঁকে দেখলে শীত-গ্রীষ্ম বোঝা যায় না। পার্থকে দেখে বললেন—আজ রিপাবলিক ডে। বিশ্বসুদ্ধ সব্বার ছুটি, তোমার ছুটি গ্রান্ট হল না? সে কি হে?

—পরীক্ষা এবছর এগিয়ে এসেছে যে। পার্থ হাসল।

—ছাত্রী তো টিভি খুলে প্যারেড দেখছেন।

—এসে যাবে।

দু-তিন সিঁড়ি টপকে টপকে তিনতলায় উঠে গেল পার্থ। দোতলাটা পুরো মেয়েমহল। সবজি কাটা হচ্ছে, পান সাজা হচ্ছে, উচ্চৈঃস্বরে গল্পগাছা, কাজকর্ম হচ্ছে, মাছ-ভাজার গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে রয়েছে। তেলে ফোড়ন ছাড়বার চড়বড় শব্দ। কেমন যেন বে-আব্রু হয়ে যায় অন্দর, বাইরের কেউ এখান দিয়ে যাতায়াত করলে। এঁরা হাওড়ার বনেদি ধরনের মানুষ। বিরাট বিরাট চেহারা পুরুষদের। খোলা গলায়

হাসেন, দরাজ গলায় বাড়ি কাঁপিয়ে কথা বলেন, পায়ের ওপর পা দিয়ে তাকিয়া কোলে ছুটির দুপুরে তাস খেলেন। তাসের আড্ডায় গোছা গোছা পান এসে যায়। এঁদের বাড়ির মেয়েরা টকটকে ফর্সা। বৃদ্ধরা মোটা, রোগা মহিলাগুলি বাড়ির বউ, উদয়াস্ত খাটেন। বাড়ির কাজ-কর্মে, অন্তত পার্থর চোখে, কোনও শৃঙ্খলা নেই। চা এবং পান তো সর্বক্ষণ তৈরি হচ্ছে। আর, কত মিষ্টান্ন যে এঁদের ভাঁড়ারে মজুত থাকে তার ইয়ত্তা নেই। নিজেরাও খান, অকাতরে বিলিয়েও যান।

অন্দরমহলের মাঝ মধ্যিখানে একখানা ঘরে সে পড়াত আগে। তখন অন্দরমহলের যাবতীয় শব্দ, যাবতীয় কার্য-কলাপ তার কর্ণগোচর হত। একদিন বাড়ির কোনও বউ, মধুমিতার মা-কাকিদের কেউ, নিজ শাশুড়ি ও তাঁর খাস দাসীর মুণ্ডপাত করছিলেন, মধুমিতা খুব লজ্জা পেয়েছিল। তারপর থেকে তিনতলার একটা একটেরে ঘরে পড়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

এখন সিঁড়ি টপকে টপকে সেই তিনতলার টুঙ্গি ঘরেই গিয়ে উপস্থিত হল সে। মেঝে চকচকে লাল। চকচকে কালো বর্ডার ডেওয়া। মোজেইক, মার্বেল সব কিছুকেই হার মানায় এদের এই চকচকে লাল মেঝে। লম্বা লম্বা গরাদ দেওয়া দরজার মতো জানলা সব। পুরোটা খুলে দিলে মনে হয় আকাশে বসে আছি। চারপাশের সব কিছুই দেখা যায়। সব কিছু অবশ্য খুব সুবিধের নয়। চাপ চাপ বাড়ি। সোজা এক লাইনে চলে গেছে। মাঝখানে বেশিরভাগই এতটুকু ফাঁক নেই। কোথাও বা খোলা নর্দমা চিকচিক করছে। অদূরে বাজার এবং তজ্জনিত ভিড়, বেসুরো হইচই।

টেবিলের ওপর বইপত্র সব গুছোনো। বিষয় ভাগ করা। মধুমিতা খুব গুছোনো মেয়ে, এটুকু বলতেই হবে। ওর দিদি দেবমিতা পড়াশোনায় খুবই ভাল ছিল, মধুমিতা তার ধার দিয়েও যায় না। কিন্তু খুব পরিপাটি। হাতের লেখাও চমৎকার, গোটা গোটা, ভুলগুলো নিয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

এই উকিল-তনয়াকে মাধ্যমিকের সময় থেকেই টেনে তুলছে পার্থ। সে সময়টায় বাড়ি বিক্রি আর ফ্ল্যাট তৈরির ফাঁকে তারা হাওড়ার সন্ধ্যা বাজারে বাস করছিল। হাতের কাছে এই ট্যুইশনিটা পেয়ে বেঁচে গিয়েছিল সে, দুই বোনেই পড়ত তখন। বড়টির তখন ফাইন্যাল ইয়ার, পলিটিক্যাল সায়েন্সে অনার্স। নিজেও পড়ুয়া মেয়ে ছিল, পার্থকেও প্রচুর খাটিয়ে নিত। দেবমিতার বিয়ে হয়ে গেলে এখন শুধু মধুমিতা। এখনও খাটুনি আছে তবে তার ধরন অন্যরকম। মধুমিতাকে এক জিনিস অন্তত তিনবার লেখাতে হয়। অথচ মধুমিতার বাবা তাকে ছাড়তে চান না। ছাত্রী সম্পর্কে তারও যে একটা দায়িত্ববোধ জন্মে যায়নি একথাও বলা যায় না। একটা রোখ। গ্র্যাজুয়েশনের গণ্ডিটা পার করিয়েই ছাড়বে।

কিছু টাস্‌ক দেওয়া ছিল। কিন্তু টেবিলের ওপরটা পরিষ্কার। সামনে কোনও খাতা দেখতে পেল না পার্থ। কিছুক্ষণ বসে বসে বিরক্ত হওয়া ছাড়া উপায় নেই। লিখতে দিলেই মধুমিতা এই কীর্তি করবে। লিখতে নারাজ। করবে তো এ বই সে বই থেকে সংকলন। যাকে বলে পাইল দেওয়া। এই কাজটাই দেবমিতা করত চমৎকার। মধুমিতাকে সে প্রাণপণে শেখাচ্ছে, পারছে না। বোধহয় পারবার ইচ্ছেটাই নেই। বাপের পয়সা-কড়ি আছে। আদুরে তার ওপর। এদের কোনও তাগিদ থাকে না পড়াশোনার।

বইয়ের পাঁজায় একটা ময়ূরের পালক গোঁজা একটা খাতা এবার চোখে পড়ল পার্থর। টেনে বার করল খাতাটা। ঠিক। এটাই। ময়ূরের পালক, বট-পাকুড়ের পাতা, চাঁপা ফুল এই সব দিয়ে বই-খাতার মার্কা করা মধুমিতার রীতিই বটে। খাতাটা সামনে রাখতে কী হয়েছিল? উলটে-পালটে দেখল পার্থ। নাঃ লিখেছে। তবে এডিটিং-এর কাজ আজও ভাল হয়নি। মাঝে মাঝে স্টার মার্ক দিয়ে লিখে দিতে হবে তাকে।

উত্তরটার শেষ পাতায় এসে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল পার্থ। ঘটা করে লেখা— সমাপ্তি। কিন্তু তারপর কোলন ড্যাশ দিয়ে যা লেখা তা কোনওমতেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রশ্নোত্তরের সমাপ্তি নয়।

পার্থদা, আপনি বোকা, না অন্ধ জানি না। যদি আমায় কোনওদিনই বুঝবেন না তবে আমার জীবনে এলেন কেন? আমার কিছুই ভাল লাগে না। সবাই কত সুখী। আমার একারই খালি মন-খারাপ করে। নীরস বইগুলো শুধু আপনি পড়ান বলেই পড়ি। আপনার তেতো বকুনিগুলোও একই কারণে দিনের পর দিন হজম করি। এ পাড়ার সুজন্দা (চাটার্ড), আমার বন্ধুর দাদা সিদ্ধার্থ (ওযুধের বিজনেস) আমার জন্যে পাগল। কিন্তু আমার কাউকেই ভাল লাগে না। আপনাকে ছাড়া কাউকেই ভাবতে পারি না। জানি, আপনি বলবেন—আপনার চাকরি নেই। কিন্তু এম.এ.বি.এল.' পাশ করেছেন। ইনকাম-ট্যাক্স প্র্যাকটিস করুন না। বাবাকে একটু ধরলেই হেলপ করবে (দয়া করে বকা দেবেন না)।

চোখ না তুলেও পার্থ বুঝল মধুমিতা এসে দাঁড়িয়েছে। কোনও লাল ড্রেস পরছে বোধহয়, রোদ আড়াল করে লাল ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। আড়চোখে দেখে খাতার মধ্যে মুখ ডোবাল পার্থ। টকটকে ফর্সা মধুমিতা। একেবারে লাল হয়ে গেছে। চশমার আড়ালে চোখ দুটো স্তিমিত।

—আমি কি আসব? ক্ষীণ গলায় জিজ্ঞেস করল।

পার্থ জবাব দিল না।

—আসব?—গলা কাঁপছে ওর।

—তোমার ঘরে তুমি আসবে না তো কি ইউ.এস.এ.-র ফার্স্ট লেডি আসবেন? লম্বা বিনুনির প্রান্তের চুলগুলো আঙুলে পাকাচ্ছে মধুমিতা।

—খাতায় এটা কী করেছো?

মধুমিতা কেঁদে ফেলল।

—কী, বলো? নরমতর গলায় প্রশ্ন করল পার্থ।

—বলতে পারিনি বলেই তো লিখেছি।

—মানে কি এর? ইয়ার্কি? ফাজলামি?

—ইয়ার্কি নয়। কোনও মতে বলল মধুমিতা।

—তোমার বাবা আমাকে বিশ্বাস করেন। এ সব জানতে পারলে কী মনে করবেন বলো তো।

মুখ তুলে তাকাল মধুমিতা। চোখে তিরস্কার।

—বাবাকে জিজ্ঞেস করে কে কবে প্রেমে পড়েছে পার্থদা।

হঠাৎ পার্থর খুব হাসি পেয়ে গেল। বলল—প্রেম? না মোহাব্বৎ? না প্যার?

ঠিকঠাক বলো তো!

—আমার ফিলিংস নিয়ে মজা করছেন?

—মজা করছি না, আজ এখানে আসার সময়ে আমাদের ফ্ল্যাটের দারোয়ানের পুঁচকে ছেলে আর তার পুঁচকে বন্ধুদের কাছ থেকে খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাখ্যা শুনছিলাম।

—যেমন?

—ওরা বলছিল—প্রেম-ভালবাসা ফালতু কহানীতে থাকে। কোনও মানে নেই এগুলোর।

মধুমিতার চোখে এখনও জল। মুখের লাল ভাবটা কেটেছে। বিনুনি ঝাঁকিয়ে বলল—আপনার দারোয়ানের ছেলের ব্যাখ্যা আমায় মানতে হবে নাকি?

—না তা নয়। তবে চতুর্দিকের রিয়্যালিটি ওই কথাই বলে। ফিল্ম আর জীবন তো এক নয়।

পার্থ অস্বস্তি ঢাকতে একটু ইতস্তত করেই উঠে দাঁড়াল।

—চলে যাচ্ছেন?

—তোমার লেখাগুলো কারেক্ট করে দিয়েছি। প্রচুর অ্যাসটারিক্স পড়েছে। আরও চওড়া মার্জিন রাখা উচিত ছিল।

—চলে যাচ্ছেন? জোর দিয়ে প্রশ্নটা আবারও করল মধুমিতা, চোখ নামিয়ে নিয়েছে, ঠোঁট কাঁপছে খুব। পার্থ দৃশ্যটার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

—টিউটরের সঙ্গে প্রেমটা কিন্তু সত্যিই খুব হ্যাকনীড, খুব বস্তাপচা মধুমিতা। ডোন্ট বি ক্যারেড অ্যাওয়ে।

—পাড়ার ছেলের সঙ্গে, বন্ধুর সঙ্গে, দাদার বন্ধুর সঙ্গে, ক্লাস ফেলোর সঙ্গে...সব প্রেমই খুব পুরনো পার্থদা।

—প্রেম জিনিসটাই অনেক অনেক পুরনো...

—ইনকাম-ট্যাক্স প্র্যাকটিস করবার কথা ভাবলেন?—মধুমিতার সাহস হু হু করে বাড়ছে।

—তোমার বাবার জামাই আর জুনিয়র একসঙ্গে হওয়া হয়ে উঠবে না।

—কেন? মানে লাগবে?

—হ্যাঁ। তবে আমার নয়, তোমার। শোনো মধুমিতা, ব্যাপারটা ভাল করে ভেবে দেখো। ভাবাবেগকে প্রশ্রয় দিও না। পস্তাবে।

পার্থ বেরিয়ে এল। তার অভ্যস্ত দ্রুততার সঙ্গে নামতে নামতে সে বুঝতে পারছিল, তার পা কাঁপছে। হাতের পাতা খুব ঘেমেছে। এদের বাড়িতে ছুটির দিনের নানাবিধ মজায় সবাই এমন মশগুল যে, কেউ খেয়ালও করল না, টিউটর তার সময়ের আগেই চলে যাচ্ছে। টিউটরকে চা দেওয়া হল না। সে জুতো পায়ে গলাল। এক পায়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফিতে বাঁধল। বৈঠকখানা ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় বাজখাঁই গলার উল্লাসধ্বনি শুনতে পেল।—এই নাও, তোমার টেক্কা ট্রাম্পড্। একে বলে টেক্কার ওপর টেক্কা মারা—হাঃ হাঃ হাঃ হা হা।

এই বেঁচে থাকার, নিশ্চিন্তে খেয়ে-পরে রোজগার করে বেঁচে থাকার হাসি আনন্দ উল্লাস—এ খানিকটা আলাদা জগৎ। এ যেন এ দশকের জীবন নয়। এ শতকেরই নয়।

অনেকদিন আগেকার অত্বরিত এ জীবনযাত্রা কোথাও কোথাও ফসিলের মতো রয়ে গেছে। পার্থদের উর্ধ্বশ্বাস জীবনের সঙ্গে এর কোনও মিল নেই। ওপরের ওই টুঙ্গি ঘরে লাল ঠোঁট সাদা পায়রার মতো ওই মেয়েটির চোখে অশ্রু—এ-ও যেন একটা এমন জগৎ যা বহুদিন আগেকার একটা স্মৃতির মতো। কোনওদিন নিশ্চয়ই সত্য ছিল, এখন অবাস্তব।

পার্থ মনে মনে চেঁচিয়ে হেসে উঠল। কী ভাববেন মধুমিতার বাবা মিহিরবাবু যদি ঘটনাটা জানতে পারেন। এমনিতে অতি সদাশয় ব্যক্তি। দেবমিতার বিয়ে হয়ে যাবার পর তার দক্ষিণা একটি পয়সাও কমাননি। পার্থ বলেছিল, তা সত্ত্বেও না।

—আরে তোমার মতো সিনসিয়ার টিচার, টাকাটা কিছুই না। জিনিসপত্রের দাম কি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে? হু-হু-হু-হু করে চড়ে যাচ্ছে সব। তারপর আসছও তো এখন অনেক দূর থেকে। তবে হ্যাঁ, আমি যদি অ্যাফোর্ড করতে না পারতুম তো নানান কথা বলতুম হয়তো তোমায়। তুমি মনে কোনও কিন্তু রেখো না পার্থ।

টিউটর হিসেবে, মানুষ হিসেবেও তাকে পছন্দ করেন উনি। কিন্তু মেয়ের প্রেমিক হিসেবে? ওঁর বড় জামাইকে দেখলে ওঁর পছন্দ বোঝা যায়। লম্বা, নধরকান্তি, বেশ জামাই-জামাই। হঠাৎ দেখলে যদি দুধ-ঘি খাওয়া ক্যাবলাকান্ত মনে হয়, সে মনে হওয়া ভুল। এম.-এস. ডাক্তার। শিগগিরই বিদেশ যাবে। তার পাশে পার্থ বিশ্বাস? একটা এম.এ. ডিগ্রি, একটা এল.এল.বি.। কোনওটাই ভালো নয়। হাইট পাঁচ আট। রঙ মাঝারি। স্বাস্থ্য মোটামুটি। দাড়ি-গোঁফ দুই-ই থাকায় একটা বোহেমিয়ান বোহেমিয়ান চেহারা। বাবা-মার একটা সাতশ স্কোয়্যার ফুটের ফ্ল্যাট আছে উত্তর কলকাতায়। উদ্বৃত্ত পয়সা-কড়ি কিস্যু নেই।

হঠাৎ গোঁত্তা খেল পার্থ। আচ্ছা, মধুমিতা তার এই দাড়ি-গোঁফের প্রেমে পড়েনি তো? সে শুনেছে দাড়ি-গোঁফে তাকে খুব আঁতেল-আঁতেল, ভাবুক-ভাবুক দেখায়। অনির্বাণ তার বন্ধু বলে—হেভি অ্যাপিল তোর পার্থ।

ঘড়ি দেখল পার্থ। সাড়ে এগারোটাও বাজেনি। আজকের সকালটা দেওয়া ছিল মধুমিতাদের বাড়িকে। অপ্রত্যাশিত ছুটি মিলে গেল। কিন্তু এখনই বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না। অনির্বাণদের ওখানে গেলে হয় না? ব্যক্তিগত ব্যাপার কারও সঙ্গে আলোচনা করার ধাত নেই পার্থর। কিন্তু এ ব্যাপারটা এখনও খুব ব্যক্তিগত কী? একটু যেন পরামর্শর দরকার ছিল। তেমন বুঝলে চেপে যাওয়া যাবে।

বেশির ভাগ বন্ধুই তার মোটামুটি সফল। জয় তার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু এখানে কোথাও চান্স পেল না। বাঙ্গালোর থেকে মোটা টাকা ক্যাপিটেশন ফি দিয়ে এঞ্জিনিয়ার হয়ে বেরোল। হায়দ্রাবাদে আছে এখন। চিরঞ্জীৎ দিল্লী চলে গেল। সে-ও একগাদা খরচ করে সেলস ম্যানেজমেন্ট পড়ল। ওখানেই পোস্টেড। বিল্টু অতি সম্প্রতি অলটারনেটিভ মেডিসিন নিয়ে পড়াশোনা করে, আরামবাগে বসছে। করে খাচ্ছে। সে যখন পল সায়েন্সে অনার্স নিয়ে বি.এ. পড়তে ঢুকল, তখনই বন্ধুরা বলেছিল হেভি মুশকিলে পড়বি। তার ভরসা ছিল রেজাল্ট ভালো হবে, অন্তত এডুকেশন লাইনে যেতে অসুবিধে হবে না। দীর্ঘদিন পর্যন্ত তার সঙ্গী ছিল অনির্বাণ। সাধারণভাবে বি.কম. করে মুখ চুন করে ঘুরে বেড়াত। ওর বাবা-জ্যাঠাতে মিলে শেষে মোটা টাকা বার করে দিলেন।

হোটেল ম্যানেজমেন্ট পড়ল, এখন ডাঁটে কেটারিং-এর বিজনেস করছে। একমাত্র পার্থরই বাবার মোটা টাকা বার করবার ক্ষমতা নেই। খুব সম্ভব এবার ও বাতিলের দলে পড়ে যাবে।

ভেতরের তেতো ভাবটা এত বেড়ে গেল যে, অনির্বাণদের বাড়ি যেতে ইচ্ছে করল না আর। লঞ্চ ধরে বাবুঘাট গেল সে। তারপর উদ্দেশ্যহীন হাঁটতে লাগল দক্ষিণের দিকে, গঙ্গার ধার ধরে ধরে।

দুপুর দুটো নাগাদ পার্থর খেয়াল হল সে বাড়ি না ফিরলে মা-ও খেতে পারবে না। কিছু বলে আসেনি। একটা পে-বুথ থেকে সে ফোন করে দিল। ফোনটা দাদার বাড়িতে। দাদার লোক ধরেছিল। পার্থ কড়া গলায় বলেছে, এখুনি গিয়ে মাকে বলে আসতে সে আটকে গেছে। কোথাও খেয়ে নেবে।

ময়দানে বসে বসে ক্রিকেট দেখতে দেখতে সময়টা কেটে গেল। বসে বসেই ঝালমুড়ি, ফুচকা, চটপটি খাওয়া হল কিছুক্ষণ সময় বাদ বাদ। রোদের রঙ বাসি মড়ার মতো হয়ে আসা অবধি পার্থ ময়দানেই বসে রইল। তারপর উঠে বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল। ক্যাথিড্রাল রোডের মোড় থেকে মানিকতলায় নিজেদের বাড়ি পর্যন্ত পুরো পথটা হাঁটতে থাকল পার্থ, যেন হেঁটে হেঁটেই নিজের ভেতরকার চিন্তা তিক্ততাগুলোকে ক্ষইয়ে ফেলবে।

বাড়িতে পৌঁছতে পৌঁছতে অন্ধকার গাঢ়। সেই চারতলা। কত কিলোমিটার হেঁটেছে আজ? জীবনে কখনও এতটা হেঁটেছে বলে মনে করতে পারল না পার্থ। কেন হাঁটল? গন্তব্য না থাকলে তবেই বোধহয় মানুষ এভাবে হাঁটে।

দাদার ফ্ল্যাটের দরজা খুলে গেল। বৌদি দাঁড়িয়ে।—তোমার একটা ফোন এসেছে পার্থ। দুপুরেও একবার এসেছিল। এখন বারান্দা দিয়ে ভাগ্যিস দেখতে পেলুম তুমি আসছ...

ফোনটা তুলল পার্থ।

—হ্যালো...

চুপ ও দিকটা। কিছুক্ষণ পর খুব ক্ষীণ গলা ভেসে এল।

—আমি মৌ, মানে মধুমিতা বলছি।

—বলো।

—আপনি বোধহয় আমাকে খুব...মানে খুব খারাপ ভাবছেন?

পার্থ হাসল, নিজের কাছেই হাসিটা খুব নার্ভাস লাগল—ভাবার কোনও কারণ আছে কি?

—কী জানি? যেভাবে চলে গেলেন...সারাদিন বাড়ি ফেরেননি...

—আমার কাজ হয়ে গিয়েছিল, তা ছাড়া তোমার তো কাজে মন ছিল না...

পার্থর পা অবশ লাগছে, সে চেয়ার টেনে বসল।

—শুনুন, আপনি আমাকে ভাবতে বলেছিলেন, আমি ভেবেছি।...আপনিও একটু ভাবুন।...একটু...। অনুনয়ের সুর গলায়।

চুপ করে রইল পার্থ।

—কী হল? শুনছেন?

—শুনছি।

—ফোন ধরেই ভাবতে শুরু করে দিলেন না কি?

—কী ভাবব তাই-ই তো জানি না।

—পার্থদা আপনার গলা শুনলে আমার ভেতরটা কেমন...মানে আমি কেমন হয়ে যাই।

—খুব ভালো। কী ভাবব, তা তো বললে না?

—এই আমাকে আপনি ভালো...মানে আপনি আমাকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারবেন কি না।...জানি এগুলো ভেবে-চিন্তে হয় না। হবার হলে হয়, না হলে হয় না। তাই না? কিন্তু আমি আপনাকে এতটাই...মানে...আমি রিস্‌ক নিতে রাজি আছি।

বলতে বলতে মধুমিতার গলা একেবারে ভেঙে গেল। পার্থ বুঝতে পারল ও অনেক কষ্টে কান্না সামলাচ্ছে।

সে দেখে নিল বউদি এ তল্লাটে নেই। তারপর মৃদুস্বরে বলল—ছি মউ, কেঁদো না। কেউ শুনলে?

—ভয়েই মরে যাচ্ছেন, না?

—না, ভয় না।

—তবে কী? লজ্জা? ঘেন্না?

—না। খুব জটিল ফিলিং মউ, তুমি বুঝবে না।

—চেষ্টা করলে আমিও কিছু কিছু বুঝতে পারি। শুনুন, আপনি ভেবে নিন, তারপরে আমি বাবাকে বলব।

—সর্বনাশ! কী বলবে?

—বলব। যা বলবার। আপনাকে জড়াব না। ভয় নেই।

ফোন কেটে দেবার শব্দ হল।

—বউদি, যাচ্ছি! পার্থ জানান দিল।

—ঠিক আছে, দরজাটা টেনে দিও।

বউদিদের দরজাটা টেনে দিয়ে নিজেদের দরজায় এসে পার্স থেকে চাবি বার করে দরজা খুলল পার্থ। এটা সে প্রায়ই করে। বাবার পক্ষে তাড়াতাড়ি ছুটে আসা ভালো না, মা পায়ের ব্যথার জন্য তাড়া করতে পারে না। দরজার বাইরে অপেক্ষা করতে তার ভালো লাগে না। তাই ডুপ্লিকেট চাবিটা সে রাখে।

দরজাটা বন্ধ করে নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে উলটো দিকে বারান্দায় চোখ পড়ল পার্থর। বসার ঘরে খুব মৃদু একটা আলো জ্বলছে। বসার ঘর আর বারান্দার মাঝখানে কাচের দরজা। ওদিকে অন্ধকার। মা বাবা দুজনে পাশাপাশি বসে আছে। পার্থ জানে না কী ছিল এ দৃশ্যটাতে, কেনই বা সে দাঁড়িয়ে গেল। মা-বাবা তো চুপচাপ বসেই আছে। পাশাপাশি। অন্ধকারে। মনে হতে পারত একা, পরিত্যক্ত, হতাশ। কিন্তু তা মনে হল না। সারাজীবন এই হিসেব করে করে চলা, এক পা এগোনো তো তিন পা পেছনো, ছেলের জন্যে পিতৃপুরুষের ভিটে বেচা, এক সন্তান স্বার্থপর, অন্যজন অকৃতী অধম, সামান্যতম সঞ্চয়, বড় কোনও অসুখ-বিসুখ করলে তেমন চিকিৎসার আশাও নেই। তবু কিসের জোরে যে মা-বাবা ওভাবে বসে থাকে! ওই অতটুকু বারান্দায়।

মাঝখানের দরজাটা খুলে যাচ্ছে।
মা।
কী করে যে টের পায় সে ফিরেছে!
—এলি! বাবার গলা।
—এলাম, বাবা।
মউ বলছিল ভাবতে। বলছিল সে রিস্‌ক নিতে রাজি।
পার্থর ভেতরটা টনটন করছে।
সে ভাবল সে-ও রাজি। রিস্‌ক নিতে।

মুক্তি

'যা বোঝো না তা নিয়ে মাথা ঘামিও না তো।' একটু যেন ঝাঁঝ কমলেশের গলায়।

কোন্ পরিবারের ছেলে সৌম্যজিৎ তা জানো? আগেকার দিনের স্টিভেডর ওর ঠাকুরদাদা। চেহারাতে আভিজাত্যের ছাপ সীলমোহর করে বসানো। তাছাড়া কতটুকুই বা ছেলে! ওরা পরস্পরের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে মেলামেশা করছে—আমরা মাঝে পড়ে বাধা দেব কেন? কত কমপ্লিকেশনস এর থেকে হতে পারে জানো? ছেলে মেয়ের আত্মপ্রত্যয় নষ্ট হয়ে যেতে পারে, কমপ্লেক্স গ্রো করতে পারে...' তাপসী বরের সমর্থন পেয়ে আহ্লাদিত হয়ে বলল—অল্পবয়সের এইসব রিপ্রেশন থেকেই তো নানা জটিলতার সৃষ্টি হয়। কে হয়ত তোতলা হয়ে গেল, কার হাত পা কাঁপছে, কেউ প্রচণ্ড রাগী। আমাদের সাইকলজিতে পড়তে হয়েছে মা। তা ছাড়া বড়লোকের ছেলে বলে মিড্‌লক্লাসের সঙ্গে মিশবে না এ সব কমপ্লেক্স আজকের দিনে অচল।

মুক্তি বললেন—'বড়লোক ছোটলোক বুঝি না। ছেলেটা একদম ভাল না। ছোটনকে বিপথে নিয়ে যাবে। মেলামেশাতে সোজাসুজি বাধা দিতে কে বলেছে? একটু বুদ্ধি করেও তো করা যায়! বলিস তো আমি করতে পারি।'

—'না, না' কমলেশ জোরে জোরে মাথা ঝাঁকালো, 'আজকালকার বাচ্চা, ইনটারফিয়ার করলে একেবারে হাতের বাইরে চলে যাবে।'

মুক্তি হতাশ হয়ে বললেন—'তবে আর কি! আমি বারান্দায় গিয়ে বসে থাকি!'

—'তা কেন? তুমি তো ঠাকুরঘরে গিয়ে বসতে পারো।' কমলেশ বলল।

—'এই তো ঠাকুরঘরে ফুল-জল দিয়ে এলুম, আবার কী? অত ঠাকুর-ঠাকুর বাই আমার নেই খোকা। বারান্দায় বসতে না দিস তো আমি রথীনবাবুদের বাড়ি থেকে একটু ঘুরে আসি।'

—'তাই যান না।' তাপসী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে—'আসলে কী জানেন? বারান্দায় কেউ বসে থাকলেই ছোটন ভাববে ওর জন্য কেউ দুশ্চিন্তা করছে। চটে যাবে।'

—'সে চটে যাবে বলে আমরা বারান্দায় বসবো না? এ তো আচ্ছা জুলুম?' বিরক্ত হয়ে মুক্তি পায়ে চটি গলালেন।

রাস্তার ওধারেই ডক্টর রথীন সমাদ্দারের বাড়ি। মিলিটারিতে ছিলেন। সেখান থেকে অবসর নিয়ে কয়েক বছর এখানে এসে বসেছেন। পশার বেশ জমেছে। এদের পারিবারিক ডাক্তারও তিনিই। বাড়িতে তিন চারটে কুকুর আর ডক্টর সমাদ্দারের পিসিমা থাকেন। পিসিমার সঙ্গে মুক্তির জমে ভাল।

কমলেশ চৌধুরীর মা মুক্তি চৌধুরী মাঝারি সাইজের একটি মহিলা। মোটা তো নয়ই রোগাও নয়। কোঁকড়া চুলে পাক ধরেছে। সোনালি চশমার পেছনে বেশ ঝকঝকে দুটো চোখ। রঙ আধা-ফরসা। আজ পরনে কালো আঁশ পাড় টাঙ্গাইলের শাড়ি। দুহাতে সরু সরু কটা চুড়ি, সোনার চেন গলায়। গণ্ডে একটি লাল তিল। আরও তিল গজাচ্ছে। পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন বছরের বিধবা। নাতি-নাতনি আদর করে বলে মডার্ন ঠাকুমা। কেন না মুক্তি বিএসসি পাশ করেছিলেন। এখনও গলা ছেড়ে দিব্যি গান, এবং স্বামীর বিষয়-সম্পত্তি সমস্ত চিরকাল সামলে এসেছেন।

কমলেশের বাবা মোটামুটি পসার-অলা উকিল ছিলেন। তাঁর টাকাকড়ি কোথায় কী লগ্নি হবে, আমানত হবে সে সব ঠিক করা মুক্তিরই কাজ ছিল। এমনকি সল্টলেকের এই বাড়ির সরকারি জমি কেনা, বাড়ি তৈরি—এ সব মুক্তি দাঁড়িয়ে থেকে না করালে হত কিনা সন্দেহ। কর্তা মারা গেছেন আজ পনেরো ষোল বছর। এখন মুক্তি ছেলে বউকে টপকে বারো বছরের নাতনি আর চোদ্দ বছরের নাতিকে নিয়ে থিয়েটার দেখতে যান। থিয়েটার তাঁর বড্ড প্রিয়।

এই মুক্তিকে নিয়েই তাঁর ছেলে-বউ কমলেশ-তাপসী সম্প্রতি পড়েছে মহা মুশকিলে। মুশকিলটা অবশ্য শুরু তাদের ছেলে-মেয়ের জন্মের পর থেকেই। তার আগেটায় মা বেশ বুঝদারই ছিল। কমলেশ তার ক্লাস-বান্ধবী তাপসীকে বিয়ে করতে চাইলে তো তার বাবা—'সমবয়সী মেয়ের সঙ্গে আবার বিয়ে কী? পলিটিকস্ করে ওসব মেয়ে নিয়ে কি কেউ সুখী হয়?'—এই সব প্রশ্ন তুলে বেঁকে বসেছিলেন। মুক্তিই তখন তাঁকে বোঝান বিয়ের মোটিভেশন আজকাল কতটা বদলে গেছে। পুত্রার্থে তো নয়ই, সংসারার্থেও নয়, বুদ্ধি-বৃত্তি-রুচি-আদর্শ এসবের মিলযুক্ত মানুষের সঙ্গে যতদিন সম্ভব কাটানোটাই এখন জরুরি। আর সুখ? ও হয় তো হবে, নইলে হবে না। উপরন্তু পরস্পরকে বিয়ে করতে চাইছে এরকম দুটি বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলে-মেয়ের মাঝখানে কোন অজুহাতই খাড়া করা ঠিক নয়। এই সময়েই কমলেশ-তাপসী মুক্তির অতি আধুনিক মনের পরিচয় পেয়েছিল। কিন্তু বয়স মানুষকে একটা না একটা সময়ে কাবু করে ফেলবেই। কিছুদূর পর্যন্ত পরের প্রজন্মের সঙ্গে কেউ কেউ হাঁটতে পারেন। তারপরে আর তাল রাখতে পারেন না। পিছিয়ে পড়েন। এটাই স্বাভাবিক। জীবনের নিয়ম। মুক্তিও পারছেন না। কিন্তু তিনি তা কিছুতেই মানতে চাইছেন না। তাঁর ভাবটা তিনি যেন ছেলেবউ তো বটেই, নাতি-নাতনিরও সমবয়সী। কোনও জেনারেশন গ্যাপ নেই।

কিন্তু নাতি-নাতনির নামকরণেই মুক্তির রক্ষণশীলতার ব্যাপারটা প্রথম বোঝা যায়। নাতির নাম তিয়াষ, নাতনির নাম পিয়াসা। শুনে মুক্তি বললেন—'নামেতে কি আর আসে যায়। সত্যি কথা। গোলাপে যে নামে ডাকো সুগন্ধ বিতরে। কিন্তু একী কাণ্ডজ্ঞান

দেখে ন্যান, ধারে ধারে একটু অন্যতম রং চাই, বুজলেন? অন্যতম কিছু। আবার ধরেন আপনাদের শয়নের ঘরে একরকম, তো বসার ঘরে বিকল্প চাই। সবখানেই ওয়ালনাট মেহগনি হলে হবে না। রোজউড দেব ক্যাবিনেটটাতে, দেখবেন চোখ যেন স্তম্ভিত হয়ে থাকতে চাইবে। একেবারে বিকল্প।

খুকি অনেকক্ষণ ধরেই হাসছিল, বলল—আপনি লেখাপড়া জানেন, না?

—কই আর জানলুম খুকি।

খুকির বাবা এসে ডাকেন—মিস্ত্রি।

—জি।

—নতুন রং করা চেয়ারে বসলাম, গ্লেজ তো উঠে গেল।

—তা তো যাবেই সাহেব।

—সে কী! তাহলে এত কষ্ট করে খরচা করে পালিশ করার মানে কী!

—আহা এখনও তো ফিনিশ হয়নি। শেষ অস্ত্রে ল্যাকার পালিশ চড়াব। চক্ষে ধাঁধা লেগে যাবে।

—গ্লেজ?

—উঠবে না সাহেব। দশটি বচ্ছর চোখ বুজে থাকতে পারবেন।

—পারলেই ভাল—সাহেব গটমট করে চলে যান।

—হ্যাঁ কী যেন বলছিলেন! খুকি সুযোগ পেয়ে কাছিয়ে আসে!

—কী আবার!

—ওহ যে অন্যতম, বিকল্প...ভাল ভাল কথা বাংলা রচনা বই থেকে?

—ওই সেই কথা? এই যেমন ধরুন, খুকিসাহেব আপনারা আজকালের মেয়েরা সব ম্যাচিং দ্যান না? ফলসা রঙের শাড়ি, তো সেই রঙের সায়া, সেই রঙের জামা! মনে কিছু করবেন না, সরবো চেহারা লেপেপুঁছে খেঁদিবুঁচি লাগে।

খুকি আর হাসি সামলাতে পারে না।

—আপনি হাসছেন? আমি যখন একেকটি ফার্নিচার সাজাই, তাকে জামা পরাই, সায়া পরাই, কাপড় পরাই, তখন আমার ওই লেপাপোঁছা মনে ধরে না। একটা কিছু অন্যতম খুঁজি। কেমন জানেন? লাহা বাড়িতে কাজ করতে গেছলুম। সে কি আজকার কথা! সে এক অন্যতম কাল! তা সে বাড়ির মেয়েরা সব হুরী রূপসী। আশি নম্বর একশো নম্বর কাগজ দিয়ে ঘষে ঘষে ঘষে তবে তেমনতর তেলা চামড়া হয় খুকি, তারপর খালি সবেদা দিয়ে সাদা গালার পোঁচ, সর-হলুদ বাটা আর কমলালেবুর খোসা,—গ্লেজ কী। চোখ পিছলে যায়।

—পিছলে যায়? আটকে থাকে না? খুকি হাসি চেপে দুষ্টু প্রশ্ন করে।

—উঁহু, রজন পাইল দিলে চিটে হবে, ওইখানেই তো পালিশের সরবো কারিগরি।

—আহা পালিশ নয়, ওই লাহা বাড়ির সুন্দরীদের কথা কী যেন বলছিলেন?

—ও হ্যাঁ, তা ওনারা পরতেন ধবধবে সাদা খোলের কাপড়। তাতে ভোমরাকালো, কিংবা খুনখারাবি লাল রঙের পাড়। জামা পরতেন ছিটের। লালের মধ্যে হলুদ কালো সবুজ চিকিমিকি। আর সায়াটি থাকত ধোয়া গোলাপি।

—এ মা! কী বিচ্ছিরি!

হাঁ হাঁ করে ওঠে ওয়াজির মোল্লা।—না না। একেবারে বিকল্প। ওই যে সবটি লেপাপোঁছা, হল না, অন্যতম রঙের খোয়াব রইল, তাতেই রূপগুলি বিকল্প হয়ে উঠত। এই যে বর্ডার দিচ্ছি, একটা জমিনকে আলে আলে বেঁধে দিচ্ছি; এতে করে আপনার আপন হয়ে যাবে দ্রব্যটি। উদোম মাঠ নয়, যেটা বারোয়ারি। একটা ধরুন শস্যক্ষেত্র। কেমন? নয় কি?

খুকি এখন আর হাসছে না। অভিনিবেশ সহকারে শুনছে। একটু পরে সে উঠে গেল।

বাড়িটি চমৎকার সেজে উঠেছে। ওয়াজির মোল্লাসাহেব দেখছেন। ঘরের মধ্যে যেন চাঁদনি। এমনধারা চাঁদনিতে মানুষের প্রকৃত মুখটি এই ধরা পড়ে, তো এই পড়ে না। একঘর আলো, তা বুঝি তার কতকগুলান উঁচার দিকে মুখ। মানুষগুলিকে মনে হয় খোয়াবে দেখা হুরী পরী জিন জাদুকর। হ্যাঁ জাদুকরও আছে। মোল্লাসাহেব বড় আয়নায় দেখছেন, তিনি নিজেই যেন জাদুর মানুষ। ভুষো কালি আর শ্বেত গালাতে মিলে মিশে ছোট দাড়ি। হাতের কালচে চাম ইস্প্রিটের অ্যাকশনে উঠে উঠে যাচ্ছে, কাজের লুঙ্গি আর গেঞ্জিটি আলাদা করে রাখলেও ছাপছোপ পুরোপুরি এড়াতে পারেননি। পেন্টুলে একটু আধটু নানা রঙের পোঁচ লেগেছে। হলঘরটি যেন সিনেমা হল। তার মধ্যে ফার্নিচারে আলো ঠিকরোয়, ভাল গোমেদ পাথরের কাটিং যেন।

দুটো হাঁড়ি ওপর ওপর বসানো। ফর্সা পুরনো কাপড়ে বেঁধে দিচ্ছেন কর্ত্রী।

—মিস্ত্রিসাহেব, ছেলেমেয়ে বিবিদের দেবেন গিয়ে।

—কী আছে মা এতে? দাত্রী রমণীকে আজ মা ডাকতে ইচ্ছে যায়।

—লেডিকেনি আছে। আর রসগোল্লা...ভালবাসেন তো?

—হ্যাঁ মা...চমৎকার ভালবাসি সব।

—সন্ধে হয়ে গেল আজ শেষ দিনে আপনার...আর এই শাড়িখানা...পছন্দ হয়?

—আপনার পছন্দ হয়েছে মা—ওয়াজির চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখেন, দেখান।

—খু-ব। আবার দরকার পড়লে ডাকব আপনাকে।

—খোদা করুন, ডাকবার দরকার না হয় মালিক। বিশ বচ্ছরের কাম ফতে করে গেছি। রাখতে যদি পারেন। পানি আর রোদ্দুর এই দুই হল পালিশের দুশমন। পাতলা কাপড় দিয়ে মোলায়েম করে মুছে দেবেন, বাস। আর পাড়া-পড়োশন, ভাই-বহেন এঁদের কাছে যদি সুপারিশ করেন তো...আজকাল তো পালিশ লোকে করায় না, সব তেল রং আর পেলাস্টিক রং, হাউহাউ চিৎকার করছে। পালিশের কদর ওই বনেদি বাবুরাই করেন। বিকল্প কিছু...।

শাড়িটা প্যাকেট থেকে খুলে বার করেন মোল্লাসাহেব। ছাপের কাপড়। নানান রঙের হোরিখেলা। বিবি পরবেন ভাল। মোল্লাসাহেবের তত মনোমতো হয় না। কিন্তু তিনি বলেন, সুন্দর, চমৎকার। হেসে উঠছে কাপড়, আপনার এই বাড়ির মতো। সালাম, সালাম। কাঁধে ঝোলাঝুলি নিয়ে নিচে নেমে যান মোল্লাসাহেব।

—ও ওয়াজিদ আলি শা সাহেব...একটু দাঁড়ান, একটু দাঁড়ান। হাঁফাতে হাঁফাতে

ছোট্ট জমি দিয়ে ছুটে আসে খুকিসাহেব।

ঘাসের জমিতে সবুজ টিলটিল করছে। বেগুনি আভা সাঁঝের গায়ে। মিহি কাঞ্চন রঙের সিল্কের শাড়ি পরেছে খুকি। চওড়া জাম রঙের পাড়। ভেতরে জরির সুতো, কালো সুতো চমকাচ্ছে। আর জামাতে বেশ খলখলে হাসকুটে কালো, কালো না মেহগনি, বুঝি খুকিও ধাঁধা লাগিয়ে দিয়েছে। কোনও উৎসবে যাবে বোধহয়।

—'অন্যতম' হয়েছে?

হাসি দাড়ি বেয়ে টাপুর টুপুর ঝরে।

—হয়েছে, হয়েছে।

—আর 'বিকল্প'?

চতুর্দিকে হাতড়ান মোল্লাসাহেব। 'বিকল্প'টি কি ঠিক হল? 'বিকল্প' বলে কি তিনি সবসময় এক কথাই বোঝাতে চান? 'বিকল্প' মানে এখন, এখানে 'অবিকল্প'। সেরকমটি? হয়েছে কি?

খুকি রিনরিন করে হাসে। বোঝার চোখে তাকায়।

—বিকল্পটা ঠিক হল না, না শা সাহেব?

—হল না কি?—হাঁ হাঁ করে ওঠেন ওয়াজির মোল্লা—এখন এক্কেবারে বেগমসাহেবা। হানডেড পার্সেন। দু'জনেই ষড়যন্ত্রীর মতো হাসতে থাকেন। একটা যে রঙ্গ হয়ে গেল সেটা উভয়েই বুঝেছে। শিল্পীর চোখে বিকল্প অর্থাৎ অবিকল্প? তাও কি সম্ভব?

—আচ্ছা চলি বেগমসাহেবা...

—আবার আসবেন ওয়াজিদ আলি শা সাহেব...

ওয়াজিদ মোল্লা কিছু দূর চলে গিয়েছিলেন। ঘুরে দাঁড়ান।

—ওয়াজির নয় কিন্তুক। ওয়াজির...ওয়াজির মোল্লা। খিদিরপুরে বাস নয়, কাজ-কাম করি ওখানে, নাহারবাবুদের ফ্যাকটরিতে। সাকিন ন'পাড়া বাগনান, সাউথ ইস্টার্ন রেলোয়ে।

নিজস্ব শিল্পভাবনার অবিকল্প নিশানখানা কাঁধের ওপর প্রশান্ত গর্বে তুলে ধরে নতুন পাড়ার দিকে রওয়ানা দ্যান ওয়াজির মোল্লা। কোনও ইতিহাস, পুরাণ কিংবদন্তীর সঙ্গে অন্বিত হতে চান না। কিছুতেই।

বারান্দা

আলমারির গা-আয়নায় চুল আঁচড়ানো এক মহা ঝামেলার ব্যাপার। জলের ছিটে লাগবেই লাগবে। ঘোলাটে জলের ছিটে। পার্থর চুল খুব ঘন, একটু লম্বা। জলসুদ্ধ না আঁচড়ালে বসতে চায় না। এদিকে মায়ের কড়া হুকুম আছে, জলের ফোঁটা পড়লেই সঙ্গে সঙ্গে মুছে দিতে হবে। মা বলে, বসন্তের গুটির মতো দেখায়। আয়না জিনিসটা

পরিষ্কার করে মোছা কিন্তু কঠিন কাজ। এদিকটা ঠিক হল তো ওদিক দিয়ে ল্যাজ বেরলো। বাথরুমে একটা ছোটখাটো বেসিন আর আয়নার ব্যবস্থা যে কেন করা গেল না পার্থর মাথায় ঢোকে না। বললেই, মা বলবে—তুই করবি। এটা এমন কি একটা মহামারী ব্যাপার যে পার্থর জন্য অপেক্ষা করতে হবে! মা যেন বলতে চায়—তোর বাবা তোদের সবই করে দিয়েছে, ওই বেসিন আর আয়নাটুকুই যা বাকি। ওইটুকুই করে দেখা।

ধ্যাত্তেরি! যত শিগ্‌গির সম্ভব রাধুদার দোকানে একটা চোদ্দ ইঞ্চির বেসিন আর একটা আয়না-অলা ছোট ক্যাবিনেট দর করতে হবে। ওরাই মিস্ত্রি দিয়ে বসিয়ে দেবে। ট্যুইশনির রোজগার পার্থর নেহাত মন্দ নয়। তার জামাকাপড়, রাহা-খরচ, হোটেল-রেস্তোরাঁ, সিনেমা-থিয়েটার, ক্যাসেট-ট্যাসেট, এমন কি ছোটখাটো বেড়ানো পর্যন্ত সবই তাতে হয়ে যায়। উপরন্তু সে সব সময়েই কিছু না কিছু সঞ্চয়ের চেষ্টা করে যাচ্ছে। মায়ের হাতে মাঝে মাঝে কিছু দেয়ও। একটা বেকার ছেলের কাজ থেকে বাবা-মা আর কী আশা করতে পারে!

বাবা ঘরে ঢুকে বলল—তোর মাকে দেখেছিস? বাবার হাতে এক তাড়া খবরের কাগজ।

—এইটুকু তো কৌটোর মতো একটা জায়গা। যাবে আর কোথায়?—চিরুনির পেছন পেছন হাত-বুরুশ টানতে টানতে বলল পার্থ।

বাবা কী যেন বলবে বলে মুখ খুলেছিল। থেমে গেল আচমকা।

উত্তরের জানলা দিয়ে খুব শিরশিরে হাওয়া আসছে। সব কিছুর মতোই শীতও দেখা যাচ্ছে লেট হয়ে যাচ্ছে। কোথায় ডিরেইল্ড হয়ে পড়েছিল কে জানে! কত দিন টানবে তা-ও বোঝা যাচ্ছে না। পাশের জমিটাতে দুটো শিমুল গাছ ন্যাড়া হয়ে এসেছে। হলদে পাতা দু-চারটে লেগে আছে মাত্র। দেখতে দেখতে আরও একটা বছর কেটে গেল। কিচ্ছু হল না এখনও। সে কি তবে কনফার্মড বেকার হয়ে যাচ্ছে না কি! অচিন্ত্যদার মতো? গা-টা শিরশির করে উঠল। পুরনো পাড়ায় অচিন্ত্যদা ছিল উৎসাহী পাড়া-দাদাদের একজন। পুজোর চাঁদা, জলসা, কেউ মরলে শ্মশানবন্ধু জোগাড় করে কাঁধ এগিয়ে দেওয়া—সব বিষয়েই এক নম্বর। বি. কম-টম কিছু একটা পাস করলো বোধহয়। স্টেনোগ্রাফি, টাইপরাইটিং শিখলো, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নামও লেখালো। তখন পার্থরা স্কুলের নিচের ক্লাসে পড়ে। চারদিকে এত কম্পিউটার সেন্টার হয়নি। অচিন্ত্যদা বলত, চাকরি পেলেই চকলেট খাওয়াবে। কিন্তু চাকরির জন্য অনন্ত প্রতীক্ষা বেচারির আর শেষ হল না। ক্রমে এক বছর পুজো-মণ্ডপে ব্যস্ত পাড়া-দাদাদের মধ্যে অচিন্ত্যদাকে আর দেখা গেল না। কবে যে সে সব বিষয়ে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে, কবে যে তাকে হেপাটাইটিসে ধরেছে, সে যে খাচ্ছে না, বিছানা থেকে উঠছে না কেউই খেয়াল করেনি। অচিন্ত্যদা লোকচক্ষুর অগোচরেই মরে গেল। স্রেফ মরে গেল। একজন অত্যন্ত সাধারণ ছেলে যদি জীবন-দৌড়ে ক্রমে পিছিয়ে যায়, তবে? তবে সে বাতিল হয়ে যায় এইভাবে। তার চেয়ে এম.এ. পাশ করেছি, ল' পাশ করেছি এ সব গ্যাদা গুমোর না রেখে যা হোক একটা ব্যবসা ধরে ফেলা ভাল। জেরক্স আজকাল ভাল ব্যবসা। যে কোনও জিনিসের তিন-চারটে ফটোকপি চাওয়া ফ্যাশন হয়েছে

আজকাল। লাইব্রেরির বই পর্যন্ত আজকাল কেউ নোট করে না। সব জেরক্স। বাবাকে ফটোকপি মেশিন কেনার কথাটা সে বলেছিল ক'মাস আগে। তা বাবা বলল—এফ. ডি. ভেঙে, ব্যাঙ্ক লোন নিয়ে না হয় তোর মেশিন হল। কিন্তু বসবি কোথায়? একটা চার বাই আট-দশ ফুট দোকানঘরের ভাড়া-সেলামি এখন কত শুনবি?

বলেই বাবা বলেছিল—আহা, বাড়িটা বেচে দিলুম। থাকলে নিচের ঘরটাতে বসতে পারতিস!

পাঁউরুটিতে দ্রুত হাতে মার্জারিন লাগাতে থাকে পার্থ। ঘুম থেকে উঠতেই আজ দেরি হয়ে গেছে। আসলে আজ ট্যুইশানিতে যেতে হবে তার মনেই ছিল না। মাকে হাতের কাছে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। দ্বিতীয় কাপ চা-টা বোধহয় হবে না। না-ই হোক। সিংঘিদের বাড়িতে তো চা-টা দেবেই। টা যা দেবে সে-সব অবশ্য শৌখিন খাবার। সাবুর পাঁপর, সন্দেশ, রসগোল্লা, ডালমুট। ও সবে পেট ভরে না। তাছাড়া পড়াতে গিয়ে রোজ রোজ খেতে কেমন ঘেন্নাও করে তার। টিউটর বলেই হ্যাংলা, হা-পিত্যেশ মনে করিসনি বাবা। যাঃ, নিয়ে যা তোদের পাঁপর-সন্দেশ, অনেক খাওয়া আছে ও সব। তবে চায়ের কথা আলাদা, চায়ের যেমন কোনও ফুড-ভ্যালু নেই, তেমনি কোনও সময়-অসময়ও নেই। চা-টা সুতরাং চলতে পারে। ছাত্র-বাড়ির চায়েতেও অবশ্য চূড়ান্ত অবহেলা দেখিয়ে থাকে সে। খাতা দেখছে তো দেখছেই, লেকচার দিচ্ছে তো দিচ্ছেই। ছাত্র-ছাত্রী এক সময়ে বলবে—কী হল পার্থদা! চা-টা তো বরফ হয়ে গেল!

—ওহ্ হো, যাকগে। এদিকে দেখো, আবার সেই একই ভুল করছো...ঠাণ্ডা চা-টা এক চুমুকে খানিকটা খেয়ে মুখটা সামান্য বিকৃত করে কাপ নামিয়ে রাখে পার্থ।

—আরেক কাপ আনব? আনি?

—নাহ্, বেশি চা খাই না। এদিকে মন দাও তো দেখি...

এই আচরণ করে পার্থর নিজেকে বেশ বড় বড়, গম্ভীর-গাম্ভার প্রতিষ্ঠিত, মর্যাদাবান মানুষ বলে মনে হয়। নিজের কাছে নিজেকে মর্যাদার যোগ্য মনে হওয়াটা খুব জরুরি।

কেন এই বিশ্রী আত্মসচেতনতা? কবে থেকেই বা হল? চেষ্টা করেও এ রোগটা সে তাড়াতে পারছে না কেন?

মা ঢুকছে। এক কাপ দুধ এনে রাখল।

—কার এটা?

—তোর। আবার কার? পাউরুটিগুলো শুকনো খাচ্ছিস!

—বাবাকে দাও না!

কেমন আহত চোখে তার দিকে তাকাল মা। পরক্ষণেই চোখের ভাব বদলে গেল। একটু যেন কঠিন।

—খেয়ে নে।

বাবা তড়বড় করে ঢুকে বলল—রিপাবলিক ডে বলে তিনটে কাগজ দিতে কি তুমি বলেছ?

মা বলল—না তো! তুই বলেছিলি নাকি পার্থ?

—ঘাড়ে ক'টা মাথা আমার?

মার চোখে তিরস্কার। বাবা বলল—দেখো তো! কেউ বলেনি, অথচ একতাড়া কাগজ গুঁজে দিয়ে গেছে কোল্যাপসিবলের খাঁজে। দেখাচ্ছি মজা! এবার দাম দেব না এসব কাগজের।

এক চুমুকে দুধটা শেষ করে দরজার দিকে পা বাড়াল পার্থ, বলল—দ্যাখো, হয়ত দাদাদের অর্ডার ছিল, ওখানে দিতে গিয়ে এখানে দিয়েছে।

সিঁড়ি ভাঙতে লাগল সে। চারতলায় ফ্ল্যাট তাদের। তার কোনও অসুবিধে নেই। কিন্তু বাবার হার্টের গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে। অ্যানজাইনার ব্যথা হয়। বাবার পক্ষে এই চারতলার সিঁড়ি রোজ রোজ ভাঙা মোটেই ঠিক নয়। মায়ের হাঁটুর ব্যথা। শতকরা নিরানব্বই জন বাঙালি মহিলার এই আর্থারাইটিস জাতীয় কিছু একটা হবেই। তবুও চূড়ান্ত অদূরদর্শীর মতো বাবা এই ফ্ল্যাটটা কিনল। বাড়িটা তাদের পুরনো হয়ে গিয়েছিল, আপাদমস্তক সারানো মানে পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকার ধাক্কা, সেটা বাবার পক্ষে বার করা মুশকিল ছিল। সবই ঠিক। কিন্তু কথাটা হচ্ছে, বাড়িটা তো বাবা সে জন্যে বিক্রি করেনি! করেছে দাদার ম্যানেজমেন্ট পড়বার টাকা জোগাড় করতে। এই ছোট্ট ফ্ল্যাটটা কিনে দাদার পড়ার খরচটাও হয়ে যাবে বলে বাবা ঝট করে বাড়িটা ঝেড়ে দিল। দাদা এঞ্জিনিয়ারিং শেষ করতে না করতেই ভাল চাকরি পাচ্ছিল। তারাই কোনও সময়ে ওকে ম্যানেজমেন্টের কোর্স করিয়ে নিত, কিন্তু দাদার তর সইল না। সবচেয়ে দামি কোর্স করার জন্যে পরীক্ষা দিয়ে, ইন্টারভিউ দিয়ে একেবারে গেট সেট গো। দাদা চাকরি করলে যে সুরাহাটা হত সেটা তো হলই না, উপরন্তু অতিরিক্ত টাকার ধাক্কা। ঠিক কত টাকা, বাবা-মা তাকে বলেনি কখনও। কিন্তু লাখের যথেষ্ট ওপরে হবেই এ বিষয়ে তার কোনও সন্দেহ নেই। তাদের মতো পরিবারের ছেলের এই ধরনের গা-জোয়ারি উচ্চাকাঙ্ক্ষার কোনও যুক্তি আছে!

বাবার যুক্তি ছিল—তীর্থ ওখান থেকে পাশ করেই বিশাল একটা মাইনের চাকরি পাবে। পার্থর বলার ইচ্ছে হয়েছিল—চাকরিটা তীর্থ পাবে বাবা, তুমি তো কিছুতেই পাচ্ছ না!

ইচ্ছে হলেও সব কথা বলা যায় না। পাঁচ বছর আগেকার কথা তার ওপর। বয়সটাও তো পাঁচ বছর কম ছিল! তবু কিছু কিছু বলতে সে ছাড়েনি। দাদাকেই বলেছিল—তোর একটা অ্যামবিশন পূর্ণ করবার জন্যে বাবাকে তার পিতৃপুরুষের বাড়ি বিক্রি করতে হচ্ছে, এটা তুই কেমন করে হতে দিচ্ছিস আমি জানি না দাদা।

দাদা অদ্ভুত একটা কথা বলেছিল, একেবারেই সেটা আশা করেনি কেউ, পার্থ না, বাবা না, মা তো না-ই।

দাদা বলেছিল—পিতৃপুরুষ তো আমারও, বাড়িটায় আমারও তো অংশ আছে!

বলে ফেলে খুব অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল দাদা—আমি প্রতিটি পাই পয়সা শোধ করে দেব বাবা, দেখো!

তা অবশ্য দিতে চেয়েও ছিল দাদা, বাবা এত বোকা, এত সেন্টিমেন্টাল যে নিল না। বোধহয় পিতৃপুরুষের বাড়িতে বড় ছেলের অংশ থাকার কথাটা বিঁধেছিল বুকে। হয়ত ভেবেছিল টাকাটা যদি ঋণও হয়, সে ঋণ শোধ না হলে ছেলের সঙ্গে সম্পর্কটা পোক্ত থাকবে। টাকাও হারালো, ছেলেও বাবা-মার থাকল না। টাকাটা থাকলে পার্থর

ফটো-কপি মেশিন ও আনুষঙ্গিকের একটা সুরাহা হত। কিংবা কে জানে, বাবা হয়ত এক ছেলেকে দিয়ে ঠকেছে বলে আর এক ছেলেকে আর দিতই না।

নিজেকে এক সময়ে খুব নীচ মনে হল পার্থর। বাবা এই সেদিনও খেদ করছিল, পুরনো বাড়িটা থাকলে তার একতলার রাস্তার দিকের ঘরটায় পার্থর ফটো-কপি মেশিন, ক্রমে ক্রমে অ্যামোনিয়া প্রিন্টিং মেশিন এ-সব বসতে পারত।

বাবা আসলে একেবারেই প্র্যাক্টিক্যাল নয়। বাড়িটা যতই পুরনো হোক, ছোট হোক, একটা গোটা বাড়ি। ছিলও কর্নার প্লটে। লোকেশনের একটা আলাদা মূল্য আছে। ফট করে যা পেল নিয়ে বেচে দিল। এই ফ্ল্যাটটা সাতশো স্কোয়ার ফুটের। দুটো ছোট ছোট শোয়ার ঘর বসার ঘর ছাড়া এক চিলতে খাবার জায়গা আর দক্ষিণে এতটুকু একটা বারান্দা। বিয়ে করে দাদার সুবিধেই হল আলাদা থাকবার। একই তলায় উলটোদিকের ফ্ল্যাটটা খালি ছিল। সেটাই ভাড়া নিয়ে আছে। তবে শিগ্‌গিরই দিল্লি কি বোম্বাইয়ে পোস্টিং পেয়ে যাবে। তারপর আর এই আবাসনে দাদা ফিরছে না। একথা বাবা-মা যদি না-ও জানে, পার্থ অভ্রান্তভাবে জানে।

সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে একটা বিশ্রী ঠোক্কর খেল পার্থ। কয়েকটা থান ইট সারি বেঁধে রাখা। ছিটকে পড়ছিল পার্থ। খুব সামলে নিয়েছে। তিনটি বালক ঢুকছিল গেট দিয়ে। শাঁ-শাঁ করে ছুটে এল।

—চোট লাগল? পার্থদা? পচা বলল।

—কে রেখেছে এখানে থান ইটগুলো?

—আমরা—অপরাধী গলায় বলল ওরা, ছাদ থেকে নামিয়ে আনছিলুম...উইকেট হবে...

—চমৎকার! তা আমাকেই তো আউট করে দিচ্ছিলি। সঙ্গে সঙ্গে এগুলো সরাতে কী হয়েছিল?

—দ্যাখো না, দ্যাখো না, তিনজনে কলবল করে ওঠে—হাওয়াই চপ্পল দিয়ে বেল বানাচ্ছি, রাজুটা ফালতু ফালতু তক্কো জুড়ল...

—কী তক্কো? পার্থ প্যান্টের ক্রিজ ঠিক করতে করতে বলল।

রাজু বলল—আচ্ছা পাখদা, মোহাব্বৎ ঔর প্যার, এক হী চীজ ক্যা? পচা বোলতা, প্রেম ভালোয়াসা হী এক। এক হী মত্‌লব! সচ্!

তৃতীয় খোকা মুন্না বলল, ওতো বলছে লভও এক।

মুন্না এ বাড়ির কেয়ার-টেকার কাম দারোয়ান মিশিরজির ছেলে। রাজু আর পচা ওর বন্ধু। দশ-এগারোর মধ্যে বয়স ওদের। শব্দগুলো ওদের মুখে খুবই কিম্ভূত শোনাচ্ছিল।

—তা তফাতটা কী? কী বলে মনে হচ্ছে? পার্থ কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল।

রাজু বলল—মোহাব্বৎ হচ্ছে দুখ, বহোৎ দুখ দেয়, লায়লা-মজনু জৈসা, ঔর প্যার মিঠা মিঠা। সুহাগ রাত বনায় গা, ঘুংঘট উতারেগা।

—আর প্রেম ভালবাসা?

—উও সব ফালতু কহানীতে থাকে। কোনও মানে নেই।

—বাঃ। আর লভ্?

এবার তিন বালক পরস্পরের দিকে কেমন অশ্লীল চোখে চাইল। দু আঙুল মুখের

মধ্যে পুরে সিটি দিল রাজু।

মুন্না ছেলেমানুষের গলা হেঁড়ে করে গেয়ে উঠল—লব্ তুঝে লব ম্যাঁয় করতা হুঁ।

রাজু বলল—বাস্। এহী চীজ।

পার্থ বলল—পথ ছাড়। যেতে দে।

—কে ঠিক বলল, বললে না?

—ওরকম বাজে সিটি-ফিটি দিলে বলছি না।

মুন্না বড় বড় চোখে চেয়ে বলল—ক্যা কসুর? অ্যাক্টিং তো!

—আরেক দিন বলব, আজ দেরি হয়ে গেছে—পার্থ পথে নেমে পড়ল।

বাস-রাস্তা, দুশ পনেরো নম্বরে গাদাগাদি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লাট খেতে খেতে অবশেষে সিট পাওয়া। একজনের পা মাড়িয়ে দেওয়া, কানা কিনা প্রশ্ন শোনা, হাওড়া ব্রিজে যথারীতি খানিকটা জ্যাম...চুপচাপ বসে থাকা অবশেষে হাওড়া ময়দান... পঞ্চাননতলার দিকে অভিযান। সারাক্ষণই পার্থর মনে রাজু-মুন্নার অভিনব ব্যাখ্যা ঘুরছে। প্যার মিঠা, মোহাব্বৎ বহোৎ দুখ দেয় আর প্রেম ভালবাসা ফালতু কহানীতে থাকে।

সবই কহানীতে থাকে বস্তুত। এবং সেই কাহিনী চিত্রের মাধ্যমে মূর্ত হলে তবেই তার একটা বোধগম্য অর্থ দাঁড়ায়। বোকা-বোকা প্রেম ভালবাসা, স্মার্ট-স্মার্ট প্যার-মোহাব্বৎ সবই কহানীর জিনিস, পুরাণে লোককথায় নৈর্ব্যক্তিক অবাস্তবতার আশ্রয়ে রয়েছে। এবং লভ? লভ কী? কোথায় দাঁড়িয়ে আছে? যেখানে যতেক মস্তানি, রোড-রোমিওগিরি, এমন কি রেপ, মুখে অ্যাসিড-বালব্, ছাদ থেকে ঠেলে দেওয়া সব স-বই লভ এবং লভ্-জাত। লব্ তুঝে লব ম্যাঁয় করতা হুঁ।

রাজু-মুন্নারা ক্রমশই প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ, ব্যঞ্জনা, অনুষঙ্গ সম্পর্কে আরও আরও ওয়াকিবহাল হয়ে উঠবে। পার্থকে বা আর কাউকেই জিজ্ঞেস করতে হবে না, এমন দিন ওদের বেশি দূরে নেই।

ছাত্রী মধুমিতার বাবা একটা হাফ পাঞ্জাবি আর লুঙ্গি পরে নিজেদের বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বাজখাঁই গলায় প্রতিবেশীর সঙ্গে গল্প করছেন। ওঁকে দেখলে শীত-গ্রীষ্ম বোঝা যায় না। পার্থকে দেখে বললেন—আজ রিপাবলিক ডে। বিশ্বসুদ্ধ সব্বার ছুটি, তোমার ছুটি গ্রান্ট হল না? সে কি হে?

—পরীক্ষা এবছর এগিয়ে এসেছে যে। পার্থ হাসল।

—ছাত্রী তো টিভি খুলে প্যারেড দেখছেন।

—এসে যাবে।

দু-তিন সিঁড়ি টপকে টপকে তিনতলায় উঠে গেল পার্থ। দোতলাটা পুরো মেয়েমহল। সবজি কাটা হচ্ছে, পান সাজা হচ্ছে, উচ্চৈঃস্বরে গল্পগাছা, কাজকর্ম হচ্ছে, মাছ-ভাজার গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে রয়েছে। তেলে ফোড়ন ছাড়বার চড়বড় শব্দ। কেমন যেন বে-আব্রু হয়ে যায় অন্দর, বাইরের কেউ এখান দিয়ে যাতায়াত করলে। এঁরা হাওড়ার বনেদি ধরনের মানুষ। বিরাট বিরাট চেহারা পুরুষদের। খোলা গলায়

হাসেন, দরাজ গলায় বাড়ি কাঁপিয়ে কথা বলেন, পায়ের ওপর পা দিয়ে তাকিয়া কোলে ছুটির দুপুরে তাস খেলেন। তাসের আড্ডায় গোছা গোছা পান এসে যায়। এঁদের বাড়ির মেয়েরা টকটকে ফর্সা। বৃদ্ধরা মোটা, রোগা মহিলাগুলি বাড়ির বউ, উদয়াস্ত খাটেন। বাড়ির কাজ-কর্মে, অন্তত পার্থর চোখে, কোনও শৃঙ্খলা নেই। চা এবং পান তো সর্বক্ষণ তৈরি হচ্ছে। আর, কত মিষ্টান্ন যে এঁদের ভাঁড়ারে মজুত থাকে তার ইয়ত্তা নেই। নিজেরাও খান, অকাতরে বিলিয়েও যান।

অন্দরমহলের মাঝ মধ্যিখানে একখানা ঘরে সে পড়াত আগে। তখন অন্দরমহলের যাবতীয় শব্দ, যাবতীয় কার্য-কলাপ তার কর্ণগোচর হত। একদিন বাড়ির কোনও বউ, মধুমিতার মা-কাকিদের কেউ, নিজ শাশুড়ি ও তাঁর খাস দাসীর মুণ্ডপাত করছিলেন, মধুমিতা খুব লজ্জা পেয়েছিল। তারপর থেকে তিনতলার একটা একটেরে ঘরে পড়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

এখন সিঁড়ি টপকে টপকে সেই তিনতলার টুঙ্গি ঘরেই গিয়ে উপস্থিত হল সে। মেঝে চকচকে লাল। চকচকে কালো বর্ডার ডেওয়া। মোজেইক, মার্বেল সব কিছুকেই হার মানায় এদের এই চকচকে লাল মেঝে। লম্বা লম্বা গরাদ দেওয়া দরজার মতো জানলা সব। পুরোটা খুলে দিলে মনে হয় আকাশে বসে আছি। চারপাশের সব কিছুই দেখা যায়। সব কিছু অবশ্য খুব সুবিধের নয়। চাপ চাপ বাড়ি। সোজা এক লাইনে চলে গেছে। মাঝখানে বেশিরভাগই এতটুকু ফাঁক নেই। কোথাও বা খোলা নর্দমা চিকচিক করছে। অদূরে বাজার এবং তজ্জনিত ভিড়, বেসুরো হইচই।

টেবিলের ওপর বইপত্র সব গুছোনো। বিষয় ভাগ করা। মধুমিতা খুব গুছোনো মেয়ে, এটুকু বলতেই হবে। ওর দিদি দেবমিতা পড়াশোনায় খুবই ভাল ছিল, মধুমিতা তার ধার দিয়েও যায় না। কিন্তু খুব পরিপাটি। হাতের লেখাও চমৎকার, গোটা গোটা, ভুলগুলো নিয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

এই উকিল-তনয়াকে মাধ্যমিকের সময় থেকেই টেনে তুলছে পার্থ। সে সময়টায় বাড়ি বিক্রি আর ফ্ল্যাট তৈরির ফাঁকে তারা হাওড়ার সন্ধ্যা বাজারে বাস করছিল। হাতের কাছে এই ট্যুইশনিটা পেয়ে বেঁচে গিয়েছিল সে, দুই বোনেই পড়ত তখন। বড়টির তখন ফাইন্যাল ইয়ার, পলিটিক্যাল সায়েন্সে অনার্স। নিজেও পড়ুয়া মেয়ে ছিল, পার্থকেও প্রচুর খাটিয়ে নিত। দেবমিতার বিয়ে হয়ে গেলে এখন শুধু মধুমিতা। এখনও খাটুনি আছে তবে তার ধরন অন্যরকম। মধুমিতাকে এক জিনিস অন্তত তিনবার লেখাতে হয়। অথচ মধুমিতার বাবা তাকে ছাড়তে চান না। ছাত্রী সম্পর্কে তারও যে একটা দায়িত্ববোধ জন্মে যায়নি একথাও বলা যায় না। একটা রোখ। গ্র্যাজুয়েশনের গণ্ডিটা পার করিয়েই ছাড়বে।

কিছু টাস্ক দেওয়া ছিল। কিন্তু টেবিলের ওপরটা পরিষ্কার। সামনে কোনও খাতা দেখতে পেল না পার্থ। কিছুক্ষণ বসে বসে বিরক্ত হওয়া ছাড়া উপায় নেই। লিখতে দিলেই মধুমিতা এই কীর্তি করবে। লিখতে নারাজ। করবে তো এ বই সে বই থেকে সংকলন। যাকে বলে পাইল দেওয়া। এই কাজটাই দেবমিতা করত চমৎকার। মধুমিতাকে সে প্রাণপণে শেখাচ্ছে, পারছে না। বোধহয় পারবার ইচ্ছেটাই নেই। বাপের পয়সা-কড়ি আছে। আদুরে তার ওপর। এদের কোনও তাগিদ থাকে না পড়াশোনার।

বইয়ের পাঁজায় একটা ময়ূরের পালক গোঁজা একটা খাতা এবার চোখে পড়ল পার্থর। টেনে বার করল খাতাটা। ঠিক। এটাই। ময়ূরের পালক, বট-পাকুড়ের পাতা, চাঁপা ফুল এই সব দিয়ে বই-খাতার মার্কা করা মধুমিতার রীতিই বটে। খাতাটা সামনে রাখতে কী হয়েছিল? উলটে-পালটে দেখল পার্থ। নাঃ লিখেছে। তবে এডিটিং-এর কাজ আজও ভাল হয়নি। মাঝে মাঝে স্টার মার্ক দিয়ে লিখে দিতে হবে তাকে।

উত্তরটার শেষ পাতায় এসে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল পার্থ। ঘটা করে লেখা—সমাপ্তি। কিন্তু তারপর কোলন ড্যাশ দিয়ে যা লেখা তা কোনওমতেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রশ্নোত্তরের সমাপ্তি নয়।

পার্থদা, আপনি বোকা, না অন্ধ জানি না। যদি আমায় কোনওদিনই বুঝবেন না তবে আমার জীবনে এলেন কেন? আমার কিছুই ভাল লাগে না। সবাই কত সুখী। আমার একারই খালি মন-খারাপ করে। নীরস বইগুলো শুধু আপনি পড়ান বলেই পড়ি। আপনার তেতো বকুনিগুলোও একই কারণে দিনের পর দিন হজম করি। এ পাড়ার সুজনদা (চাটার্ড), আমার বন্ধুর দাদা সিদ্ধার্থ (ওষুধের বিজনেস) আমার জন্যে পাগল। কিন্তু আমার কাউকেই ভাল লাগে না। আপনাকে ছাড়া কাউকেই ভাবতে পারি না। জানি, আপনি বলবেন--আপনার চাকরি নেই। কিন্তু এম.এ.বি.এল.' পাশ করেছেন। ইনকাম-ট্যাক্স প্র্যাকটিস করুন না। বাবাকে একটু ধরলেই হেলপ করবে (দয়া করে বকা দেবেন না)।

চোখ না তুলেও পার্থ বুঝল মধুমিতা এসে দাঁড়িয়েছে। কোনও লাল ড্রেস পরছে বোধহয়, রোদ আড়াল করে লাল ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। আড়চোখে দেখে খাতার মধ্যে মুখ ডোবাল পার্থ। টকটকে ফর্সা মধুমিতা। একেবারে লাল হয়ে গেছে। চশমার আড়ালে চোখ দুটো স্তিমিত।

—আমি কি আসব? ক্ষীণ গলায় জিজ্ঞেস করল।

পার্থ জবাব দিল না।

—আসব?—গলা কাঁপছে ওর।

—তোমার ঘরে তুমি আসবে না তো কি ইউ.এস.এ.-র ফার্স্ট লেডি আসবেন? লম্বা বিনুনির প্রান্তের চুলগুলো আঙুলে পাকাচ্ছে মধুমিতা।

—খাতায় এটা কী করেছো?

মধুমিতা কেঁদে ফেলল।

—কী, বলো? নরমতর গলায় প্রশ্ন করল পার্থ।

—বলতে পারিনি বলেই তো লিখেছি।

—মানে কি এর? ইয়ার্কি? ফাজলামি?

—ইয়ার্কি নয়। কোনও মতে বলল মধুমিতা।

—তোমার বাবা আমাকে বিশ্বাস করেন। এ সব জানতে পারলে কী মনে করবেন বলো তো!

মুখ তুলে তাকাল মধুমিতা। চোখে তিরস্কার।

—বাবাকে জিজ্ঞেস করে কে কবে প্রেমে পড়েছে পার্থদা।

হঠাৎ পার্থর খুব হাসি পেয়ে গেল। বলল—প্রেম? না মোহাব্বৎ? না প্যার?

ঠিকঠাক বলো তো!

—আমার ফিলিংস নিয়ে মজা করছেন?

—মজা করছি না, আজ এখানে আসার সময়ে আমাদের ফ্ল্যাটের দারোয়ানের পুঁচকে ছেলে আর তার পুঁচকে বন্ধুদের কাছ থেকে খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাখ্যা শুনছিলাম।

—যেমন?

—ওরা বলছিল—প্রেম-ভালবাসা ফালতু কহানীতে থাকে। কোনও মানে নেই এগুলোর।

মধুমিতার চোখে এখনও জল। মুখের লাল ভাবটা কেটেছে। বিনুনি ঝাঁকিয়ে বলল—আপনার দারোয়ানের ছেলের ব্যাখ্যা আমায় মানতে হবে নাকি?

—না তা নয়। তবে চতুর্দিকের রিয়্যালিটি ওই কথাই বলে। ফিল্ম আর জীবন তো এক নয়।

পার্থ অস্বস্তি ঢাকতে একটু ইতস্তত করেই উঠে দাঁড়াল।

—চলে যাচ্ছেন?

—তোমার লেখাগুলো কারেক্ট করে দিয়েছি। প্রচুর অ্যাসটারিস্ক পড়েছে। আরও চওড়া মার্জিন রাখা উচিত ছিল।

—চলে যাচ্ছেন? জোর দিয়ে প্রশ্নটা আবারও করল মধুমিতা, চোখ নামিয়ে নিয়েছে, ঠোঁট কাঁপছে খুব। পার্থ দৃশ্যটার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

—টিউটরের সঙ্গে প্রেমটা কিন্তু সত্যিই খুব হ্যাকনীড, খুব বস্তাপচা মধুমিতা। ডোন্ট বি ক্যারেড অ্যাওয়ে।

—পাড়ার ছেলের সঙ্গে, বন্ধুর সঙ্গে, দাদার বন্ধুর সঙ্গে, ক্লাস ফেলোর সঙ্গে...সব প্রেমই খুব পুরনো পার্থদা।

—প্রেম জিনিসটাই অনেক অনেক পুরনো...

—ইনকাম-ট্যাক্স প্র্যাকটিস করবার কথা ভাবলেন?—মধুমিতার সাহস হু হু করে বাড়ছে।

—তোমার বাবার জামাই আর জুনিয়র একসঙ্গে হওয়া হয়ে উঠবে না।

—কেন? মানে লাগবে?

—হ্যাঁ। তবে আমার নয়, তোমার। শোনো মধুমিতা, ব্যাপারটা ভাল করে ভেবে দেখো। ভাবাবেগকে প্রশ্রয় দিও না। পস্তাবে।

পার্থ বেরিয়ে এল। তার অভ্যস্ত দ্রুততার সঙ্গে নামতে নামতে সে বুঝতে পারছিল, তার পা কাঁপছে। হাতের পাতা খুব ঘেমেছে। এদের বাড়িতে ছুটির দিনের নানাবিধ মজায় সবাই এমন মশগুল যে, কেউ খেয়ালও করল না, টিউটর তার সময়ের আগেই চলে যাচ্ছে। টিউটরকে চা দেওয়া হল না। সে জুতো পায়ে গলাল। এক পায়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফিতে বাঁধল। বৈঠকখানা ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় বাজখাঁই গলার উল্লাসধ্বনি শুনতে পেল।—এই নাও, তোমার টেক্কা ট্রাম্পড্। একে বলে টেক্কার ওপর টেক্কা মারা—হাঃ হাঃ হাঃ হা হা।

এই বেঁচে থাকার, নিশ্চিন্তে খেয়ে-পরে রোজগার করে বেঁচে থাকার হাসি আনন্দ উল্লাস—এ খানিকটা আলাদা জগৎ। এ যেন এ দশকের জীবন নয়। এ শতকেরই নয়।

অনেকদিন আগেকার অত্বরিত এ জীবনযাত্রা কোথাও কোথাও ফসিলের মতো রয়ে গেছে। পার্থদের উর্ধ্বশ্বাস জীবনের সঙ্গে এর কোনও মিল নেই। ওপরের ওই টুঙ্গি ঘরে লাল ঠোঁট সাদা পায়রার মতো ওই মেয়েটির চোখে অশ্রু—এ-ও যেন একটা এমন জগৎ যা বহুদিন আগেকার একটা স্মৃতির মতো। কোনওদিন নিশ্চয়ই সত্য ছিল, এখন অবাস্তব।

পার্থ মনে মনে চেঁচিয়ে হেসে উঠল। কী ভাববেন মধুমিতার বাবা মিহিরবাবু যদি ঘটনাটা জানতে পারেন। এমনিতে অতি সদাশয় ব্যক্তি। দেবমিতার বিয়ে হয়ে যাবার পর তার দক্ষিণা একটি পয়সাও কমাননি। পার্থ বলেছিল, তা সত্ত্বেও না।

—আরে তোমার মতো সিনসিয়ার টিচার, টাকাটা কিছুই না। জিনিসপত্রের দাম কি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে? হু-হু-হু-হু করে চড়ে যাচ্ছে সব। তারপর আসছও তো এখন অনেক দূর থেকে। তবে হ্যাঁ, আমি যদি অ্যাফোর্ড করতে না পারতুম তো নানান কথা বলতুম হয়তো তোমায়। তুমি মনে কোনও কিন্তু রেখো না পার্থ।

টিউটর হিসেবে, মানুষ হিসেবেও তাকে পছন্দ করেন উনি। কিন্তু মেয়ের প্রেমিক হিসেবে? ওঁর বড় জামাইকে দেখলে ওঁর পছন্দ বোঝা যায়। লম্বা, নধরকান্তি, বেশ জামাই-জামাই। হঠাৎ দেখলে যদি দুধ-ঘি খাওয়া ক্যাবলাকান্ত মনে হয়, সে মনে হওয়া ভুল। এম.-এস. ডাক্তার। শিগগিরই বিদেশ যাবে। তার পাশে পার্থ বিশ্বাস? একটা এম.এ. ডিগ্রি, একটা এল.এল.বি.। কোনওটাই ভালো নয়। হাইট পাঁচ আট। রঙ মাঝারি। স্বাস্থ্য মোটামুটি। দাড়ি-গোঁফ দুই-ই থাকায় একটা বোহেমিয়ান বোহেমিয়ান চেহারা। বাবা-মার একটা সাতশ স্কোয়্যার ফুটের ফ্ল্যাট আছে উত্তর কলকাতায়। উদ্বৃত্ত পয়সা-কড়ি কিস্যু নেই।

হঠাৎ গোঁত্তা খেল পার্থ। আচ্ছা, মধুমিতা তার এই দাড়ি-গোঁফের প্রেমে পড়েনি তো? সে শুনেছে দাড়ি-গোঁফে তাকে খুব আঁতেল-আঁতেল, ভাবুক-ভাবুক দেখায়। অনির্বাণ তার বন্ধু বলে—হেভি অ্যাপিল তোর পার্থ।

ঘড়ি দেখল পার্থ। সাড়ে এগারোটাও বাজেনি। আজকের সকালটা দেওয়া ছিল মধুমিতাদের বাড়িকে। অপ্রত্যাশিত ছুটি মিলে গেল। কিন্তু এখনই বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না। অনির্বাণদের ওখানে গেলে হয় না? ব্যক্তিগত ব্যাপার কারও সঙ্গে আলোচনা করার ধাত নেই পার্থর। কিন্তু এ ব্যাপারটা এখনও খুব ব্যক্তিগত কী? একটু যেন পরামর্শর দরকার ছিল। তেমন বুঝলে চেপে যাওয়া যাবে।

বেশির ভাগ বন্ধুই তার মোটামুটি সফল। জয় তার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু এখানে কোথাও চান্স পেল না। বাঙ্গালোর থেকে মোটা টাকা ক্যাপিটেশন ফি দিয়ে এঞ্জিনিয়ার হয়ে বেরোল। হায়দ্রাবাদে আছে এখন। চিরঞ্জীৎ দিল্লী চলে গেল। সে-ও একগাদা খরচ করে সেলস ম্যানেজমেন্ট পড়ল। ওখানেই পোস্টেড। বিল্টু অতি সম্প্রতি অলটারনেটিভ মেডিসিন নিয়ে পড়াশোনা করে, আরামবাগে বসছে। করে খাচ্ছে। সে যখন পল সায়েন্সে অনার্স নিয়ে বি.এ. পড়তে ঢুকল, তখনই বন্ধুরা বলেছিল হেভি মুশকিলে পড়বি। তার ভরসা ছিল রেজাল্ট ভালো হবে, অন্তত এডুকেশন লাইনে যেতে অসুবিধে হবে না। দীর্ঘদিন পর্যন্ত তার সঙ্গী ছিল অনির্বাণ। সাধারণভাবে বি.কম. করে মুখ চুন করে ঘুরে বেড়াত। ওর বাবা-জ্যাঠাতে মিলে শেষে মোটা টাকা বার করে দিলেন।

হোটেল ম্যানেজমেন্ট পড়ল, এখন ডাঁটে কেটারিং-এর বিজনেস করছে। একমাত্র পার্থরই বাবার মোটা টাকা বার করবার ক্ষমতা নেই। খুব সম্ভব এবার ও বাতিলের দলে পড়ে যাবে।

ভেতরের তেতো ভাবটা এত বেড়ে গেল যে, অনির্বাণদের বাড়ি যেতে ইচ্ছে করল না আর। লঞ্চ ধরে বাবুঘাট গেল সে। তারপর উদ্দেশ্যহীন হাঁটতে লাগল দক্ষিণের দিকে, গঙ্গার ধার ধরে ধরে।

দুপুর দুটো নাগাদ পার্থর খেয়াল হল সে বাড়ি না ফিরলে মা-ও খেতে পারবে না। কিছু বলে আসেনি। একটা পে-বুথ থেকে সে ফোন করে দিল। ফোনটা দাদার বাড়িতে। দাদার লোক ধরেছিল। পার্থ কড়া গলায় বলেছে, এখুনি গিয়ে মাকে বলে আসতে সে আটকে গেছে। কোথাও খেয়ে নেবে।

ময়দানে বসে বসে ক্রিকেট দেখতে দেখতে সময়টা কেটে গেল। বসে বসেই ঝালমুড়ি, ফুচকা, চটপটি খাওয়া হল কিছুক্ষণ সময় বাদ বাদ। রোদের রঙ বাসি মড়ার মতো হয়ে আসা অবধি পার্থ ময়দানেই বসে রইল। তারপর উঠে বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল। ক্যাথিড্রাল রোডের মোড় থেকে মানিকতলায় নিজেদের বাড়ি পর্যন্ত পুরো পথটা হাঁটতে থাকল পার্থ, যেন হেঁটে হেঁটেই নিজের ভেতরকার চিন্তা তিক্ততাগুলোকে ক্ষইয়ে ফেলবে।

বাড়িতে পৌঁছতে পৌঁছতে অন্ধকার গাঢ়। সেই চারতলা। কত কিলোমিটার হেঁটেছে আজ? জীবনে কখনও এতটা হেঁটেছে বলে মনে করতে পারল না পার্থ। কেন হাঁটল? গন্তব্য না থাকলে তবেই বোধহয় মানুষ এভাবে হাঁটে।

দাদার ফ্ল্যাটের দরজা খুলে গেল। বৌদি দাঁড়িয়ে।—তোমার একটা ফোন এসেছে পার্থ। দুপুরেও একবার এসেছিল। এখন বারান্দা দিয়ে ভাগ্যিস দেখতে পেলুম তুমি আসছ...

ফোনটা তুলল পার্থ।

—হ্যালো...

চুপ ও দিকটা। কিছুক্ষণ পর খুব ক্ষীণ গলা ভেসে এল।

—আমি মৌ, মানে মধুমিতা বলছি।

—বলো।

—আপনি বোধহয় আমাকে খুব...মানে খুব খারাপ ভাবছেন?

পার্থ হাসল, নিজের কাছেই হাসিটা খুব নার্ভাস লাগল—ভাবার কোনও কারণ আছে কি?

—কী জানি? যেভাবে চলে গেলেন...সারাদিন বাড়ি ফেরেননি...

—আমার কাজ হয়ে গিয়েছিল, তা ছাড়া তোমার তো কাজে মন ছিল না...

পার্থর পা অবশ লাগছে, সে চেয়ার টেনে বসল।

—শুনুন, আপনি আমাকে ভাবতে বলেছিলেন, আমি ভেবেছি।...আপনিও একটু ভাবুন!...একটু...! অনুনয়ের সুর গলায়।

চুপ করে রইল পার্থ।

—কী হল? শুনছেন?

—শুনছি।

—ফোন ধরেই ভাবতে শুরু করে দিলেন না কি?

—কী ভাবব তাই-ই তো জানি না।

—পার্থদা আপনার গলা শুনলে আমার ভেতরটা কেমন...মানে আমি কেমন হয়ে যাই।

—খুব ভালো। কী ভাবব, তা তো বললে না?

—এই আমাকে আপনি ভালো...মানে আপনি আমাকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারবেন কি না।...জানি এগুলো ভেবে-চিন্তে হয় না। হবার হলে হয়, না হলে হয় না। তাই না? কিন্তু আমি আপনাকে এতটাই...মানে...আমি রিস্ক নিতে রাজি আছি।

বলতে বলতে মধুমিতার গলা একেবারে ভেঙে গেল। পার্থ বুঝতে পারল ও অনেক কষ্টে কান্না সামলাচ্ছে।

সে দেখে নিল বউদি এ তল্লাটে নেই। তারপর মৃদুস্বরে বলল—ছি মউ, কেঁদো না। কেউ শুনলে?

—ভয়েই মরে যাচ্ছেন, না?

—না, ভয় না।

—তবে কী? লজ্জা? ঘেন্না?

—না। খুব জটিল ফিলিং মউ, তুমি বুঝবে না।

—চেষ্টা করলে আমিও কিছু কিছু বুঝতে পারি। শুনুন, আপনি ভেবে নিন, তারপরে আমি বাবাকে বলব।

—সর্বনাশ! কী বলবে?

—বলব। যা বলবার। আপনাকে জড়াব না। ভয় নেই।

ফোন কেটে দেবার শব্দ হল।

—বউদি, যাচ্ছি! পার্থ জানান দিল।

—ঠিক আছে, দরজাটা টেনে দিও।

বউদিদের দরজাটা টেনে দিয়ে নিজেদের দরজায় এসে পার্স থেকে চাবি বার করে দরজা খুলল পার্থ। এটা সে প্রায়ই করে। বাবার পক্ষে তাড়াতাড়ি ছুটে আসা ভালো না, মা পায়ের ব্যথার জন্য তাড়া করতে পারে না। দরজার বাইরে অপেক্ষা করতে তার ভালো লাগে না। তাই ডুপ্লিকেট চাবিটা সে রাখে।

দরজাটা বন্ধ করে নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে উলটো দিকে বারান্দায় চোখ পড়ল পার্থর। বসার ঘরে খুব মৃদু একটা আলো জ্বলছে। বসার ঘর আর বারান্দার মাঝখানে কাচের দরজা। ওদিকে অন্ধকার। মা বাবা দুজনে পাশাপাশি বসে আছে। পার্থ জানে না কী ছিল এ দৃশ্যটাতে, কেনই বা সে দাঁড়িয়ে গেল। মা-বাবা তো চুপচাপ বসেই আছে। পাশাপাশি। অন্ধকারে। মনে হতে পারত একা, পরিত্যক্ত, হতাশ। কিন্তু তা মনে হল না। সারাজীবন এই হিসেব করে করে চলা, এক পা এগোনো তো তিন পা পেছনো, ছেলের জন্যে পিতৃপুরুষের ভিটে বেচা, এক সন্তান স্বার্থপর, অন্যজন অকৃতী অধম, সামান্যতম সঞ্চয়, বড় কোনও অসুখ-বিসুখ করলে তেমন চিকিৎসার আশাও নেই। তবু কিসের জোরে যে মা-বাবা ওভাবে বসে থাকে! ওই অতটুকু বারান্দায়।

মাঝখানের দরজাটা খুলে যাচ্ছে।
মা।
কী করে যে টের পায় সে ফিরেছে!
—এলি! বাবার গলা।
—এলাম, বাবা।
মউ বলছিল ভাবতে। বলছিল সে রিস্‌ক নিতে রাজি।
পার্থর ভেতরটা টনটন করছে।
সে ভাবল সে-ও রাজি। রিস্‌ক নিতে।

মুক্তি

'যা বোঝো না তা নিয়ে মাথা ঘামিও না তো।' একটু যেন ঝাঁঝ কমলেশের গলায়।

কোন্ পরিবারের ছেলে সৌম্যজিৎ তা জানো? আগেকার দিনের স্টিভেডর ওর ঠাকুরদাদা। চেহারাতে আভিজাত্যের ছাপ সীলমোহর করে বসানো। তাছাড়া কতটুকুই বা ছেলে! ওরা পরস্পরের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে মেলামেশা করছে—আমরা মাঝে পড়ে বাধা দেব কেন? কত কমপ্লিকেশনস এর থেকে হতে পারে জানো? ছেলে মেয়ের আত্মপ্রত্যয় নষ্ট হয়ে যেতে পারে, কমপ্লেক্স গ্রো করতে পারে...' তাপসী বরের সমর্থন পেয়ে আহ্লাদিত হয়ে বলল—অল্পবয়সের এইসব রিপ্রেশন থেকেই তো নানা জটিলতার সৃষ্টি হয়। কে হয়ত তোতলা হয়ে গেল, কার হাত পা কাঁপছে, কেউ প্রচণ্ড রাগী। আমাদের সাইকলজিতে পড়তে হয়েছে মা। তা ছাড়া বড়লোকের ছেলে বলে মিড্‌লক্লাসের সঙ্গে মিশবে না এ সব কমপ্লেক্স আজকের দিনে অচল।

মুক্তি বললেন—'বড়লোক ছোটলোক বুঝি না। ছেলেটা একদম ভাল না। ছোটনকে বিপথে নিয়ে যাবে। মেলামেশাতে সোজাসুজি বাধা দিতে কে বলেছে? একটু বুদ্ধি করেও তো করা যায়! বলিস তো আমি করতে পারি।'

—'না, না' কমলেশ জোরে জোরে মাথা ঝাঁকালো, 'আজকালকার বাচ্চা, ইনটারফিয়ার করলে একেবারে হাতের বাইরে চলে যাবে।'

মুক্তি হতাশ হয়ে বললেন—'তবে আর কি! আমি বারান্দায় গিয়ে বসে থাকি!'

—'তা কেন? তুমি তো ঠাকুরঘরে গিয়ে বসতে পারো!' কমলেশ বলল।

—'এই তো ঠাকুরঘরে ফুল-জল দিয়ে এলুম, আবার কী? অত ঠাকুর-ঠাকুর বাই আমার নেই খোকা। বারান্দায় বসতে না দিস তো আমি রথীনবাবুদের বাড়ি থেকে একটু ঘুরে আসি।'

—'তাই যান না!' তাপসী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে—'আসলে কী জানেন? বারান্দায় কেউ বসে থাকলেই ছোটন ভাববে ওর জন্য কেউ দুশ্চিন্তা করছে। চটে যাবে।'

—'সে চটে যাবে বলে আমরা বারান্দায় বসবো না? এ তো আচ্ছা জুলুম?' বিরক্ত হয়ে মুক্তি পায়ে চটি গলালেন।

রাস্তার ওধারেই ডক্টর রথীন সমাদ্দারের বাড়ি। মিলিটারিতে ছিলেন। সেখান থেকে অবসর নিয়ে কয়েক বছর এখানে এসে বসেছেন। পশার বেশ জমেছে। এদের পারিবারিক ডাক্তারও তিনিই। বাড়িতে তিন চারটে কুকুর আর ডক্টর সমাদ্দারের পিসিমা থাকেন। পিসিমার সঙ্গে মুক্তির জমে ভাল।

কমলেশ চৌধুরীর মা মুক্তি চৌধুরী মাঝারি সাইজের একটি মহিলা। মোটা তো নয়ই রোগাও নয়। কোঁকড়া চুলে পাক ধরেছে। সোনালি চশমার পেছনে বেশ ঝকঝকে দুটো চোখ। রঙ আধা-ফরসা। আজ পরনে কালো আঁশ পাড় টাঙ্গাইলের শাড়ি। দুহাতে সরু সরু কটা চুড়ি, সোনার চেন গলায়। গণ্ডে একটি লাল তিল। আরও তিল গজাচ্ছে। পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন বছরের বিধবা। নাতি-নাতনি আদর করে বলে মডার্ন ঠাকুমা। কেন না মুক্তি বিএসসি পাশ করেছিলেন। এখনও গলা ছেড়ে দিব্যি গান, এবং স্বামীর বিষয়-সম্পত্তি সমস্ত চিরকাল সামলে এসেছেন।

কমলেশের বাবা মোটামুটি পসার-অলা উকিল ছিলেন। তাঁর টাকাকড়ি কোথায় কী লগ্নি হবে, আমানত হবে সে সব ঠিক করা মুক্তিরই কাজ ছিল। এমনকি সল্টলেকের এই বাড়ির সরকারি জমি কেনা, বাড়ি তৈরি—এ সব মুক্তি দাঁড়িয়ে থেকে না করালে হত কিনা সন্দেহ। কর্তা মারা গেছেন আজ পনেরো ষোল বছর। এখন মুক্তি ছেলে বউকে টপকে বারো বছরের নাতনি আর চোদ্দ বছরের নাতিকে নিয়ে থিয়েটার দেখতে যান। থিয়েটার তাঁর বড্ড প্রিয়।

এই মুক্তিকে নিয়েই তাঁর ছেলে-বউ কমলেশ-তাপসী সম্প্রতি পড়েছে মহা মুশকিলে। মুশকিলটা অবশ্য শুরু তাদের ছেলে-মেয়ের জন্মের পর থেকেই। তার আগেটায় মা বেশ বুঝদারই ছিল। কমলেশ তার ক্লাস-বান্ধবী তাপসীকে বিয়ে করতে চাইলে তো তার বাবা—'সমবয়সী মেয়ের সঙ্গে আবার বিয়ে কী? পলিটিকস্ করে ওসব মেয়ে নিয়ে কি কেউ সুখী হয়?'—এই সব প্রশ্ন তুলে বেঁকে বসেছিলেন। মুক্তিই তখন তাঁকে বোঝান বিয়ের মোটিভেশন আজকাল কতটা বদলে গেছে। পুত্রার্থে তো নয়ই, সংসারার্থেও নয়, বুদ্ধি-বৃত্তি-রুচি-আদর্শ এসবের মিলযুক্ত মানুষের সঙ্গে যতদিন সম্ভব কাটানোটাই এখন জরুরি। আর সুখ? ও হয় তো হবে, নইলে হবে না। উপরন্তু পরস্পরকে বিয়ে করতে চাইছে এরকম দুটি বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলে-মেয়ের মাঝখানে কোন অজুহাতই খাড়া করা ঠিক নয়। এই সময়েই কমলেশ-তাপসী মুক্তির অতি আধুনিক মনের পরিচয় পেয়েছিল। কিন্তু বয়স মানুষকে একটা না একটা সময়ে কাবু করে ফেলবেই। কিছুদূর পর্যন্ত পরের প্রজন্মের সঙ্গে কেউ কেউ হাঁটতে পারেন। তারপরে আর তাল রাখতে পারেন না। পিছিয়ে পড়েন। এটাই স্বাভাবিক। জীবনের নিয়ম। মুক্তিও পারছেন না। কিন্তু তিনি তা কিছুতেই মানতে চাইছেন না। তাঁর ভাবটা তিনি যেন ছেলেবউ তো বটেই, নাতি-নাতনিরও সমবয়সী। কোনও জেনারেশন গ্যাপ নেই।

কিন্তু নাতি-নাতনির নামকরণেই মুক্তির রক্ষণশীলতার ব্যাপারটা প্রথম বোঝা যায়। নাতির নাম তিয়াষ, নাতনির নাম পিয়াসা। শুনে মুক্তি বললেন—'নামেতে কি আর আসে যায়। সত্যি কথা। গোলাপে যে নামে ডাকো সুগন্ধ বিতরে। কিন্তু একী কাণ্ডজ্ঞান

তোদের! দুটোকেই তেষ্টায় ছাতি ফাটিয়ে মারছিস মা-বাপ হয়ে। অন্য নাম দে বাপু।'

কমলেশ বলে—'কেমন পোয়েটিক নাম বলতো?'

—'এসব আজকাল পোয়েট্রিতেও চলছে না খোকা, তা যদি বলিস।'

কমলেশ মজা করে বলল,—'পিতৃপিতামহদের নামগুলো ছিল জগদ্দল টাইপ, আমাদেরগুলো হল কোনক্রমে জলচল, এবার আসছে কল্পনা, কবিতা, আমরা শোধ নিচ্ছি ধরো।'

মুক্তি বললেন,—'এর চেয়ে যে তোদের বাপ-ঠাকুর্দার পঞ্চানন, মনমোহনও ভাল ছিল রে! তিয়াষ-পিয়াসা শুনলে আশুতোষ জীবিত থাকলে ক ভল্যুম এনসাইক্লোপিডিয়া নিয়ে তাড়া করতেন কে জানে?'

যতই আপত্তি করুন আর যুক্তি দেখান, কমলেশ-তাপসীর বড় সাধের নাম পালটালো না। মাঝখান থেকে মুক্তি পিছিয়ে পড়তে লাগলেন।

ইতিমধ্যে নাতি-নাতনি কিন্তু তাঁকে মডার্ন বিশেষণে বিশেষিত করেছে। আসল কথা ছোটন আর পুঁটু দুই নাতি-নাতনিই সর্বভুক। বাবা-মা দুজনেই কাজে বেরিয়ে যায়। ঠাম্মার কাছেই অক্ষর পরিচয়। অক্ষর পরিচয় হতে না হতেই গড়গড় করে পড়া। যা পায় তাই পড়ে। পঞ্জিকা থেকে, খাবারের ঠোঙা থেকে সব। তারপর একদিন তাদের মা দেখল পুঁটু আর ছোটন কাড়াকাড়ি করে 'চরিত্রহীন' পড়ছে। বইটা তাপসী ছোঁ মেরে কেড়ে নেয়।

মুক্তি উল বুনছিলেন, বললেন—'পড়ুক না তাপসী, ওদের বয়সে যতটুকু নেবার তার বেশি নিতে পারবে না। মাঝখান থেকে ভাষার ভিত শক্ত হয়ে যাবে।' ঠাম্মার প্রশ্রয়ে ছোটন-পুঁটু মহানন্দে শরৎচন্দ্র-বিভূতিভূষণ-রবীন্দ্রনাথ গোগ্রাসে গিলছে। সেই সঙ্গে ঠাম্মাকে একেবারে নিজেদের সমমানসী ভাবছে।

কিন্তু ইদানীং ঠাম্মার এই আধুনিকতায় একটু যেন চিড় ধরেছে। ছোটনের বন্ধুদের মধ্যে আজকাল একটি নতুন মুখ দেখা যাচ্ছে—সৌম্যজিৎ গাঙ্গুলি। ছেলেটি দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনি স্মার্ট, উপরন্তু পকেটে সব সময়ে টাকাপয়সা ঝমঝম করছে। এই ছেলেটিকে মুক্তি কেন কে জানে দেখতে পারেন না। প্রথম দিনেই বলেছিলেন,—'তুমি গলায় ওটা কী পরেছো সৌম্যজিৎ? সোনার হার নাকি?'

—'হ্যাঁ, ঠাকুমা। আমার ইচ্ছে হল চাইলাম, বাবা কিনে দিল।'

—'তোমার হার পরতে ইচ্ছে হয়? তার ওপরে সোনার? বলো কী? যে কোনও সময়ে চোর-ছ্যাঁচোড়ে টেনে নিতে পারে যে!'

—'হার পরা আজকাল টপ ফ্যাশন যে! জানেন না ঠাকুমা? নিলেই হল? তাছাড়া কত নেবে? নিলে আরেকটা পরবো...আরেকটা!'

ছেলেটির কথাবার্তা মুক্তির ভাল লাগে নি। তবু তিনি কিছু বলেন নি। ছেলেমানুষদের কত বন্ধু আসে, কত বন্ধু যায়, নিজেদের রুচিমতো বন্ধুর বৃত্ত ঠিক হয়ে যায় শেষে। কিন্তু সৌম্যজিৎ যেন ছোটনের সঙ্গে সঙ্গে পুঁটুকেও বশ করেছে। অন্য বন্ধু-বান্ধব কমে যাচ্ছে। জিতু আসে না, বিপণ আসে না। সুমিত, বজ্র, রাকা, দীপান্বিতা—ছোটন-পুঁটুর সঙ্গে সঙ্গে এরা মুক্তিরও বন্ধু ছিল। এখন খালি সৌম্যজিৎ। সৌম্যজিতের বাড়ি। ঠাম্মার সঙ্গে সেই সরস আড্ডাগুলো আর হয় না। হয় না মা-বাবার সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক।

সৌম্যজিৎ একা যেন অন্য সব সম্পর্কগুলোকে খেয়ে ফেলছে।

মুক্তি একদিন জিজ্ঞেস করলেন,—'হ্যাঁরে ছোটন, সৌম্যজিতের বাড়িতে কে কে আছেন রে?'

-'কেন?'

—'এমনি! কৌতূহল হয় না?'

—'ওদের বাড়িতে তোমার কৌতূহল মেটাবার মতো কেউ নেই ঠাম্মা। মা কোথায় থাকেন কোনদিন দেখিনি। বাবার গাড়ি মাঝে মাঝে আসে যায়, ব্যাস। আমাদের বিরক্ত করবার কেউ নেই। তিন চারটে ঘর নিয়ে সৌম্য থাকে, চাকর আছে, তারা, আমরা যা চাই করে দেয়। সৌম্যদের বাড়িতে আমরা এক্কেবারে ফ্রি।'—আহ্লাদে আটখানা হয়ে ছোটন বলল।

সেই থেকে মুক্তি খুঁত খুঁত করছেন,—'তোরা কিছু কর কমলেশ, তাপসী কিছু করো।'

সৌম্যজিতদের বাড়ির টেনিস লনে খেলে খেলে ছোটন পুঁটু এদিকে রীতিমতো টেনিস প্লেয়ার হয়ে উঠছে। ওদের সুইমিং পুলও আছে। একদিন বলে ফেলেছিল পুঁটু। কিন্তু ঠাম্মার কড়া নিষেধ সৌম্যর বাড়িতে যেন পুঁটু সাঁতারে না নামে।

—'তুই তো লেকেই যাচ্ছিস সাঁতার কাটতে। আবার বন্ধুর বাড়ি সাঁতার কাটবার কী আছে? কী মনে করবে বল্ তো!'—ঠাম্মার উক্তি।

—'কেন? কী আবার মনে করবে? মনে করবার জন্যে কে বসে আছে ওদের বাড়ি?'

—'লোকজনও তো আছে? সৌম্য নিজেও তো আছে।'

—'সৌম্য?' বলে মুচকি হেসে পুঁটু চুপ করে যায়।

সেদিকে গম্ভীরভাবে তাকিয়ে ঠাম্মা বলেন,—'আত্মসম্মান একটা বড় জিনিস রে পুঁটু!'

তাপসী মাঝখান থেকে শুনে বলে,—'কী বিষয়ে কথা হচ্ছে রে পিয়া? কার আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হল?'

পিঁয়া ওরফে পুঁটু সবটা বলতে তাপসী অসন্তুষ্ট হয়ে বলল,—'কী যে একেকটা কথা বলেন না, বারো বছরের মেয়ের আবার আত্মসম্মান। ওদের মধ্যে এতো কমপ্লেক্সও ঢোকাতে পারেন আপনি।'

মুক্তি বললেন,—'বারো বছর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বয়স তাপসী। আত্মসম্মানবোধ আরও ছোট থেকে জাগে মানুষ বিশেষে, কিন্তু বারো বছরেও না জাগলে বিপদ! খুব বিপদ! আর কমপ্লেক্স? একেবারে কমপ্লেক্সহীন মানুষ আছে ? তোমাদের সাইকলজি কী বলে? কিছু কিছু কমপ্লেক্স থাকা ভালো। আমার কথাগুলো সবই উড়িয়ে দিও না, একটু ভেবে-চিন্তে মতামত দিও। আর পুঁটু, তুই কিন্তু ওই সৌম্যদের বাড়ি খবরদার সাঁতার কাটতে যাবি না।' রায় দিয়ে মুক্তি আর দাঁড়ালেন না।

পুঁটু অবশ্য ঠাম্মার খুব আদরিণী। কথাটা শুনলো। কিন্তু স্কুল ফেরত হুটহাট সৌম্যজিতের বাড়ি যাওয়া ওদের আটকানো গেল না। চলে যায়, ফেরে ওদের গাড়ি করে। যতক্ষণ না আসে বোঝা যায় মুক্তি যেখানেই থাকুন, যে ভাবেই থাকুন, ভীষণ

উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন।

একদিন কমলেশ বাড়ি ফিরে দেখল মা তিনবার তার সামনে দিয়ে চলে গেল, অথচ যেন দেখতেই পেল না। তাপসীকে ইশারায় জিজ্ঞেস করতে তাপসী ফিসফিস করে বলল,—'ছোটন, পিয়া এখনও স্কুল থেকে ফেরে নি, মানে সৌম্যদের বাড়ি গেছে, তাই!'

শেষ কথাগুলো বোধহয় মুক্তি শুনতে পেলেন, হঠাৎ কমলেশের সামনে এসে চেয়ার টেনে বসে বললেন,— 'তোরা কী ভেবেছিস বল্ তো। ওইটুকু টুকু ছেলে-মেয়ে সন্ধ্যে পেরিয়ে গেল বাড়ি ফিরছে না, কিছু বলবিও না, করবিও না!'

কমলেশ বলল,—'আহ্ হা, ওরা সৌম্যর বাড়ি গেছে, গাড়িতে পৌঁছে দেবে...।'

—'গাড়িতে পৌঁছে দিলেই আর ভাবনার কোনও কারণ থাকে না? পড়াশোনা নেই? এইখানে পাশের গলিতে জিতুদের বাড়ি গেলে তো বকে ধমকে একসা করতিস! তবে কি ছেলে-মেয়ে গাড়ি চড়তে পাচ্ছে বলেই চুপ করে রয়েছিস?'

কমলেশ রেগে গিয়ে বলল,—'মা, তুমি এমন একেকটা কথা বলো! গাড়িটা মেনশন করছি সিকিউরিটির জন্য। আর জিতু? জিতুদের বাড়িতে অযথা সময় নষ্ট হত।'

—'সৌম্যদের বাড়িতে কীভাবে সময় লাভ হচ্ছে শুনি?'

তাপসী বলল,—'ওদের স্কুলের মিসেস ডিবেচা, মিঃ ত্রিবেদী, অরুন্তুদ মুখার্জি সববাই সৌম্যকে পড়ান। ছোটন আর পিয়া যদি সেখানে কিছু না হোক বসেও থাকে তো ওদের অর্ধেক পড়া হয়ে যাবে।'

'বুঝলুম'—মুক্তি বললেন—'গাড়ি, টেনিস কোর্ট, টিউটর, সুইমিং পুল—যা যা নিজেরা দিতে পারছিস না সেই সব জিনিসের লোভে ছেলেমেয়ে দুটোকে ছাড়া গরু করে দিয়েছিস? বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক উঠে যাচ্ছে মেনে নিচ্ছিস! এরপরে হয় আপস্টার্ট নয় ভিখারির কি চাটুকারের মনোবৃত্তি হবে ওদের? বাপ-মা হয়ে সেই সর্বনাশের দিকে ওদের ঠেলছিস? ছি ছি! শত ধিক তোদের!'

তাপসী রাগ করে দুমদুম করে চলে গেল। কমলেশ মুখ লাল করে বলল,—'তাই বলে একটা সামান্য কারণে আমাদের যা নয় তাই বলে অপমান করবে?'

—'কত বড় ঝড় তোদের মাথার ওপর দিয়ে আসছে, টের পাচ্ছি বলেই বলি। ওয়ার্নিং বেল শুনতে কর্কশই লাগে। জানিস, সৌম্যর মা বাবার মিল নেই। সম্পর্ক নেই।'

—'এই কথা!' কমলেশ হো হো করে হেসে উঠল।

—'তাই বলো! মা তুমি এ যুগে একেবারে অচল, বলতে বাধ্য হচ্ছি। এই না তোমার নাতি-নাতনি তোমায় মডার্ন ঠাকুমা বলে গর্ব করে? আরে বাবা, সৌম্যর মা বাবার ডিভোর্স হয়ে গেছে। তো কী? এ তো এখন আখচার হচ্ছে! ডিভোর্সড বাবা-মার সন্তানের সঙ্গে তা হলে কেউ মিশবে না? এ তোমার কেমন বিচার হল মা? তুমি তো এতো নিষ্ঠুর ছিলে না!'

—'বেশ তো, দয়ার বিধান যদি দিতে চাস তো ওই ছেলেটাকে আন্তরিক ভাবে বাঁচাবার চেষ্টা কর না। ওর বাবা-মার অভাব যতটা পারিস পুষিয়ে দে। ও নির্ঘাৎ বয়ে

যাচ্ছে। ওর সঙ্গে নিজের ছেলে-মেয়েকে ভিড়িয়ে দিয়ে ডবল সর্বনাশ করিস না।'—মুক্তি গম্ভীর মুখে বললেন।

দু চার দিন পরে মুক্তি নাতি-নাতনিকে বললেন,—'তোমরা তো প্রায়ই সৌম্যজিতের বাড়ি যাও। কই ও তো তোমাদের বাড়ি আসে না? এবার থেকে বরং ওকেই এখানে নিয়ে এসো।'

ছোটন বলল,—'দূর, এখানে অত মজা কোথায়? ওর জিম রয়েছে নিজের। টেনিস, ব্যাডমিন্টন, টেবিল-টেনিস, বিলিয়ার্ডস বোর্ড পর্যন্ত রয়েছে ওদের বাড়ি, দুর্দান্ত ভিডিও-গেমস, ফাটাফাটি সব ক্যাসেট। আমরা কত দিন কত জায়গায় বেড়াতেও তো যাই। তাজ বেঙ্গল, পার্ক হোটেল...

তাপসী-কমলেশ দুজনেই উপস্থিত ছিল। মুক্তি তাদের দিকে অর্থপুর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। বললেন,—'যতই যাই থাক, তোমাদের বাড়িতেও কিছু কিছু ভালো নিশ্চয়ই আছে। তা ছাড়া বন্ধুর বাড়ি গেলে তাকেও ফিরে ডাকতে হয়। সেটাই ভব্যতা।'

পুঁটু বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বলল,—'সেটা ঠিক।'

ক'দিন স্কুল ফেরত ওদের সঙ্গে এলো সৌম্য। ভালো ভালো জলখাবার তৈরি করেছিলেন মুক্তি আর তাপসী। খাওয়া-দাওয়া করতে করতে তিনজনে খুব হই-চই করল। তারপর ছোটনের ঘরে গিয়ে তিনজনে কিছু গান বাজনা শুনল। একটু পরেই সৌম্য চলে গেল। বোঝা গেল তেমন জমল না।

কদিন বাদ। তারপরেই ছোটন-পুঁটু আবার নিয়মিত সৌম্যজিতের বাড়ি যেতে থাকলো।

ছোটন বলল,—'ঠাম্মা, বাড়িতে সন্ধ্যেবেলা বড্ড বোর লাগে, প্লীজ।'

তাপসী বলল,—'সকাল সকাল ফিরো। রোজ রোজ এত দেরি কিসের?'

'বাড়িটাকে কেমন ভুতুম বুড়ো লাগে, সত্যি বলছি মা। নো ফান।'

ছোটন শ্রাগ করল। চলে গেলে মুক্তি বললেন,—'হল তো?'

—'কী হল?' তাপসী দমবার পাত্রী নয়।

মুক্তি বললেন, —'বাড়িটাকে যা'র এই বয়সেই ভুতুম বুড়ো লাগছে, আর একটু বয়স বাড়লে সে যে একেবারে পগার পার হয়ে যাবে তাপসী।'

তাপসী বলল,—'ধরে রাখতে চাইলেই কি পারবো মা। ছেলে আজকালকার দিনে কোথায় পড়াশোনা করবে, কোথায় চাকরি পাবে, দেশে অ্যাট অল থাকবে কিনা...'

—'সে তো নিশ্চয়ই'—মুক্তি আর কথা বাড়ালেন না। তারপর বললেন,—আমি একটু রথীনবাবুদের বাড়ি থেকে ঘুরে আসছি তাহলে।'

কমলেশ-তাপসী বেঁচেছে। সন্ধ্যেবেলার দিকটা সেই থেকে মুক্তি পাড়া বেড়াতে যান। প্রতিদিনকার সেই একই তর্ক-বিতর্ক, মেজাজ খারাপ, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা এসব আর নেই। ছোটন পুঁটুও বেশ খুশিতে আছে। পুজোর সময়ে মুক্তি রথীনবাবুদের সঙ্গে কেদার ঘুরে এলেন।

ডিসেম্বর মাস পড়ো পড়ো। ডিসেম্বরের শেষে ছুটি নিয়ে কমলেশরা বেড়াতে যাবে। কোথায় যাওয়া হবে সেই নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।

কমলেশ বলল,—'যাক এতোদিনে মায়ের মতি ফিরেছে, তীর্থধম্মো-টম্মো করছে। আবার নাকি বেড়াতে যাবার প্ল্যান করছে। আমরা ফিরে এলেই যাবে।'

তাপসী বলল,—'ধর্ম আছে, কিন্তু ধর্মের বাড়াবাড়ি নেই এটা কিন্তু মায়ের একটা মস্ত গুণ, স্বীকার করতেই হবে।'

এই সময়ে বাইরে গাড়ির শব্দ হল। ছোটন আর পুঁটু ঢুকল। তাপসী বলল,—'পিয়া, ছোটন এখানে শুনে যা!' দুজন এসে দাঁড়াতে কমলেশ বলল,—'মাত্র সাতদিন ছুটি, টেনেটুনে ন'দিন করা যেতে পারে, এখন বলো কোথায় যাবে, যাতে মিনিমাম সময়ে ম্যাক্সিমাম মজা হয়, তোমাদের মা বলছে, আসাম কাজিরাঙা, শিলং। শীতে শিলং দারুণ। প্লেনে যাবো, যাতায়াতের টাইমটা বাঁচবে।'

হঠাৎ ছেলে মেয়ে দুজনেই কেমন মিইয়ে গেল। ছেলে বলল,—'তোমরা যাও না। আমাদের প্রচুর পড়াশোনা আছে। মার্চের প্রথমেই অ্যানুয়াল।'

—'সে কি রে? দুবছর পরে বেরোচ্ছি, তোরা যেতে চাইছিস না?'

কমলেশ যেমনি অবাক তেমনি ক্ষুব্ধ। বলল—'ওসব চালাকি শুনছি না। যেতে তোমাদের হবেই। ইয়ার্কি নাকি?'

এমন সময় মুক্তি ঢুকলেন। পুঁটু নাকি সুরে বলল—'দ্যাখো না ঠাম্মা, আমাদের পরীক্ষা এসে গেছে। বাবা মা এই সঁময়ে বেঁড়তে যাঁবার প্ল্যাঁন কঁরছে। আমরা তো তোঁমার কাঁছেই থাঁকতে পাঁরি। বাবা-মা ঘুঁরে আঁসুক না!

মুক্তি সবটা শুনে বললেন—'ও। কিন্তু ওই সময়ে তো আমি তোদের রাখতে পারব না। আমার অসুবিধে আছে।'

—'কেন? কী কাজ?'

—'সে একটা আছে দরকার।'

—'বলো না কী দরকার?' ছোটন-পুঁটু না-ছোড়।

তখন মুক্তি বললেন—'৩১শে ডিসেম্বর আমি বিয়ে করছি কি না!'

—'কী বললে? কে বিয়ে করছে?'—ছোটন লাফিয়ে উঠে বলল।

কমলেশ কোনও একটা প্রশ্ন করেছে কিন্তু শব্দ বেরোয় নি। মুখটা হাঁ। তাপসী অবাকেরও অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে। মুক্তি বললেন—'খোকা হাঁ টা বুজিয়ে ফ্যাল। পোকা-টোকা ঢুকে যাবে, একত্রিশে ডিসেম্বর আমি আর ও বাড়ির রথীনবাবু বিয়ে করছি।'

—'আপনার কি ভীমরতি হয়েছে?' তাপসীর লাল মুখটা থেকে এতোক্ষণে বেরোয়।

—'ভীমরতির কি আছে? আজকাল তো এরকম আখচার হচ্ছে। বিদেশে প্রায় কোন মহিলাই পারলে একা থাকে না। তোরা সব বিষয়ে এত আধুনিক। ডিভোর্স-টিভোর্স জলভাত মনে করিস, আর বুড়োদের বিয়েটা মেনে নিতে পারছিস না? আমরা অবশ্য নিজেদের ঠিক বুড়ো-বাতিল বলে মনে করি না। বুড়ো আবার কী?

ছোটন বলল—'ঠাম্মা, তুমি বলছ কী? তোমার সঙ্গে ডাক্তারদাদুর বিয়ে? ঠাম্মাদের আবার বিয়ে হয় নাকি? আমরা যে লাফিং স্টক হয়ে যাবো পাড়ায়?'

কমলেশ বলল—'রাইট। লোকে যে হাসাহাসি করবে? কী যা তা বলছো।'

মুক্তি বললেন—'লোকে হাসবে বলে আমার যা করা দরকার মনে হচ্ছে তা করতে পাবো না? এ তো আচ্ছা জুলুম! দ্যাখ খোকা, আমার আজকাল খুব একা লাগে, রথীনবাবুরও তাই। মতেও খুব মেলে আমাদের। উনি অনেকদিন ধরেই বলছেন। আমি নাতি-নাতনিদের দায়িত্বের কথা ভেবে এতো দিন...।'

—'দোহাই তোমার', কাঁদো কাঁদো গলায় কমলেশ বলল—'তুমি যা বলবে তাই শুনবো। বুঝতে পারছি নাতি-নাতনি কাছ ছাড়া হয়ে তুমি মন মরা হয়ে গেছো। এই ছোটন, পিয়া তোরা আগের মতো ঠাম্মার সঙ্গে থিয়েটার দেখতে যাবি। সর্বক্ষণ সৌম্য-সৌম্য কী রে?'

মুক্তি বললেন—'তুই ঠিকই ধরেছিস। নাতি-নাতনিকে মানুষ করার কাজটা নিয়েছিলুম বলেই অন্যদিকে মন যায়নি এতদিন। কাজ, সঙ্গ এগুলো বড় জিনিস। তবে এখন ওরা আর ফিরতে পারবে না। আমার মনে হচ্ছে আজকাল ওদের জামাকাপড়ে গাঁজা-টাজার গন্ধ পাচ্ছি। সৌম্যজিৎ ভিডিও টেনিস এসবের নেশার সঙ্গে সঙ্গে ড্রাগও ধরিয়ে দিয়েছে।'

তাপসী চোখ বড় বড় করে বলল—'ড্রাগ? কে ধরেছে ড্রাগ? কেন?' ছোটন তখন বন্ধ দরজা দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে যাচ্ছে, পেছন পেছন পুটু।

মুক্তি বললেন—'কেন ধরেছে? হাতে অনেক পয়সা। মা বাবা থেকেও নেই। অজস্র স্বাধীনতা, বিশাল বাড়িতে অগাধ সুযোগ...এতগুলো যোগাযোগেও ড্রাগ ধরবে না? বিপথগামী ছেলেপুলেকে দেখলেই বয়সের চোখ চিনতে পারে। যাই হোক, আমার শক্তিতে আর কুলোবে না। এবার তোমরা ছেলে-মেয়ের বাবা-মা যা পারো করো।'

পুটুকে ফ্রকের কোণ ধরে আটকে রেখেছিল তার মা। সে ভয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। দরজার কাছ থেকে ছোটনকে পাকড়াও করে ঘরে ঢুকলেন ডক্টর রথীন সমাদ্দার। ট্রাউজার্স আর ঢোলা শার্ট পরনে, মুখটা ভারী, কদম ছাঁট চুল, কিন্তু বেশ জব্বর একটা গোঁফ। গলাটিও বেশ ভারী। বললেন—'এই যে কমলেশ তাপসী, দুজনেই আছো তাহলে। সর্ব সমক্ষেই তাহলে তোমাদের মা মুক্তি চৌধুরীকে বিবাহের প্রস্তাবটি রাখছি।'

কমলেশ রাগে তোতলা হয়ে যায়। ...'আমাদের এই দুঃসময়ে আপ্‌ আপনি ঠ্‌ ঠাট্টা করতে এসেছেন?'

ডাক্তারবাবু বলেন—'ঠাট্টা? বলো কি হে? আজ পাঁচ বছর ধরে বিল যাচ্ছে পার্লামেন্টে। তর্কাকর্কি, খচাখচি, অ্যাদ্দিনে পাশ হল। কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করতেই বলো, আর বি-পিতার দায়িত্ব স্বীকার করতেই বলো, আমি না হয় ছোটন পুটুকে নিয়ে একটা শেষ চেষ্টা করে দেখতে পারি। অবশ্য তোমাদের অনুমতি চাই। কী তাপসী? হবু-শ্বশুরই হই আর হবু-বাপই হই, অন্ততপক্ষে ফ্যামিলির ডাক্তার তো বটে! এক কাপ চা অন্তত খাওয়াবে না?'

ভর

কর্ড লাইনের ট্রেনটা সুব্রতদের যেখানে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল সে জায়গাটার চেহারা দেখে বেশ হতাশ হবারই কথা। স্টেশন বলতে গাছের তলায় ঢালাইয়ের বেঞ্চি গোটা-দুই আর একটা টিকিটঘর। স্টেশনমাস্টার ভদ্রলোকের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেল গোঁসাইমারি যাবার জন্যে গরুর গাড়ি মিলবে, তবে একটা ছোট নদী পেরোতে হয়। নদীতে এসময়ে হাঁটু জলের বেশি থাকে না। গরুর গাড়ি হয়ত স্বচ্ছন্দে পার হয়ে যাবে। না পেলে পুরো পথ হাঁটা এবং পথ অনেকটা।

রাস্তা যাচ্ছেতাই। খানিকটা পথ গরুর গাড়ির প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেতে খেতে অবশেষে যখন অনাদির দামী ক্যামেরাটা তিন-চার বার ঠোক্কর খেল, তখন দুজনেই ঠিক করল নদী পার হবার পর ওরা হেঁটেই যাবে। তখন বেলা পড়ে যাবে, রোদের কষ্টটা থাকবে না। অসুবিধে একটাই। সুব্রত অনাদি কেউই ঠিক সুস্থ নয়। সুব্রতর স্পন্‌ডিলাইটিস—গলায় কলার পরা। আর অনাদির দিন সাতেক ধরে একটা গাম বয়েলের মতো হয়েছে—ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে। এটুকু শারীরিক অসুবিধেকে কি আর অফিসে পাত্তা দেয়?

সম্পাদক বীরেন মুস্তাফি সুব্রতকে ডেকে বলেছিলেন কথাটা। কর্ডলাইনে মামুদপুর স্টেশনে নেমে সাত-আট মাইল পশ্চিমে গেলে পড়বে গোঁসাইমারি গ্রাম। সেখানে নাকি এক নাপিতের ওপর ধন্বন্তরির ভর হয়। বহু দূর দূর থেকে লোক যাচ্ছে দুরারোগ্য রোগ সারাতে। সুব্রত কভার করুক ব্যাপারটা। সঙ্গে যাবে অনাদি চাটুজ্জে ফটোগ্রাফার।

এর আগে এ ধরনের দু একটা বুজরুকি সুব্রত ধরে ফেলেছে এবং তাদের কাগজে জোরালো কলমে লিখেছে। যেমন দমদমের ব্যাপারটা—দমদমের নাগেরবাজারে দিনকতক আগে এক সাধুবাবার আবির্ভাব হয়। মাথাভর্তি লালচে জটা। মুখভর্তি গোঁফ দাঁড়ি। দাড়ি এসে ঠেকেছে হাঁটুতে। সাধুটি অশত্থতলায় বসে থাকেন আর টাকা-মাটি, মাটি-টাকা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যা থিয়োরিতে বলে গিয়েছিলেন, ইনি নাকি তার প্র্যাক্‌টিক্যাল করে দেখাচ্ছেন। এই 'প্র্যাক্‌টিক্যাল' দেখতে সেখানে এত লোকের ভিড় হতে আরম্ভ করে যে রীতিমত বেটনধারী পুলিশ মোতায়েন করতে হয়। সাধুর হাতে মাটির ঢেলা দিলে সেটাকে তিনি নিমেষে একশ টাকার নোট বানিয়ে ফেলেন। আর একশ টাকার নোট দিলে সেটা মাটির ঢেলা হয়ে যায়। সুব্রতর লাগাতার অনুসন্ধানে ক্রমশ বার হয়ে পড়ল ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ধাপ্পা। কয়েকজন অসাধু ব্যবসায়ী এইভাবে কালো টাকাকে সাদা করার আশায় ভণ্ড সাধুটাকে ঐখানে বসিয়েছিল। লোকটার আরেকটা ছদ্মনাম মিঃ ফক্স—একটা রং-চং মাখা উজবুক লোককে ক্লাউন বানিয়ে কদিন আগেও মফঃস্বলে ম্যাজিক দেখিয়ে বেড়িয়েছে।

কেসটাতে সুব্রতর খুব নাম হয়। কাগজেরও প্রেস্টিজ বাড়ে। সম্ভবত সেজন্যেই এবারেও বীরেনবাবুর সুব্রতর কথাই আগে মনে হয়েছিল।

নদীর কাছে এসে গরুর গাড়িটা ছেড়ে দিল ওরা। থেকে থেকে বালির চড়া জেগে উঠেছে। স্বচ্ছ জলের মধ্যে বড় বড় গর্ত দেখা যাচ্ছে। একেই স্পন্‌ডিলাইটিস। গাড়ির নাচুনিতে হাড় কখানা খুলে না পড়ে। অনাদির দাঁতের ব্যথাটাকেও যেন আর বাগ মানানো যাচ্ছে না। ব্যাগ খুলে দু-তিনটে বড়ি বার করে মরিয়ার মতো এক সঙ্গে গিলে ফেলল সে।

সরু নদী। জল যেন নেই বললেই হয়। কিন্তু যেটুকু আছে ভারি সুন্দর। সারাদিন সূর্যের তাপে সামান্য তেতে আছে। শীতের বিকেলে এতখানি পথশ্রমের পর গায়ে যেন ফুটবাথের আরাম হল। কখনো গোড়ালি জলে, কখনো হাঁটু জলে নদী পার হয়ে ওরা যখন ওপারে এসে পৌছল, তখন সূর্য বেশ খানিকটা হেলে পড়েছে। ওরা মনে করেছিল, পথচলতি দু'একজন লোক নিশ্চয়ই পাবে, তাদের জিজ্ঞেস করেই এগোনো যাবে। কিন্তু দেখল জিজ্ঞেস করার দরকারই নেই। রাশি রাশি গ্রাম্য লোক কোলে পুঁটুলি, কাঁখে পুঁটুলি নিয়ে ছেলেপিলেবউ সহ গোঁসাইমারির দিকে চলেছে। যেন মেলার ভিড়। এদের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতেই ব্যাপারটা সম্বন্ধে নানান তথ্য জানতে পারল ওরা। ভর নাকি হয় শুক্রবার দিনে, অন্যান্য জায়গার মতো শনি মঙ্গলবারে নয়। অন্যান্য দিন দীননাথ তার জাত ব্যবসা করে, সাধারণ মানুষ। ভরের সময়কার কথা তার মনেও থাকে না। বৃহস্পতিবার মাঝরাত্তির থেকেই নাকি ব্যাপারটা শুরু হয়। তখন থেকে নাকি তার রাশই বদলে যায়। নিজের স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে অচেনার মতো ব্যবহার করে। হেন রোগ নেই যা নাকি সে সারায় না, বিশেষত অস্ত্রোপচার। সেটা আবার করে তার নাপিতের বাক্সের ক্ষুরকাঁচি দিয়ে। যার ওপর করা হয়, সে টের পর্যন্ত পায় না। শেষ রোগীটির চিকিৎসা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ভর বজায় থাকে। লোকজনের মনে ব্যাপারটা নিয়ে আদৌ কোনও সংশয় আছে বলে মনে হল না।

সুব্রত বলল, "এতগুলো লোক আশাভরসা নিয়ে সেখানে ছুটে যাচ্ছে। দুদিন পরে এদের সেই ভরসাটুকু গুঁড়িয়ে দিয়ে আমরা কেটে পড়ব, ভাবতে কিন্তু খুব খারাপ লাগছে অনাদিদা।"

"মিথ্যে আশা নিয়ে মরীচিকার পেছনে দৌড়ানোর কোন মানে হয়?"—অনাদি বলল।

সুব্রত দুঃখিত গলায় বলল, "কিন্তু লোকগুলো কী হতদরিদ্র দেখো একবার। আশা ছাড়া ওদের জীবনে আর কী বা আছে বলো?

"বাঃ, সেই আশাটাকে এক্সপ্লয়েট করছে ওদের চালাক জাতভাই, সেটাও ভাবো! প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে এইভাবে মানুষের আশা আকাঙক্ষা এক্সপ্লয়েট করে করেই তো একদলের পেট এত মোটা হল!"

সুব্রতর কী মনে হল, একটি লোককে জিজ্ঞেস করল, "কী নেন তোমাদের বাবা?"

লোকটি হাত জোড় করে সসম্ভ্রমে অদৃশ্য বাবার উদ্দেশে নমস্কার জানিয়ে বলল, "কিছু না এজ্ঞে। ভর অবোস্তায় কেউ কিছু দিলে নাতি মেরে ফেলে দ্যান। পরে ব্যায়রাম সারলে আমরা যে যা পারি তেনার মায়ের হাতে দিয়ে আসি। কত লোকে কিছু দেয়ই না।"

অনাদি বলল, "দেখলে? কিছু নেবে না এটাও একধরনের ভাঁওতা। সবাই জানে, এতে সাপও মরবে আবার লাঠিও ভাঙবে না।"

দুজনেই খুব খানিকটা হাসল।

গোঁসাইমারি গ্রামটা সত্যিকার অজ পাড়াগাঁ বলতে যা বোঝাই তাই। জঙ্গল, ডোবা, মজাপুকুর, এবড়ো-খেবড়ো মাটির রাস্তা, হতদরিদ্র কিছু খড়ো ঘর, আরেক দিকে দিগ্‌বিসারি একূল-ওকূলহীন বিশাল এক মাঠ। এই মাঠটার ধারেই দীননাথ নাপিতের

ঘর। গাঁয়ের লোকেরা চাঁদা তুলে পাশে একটা বড়সড় আটচালা বানিয়ে দিয়েছে। সেখানে হা-পিত্যেশ করে বসে আছে লোকে। সবাইকে ধরেও নি—তারা বসে বা দাঁড়িয়ে আছে আশেপাশে।

খবরের কাগজের লোক দেখে গ্রামবাসীরা সুব্রতদের যথেষ্ট খাতির করল। রাতের খাওয়ার জন্যে দুধ, চিঁড়ে, কলা নিয়ে এল। সঙ্গে বেশ ভাল খেজুরের গুড়। গ্রামের মোড়ল ভেতরবাড়ির দাওয়ার ওদের শোবার ব্যবস্থা করে দিল। কিটব্যাগের ভেতর থেকে পশমী র‍্যাপার আর ফোলানো বালিশ বার করে শুয়ে পড়ল দুজনে। মোড়ল বলল সময় হলে ডেকে দেবে।

পথশ্রমের ক্লান্তিতে ওরা অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছিল। অনাদি আরও দুটো ব্যথাহারী বড়ি গিলেছে। একরকম অচৈতন্য সুতরাং। মোড়লের ঠেলাঠেলিতে যখন ঘুম ভাঙল, তখন রাত নিশুত। কালির মতো অন্ধকারে চারিদিক ঢেকে গেছে। ঝিঁঝির ডাকে যেন চতুর্দিকে খত্তাল বাজছে মনে হল। ধরাচুড়ো পরেই শুয়েছিল দুই সাংবাদিক। মোড়ল বলল, "বাবার জাগার সময় হল বাবুরা, যান গিয়ে।"

আটচালা ঘরটায় টিমটিমে একটা লণ্ঠন জ্বলছে। অন্ধকারের মধ্যে আরও দলাদলা অন্ধকারের মতো গুটিসুটি মেরে বসে আছে লোকগুলো। এত নিস্তব্ধ সুন্‌সান চারদিক যে তাদের পায়ের শব্দ যেন দুরমুশ পেটার মতো শোনাতে লাগল। একটি শিশু শুধু থেকে থেকে কেঁদে যাচ্ছে অন্ধকারের ভেতর। সুব্রত অনাদির পায়ে একটা খোঁচা দিল—"শুনতে পাচ্ছ অনাদিদা?"

দীননাথের ঘরের দিক থেকে নিশ্চুপ অন্ধকারের মধ্যে একটা মৃদু গোঙানির আওয়াজ উঠছে।

অনাদি ফিসফিস করে বলল, "এ তো হিস্টিরিয়া! আমার ছোটকাকিমার ছিল।"

"মৃগীও হতে পারে", সুব্রত বলল। "আমি একাধিক কেস দেখেছি।"

অনাদি বলল, "মৃগী হলে পিত্তর নিউরোলজি, আর হিস্টিরিয়া হলে সাইকিয়াট্রিক কেস। তবে আমাদের আগে ধারণা ছিল, হিস্টিরিয়া মেয়েদেরই হয়।"

"না অনাদিদা। চাপা কামনাবাসনার প্রেশার এসময়ে আমাদেরই বা কী কম? প্রচণ্ড প্রেশার সবদিকে। লোকের যখন তখন নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়ে যাচ্ছে। স্কিজোফ্রেনিক আগের থেকে অনেক বেড়ে গেছে। তাছাড়া মাস-হিস্টিরিয়ার কথা ভাবো। লাঠিসোটা নিয়ে গ্রামের আপাত নিরীহ লোক ডাকাত মেরে ফেলছে, ডাইনি পিটোচ্ছে, সংকীর্তনের আসরে উদ্দণ্ড নেত্য করছে। এগুলো তো বেশিরভাগই পুরুষদের কেস।"

"মাস-হিস্টিরিয়া ইজ এ ডিফারেন্ট ফেনোমেনন, সুব্রত। তার আলাদা ব্যাখ্যা...।" বলতে বলতে অনাদি একদম চুপ হয়ে গেল।

দীনুর ঘরের দাওয়ায় একজন মানুষের শিলুয়েৎ ফুটে উঠেছে। পেছনে সাত-আটটা প্রজ্বলিত লণ্ঠন। কালো নিরেট পাথরের একটি জমাট মনুষ্যমূর্তি যেন আলো বিকিরণ করছে। লণ্ঠনগুলো পেছন থেকে সামনে চলে এল। ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে একটি নিকষ কালো মাঝবয়সী মানুষ। গায়ে কালচে রঙের ফতুয়া, হেঁটো ধুতি, খালি পা। লণ্ঠনের আলো পড়ে কিনা কে জানে—চোখদুটো অন্ধকারে জ্বলছে।

আটচালার একদিকে একটা লম্বা টেবিল আর একটা নড়বড়ে চেয়ার। সেই চেয়ারে

এসে বসল লোকটি। একদম শরের মতো সোজা। পেছন থেকে একটা নাপিতের ক্ষৌরকর্মের বাক্স আর দু-তিন বোতল জলের মতো দেখতে এবং লালচে রঙের কোনও তরল এনে রাখল দুজন লোক। একটা কেরোসিনের স্টোভের ওপর ডেকচিতে জল ফোটাচ্ছে আর একটা লোক।

কিছুক্ষণ চারদিকে অস্বাভাবিক উজ্জ্বল দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে দেখল লোকটি। তারপর হঠাৎ গমগমে গলায় হাঁক দিল,—"বাচ্চাটাকে নিয়ে আয়।" বলতে বলতে সে সন্না দিয়ে গরম জলের মধ্যে থেকে ক্ষুর তুলে নিল।

বছর পাঁচেকের একটি ছোট ছেলে সমানে কেঁদে যাচ্ছিল এতক্ষণ। তার অভিভাবক তাকে ধরে ধরে দীননাথের কাছে নিয়ে যেতেই পরিষ্কার গলায় সে বলে উঠল— "এখুনি অপারেশন করতে হবে, শুইয়ে দে।"

এরপর একটি অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখল সুব্রতরা। বাচ্চাটাকে সেই খোলা কাঠের টেবিলটায় শুইয়ে দেওয়া হল। একজন তার মুখের সামনে একটা কাপড়ের টুকরো ধরল। দীননাথ মুখ নিচু করে নির্নিমেষ বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ক্ষুর বাগিয়ে নিমেষে তার পেটের ডানদিকে একটু অংশ চিরে দিল। সুব্রত সভয়ে চোখ বুজল। কিছুক্ষণ পরে অনাদির খোঁচায় চোখ খুলে দেখল, ক্ষতস্থান সেলাই হচ্ছে। একটি লোক ভাঁড়ে করে কী একটা রক্তাক্ত জিনিস দাওয়ার বাইরে গিয়ে ফেলে দিয়ে এল।

সুব্রত আর থাকতে পারল না। উঠে দাঁড়িয়ে রুক্ষ গলায় বলে উঠল,—"এটা কী হচ্ছে? এইভাবে ক্ষুরফুর দিয়ে ছেলেটার পেট কাটলেন, যদি সেপ্‌টিক হয়ে যায়?"

লোকটি কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে সুব্রতর দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল,— "অ্যাপেনডিক্স পেকে গিয়েছিল, ফাটত। সার্জন-ডাক্তার পাব কই? বিশ মাইলের মধ্যে হাসপাতাল নাই।"

—"তাই বলে এভাবে?"

—"লাচার হলে ন্যাড়াই ভগমান। নাপ্‌তের ক্ষুরই ডাক্তারের ছুরি। তোমার ঘাড়ে কলার পরেছো কেন? ওটা স্পন্‌ডিলাইটিস নয়, ট্র্যাক্‌শন নিও না। ওটা নার্ভের।"

সুব্রত হতভম্বের মতো পেছু হটতে হটতে নিজের জায়গায় চলে এল। অনাদি বলল,—"ফেইথ-হীলারের সঙ্গে তর্করত স্কেপ্‌টিক সাংবাদিকের একটা ছবি নিলাম। দুর্দান্ত হবে।"

সুব্রত জবাব দিল না।

পরদিন রোদ উঠতে দুই বন্ধু অসীম কৌতূহল সত্ত্বেও উঠে আসতে বাধ্য হল। খিদেয় পেট জ্বলছে। একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নও হওয়া দরকার। ওদিকে চিকিৎসা কিন্তু সমান তালে চলছে। এইরকমই নাকি চলবে যতক্ষণ রোগী থাকে। কার আঙুলহাড়া, কার পিত্তশূল, কার গলগণ্ড—দীননাথ ওষুধ দিয়েই চলেছে, দিয়েই চলেছে।

"—নাঙ্গা পায়ে চলবে না। রবারের ঘের দেওয়া জুতো কিনে নিবে। এসব কিরমি পা ফুঁড়ে ওঠে বাবা..."

—"নাড়ি নেমে গেছে মা, তাই যন্ত্রণা। কাশী, পর্দা ধর্‌..."

—"হাড় ভাঙেনি, ডিসলোকেট হয়েছে। সেট করে দিই।"

—"এরে কয় টিউমার। মূলসুদ্ধু কেটে বাদ দিয়ে দেব।"

চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর গলায় দীননাথের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য অনর্গল।

অনাদি বলল,—"অ্যানেস্‌থেসিয়া ছাড়া কী করে অপারেশনগুলো করছে বলো তো?"

সুব্রত আস্তে আস্তে বলল,—"কী জানি! হিপ্‌নোটাইজ করে মনে হয়।"

সারাদিন ওরা গ্রামের এপাড়া ওপাড়া ঘুরে বেড়ালো। উদ্দেশ্য অজ পাড়াগাঁয়ের জীবনযাত্রা স্বচক্ষে দেখা এবং দীননাথ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ। লোকটি নাকি সদর শহরের স্কুলের ক্লাস নাইন অবধি পড়েছিল। তারপর দারিদ্র্যের জন্যে পড়া ছেড়ে দিয়ে জাতব্যবসা ধরতে বাধ্য হয়।

সন্ধে হতে আবার আটচালায় এসে গুছিয়ে বসল দুজনে। দীননাথের টেবিলের যত কাছে সম্ভব। এখন রোগীর ভিড় অনেক পাতলা হয়ে এসেছে। দীননাথের চোখ ঢুলুঢুলু। হঠাৎ দেখলে মনে হয় নেশা করেছে। শেষ রোগীটি যখন প্রণিপাত করে চলে গেল, তখন ওদের ঘড়িতে রাত প্রায় সাড়ে সাত। হঠাৎ গম্ভীর একটা ধমকের মতো আওয়াজ শুনে চমকে উঠল দুজনে। অনাদির দিকে আঙুল, দীননাথ বলছে,—"এদিকে শুনে যাও তো হে ছোকরা।"

হতবাক অনাদি শশব্যস্ত উঠে গেল। সুব্রত শুনল দীননাথ বলছে—"পচা ঘায়ের গন্ধ পাচ্ছি। কোথায়? মাড়িতে?"

অনাদি হাঁ করল।

—"চটপট শুয়ে পড়ো। এটা ম্যালিগ্‌ন্যান্ট হয়ে গেল বলে।"

সুব্রত দেখল, টেবিলের ওপর শোওয়া অনাদির হাঁয়ের মধ্যে দীননাথের ক্ষুরটা তড়িৎগতিতে ঢুকে যাচ্ছে। মিনিট কয়েক পরে সে যখন চোখ খুলল, তখন অনাদি তার পাশে বসে, চোখে কেমন একটা বিহ্বল দৃষ্টি। সুব্রতর দিকে চেয়ে ফিসফিস করে বলল,—"কিচ্ছু টের পাইনি হে। ব্যথাটা গন!"

একটা মৃদু গোঙানির আওয়াজ। ওরা চমকে সামনের দিকে চাইল। দীননাথ আটচালার মেঝেতে সটান উপুড় হয়ে শুয়ে আছে, যেন সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করছে। একটি বুড়ি মানুষ হরিনাম করতে করতে তার মুখেচোখে জল দিচ্ছে।

মোড়ল বলল,—"আসুন তো বাবুরা একবার এদিকটায়।"

দীননাথের ঘরের পেছনে সেই দূরবিসর্পী মাঠ। ফুটফুটে জোছনায় দু-চারটে লম্বা লম্বা নারকোল গাছের ছায়া শুয়ে আছে। যতদূর চোখ যায় আর কিছু নেই।

মোড়ল বলল,—"দ্যাখলেন?"

—"কী দেখবো?"

—"ধন্বন্তরি ঠাকুর গো! দীনুকে ছেড়ে ঐ যে চলে যাচ্ছেন। ঢ্যাঙা মতন, ফুটফুটে ফর্সা, খালি গায়ে পইতের গোছ...দেখতে পেলেন নি?

চোখে জল, মোড়ল বার বার নমস্কার করতে লাগল।

কলকাতায় ফেরার সময়ে সারা রাস্তাটা প্রায় নীরবেই হেঁটেছে দুই বন্ধু। গোঁসাইমারির সীমানা যখন দিগন্তের সঙ্গে মিশে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল, অনাদি বলল,—"কথাটা উড়িয়ে দিও না সুব্রত। ব্যথাটার জন্যে নিউরোলজিস্টের কাছে যাও।"

সুব্রত ধীরে ধীরে ভারী গলায় বলল,—"তা যেন হল, কিন্তু রিপোর্টটা কী দেবো অনাদিদা?"

দিগন্তের দিকে তাকিয়ে অনাদি আঙুল তুলে বলল,—"ঐ যে, ঐ যে তোমার রিপোর্ট।"

কাঁধে পুঁটলি, কাঁখে কচি ছেলে, মাথায় হাঁড়িকুড়ি, পরনে শতচ্ছিন্ন শাড়িধুতি, দলে দলে লোক ফিরে চলেছে। দেখলেই বোঝা যায়, পেটে অন্ন নেই, দেহে বস্ত্র নেই, মাথার ওপরে চাল নেই। যেমন-তেমন ভাবে শুধু দুটি অন্ন খুঁটে খাবার প্রাণান্তকর চেষ্টায় ব্যয় হয়ে যাচ্ছে শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে জীবন—সেই জীবন যা নাকি অমূল্য।

দীনুর ওপর ধন্বন্তরির ভর হয়, না প্রতিভার ভর হয়, না এই মানুষগুলোর আপ্রাণ ইচ্ছাশক্তির ভর হয়—দুই সাংবাদিক ঠিক করতে পারল না।

বাজ

দুলাল দত্ত যখন তার ডালহৌসি ইস্ট-এর 'ট্রাভল ইন্টারন্যাশানাল'-এর অফিসে ঢুকেছিল একটা বাজতে পাঁচ মিনিটে, তখন তার মেজাজ বেশ ফুরফুরেই ছিল। পার্কিং জোনে নতুন মারুতি এসটিম খানা ঢুকিয়ে বেশ সন্তোষের সঙ্গে সে গাড়িটার নীল বডিতে হাত বুলিয়েছিল। আকাশ ছিল বেশ পরিষ্কার নীল, কালো কেন সাদা মেঘের লেশমাত্র ছিল না। এমন চমৎকার দিনে একটা ব্রহ্মানন্দের অনুভূতি হয় তার। সে-ই ব্রহ্ম, অথবা ব্রহ্মই সে, দুটো একই কথা, পৃথিবীর যা কিছু সবকিছুর মধ্যে সে বিরাজমান, তার ইচ্ছা বিরাজমান, কিংবা আরও ভাল করে বলতে গেলে তারই জন্যে পৃথিবীর যাবতীয় সুখ-সুবিধে, সে দেখছে বলেই আকাশ আজ এত নীল, সে রাগ করবে বলে রাস্তায় জ্যাম ছিল না, তার চোখ জ্বালা করবে বলে বাতাস হু হু করে বয়ে বায়ুদূষণ উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই ধরনের একটা সুখের মৌতাতে আচ্ছন্ন সে প্রায় গুনগুন করে 'জিসকি বিবি মোটি' গেয়ে উঠেছিল এবং সুখবোধটা অক্ষুণ্ণ ছিল অফিসে ঢুকে পিওন, স্টেনো, অ্যাসিস্ট্যান্ট এদের কারও কাছ থেকে হাত কচলানি, কারও কাছ থেকে বিগলিত বেরাদরি পেয়ে।

মিনিট পনেরো পরে তার কিউবিকলের দরজা খুলে জবাকে ঢুকতে দেখে সে আরও উল্লসিত হয়ে উঠেছিল। দুলাল দত্ত সেই জাতীয় লোক যারা বউ পেয়ে বড্ড সুখী হয়, সে বউ ধনশালিনী হলে তা তো কথাই নেই, বস্তুত দুলাল তার স্ত্রীর ডাউরি থেকেই (খবরদার পণ বলবেন না) সম্প্রতি অফিসটির আমূল সংস্কারসাধন করিয়েছে, এয়ার কন্ডিশনড্ অফিস এখন তার, বেশ কিছু পাতাবাহার ও আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার প্রিন্ট সুদ্ধু খোলতাই চেহারা তার অফিসের। তা সে যাই হোক দুলাল দত্তের মতো লোকেরা এই জাতীয় বউ পেলে সুখী। শালী পেলে আরও সুখী। কাজেই

ব্লু-জিন্‌স ও আলগা টপ পরা টপ-নটেড হাই-হিল শালী যখন ফ্রস্টেড টেরাকোটা ঠোঁটের অকৃপণ হাসি দিয়ে ঢুকে এল, তার ব্রহ্মানন্দে কোনও চিড় ধরেনি।

—আরে, আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলুম বল তো? জবা দুলাল দত্তের পিসতুতো মাসতুতো শালী। তার ওপর আঁতেল শালী মডেল শালী, দুর্দান্ত মড। এই ধরনের শালীরা তাদের প্রতি মনোযোগী হলে দুলালের মতো জামাইবাবুদের ইউফোবিয়া আরও বেড়ে যায়।

জবা বলল—'কার আবার, যে লাকি ভদ্রমহিলার মুখ দেখে রোজ ওঠেন!' তার ফ্রস্টেড ঠোঁট একটু স্ফুরিত বুঝি বা।

সাধারণত পুরুষদেরই 'লাকি গাই' বলা হয়ে থাকে। তার স্ত্রীকে লাকি বলায় দুলাল হৃষ্টপুষ্ট হয়ে ওঠে। সে তালে তাল রাখতে বলে—'তা তোমাকে আর পাচ্ছি কোথায় বল, তাই অগত্যা সেই ভদ্রমহিলারই মুখ...।' জবা ভ্রূভঙ্গি করে।

—'যা মুখে আসে তাই বলছেন একা পেয়ে, না?'

—'তা এমন ডবকা শালীর সঙ্গে একটু ফস্টি-নস্টি না করলে আর লাইফ কী?'

—'একা পেয়ে যা খুশি করবেন, একা পেয়ে যা খুশি বলবেন, এরকম করলে কিন্তু আমি তার আসব না।'

—'আরে আরে রাগ করলে তোমায় যা দারুণ দেখায় না!' এই পুরুষীয় উক্তি আজকাল বস্তাপচা হয়ে গিয়ে থাকলেও দুলাল এর বাইরে যাবার প্রতিভা দেখাতে পারে না।

—'তা ব্যাপারটা কী বল তো? আজকে হঠাৎ অধীনকে স্মরণ করলে?'

—'একটা উপকার করবেন দুলালদা। যাব পার্ক হোটেলে, একটা পার্টির সঙ্গে অ্যাপো আছে, একটু পৌঁছে দেবেন?'

—'এই রে মুশকিল করলে। আমি তো এইমাত্র অফিসে ঢুকছি। বহু কাজ পেন্ডিং রয়েছে।'

বলতে বলতেই ফোন বাজতে লাগল। সেটা নামিয়ে রেখে দিতেই আবার একটা।

'দেখলে তো?—আমার এখন নিঃশ্বাস ফেলবার ফুরসত নেই। এখান থেকে পার্ক হোটেল কতটুকু। তুমি একটা স্মার্ট মড ইয়ং লেডি, হেঁটে মেরে দাও! কিংবা একটা ট্যাক্সি ধরে—।'

—'এইভাবে যে পার্ক হোটেলে যাওয়া যায় সে জ্ঞান আমার আছে দুলালদা, চলি।'

জবা উঠে দাঁড়াল।

—'এ কী। এক কাপ কফি খেয়ে যাও! রাগ করলে না কি?' জবার মুখ আহত। সে কোনও কথা বলছে না। পেছন ফিরছে, এবার চলে যাবে।

—'রাগ করো না জবা। আচ্ছা একটু বসো, আমি কটা কাজ সেরে নিই।' জবা দরজাটা টেনে ধরে বেরিয়ে গেল।

ঝাটতি বাজার টেপে দুলাল দত্ত।

পিওন উঁকি দেয়।

—'ওই দিদিকে চট করে একটু আসতে বলো তো।'

অফিসের বাইরে থেকে জব্যকে ডেকে নিয়ে আসে হাবুল পিওন।

—নীরবে সামনে বসে আছে জবা।

—'পাঁচ মিনিট বসো প্লিজ।' নীরবে বসে থাকে জবা।

পাঁচ মিনিটে কোনও কাজ হয় না। তিন পাঁচে পনেরো মিনিট লাগল। হাবুল পিওন, প্রীতিশ স্টেনো, অ্যাসিস্টেন্ট মনোজ ও বান্টি দেখল, দুলাল দত্ত বেরিয়ে যাচ্ছেন, সঙ্গে একটি মড মেয়ে। দুলালের মুখে গলমান হাসি, মেয়েটির মুখ গম্ভীর।

শ্বশুরবাড়ির মেয়েদের সম্পর্কে পুরুষরা বরাবরই একটু দুর্বল। শালী, শালাজ, ইত্যাদেত্যাদি। বাপের বাড়ির (ছেলেদের বিয়ে হলে তাদেরও কিন্তু একটা বাপের বাড়ি হয়) মেয়েরা সব বোন-পিসতুতো, মাসতুতো, জাঠতুতো, খুড়তুতো এবং বৌদি অথচ শ্বশুর বাড়ির সেই একই মেয়েরা শালী শালাজ অভিধায় ভূষিত হয়ে একটা অতিরিক্ত গ্ল্যামার এবং সেক্স অ্যাপিল সংগ্রহ করে থাকে। বাঙালি সমাজের অদ্যাবধি ঘোমটা টানা পরিপ্রেক্ষিতে এই ব্যঞ্জনাময় সম্পর্কের স্বাদই আলাদা। এই যৌন আবেদনকে গ্যালান্ট্রি নামক ভঙ্গি দ্বারা অভিনন্দিত করতেই হয়, করেও বেশিরভাগ জামাই। দুলাল দত্ত, বালাই ষাট, কোনও ব্যতিক্রমী জামাই চরিত্রই নয়। সুতরাং পার্ক হোটেলে গিয়ে যখন দেখা গেল জবার অ্যাপয়েন্টি আসেনি বা এসে চলে গেছে তখন জবার থমথমে ব্লাশার শোভিত মুখশ্রীর দিকে তাকিয়ে দুলালকে বলতেই হয়—'লাঞ্চ করেছো?'

—'আমি লাঞ্চ করি না।'

—'করো, আজকে করবে।'

অতএব পার্ক হোটেলের অভ্যন্তরে জবার মানভঞ্জন হয়ে যায়।

ঘটনাটা এই পর্যন্তই।

কিন্তু জবা যদি আসতেই থাকে? আসতেই থাকে? সে নানা ব্যাপারেই দুলালদার পরামর্শ চায়, সাহায্য চায়। সেগুলো দিতে করতে দুলালের কোনও অসুবিধে হয় না। অফিসের পর যদি জবা তাকে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে যেতে জোর করে? দুলাল যদি অনুরোধ এড়াতে না পেরে যায়? জবার যেন একটা অধিকার জন্মে যাচ্ছে দুলাল দত্তর ওপর। তাই না! জবার জন্মদিনে নিমন্ত্রিত দুলাল দত্ত। না তেমন অনুষ্ঠানিক ব্যাপার কিছু নয়। সামান্য কজন। সেরকম ব্যাপার হলে তো মুন্নি-দিকে বলতোই। জাস্ট একবার অফিস ফেরত ঘুরে যাবেন। জবার ভাল লাগবে তাহলে। জবার মায়েরও। বিশেষ করে বলে দিয়েছেন উনি। কিন্তু আসল ক্ষেত্রে দেখা গেল জবার মা নির্লিপ্ত, উদাস,—'ভাল আছো বাবা? এসো,' বলে তিনি সেই আপন কাজে গেলেন আর দেখা নেই। এদিকে জবার ঘরে ধূপ, রবীন্দ্রনাথের ছবিতে মালা, ক্যাসেটে 'তুমি কিছু দিয়ে যাও', জবার চোখের কাজল যেন একটু ধেবড়ে গেছে, পরনে আজ বাঙালি সাজ, জবার চুল যথেষ্ট। আজ যেন ফুলে ফেঁপে সব ভাসিয়ে নেবে। এবং অন্য কেউ নেই।

কিন্তু জবা কথা বলছে না কেন? দুলার দত্তর একটু দেরি হয়ে গেছে ঠিকই।

—'কী ব্যাপার, তোমার বন্ধু বান্ধব সব চলে গেল না কী?' জবা একবার চোখ তুলে তাকাল। ব্যাস। কথা বলল না।

কিছুক্ষণ বসে বসে গান শোনে দুলাল দত্ত। জবার মা খাবার এনে দিলেন। গাঙ্গুরামের রাধাবল্লভী-আলুরদম, বাঞ্ছারামের সন্দেশ, ক্যাথলিনরামের পেস্ট্রি। গান

শুনতে শুনতে দুলাল খায়।

—'কী হল জবা, রাগটা কেন বলবে তো?' জবা কোনও কথা বলে না। চুলগুলো কপাল থেকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। উঠে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের গলার মালাটা ঠিকঠাক করে দেয়। যেন সে তার জন্মদিন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের গলাতেই মালা দিচ্ছে দুলাল দত্তকে উপেক্ষা করে।

চা-টা জবা নিজেই এনে দিল। একই রকম নীরব। এইবার দুলাল দত্তের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। নিমন্ত্রণকারী তার সামনে মুখভার করে বসে থাকবে আর সে গপগপ করে খাবে—এ আবার কী? সে খেতে এসেছে না কী? সে উঠে পড়ে—'চলি জবা।'

এইবার জবা স্ফুরিতাধরে চুল লুটিয়ে আঁচল লুটিয়ে বাইরের দরজা রোধ করে দাঁড়ায়।

—'এ আবার কী?'

—'বলেছিলে এলাম। খেলাম। এবার চলে যাচ্ছি।'

—'না আগে ফয়সালা হয়ে যাক।'

—'কিসের ফয়সালা? কী ব্যাপার?'

—'দুলালদা অনেকদিন আমাকে ইউজ করেছেন, আজকে একটা ফয়সালা চাই।'

—'হোয়াট ডু ইউ মিন? ননসেন্স। রাবিশ।'

দুলাল দত্ত এবার যাবেই। কিন্তু জবা অচল-অটল দরজা আটকে দাঁড়িয়ে আছে। দুলাল যার পর নাই বিরক্ত। কয়েকবার সরতে বলে অবশেষে সে জবার একটা হাত দরজার পাল্লা থেকে সরাবার চেষ্টা করে।

জবা সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে পার্শ্ববর্তী কৌচে পড়ে যায়। দুলাল অনুতপ্ত কিন্তু অবাকও। কী করে যে জবার এতটা ধাক্কা লাগল সে বুঝে উঠতে পারে না। যাই হোক সে বলে—'আরে লাগল না কি? সে নিচু হয়ে জবাকে তুলতে যায়। জবা তাকে অবিশ্বাস্য জোরে পেছন দিকে ঠেলে দেয়। টাল সামলাতে জবাকেই ধরে দুলাল। এবং হুমড়ি খেয়ে জবার ওপর পড়ে যায়।

—'ছিঃ ছিঃ'—জবার মা ভেতরের দিকের দরজার সামনে।

—'আরে দেখুন তো মাসিমা, জবার কাণ্ড!'—অপ্রস্তুত দুলাল উঠে দাঁড়াচ্ছে।

এখন যদি জবার মা দাবি জানান, দুলালের ব্যাপার যখন এই রকমই তখন সে জবাকে বিয়ে করুক, অবশ্যই তার সদ্য বিবাহিত স্ত্রী সুনীতাকে খারিজ করে, তা হলে দুলাল দত্ত কী করবে?

—'শুনুন মাসিমা এসব আপনি কী বলছেন? জবা আমার পথ আটকে দাঁড়িয়ে ছিল, আমি ওকে সরাতে গেছি তাই...

—'আমি কোনও কথাই শুনতে চাই না, ছিঃ ছিঃ। আবার সাফাই গাইছো? জবা তোমাকে আমি শেষ কথা শুনিয়ে দিলাম, সুনীতাকে আমি আজই ফোন করছি।'

—'আটকাও, আটকাও জবা।' আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠে দুলাল। যেতে যেতে জবা বলে যায়—'আজ না হয় আটকালাম, কিন্তু এর পর?'

দুলাল আর কোনও কথা বলে না। ঊর্ধ্বশ্বাসে গাড়ি চালিয়ে দেয়। মেয়েদের ছলা-কলা, মুড-মুডভঙ্গ এসবের সঙ্গে আর পাঁচটা সাধারণ বাঙালির মতোই তার পরিচয়

কম। চমৎকার একটি মনের মতো মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়ে, আশাতিরিক্ত যৌতুক পেয়ে সে খুব সপ্রতিভ, ফষ্টিনষ্টিতে অভিজ্ঞ জামাইবাবুর ভূমিকায় অভিনয় করতে গিয়েছিল মাত্র। বিয়ের প্রথম সাতদিনের আদি-রসাত্মক পরিবেশে একাধিক শ্যালিকার সঙ্গে সে ইয়ার্কি দিয়েছে। প্রত্যেককেই বুঝতে দিয়েছে, জামাইবাবু দুলালদা দারুণ মাই ডিয়ার লোক, সিনেমা-থিয়েটার দেখতে, খাওয়াতে কার্পণ্য নেই। জবা শালীটি তাকে চন্দনের ফোঁটায় সাজিয়ে দেয়। এবং অতটা কাছে আসার সুবাদে আলাপ তারই সঙ্গে সবচেয়ে বেশি জমে যায়।

—'দেখবো দেখবো পরে আমায় চিনতে পারেন কি না। এর পরে দেখা হলে হয়ত আমায় পাত্তাই দেবেন না,' ইত্যাকার চ্যালেঞ্জ সে দুলালকে ছুঁড়ে দিয়েছিল। সেই সব চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতেই দুলাল অতটা নমনীয় হয়েছিল।

এখন গাড়ি হাঁকাতে হাঁকাতে 'ইউজ' কথাটা ইলেকট্রিক শব্দের মতো ধাক্কা মারতে থাকে। 'ইউজ' কথাটার 'ইউসেজ' জবা নামে মেয়েটি জেনে বুঝে করেছে? না আলগা ভাবে কথাটা লোফালুফি করছিল মাত্র। সত্যিই সে মেয়েটিকে কিছু 'আইডিয়া' দিয়েছে না কি? সর্বনাশ। শ্বশুরবাড়িতে চন্দন পরাবার সময়ে দু-একবার ঠাট্টা করে বলেছিল বটে,—'বড্ড কাছে চলে আসছ কিন্তু! দেব না কি কামড়ে?'

দু-একবার গালে আদরের ঠোনাও মেরেছিল। এ সব থেকে মেয়েটা কি কিছু ভেবে নিয়েছে? এ তো আচ্ছা বুরবক?

বাড়ি ফিরে দুলাল তার বউকে চুমু খেতে ভুলে গেল। উপরন্তু ব্যস্ত উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে জিজ্ঞেস করে বসল—'কোনও ফোন এসেছিল?'

—'তোমার না আমার'?—বউ জিজ্ঞেস করে। তার মুখ শীতল।

এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর দুলাল দিতে পারে না।

বলি বলি করেও আজকের ঘটনাটা সে বউকে বলতে পারে না।

কেন না, আগের ঘটনাগুলোও তো সে বলে নি!

সারাদিনের কাজে কর্মে সব মোলাকাতগুলোর কথাই সে ভুলে গিয়েছিল। পরে মনে পড়লেও বলবার মতো কোনও ঘটনা বলে মনে হয় নি।

আজকে জন্মদিনের নিমন্ত্রণের কথাও সে বেমালুম ভুলে মেরে দিয়েছিল!

ফুল-ওয়ালার দোকান থেকে একগুচ্ছ ফুল পাঠাবার ব্যবস্থা আগেই করে রেখেছিল। সাউথ-ইস্টার্নের পি.আর.ও.র সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। সেখানেই খানিকটা দেরি হয়ে যায়। তারপর সে বাড়িই ফিরে আসছিল। ওয়েলিংটনে ঢুকে পড়ে। তখন আবার ট্রাফিক লাইট। জ্যাম এবং ওয়ান ওয়ের বাধা কাটিয়ে ভবানীপুরের পথ ধরে।

যে নেমন্তন্নের কথা বউকে বলতেই ভুলে গেছে সেই নেমন্তন্নে গিয়ে একটা অপ্রীতিকর ঘটনার মুখোমুখি হয়েছে এ কথা বললে বউ যদি এখন ভুল বোঝে?

একমাত্র রাত্তিরে খেতে বসে সে অনেক চেষ্টা করে সহজ হয়ে জিজ্ঞেস করতে পারে—'আচ্ছা, তোমার ওই জবা নামে কাজিনটি কিরকম মেয়ে বলো তো?'

—'হঠাৎ জবা? কেন? পছন্দ?'—বউ বাঁকা চোখে তাকাচ্ছে। মুখে হাসি। শ্লেষের? না ঈর্ষার? না রাগের?—সর্বনাশ!

—'এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম। মাঝে মাঝে আমার অফিসে এসে উদয় হয় কি না!'

—'তাই না কি? জবাদের সঙ্গে আমাদের তেমন মাখামাখি কোনদিনই নেই। তা যদি বলো, খুব ভাল সাজাতে টাজাতে পারে। বিয়ের সময় ও-ই তো আমাকে সাজালো। তবে খুব করিৎকর্মা মেয়ে। ফিল্মটিল্ম বানাচ্ছে আজকাল। সেই সূত্রে ওর বহু চেনা। অনেক জায়গায় ঘোরাফেরা...তা তোমার অফিসে এসেছিল কেন?'

—'ওই ও পাড়ায় এসেছিল দেখা করে গেল আর কি!'

পার্ক হোটেলে নিয়ে যাবার অনুরোধ ইত্যাদি বিশদ তথ্য দিতে দুলাল কেন যেন সাহস পেল না আর।

বউ বলল—'ও'। দুলাল জানতো-ই না জবা তেমন গুরুত্বপূর্ণ শালী নয়।

দিন তিনেক পরে ট্রাভল ইন্টারন্যাশনালে আবার দেখা যায় জবাকে। আজ সালোয়ার-কামিজ, মুখে ঘাম। ব্যস্ত সমস্ত।

মনোজ আর বান্টি চোখাচোখি করে।

হাবুল প্রীতিশের দিকে তাকিয়ে চোখ মটকায়।

জবা বলে—'দুলালদা, কী করি বলুন তো! মাকে আর সামলাতে পারছি না।'

—'ওঁকে বুঝিয়ে বলেছো ব্যাপারটা?'

—'বুঝতে চাইছে না।' ওড়নার খুঁট ধরে আঙুলে জড়াতে থাকে।

দুলাল ওর দিকে আতঙ্কিত হয়ে চেয়ে থাকে। এ কি উড়ো বিপদ। রাগ ঠেলে ওঠে মাথায়।

সে বলে—'তুমিই বা ওরকম অদ্ভুত আচরণ করলে কেন?'

—'বাঃ ফুল পাঠিয়ে দিলেন সকালে, সন্ধেয় আসেনই না আসেনই না। মিতা, সুপর্ণা, সুজিতরা বলল "কেমন জামাইবাবু তোর? অ্যাতো ফর্মাল! ধুর!" আমার মন খারাপ হয়ে গেল।'

যাক, তা হলে জবার রাগের কোনও না কোনও কারণ আছে। যত হাস্যকরই হোক। মেয়েদের ব্যাপার! এবং এই স্বস্তিতে যুক্তিতে দুলাল দত্ত সেই অদ্ভুত 'ইউজ' শব্দটার ব্যবহারের মানেটা জেনে নিতে ভুলে যায়।

—'একমাত্র উপায় মাকে কিছুদিন এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া, বুঝলেন? কিছুদিন বেড়তে গেলে মা ব্যাপারটা ভুলে যাবে। জেদটাও ভুলে যাবে।'

গুড আইডিয়া, দুলাল দত্ত মনে মনে বলে।

'দেখি কিছু টাকার জোগাড় করতে পারি কি না, লেটেস্ট ফিল্মটাতে সব টাকাকড়ি আটকে আছে কিনা! ওটা সেল হয়ে গেলেই আর চিন্তা ছিল না।'

জবা উঠে পড়ে।

দুলাল দত্তর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে কথাগুলো—'কত টাকার দরকার এখন?'

—'কেন আপনি দেবেন?' জবা ঘুরে দাঁড়িয়েছে—

—'মাথা খারাপ?'

—এক্ষুনি যদি দরকার থাকে দেওয়াই তো যায়।'

—'হাউ ডেয়ার য়্যু' জবার চোখ জ্বলছে। জবার মান অপমান বোধ খুব তীক্ষ্ণ।

সেই দিনই বাড়ি ফিরে খবরটা শোনে দুলাল।

সুনীতা বলে—'আরতি মাসি ফোন করেছিলেন হঠাৎ।'

—'আরতি মাসি কে?'

—'ওই যে জবা! জবার মা! আমাদের বাড়ি একদিন আসতে চাইছেন। পরের হপ্তায়।'

'কেন?'—দুলালের স্বরটা ফ্যাঁসফেঁসে শোনায়।

'আমার মনে হয় জবার ব্যাপারে।'

'জবার আবার কী ব্যাপার?' দুলাল বলছে কিন্তু কথাগুলো প্রায় শোনাই যাচ্ছে না।

'মেয়ের বিয়ে নিয়ে তো সব মায়েরই চিন্তা থাকে। আমার নতুন বিয়ে হয়েছে। একগাদা বরযাত্রী দেখেছেন। দেখো, কাউকে হয়তো ওঁর পছন্দ হয়েছে।'

দুলাল জানে তা নয়।

পরের দিন সে পাগলের মতো ফোন করে। ফোনটা জবারই ঘরে। আশা করা যায় সে-ই ধরবে।

—'হ্যাললো—'

—'জবা আমি দুলালদা বলছি।'

—'বলুন।'

—'শোনো তোমাদের দুজনের প্লেনের টিকিট কেটে দিচ্ছি। নেপাল ঘুরে এসো। খরচ-খরচার জন্যে যা দরকার হবে আমি বেয়ার করবো। দ্য হোল থিং ইজ অন মী। বুঝলে?'

ও দিকে নীরবতা।

—'কী হল শুনছো?'

—'শুনছি।'

—'আপনার কথাগুলো আবার বলুন।'

—'তুমি মাকে নিয়ে নেপাল ঘুরে এসো। পুরো খরচটাই আমি বেয়ার করবো।'

—'কেন?'

—'কেন আবার কী? ইটস মাই প্লেজার।'

—'আপনার মাথা খারাপ হয়েছে দুলালদা? লোকে কী মনে করবে বলুন তো?'

—'লোকে জানছে কোত্থেকে?'

—'আমি তো জানছি!'

—'বলছি তো তোমরা একটু আনন্দ করে এলে আমার ভাল লাগবে।'

—'ঠিক আছে। আপনার যখন এতোই ইচ্ছে।'

এই টেলিফোন সংলাপের টেপটাই দুলাল দত্তকে শোনাচ্ছে এখন তার স্ত্রী সুনীতা। সুনীতা হিন্দি ফিল্মের ভাষায় মা বননেওয়ালি এখন। শরীর খুব খারাপ। মানসিক অবস্থার কথা বলা বাহুল্য। তার এক চোখে আগুন আর এক চোখে জল।

'তুমি মাকে নিয়ে নেপাল ঘুরে এসো। পুরো খরচটাই আমি বেয়ার করবো।'

—'কেন?'

—'কেন আবার কী? ইটস মাই প্লেজার।'

—'আপনার মাথা খারাপ হয়েছে দুলালদা? লোকে কী মনে করবে বলুন তো?'

—'লোকে জানছে কোত্থেকে?'

—'আমি তো জানছি।'

—'বলছি তো, তোমরা একটু আনন্দ করে এলে আমার ভাল লাগবে।'

কথা বলতে পারছে না সুনীতা, শুধু জল আর আগুন ঝরাচ্ছে। কথা বলতে পারছে না দুলালও।

—'কোথা থেকে পেলে এটা?'

—'সেটা জানার কী দরকার?'

—'যে যা খুশি পাঠিয়ে দেবে, তুমি সেগুলো বিশ্বাস করবে। হা-হুতাশ করবে, রাগারাগি করবে?'

—'বেশ তো তুমি বলো না, এটা তোমার গলা নয়। তুমি বলো না, তুমি মাসি আর জবাকে নেপালে নিজের খরচে বেড়াতে পাঠাও নি।'

সাধারণ মানুষের মিথ্যে কথা বলতে একটু প্রস্তুতির দরকার হয়। দুলাল সাধারণ মানুষ। তারও মিথ্যে কথার জন্য একটু প্রস্তুতি দরকার ছিল।

স্ত্রী যখন মেঝেতে মাথা ঠুকতে থাকে, না জেনে শুনে একটা লোচ্চাকে বিয়ে করে তার সর্বনাশ হয়ে গেছে বলে, তখন দুলালের চৈতন্য ফেরে। সে আসলে ভাবছিল, জবা তাদের টেলিফোন সংলাপটা টেপ করেছে কেন? এটা তো স্বাভাবিক আচরণ নয়? এবং এখন ভেবে দেখতে গেল। জবার কোনও আচরণটাই স্বাভাবিক নয়।

সে হঠাৎ খুব তৎপর হয়ে ওঠে। স্ত্রীকে যথাসাধ্য গায়ের জোরে মেঝেতে মাথা ঠোকা থেকে নিরস্ত করে।

'আমাকে ছোঁবে না'—এই মেয়েলি উক্তি বস্তাপচা হয়ে গিয়ে থাকলেও সুনীতা এর বাইরে যাবার প্রতিভা দেখাতে পারে না। দুলাল খুব খাপছাড়া ভাবে বলে ওঠে—'তুমি সেদিন বলছিলে—ওদের বাড়িটা নাকি জবা-ই করেছে! সে কোথা থেকে এত টাকা পেল?—

সুনীতা বলল—'তুমি পাও কোথা থেকে এতো টাকা মিসট্রেসকে তার মায়ের সঙ্গে নেপাল বেড়িয়ে আসতে দেবার জন্যে?'

মিসট্রেস কথায় প্রচণ্ড ধাক্কা খায় দুলাল, সুনীতার বাপের বাড়ির নৈতিক চরিত্রের প্রতি কটাক্ষপূর্ণ আপত্তিকর কথা বলে। জবাও তো সেই বাপের বাড়িরই প্রোডাক্ট।

এই কুৎসিত ঝগড়ার বিশদ বিবরণে গিয়ে কাজ নেই। এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে পারস্পরিক কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির খেলায় কেউই কম গেল না। এবং দুলাল দত্তের মনে যে সঙ্গত এবং প্রাসঙ্গিক প্রশ্নটি উঠেছিল, অর্থাৎ জবা কেন টেলিফোন সংলাপ টেপ করে, সে প্রশ্নটির গভীরে যাওয়া আর হয়ে ওঠে না। যে ঝড় তারপর চলতে থাকে, তার মধ্যে শান্তভাবে স্ত্রীকে বোঝানোর সমস্ত সম্ভাবনা লুপ্ত হয়ে যায়। সমস্ত রকম আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে কুটুম্ব-বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দুলালের সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায়। অশান্ত অসুখী আতঙ্ক ও হিস্টিরিয়াগ্রস্ত সুনীতা অসময়ে একটি মৃত সন্তান প্রসব করে এ পৃথিবীর মায়া কাটায়।

দুলাল এখন জানে না সে বেঁচে আছে কি না, এবং যদি থেকে থাকে তো কেন।

কলেজস্ট্রিট কফিহাউসে সৌমিত্র সাধারণত যায় না। কিন্তু ঋত্বিক যখন একটা ডকু-ফিল্ম করছে কলেজস্ট্রিট পাড়ার ওপর এবং তার ধারাভাষ্য পড়বার ভার যখন সৌমিত্ররই, তখন তাকে যেতে হয়েছে। বিশেষত এই ধারাভাষ্যটি যখন সে-ই লিখবে। এ গুলো সৌমিত্রর নেশা। ফিল্মের ওপর তার যথেষ্ট পড়াশুনো। মাঝে মাঝে এ কাগজের ও কাগজের হয়ে সে ফিল্ম, নাটক, ইত্যাদি কভার করেও থাকে। পেশায় সে এঞ্জিনিয়ার অধ্যাপক। সবে ইংল্যান্ড থেকে ফিরেছে। ফিরেই ঋত্বিকের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে সে। ঋত্বিক তার স্কুলের বন্ধু। রাজধানী এক্সপ্রেসের পুরো একটা কোচ ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল-যাত্রী কলকাত্তাই ফিল্মওয়ালাতে ভরে গেছে।

দিনটা মেঘলা। চাপা গরম। এপ্রিলের ভ্যাপসায় রাজধানী এক্সপ্রেস-এর ভেতরে এখন আইসক্রিম আরাম। পশুপতিনাথের মন্দির ও তার পুরোহিতের বংশ নিয়ে একটা ডকুফিল্ম করেছে জবা। সেটা নিয়েই এবারের দিল্লি যাত্রা। জাতীয় ফিল্ম উৎসবে প্রচারমূলক ছবির একটা প্রতিযোগিতাও আছে। আবার মান্ডি হাউসেও ছবিটা নিয়ে একটা অ্যাওয়ার্ড যদি মেরে দিতে পারে তাহলে বিক্রির অসুবিধে থাকবে না। দূরদর্শনে একটা প্রাইম টাইম স্লট তার চাই-ই চাই। চুলগুলো গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত পার্ম করে নিয়েছে জবা। জিনস আর টাইট টপ পরা। চোখেতে বেশ ঘন করে কাজল দিয়েছে। নাকে একটা রিং। সেক্‌সি সেক্‌সি লুকটা এখন খাচ্ছে খুব। ঋচীকাদিকে নিয়ে গিয়েছিল কাঠমাণ্ডুতে। বদলে ঋচীকাদি স্ক্রিপ্টটাও করে দিয়েছে। রৌণক ক্যামেরা হ্যান্ডল করে ভাল। এডিটিং এবং গ্রাফিকস্‌-ও সে-ই করেছে। সাক্ষাতকারগুলো নিয়েছে জবা নিজে। ঋচীকাদির স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী। ভাষ্যের জন্য একটা ভাল গলা দরকার ছিল। একজন শখের আবৃত্তিকারকে দিয়ে করিয়ে নেওয়া গেছে। বিক্রি হলে রৌণককে তার ওয়ান ফোর্থ শেয়ার দিয়ে যা থাকবে তাতে এবার একটা গাড়ি হয়ে যাবে জবার। গাড়িটা থাকলে অনেক সুবিধে।

গাড়ির মেনটেনান্সের কথাটা অবশ্যই ভাবতে হয়। থোক কিছু দরকার। হঠাৎ শিহরণ খেলে যায় তার সারা শরীরে। এতক্ষণ লক্ষ্য করে নি তার উলটোদিকে একটি যুবক বসে মন দিয়ে 'আওয়ার ফিল্মস দেয়ার ফিল্মস' পড়ছে। হাতে খুব দামী ঘড়ি। লাগেজটা উঁকি মারছে তলা থেকে—এস চ্যাটার্জী। বিদেশী মনে হচ্ছে। পড়ুয়া গোছের ছেলে। চব্বিশ ঘণ্টা যারা বইয়ে মুখ ঢেকে বসে থাকে। কে এ ছেলেটি? কী এর পেশা? জবা তার নিজের অভিজ্ঞতার বিশ্বকোষের পাতা উলটোয়। নাঃ এ ছেলে ফিল্ম লাইনের নয়। এ ডাক্তার নয়। ডাক্তারদের আবহে একটা অ্যান্টিসেপটিকের গন্ধ থাকে। সার্জন হলে হাতগুলো হয় ফুলের মতো। এর হাতগুলো শক্তপোক্ত। কোন্‌ পেশায় এত সময় এবং নিশ্চিন্ততা থাকবে যে ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে যাবে 'আওয়ার ফিল্মস দেয়ার ফিল্মস' পড়তে পড়তে? পোড় খাওয়া ফিল্ম সমালোচক নয়, সেক্ষেত্রে এ বইটা আগেই পড়া থাকত।

যদি বিদেশে থাকে অর্থাৎ এন. আর. আই. হয় তাহলে ভাল আর যদি সদ্য বিদেশ-প্রত্যাগত হয় তাহলে আরও ভাল।

জবা চোখ শানায়, ডানা মোড়ে, থাবার মধ্যে থেকে বক্র নখ বার করে।

'এক্সকিউজ মি, আপনিই কি সেই বিখ্যাত এস চ্যাটার্জি যিনি মুঘল আর্কিটেকচারের ওপর ফ্যানটাসটিক ডকুটা বানিয়েছেন? ইস্‌স, আপনি পড়ছিলেন, আমি...আ য়্যাম সো সরি।'

—আমি কোনও বিখ্যাত এস চ্যাটার্জি নই। সামান্য সৌমিত্র চ্যাটার্জি। বেঙ্গল এঞ্জিনিয়ারিং-এ পড়াই। নমস্কার।'

—জবা ঝাঁপ দিয়েছে।

সেই লোকটা

লোকটাকে সে প্রথম খেয়াল করে হুগলির ডি. আই. অফিসে। আগেও দেখেছে। কিন্তু সে ভাবে লক্ষ্য করেনি।

বাবা স্কুল থেকে অবসর নিয়েছেন পাঁচ বছর হয়ে গেল। কিছুই হাতে পাননি। না পেনশন, না গ্র্যাচুয়িটি, না জি. পি. এফ.। কোনটার কাগজপত্র রেডি হয়নি, কোনটার ফাইল হারিয়ে গেছে। কোনটা আবার ট্রেজারি রিলিজ করছে না। বাবা বললেন—'দুটো বর্গের জ-ই আমার ক্ষয়ে গেল রে...জুতো আর জীবন। এবার তুই দ্যাখ যদি পারিস।'

তা সেই তার বাবার কর্মক্ষেত্রের গোলকধাঁধায় প্রথম প্রবেশ। পাঁচ বছর সময় যতটা কম মনে হয়, ততটা কম নয় দেখা গেল। কেননা বাবার কর্মক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। বাবার সময়ের হেডমাস্টারমশাই রিটায়ার করেছেন। সেই সময়কার ক্লার্ক মারা গেছেন। কাগজপত্র সাত বাঁও জলে। বর্তমান ক্লার্কের কাছে বর্তমান হেডামস্টারমশাই যেদিন তাকে চতুর্থবার পাঠালেন সেদিন ক্লার্ক কাগজ পাকিয়ে কানে সুড়সুড়ি দিচ্ছিলেন। বললেন—'পেন্ডিং কাজ যে করব ইনসেনটিভ কই?'

এখন, কাজ কখন পেন্ডিং হয়? যখন তোমরা তাকে পেন্ডিং রাখো, তাই না? তো তার আবার ইনসেনটিভ কী?—সে এইভাবে ভাবল। কিন্তু সে একটু ভিতু প্রকৃতির। উপরন্তু খুব বুঝদার। সবসময়ে অন্যের কথা ভেবে কাজ করার অভ্যাস। তাই সে দ্বিতীয় চিন্তা করল—সত্যিই। এঁদেরও তো বাঁধা সময় আছে। তার বাইরে কাজ করতে গেলে সেটা অন্যত্র হলে ওভারটাইম হত। আগের ক্লার্ক যে কাজ ফেলে রেখে বে-আক্কেলের মতো মারা গেলেন, তার জন্যে বেশি সময় খরচ করার কী দায় এঁর পড়েছে। হলই বা এটা সত্তর বছরের এক বৃদ্ধের গ্রাসাচ্ছাদনের মরণ বাঁচনের ব্যাপার।

স্কুল লাভ-ক্ষতির কারবার করে না, সে ইনসেনটিভ দেবে কোত্থেকে? পঞ্চম দিনে সুতরাং সে এক বাক্স নলেন গুড়ের ভাল সন্দেশ নিয়ে গেল। ইনসেনটিভ নয় এটা। কিন্তু তার আগাম খুশি আগাম কৃতজ্ঞতা সত্যিই ভারি কৃতজ্ঞ হয়ে জানিয়ে রাখছে সে—পেনশনেপ্সু পিতার কৃতজ্ঞ ছেলে।

কাগজপত্র নড়েছে সংবাদ পেয়ে সে যখন বিজয়গর্বে বেরিয়ে আসছে তখন বাবার স্কুলের দরজার পাশ দিয়ে কালোমতো কে একটা যেন সরে গেল। গেল তো গেল, সে খেয়াল করেনি।

তারপর সে জানল তাকে ডি. আই. অফিসে ধরনা দিতে হবে। কেননা সতেরো বছর আগের প্রাপ্য একটা ইনক্রিমেন্ট নাকি যোগ করা হয়নি, ভুলভাল হয়ে গেছে।

ডি. আই. অফিসের রঙচটা বাড়িটাকে মাঠের মাঝখানে হেঁপো রুগির মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই তার মনটা দমে গিয়েছিল। করিডর দিয়ে যেতে যেতে সে দু পাশের ঘরে ফাইলের পাহাড় এবং ধুলো লক্ষ্য করে। এবং সেই লোকটাকে করিডরের এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। কাজটা তার দু তিনবার হাঁটাহাঁটি করার পর হয়ে যায়। অবশ্য 'ইনসেনটিভ' লাগে।

এইভাবে অবশেষে সে বাবার পেনশন উদ্ধার করে যেদিন বাড়ি ফিরছে, তার মনে হল কে যেন তাকে অনুসরণ করছে। পকেটে পাঁচ টাকা তিরিশ পয়সার খুচরো এবং একঠোঙা কাবুলিমটর—সে খুব ভালবাসে, পায়ে শুকতলা ক্ষয়ে যাওয়া ঝ্যালঝেলে হাওয়াই চটি, দু দিনের বাসি দাড়ি গালে এবং ছোটভাইয়ের চেকশার্ট আর নিজের ব্লু জিনস তার পরনে, তার ভয় করার কিছু ছিল না, তবু সে নির্জন গলিগুলো এড়িয়ে যায়। একটা রাস্তা বাঁক ফেরবার মুখে কায়দা করে সে পেছনের লোকটাকে দেখেও নেয়। ওহ্। তেমন কেউ না। সে আশঙ্কা করেছিল শার্টের কলার-তোলা, চোয়াড়ে-মুখে ব্রণ, মিঠুন-ছাঁটের চুল-ওয়ালা সাইকেলের চেন হাতে, ভোজালি-পকেটে কোনও মস্তানকে দেখবে। সে সব নয়। সেই লোকটা যে ডি. আই. অফিসের করিডরের এই কোনায় চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল, এবং যে খুব সম্ভব বাবার স্কুলের দরজার পাশ দিয়েও সড়াৎ করে সরে গিয়েছিল।

এবার সে নিশ্চিন্ত হয়ে যায়, একটা নতুন শোনা জীবনমুখী গান ভাঁজতে ভাঁজতে বাকি পথটা দিব্যি হেঁটে মেরে দেয়, হাওয়াই চপ্পলটা মাঝরাস্তায় জবাব দিলেও সে কিছু মনে করে না।

লোকটাকে সে দ্বিতীয়/তৃতীয়বার দেখে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের এমার্জেন্সিতে। তার মায়ের যেবার অ্যাকসিডেন্ট হল সেই বার। তাদের আসলে একটা বাড়ি আছে। দেড়কাঠা জমিতে ঠাকুর্দা একতলা করেছিলেন। বাবা উদয়াস্ত কোচিং করে করে সারা জীবন ধরে দোতলাটা তোলেন, কিন্তু ছাদের পাঁচিলটা আর শেষ করতে পারেননি। তিন ইঞ্চি ইঁটের যে নিচু গাঁথনিটা পাঁচিলের জায়গায় ছিল, পলেস্তারা পড়েনি বলেও বটে, সিমেন্টে মাটি মেশানো ছিল বলেও বটে, সে গাঁথনিটা কমজোরি হয়ে গিয়েছিল, ভেতরে ভেতরে আলগা হয়ে গিয়েছিল। যেমন হয় আর কি। হবি তো হ, তার মা আলসে থেকে তার একটা উড়ে-পড়ে যাওয়া গোলাপি ব্লাউজ ঝুঁকে তুলতে যান। তার মত অতবড় বেকার ছেলের মায়ের গোলাপি ব্লাউজের ওপর ঝোঁকের বে-আক্কেলেমিতেই হোক আর যা-ই হোক, পাঁচিলটি ধসে যায়, ফলে মা পড়ে যান, যে ঘটনাটুকু নিয়ে একটা গল্প লিখে ফেলা যায়, 'একটি গোলাপি ব্লাউজের জন্যে' নাম দিয়ে।

মাকে সে হাসপাতালে ভর্তি করতে পারছিল না। ডাক্তারবাবুরা, বেশ ইয়ং ছেলে সব, এই বয়সেই এত অ্যাকসিডেন্ট আর মৃত্যু দেখেছেন যে কারো রক্তাক্ত থেঁতলানো দেহ নিয়ে তাঁরা খুব ব্যস্ত না হয়ে প্রচুর কাজের ফাঁকে একটু মৃদু ফষ্টিনষ্টি করে নিচ্ছিলেন, এবং যে নার্সটির সঙ্গে করছিলেন না তার মেজাজ খাট্টা হয়ে গিয়েছিল। এমত সময়ে সেই লোকটাকে নজর করে সে। একদম অপরিচিত প্রাণীদের চিড়িয়াখানায়

একটিমাত্র চেনা মুখ দেখে সে হয়তো অসহায় চোখে তাকিয়েছিল, লোকটি এগিয়ে আসে। হাত পাতে, সে তার কাছে যা ছিল দিয়ে দেয় এবং তার মা ভর্তি হয়ে যান।

তবে তারপরে হয় আর এক ফ্যাচাং। দেখা যায় কম্মো কাবার। মা এতটা ধৈর্য ধরেননি, বিরক্ত হয়েই হয়তো বালতিতে লাথি মেরেছেন। ডাক্তারবাবুরা ভীষণ নিয়ম মানেন, তাঁরা জানেন একটা লাশকে এনে যদি কেউ চিকিৎসার দাবি করে, সেই দাবিকে সন্দেহের চোখে দেখা ডাক্তারবাবুদের কর্তব্য। আগে লাশ বানিয়ে তারপর তাকে ফেলে দেওয়া হয়েছে কি না এ সন্দেহ নিরসন করতে ময়নাতদন্ত করতে হবে।

মা আর মা রইলেন না, ঝামেলায়-ফাঁসানো এক লাশ হয়ে গেলেন, তো সেই লাশ ছাড়াতে যখন সে ডোমেদের সঙ্গে দরাদরি করতে থাকে, সে এ সব জানে না বলে বন্ধুজনদের তার বোকামিতে মজা পাওয়া হাসি শুনতে শুনতে, তখন সেই লোকটাকে তৃতীয়/চতুর্থবার সে দেখতে পায় এবং বুঝতে পারে মুশকিল আসান হয়ে যাবে। ঠিক তাই। চারশো থেকে দুশোয় নেমে যায় ডোম। তার মড়াখেকো চেহারা দেখেই হয়তো এবং সেই দু'শো টাকা বন্ধুবান্ধবদের পকেট থেকে আপাতত উধার পাওয়া যায়।

এখন এই লোকটিকে যদি সে দেবদূত বলে মনের মধ্যে ভয়-মিশ্রিত শ্রদ্ধার আসনে বসিয়ে রাখে তাকে কি দোষ দেওয়া যায়? যাদের বাবারা এই রকম পেনশন পান না, ঠাকুর্দারা বাড়ি শেষ করে যেতে পারেন না, মায়েরা গোলাপি ব্লাউজ তুলতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে মারা যান এবং মর্গে চালান হয়ে যান তাদের জীবনে একটা দেবদূতের কি দরকার হয় না? একটা দেবদূত কত কাজে লাগে বলুন তো? সাহস দিতে, মুশকিল আসান করতে, ভরসা জাগাতে জীবনটা সবটাই বরবাদ নয়—তার ভেতর কিছু একটা নেই-নেই করেও আছে এই বোধ উসকে দিতে একটা দেবদূত বড্ড কাজে লাগে। তারও লেগেছিল।

কিন্তু মানুষের ধর্মবিশ্বাস বড্ডই প্রয়োজননির্ভর। তাই এত কাণ্ডের পরেও সে দেবদূতকে ভুলে যায়। দেবদূতের প্রয়োজনটা পর্যন্ত ভুলে যায়। কেন না তার ভাববার সময় ছিল না। মা মারা যাওয়ার ফলে সে রান্না করতে এবং তার ছোট ভাই কাপড় কাচতে বাধ্য হওয়ায়, বাবা শোকগ্রস্ত জরাগ্রস্ত ভূতগ্রস্ত হয়ে পড়ায়, জামাইবাবুর সঙ্গে দিদির বনিবনা না হওয়ায়, একটি মেয়ে সুদ্ধু দিদি এসে পড়ায়, দিদির খোরপোষের জন্য মামলা করতে টিউশানির সব টাকাগুলি উকিলকে গ্যাঁটগচ্চা দিতে হওয়ায়, একটি রামবোকা ছাত্রী তার প্রেমে পড়ার কারণে ছাত্রীর দাদার ভাড়া করা গুণ্ডাদের হাতে ঠ্যাঙানি খাওয়ায় সে ডাইনে বাঁয়ে তাকাবার অবসর পায়নি। কোনও কল্পনা, কোনও স্বপ্ন, আশা-নিরাশার দোদুলদোলা এ সব তার অভিধান থেকে বেমালুম লোপাট হয়ে যায়।

সে অথৈ নদীর জলে পড়ে গেছে। সাঁতারের স জানে না, কিন্তু তাকে বাঁচতেই হবে সুতরাং সে যেমন পারে হাত পা ছোঁড়ে, ছুঁড়তে ছুঁড়তে ভেসে থাকতে শিখে যায়, শুধু ভেসে থাকা নদীতে জোয়ার আসলে সে একদিকে হড়কে যায়, আবার ভাটার সময়ে আরেক দিকে হড়কে যায়, এই সময়ে আবার ভরা কোটালে বান আসে। তিনতলা সমান উঁচু জলস্তম্ভ তাকে তুঙ্গে তুলে নিয়ে আছড়ে ফেলে দেয়, তারপরে সে অদূরে ঘূর্ণিপাক দেখে, প্রাণপণে বিপরীত দিকে টানতে থাকে নিজেকে। কাজেই তার

দেখা হয় না কোথাও কোনও কোণে কেউ দাঁড়িয়ে আছে কি নেই।

তবে এইভাবে আনাড়ি সাঁতার দিতে দিতে সে একটা কুটো পেয়ে যায়। কুটো নয়, কেরোসিন কাঠের টুকরো, কেরোসিন কাঠের টুকরো নয়, ভাঙা নৌকো, আগে থাকতে জেনে শুনেও সে সেই ভাঙা নৌকোয়ই চড়ে, সেটি একটি বোবা মেয়ে যার বুদ্ধি আছে এবং টাকাও কিছু আছে।

এইবারে সে সাবধানে, খুব যত্নে কিছু বিকিকিনি শুরু করে। সস্তায় কেনে, একটু বেশি দামে বেচে। ঘুরে ঘুরে প্রাণপাত করে, কোথায় কোন্ জিনিস একটু সস্তায় মেলে, কোথায় কোন্ জিনিসের অগাধ চাহিদা, খোঁজ খবর করে সেই খোঁজখবরকে কাজে লাগায়। এদিকে জামাইবাবুর কাছ থেকে দিদি ও তার মেয়ের জন্যে একটা চলনসই খোরপোষ মেলে, বাবা শয্যায় মারা গিয়ে তাকে মুক্তি দেন, ছোট ভাই এক ইয়ুথ কয়্যার-এ ভিড়ে গিয়ে এখানে ওখানে কল শোতে মেতে থাকে এবং খুব একটা রোজগারপাতি না হলেও ভারী খুশি মেজাজে থাকে। সে বাড়িটা সারায়, বাড়ির পাঁচিল তোলে, স্নো-সেমের রঙ লাগায় বাড়িতে, তার পরে বিয়ের পাঁচ বছর পরে হনিমুনে যায়। বেশি দূরে কোথাও নয়। দীঘায়।

সমুদ্র দেখবি তা গোয়ায় যা। সুন্দরী সুন্দরী সী বীচ। মিরামার, কলাংগুটে, কোলবা সব একেক জন একেক রকম সেজে বসে আছে। ঘুরে আয় মুম্বই, সমুদ্রটা তেমন কিছু না হলেও, লঞ্চে চেপে এলিফ্যান্টাটা সেরে আসা যায়। কিম্বা চলে যা কন্যকুমারিকায়। তিন দিক থেকে কেমন তিন রঙের সমুদ্র মিশেছে দেখতে পাবি, দেখতে পাবি ওই সিন্ধুর টিপ বিবেকানন্দ দ্বীপ, দেখবি কুমারী দেবী কেমন অনন্ত প্রতীক্ষায় থমকে রয়েছেন। যেতে পার, যায় চেন্নাইয়ের দীর্ঘ মেরিন ড্রাইভে, পণ্ডিচেরির সবুজ সমুদ্রে। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমটাও দেখা হয়ে যাবে। আচ্ছা অতদূর না-ই হল, গোপালপুর? চাঁদিপুর নিদেনপক্ষে পুরী? পুরীতে তো তামাম বাঙালিস্তানের লোক হনিমুন করতে যাচ্ছে। তা না দীঘা!

তা তা-ই সই। পুকুরের মতো নিথর টাইপের সেই সমুদ্দুরে লম্বা ফেনার গুড়িমারা বেঁটে ব্রেকার দেখেই তার বোবা স্ত্রী আনন্দে নাচতে থাকে। তার চোখ ভরে যায়। মন ভরে যায়। গলার কাছে একটা ব্যথা ডেলা পাকায়। আহা, বাবা দেখতে পেল না, মা-টা গোলাপি ব্লাউজ তুলতে গিয়ে খামোখা মারা গেল! আহা দিদিটা? দিদিটার মধু-যামিনীর সুখ হল না জীবনে। দিদির মেয়েটার হবে তো? হবে হবে নিশ্চয়ই হবে। সে তো চেষ্টা করছে প্রাণপণে। বোবা বউ তার বড় লক্ষ্মী! এই শান্ত দীঘার মধুযামিনীকেই সে আনজুনার জৌলুসের জোয়ার দেবে।

গা ভর্তি শান্তি মেখে সে ফিরে আসে। দিদি দরজা খুলে দেয়, ভাই হাত থেকে সুটকেস নেয়, হাঁড়ি ভর্তি মিষ্টি সে দিদির মেয়ের পিতৃহীন হাতদুটিতে তুলে দিতে পেরে বড্ড আরাম অনুভব করে। দিদি বলে—'তোর সঙ্গে এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন। আর এক দিনও ঘুরে গেছেন। বোধহয় খুব দরকার...।'

তার তথাকথিত বৈঠকখানায় ঢোকে সে। বাবার পুরনো তক্তপোষের পাশে তার নতুন কেনা সোফায় বসে আছে—সেই লোকটা। এতদিনে সে লক্ষ্য করে লোকটা ঠিক কালো নয়, কেমন কালিময়, ঠিক মোটা নয়, কেমন ফোলা ফোলা, জুলফি বেয়ে কাঁচা

কলপ ঘামে গলে নেমে এসেছে। সিনথেটিকের জামায় আটকে পড়া ঘামের দুর্গন্ধে সমস্ত ঘরটা নাক কুঁচকে ছোট হয়ে আছে, তবু সে টের পাচ্ছে না। লোকটা বলল—'আমি বুঝলেন, আয়কর অফিসে আছি। আপনার যা কাগজপত্র দেখলুম ওরা ইচ্ছে করলেই কেসে ফাঁসাতে পারে। না, না তেমন কিছু না। আমি তো রয়েছি। বিজনেস ব্যাপারটা আসলে...না না সেসব কিছু নয়...' বলতে বলতে তার বাঁ পকেটের পাশ থেকে লোকটা ছোট্ট করে হাত বাড়াল।

এখন সে কী করবে? কি করতে পারে সে? খুব বেশি ভাববার সময় নেই। প্রচণ্ড রাগের মধ্যেও দ্রুত চিন্তা করতে হচ্ছে। তিনটে বিকল্প আছে মোট। এক লোকটাকে খুন করা। সে ক্ষেত্রে তার ফ্যামিলি ভেসে যাবে; দুই নিজেকে খুন করা, সে ক্ষেত্রেও তার ফ্যামিলি ভেসে যাবে। সে অতএব তৃতীয় বিকল্পটা নিল।

হেঁটে হেঁটে হেঁটে হেঁটে সে
লোকটার ভেতর
ঢুকে গেল।

গৃধ্রকূট

বোধগয়া থেকে ছেষট্টি কিলোমিটারের মতো অ্যামবাসাডরে। তিনটি জাপযুবক, একটি বাঙালি দম্পতি। জাপানীদের তীর্থযাত্রা, দম্পতির মধুচন্দ্রিমা। বৈভার, বিপুল, রত্নগিরি, উদয়গিরি, শৈলগিরিতে ঘেরা পাঁচ-পাহাড়ি এই বৌদ্ধ তীর্থে দু ধরনের যাত্রা কী অনায়াসে মিলে যায়।

ডিসেম্বরের দাঁত-কাপানো কুয়াশার ভেতর থেকে রোদ-ঝলমলে সকাল আস্তে আস্তে ফুটে বেরোচ্ছে। নরম রোদ। শালুক ফুলের মতো নম্র, নরম।

পাঁচজনের মধ্যে অন্তত চারজন কী রকম একটা ঘোরের মধ্যে ছিল। বুদ্ধে বুদ্ধে ছয়লাপ। তিব্বতি বুদ্ধ, চিনা বুদ্ধ, থাই বুদ্ধ, নেপালি বুদ্ধ, ভুটানি বুদ্ধ, আর জাপানি বুদ্ধ মন্দিরের সেই আকাশচুম্বী বুদ্ধিমূর্তি।

বুলা জন্মেছে জুরিখে। এক পৃথিবীচর পরিবারের মেয়ে সে। বাবার সঙ্গে ছোটবেলায় কত যে ঘুরেছে। ভারতবর্ষ তো বটেই, ভারতের বাইরেও।

—'নৈনিতাল, রানিক্ষেত, কৌশানি?'

—'হ্যাঁ।'

—'কুলু-মানালি-চম্বা?'

—'হ্যাঁ।'

—'মুসৌরি-দেরাদুন!'

—'কতবার।'

—'পুর্ণিমায় তাজমহল, মার্বল রক্‌স।'

—'অবশ্যই।'

—'অজন্তা-ইলোরো-ঔরঙ্গাবাদ-গোয়া?'

—'সব। সব।'

সবই বুলার যাওয়া, দেখা, কোনও কোনওটা একাধিকবার। অমন যে বিশাল দাক্ষিণাত্যের মালভূমি—তারও পুঙ্খানুপুঙ্খ তার দেখা।

'তাহলে তো তোমাকে হংকং নিয়ে যেতে হয়।'

—'হংকং তো বাজার-নগরী। বিয়ের বাজার তো ওখান থেকেই করলাম। না হলে তোমার নাইকন ক্যামেরা, লেটেস্ট মডেলের রোলেক্স ঘড়ি, অ্যামস্টারডামের হিরের আংটি, সার্জিও ভ্যালেনটাইনোর শেভিং কিট, ম্যানিকিওর সেট কোথা থেকে আসত।'

—'তবে কি সুইজারল্যান্ড? সে তো আমার ক্ষমতায় আর ইহজীবনে কুলোবে না!'

এই জায়গায় বুলা সতর্ক হয়ে যায়। ইচ্ছা প্রকাশ করলে যে বাবা সুইজারল্যান্ডের ব্যবস্থাটাও করে দিতে পারেন এ কথাটা কি বলা যায়? এতে তো কুমারেশের অমর্যাদা! কুমারেশের হলে অমর্যাদাটা তারও হয়। এই কথাটুকু ধনীর দুলালী হলেও সে মোক্ষম বোঝে। মলম-মাখানো গলায় সে বলে—'আহা! সুইজারল্যান্ড কেন? অরোরা বেরিয়ালিস দেখতে নিয়ে যাওয়াও হয়তো একদিন তোমার হাতের পাঁচ হয়ে দাঁড়াবে! কে বলতে পারে?'

—'নাঃ'—কুমারেশ মনমরা গলায় বলে।

কেন যে ও ওরকম নঞর্থক চিন্তা করে? বুলা তো সমানেই উৎসাহ দিয়ে যায়।

সে অগত্যা বলে—'দূর, জায়গাটা সুন্দর হলেই হল। আর নতুন। নতুন হলেই ভাল হয়। ব্যস।'

বিদেশী ইলেট্রনিক্স গুডস-এর লোক্যাল এজেন্ট কুমারেশকে তার বিয়ে করার কথাই নয়।

এ নিয়ে অশান্তি কি কম হয়েছে?

একটা স্ট্রোকের পর বাবা এখন অবসর নিয়েছেন। একটু বেশিই দুশ্চিন্তা করেন। বলেছিলেন—'কী পরিচয় ওর আমি দেব?'

মা বলেছিলেন—'আহা, এম.কম. ডিগ্রিটা তো আছে? উদ্যমী হলে ওইখান থেকেই ও উন্নতি করবে। আমি ও দিকটা ভাবছি না। ছেলেটার আপনজন বলে কেউ নেই। কুটুম বলে কিছু থাকবে না?'

—'ওটা একটা কথা হল? যত আপনার জন থাকবে ততই কমপ্লিকেশন বাড়বে। আপনার জন তো আমরাই হতে পারি। ছেলে তো বড় বংশেরই। হাটখোলার দৌহিত্র বংশ। কিন্তু আসল যে উদ্যমের কথা বললে, সেটাই ছেলেটার নেই। লোক তো কম চরালাম না জীবনে! আমরা বুঝতে পারি।'

—'একশোবার, মা বলেছিলেন, তবে এ কথাও সত্যি যে মেয়েকে যদি কাছে রাখতে চাও তো এর চেয়ে ভাল পাত্র পাওয়া শক্ত। স্বাস্থ্য ভাল, চেহারা তো রূপকথার রাজপুত্র।'

—'ওই দেখেই তো বুলাটা ভুলেছে।'

বুলার সামনেই আলোচনা হচ্ছিল। সে এই সময়ে ফোঁস করে ওঠে—'তুমি ভোলনি? মা ভোলেনি? "কী চমৎকার কথাবার্তা। রাজপুত্রের মতো চেহারা।"—

বলোনি?'

—'তা বোধহয় বলে ফেলেছি, আবছাভাবে হলেও মনে পড়ছে'—বাবা স্বীকার করেছিলেন। মা স্মিত মুখে চুপ।

—'তবে? দোকানদার শুনেই চুপসে গেলে?'—বুলা বেশ চোখা চোখা কথা ব্যবহার করতে ভালবাসে।

বাবা হেসে ফেলেন—'সত্যিই তো এত পছন্দ? হাবুডুবু খাচ্ছিস? না কী?

—'খাচ্ছিই তো!'

—'আর ও? ও কী খাচ্ছে?'

—'ও বিষম খাচ্ছে। বলছে কোনওদিন যদি উন্নতি করতে পারে, আ চেন অফ শো রুমস ইন অল দা বিগ সিটিজ অফ ইন্ডিয়া, সে দিনই ও আমাকে প্রোপোজ করার কথা ভাবতে পারে!'

—'কথাটা তো ঠিকই বলেছে। কাণ্ডজ্ঞানটা তাহলে আছে।'

—'হয়তো বম্বে, দিল্লি, মাদ্রাজ, সরি মুম্বই, দিল্লি, চেন্নাইয়ে দোকান-শৃঙ্খল ওর হবে বাবা। তবে তখন আর আমি বিবাহযোগ্য থাকব না। আমিও তখন তোমারই মতো রিটায়ার্ড।'

মেয়ের কথার ধরনে বাবা-মা হেসে ফেলেছিলেন। একমাত্র সন্তান, কত আদরের। তার কথা কি শেষ পর্যন্ত ফেলতে পারেন?

তা জামাই দেখে সব ধন্য-ধন্যই করেছিল। বুলাও খুব জ্বলজ্বলে চেহারার মেয়ে। দু-তিন পুরুষে ধনীর ঘরে যেমন হয়। ফর্সা রঙ, বড় বড় চোখ, চোখা নাক। কিন্তু কুমারেশের রূপ একেবারে অন্য গোত্রের।

বেড়াতে বেরোতে ওদের একটু দেরিই হয়ে গেল। প্রথমত কুমারেশ তার বিয়ের যৌতুক-পাওয়া ল্যান্সডাউনের শো রুমটা নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত ছিল। দ্বিতীয়ত প্রচণ্ড গরম। ডিসেম্বরের গোড়া এখন। যখন দেখা গেল ভারতের সব বিখ্যাত রূপমহলই বুলার দেখা, তখন কুমারেশ এই চমৎকার ভ্রমণসূচীটি তার মাথা থেকে বার করে।

—'গিরিডি গিয়েছো? ফুলডুংরি? রাজরাপ্পা? রাজগির?'

এত কাছে, অথচ বুলা যায়নি। সুতরাং সব ঠিকঠাক করে গর্বিত হাসি হেসে কুমারেশ বলে—'চলো যাই বিহারে।'

নির্জনতার খোঁজে সে তার বউকে নিয়ে অদ্ভুত অদ্ভুত সব রোমাঞ্চকর জায়গায় ঘুরবে। বুনো ঝোরার ধারে ছিন্নমস্তার মন্দির, শাল-মহুয়া-পলাশ-পাইনের জঙ্গলে ছাওয়া ম্যাগনোলিয়া পয়েন্ট যেখানে ভালুকের ভয় আর সূর্যোদয়ের রোমাঞ্চ দুটোই সমান উপভোগের, পাহাড়ের ঢালে পাখির কলকাকলিতে ভরা নিঃসঙ্গ লেক...

কিন্তু আশ্চর্য কথা উশ্রী ফল্‌সে ওরা অভীষ্ট নির্জনতা পেলই না। ফল্‌সটাকে ঘিরে কত যে পিকনিক পার্টি। কত যে রকম-বেরকমের পোজ আর সেই সঙ্গে ক্যাসেটের কী যে মস্তানি! তবে কুমারেশের মতো গোমড়া মুখে বুলা বসে থাকেনি। সে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে পিকনিক পার্টিদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে, উশ্রীর এলোচুলের ধারায় চান করে যথাসম্ভব মজা করে নিয়েছে। উশ্রী বড় ভয়ঙ্করী। ওখানে চানটান করা বিপজ্জনক। ওরা দেখেছিল সেই স্পটটা যেখান থেকে পা ফসকে পড়ে বোল্ডারের পর বোল্ডারের

ধাক্কা খেতে খেতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ভেসে গিয়েছিল একটি বেপরোয়া ছেলে মাত্র মাস তিনেক আগে।

তবু বুলা তাকে নামিয়েছিল, নিজে তো নেমেছিলই। একবার নামবার পর কুমারেশেরও নেশা ধরে গিয়েছিল। আর একটা, আরও একটা পাথরে যাবার জন্য ছটফট করছিল সে।

এই সময়ে একজন পেছন থেকে চেঁচিয়ে ওঠে—'অনেক হয়েছে দাদা, খুব বীরপুরুষ আপনি, আর এগোলে নিজে যদি বাঁচেনও, বধূ-হত্যার দায়ে পড়বেন নির্ঘাত।'

কুমারেশ ভয় বেয়ে যায়—'প্লিজ বুলা এবার ফেরো।'

'ওঃ, তুমি এত ভিতু!' বুলা ঝাঁঝিয়ে ওঠে।

কিন্তু বুদ্ধগয়ার সেই অশোকের-আরম্ভ-করা কানিংহামের শেষ করা মন্দির, শ্রীলঙ্কা থেকে আনা বোধিবৃক্ষের ছায়া আর আকাশছোঁয়া বুদ্ধমূর্তি দেখে ও কেমন ঘোরে আছে। জাপানি ছেলেগুলির মধ্যে তোসিকোই একমাত্র একটু ভাঙা ভাঙা ইংরেজী বলতে পারে, দু'দিন বোধগয়ার আই.টি.ডি.সি-র হোটেল অশোকে থাকাকালীন বুলা ওর কাছে থেকে বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে অনেক জাপানি জ্ঞান সঞ্চয় করছিল এবং ওকে তথ্য দিচ্ছিল।

—'ওই দেখো ওই গৃধ্রকূট'—ভীষণ উত্তেজিত হয়ে বলল বুলা।

ড্রাইভার বলল—'বহি গৃধ্রকূট, মেমসাবনে ঠিক বোলি।'

—'তুমি চিনলে কী করে?'—কুমারেশ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল। বুলা হাতটা মাছি ওড়াবার ভঙ্গিতে নেড়ে বলল—'দেখলেই তো বোঝা যায়। শকুনের পিঠের ঢালটা তার পর মাথার গোল আর বাঁকানো ঠোঁটের শেপ দেখলেই চিনতে পারা যায়। লম্বা গলাটা নেই।'

তোসিকোদের যতই দেখায় সে, তারা চিনতে পারে না, কুমারেশ তো নয়ই।

রাজগিরের টুরিস্ট বাংলোয় বুকিং ছিল। পা দিয়েই কুমারেশ খুশি হয়ে উঠল। সারা দোতলাটায় এক বৃদ্ধ অস্ট্রেলিয়ান দম্পতি ছাড়া কেউ নেই। জাপানি তিনজন নিচে। ব্যাস।

—'এই নাও তোমার নির্জনতা,' কুমারেশ হেসে উঠল।

—'আমার নির্জনতা মানে? লোকজন হই-চই আমার সবসময়ে ভাল লাগে। নির্জনতাটা তোমারই বেশি দরকার মনে হচ্ছে। এমন করছ যেন কোনওদিন আর আমাকে একা পাবে না।'

ভ্রূভঙ্গি করে বুলা কুমারেশের কাছে ঘেঁষে আসে। তার মাথা কুমারেশের কাঁধ ছাড়িয়ে, মুখটা উঁচু করে সে আয়নার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে—'দেখো দেখো।'

—'আসল তোমাকে দেখব, না তোমার ছায়া দেখব?'

—'আমাকেও না, আমার ছায়াও না, খাজুরাহোর ওই মিথুন-মূর্তি দেখো আয়নার বুকে।'

এমন একটা মুগ্ধ আকুলতার সঙ্গে সে কথাগুলো বলে যেন সত্যিই কোনও শিল্পকৃতি দেখছে, যেন এক দম্পতির ক্ষণ-মিলনের দৃশ্য থেকে সত্যিই সে শাশ্বত মিথুনের কোনও দর্শনে পৌঁছে গেছে।

—'মনে হচ্ছে না আমরা অনেক আগের যুগে ফিরে গেছি?' বলতে বলতে শিউরে ওঠে বুলা।

...'রাজগৃহ থেকে রাজগির। রাজগিরের পথে-পথে পায়ে-পায়ে ইতিহাস।' গাইড বলছিল, 'অজাতশত্রু রাজা এই শহরের নাম দেন গিরিব্রজ।'

—'না তো!' বুলা বলে, 'গিরিব্রজই আগেকার নাম। জরাসন্ধের সময়ে মানে মহাভারতের কালেই গিরিব্রজ নাম ছিল। রাজগৃহ নাম তো বিম্বিসারের সময় থেকেই।'

জাপানিদের সে বুঝিয়ে দেয়। ওরা পাঁচজনে এই গাইডের শরণ নিয়েছে।

—'এই হল অজাতশত্রুর দুর্গ' পথের আশে-পাশে ভগ্ন প্রাচীন প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়ে গাইড বলে।

—'না তো! অজাতশত্রুর দুর্গটা পাটলিপুত্রে মানে পাটনায়। বৈশালীর ঠিক উলটো দিকে স্ট্রাটেজিক পয়েন্টে দুর্গটা করেন অজাতশত্রু। এ দুর্গ তো মহারাজ বিম্বিসারের করা। অজাতশত্রু তাতে হয়ত কিছু যোগ করেন।'

—'ইউ সিম তু নো লত্‌ হিসত্রি?' তোসিকো শ্রদ্ধার চোখে তাকায়—

—'ইউ স্তাদি?'

বুলা হেসে মাথা নাড়তে থাকে। না না, সে কিছুই জানে না। ক'টা কথা বলেছে বলেই এরা তাকে পণ্ডিত ঠাউরে নিয়েছে।

—'মূল রাস্তা তো দুটো? ওমা ওই তো বেণুবন, ঢুকব না আমরা?' সে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

গোছা গোছা বাঁশগাছ ফোয়ারার মতো আকার নিয়ে ওপরে ঠেলে উঠছে, ঠিক, ওটাই বেণুবন।

—'তবে যে বললে রাজগিরে আগে আসোনি?' কুমারেশ জিজ্ঞেস করে।

—'আসিনিই তো।'

—'বুকলেটটা এত ভাল করে পড়েছ যে...'

—'হয়তো পড়েছি। হয় তো পড়িনি'...মুখে রহস্য মেখে কুমারেশের দিকে তাকায় বুলা।

মস্ত বড় ফলকের ওপর বেণুবনের পরিচয় লেখা।

"এই বেণুবন বা বেলুবন ছিল লর্ড বুড়ঢাকে মহারাজ বিম্বিসারের প্রথম উপহার। জীবনের বারোটি বছর বেণুবনে দেশনা করেন লর্ড বুড়ঢা। অনুপম সৌন্দর্যের জন্য বেণুবন ছিল তাঁর বিশেষ প্রিয়।"

—'বাঁশগাছগুলো গোছা গোছা করে লাগিয়ে মন্দ দেখাচ্ছে না অবশ্য। কিন্তু এমন কী সৌন্দর্য আছে এর, বুঝলাম না'—কুমারেশ বলে।

—'তুমি কী মনে করেছ শুধু বাঁশগাছ দিয়ে বেণুবন সাজানো ছিল? বেণুর সৌন্দর্য অনুভব করে বিম্বিসারের বনবিভাগ বেণুর একটু প্রাচুর্যই রেখেছিলেন অবশ্য। কিন্তু আরও বহুরকম গাছ ছিল এ বাগানে। ফুলের তো সীমাসংখ্যা নেই। এত সুন্দর ছিল এ বাগান যে বিম্বিসার তাঁর এক রানী ক্ষেমাদেবীকে বেণুবনের সৌন্দর্য দেখাবার ছল করেই বুদ্ধ দর্শনে নিয়ে এসেছিলেন।

—'কেন? ছল করে কেন?—কুমারেশও বেশ কৌতূহলী হয়ে পড়েছে।

—'রানী ক্ষেমা যে গোড়ার দিকে বুদ্ধের ওপর হাড়ে চটা ছিলেন। ওই রানীই এই বেণুবনে বুদ্ধকে প্রথম দেখবার পর এমনই প্রভাবিত হন যে প্রব্রজ্যাই নিয়ে ফেলেন। এই যে এইখানে রানী ক্ষেমার সঙ্গে গৌতম বুদ্ধের প্রথম দেখা হয়েছিল।'—নাটকীয়ভাবে বুলা একটা অশথ গাছের দিকে আঙুল দেখায়।

সে মিটিমিটি হাসছে। সেদিকে তাকিয়ে তোসিকো বলল—'ক্রু? অর নো ক্রু?'

কুমারেশ বলল—'শি'জ জাস্ট কিডিং।'

—'কিদিং? কিদিং?'—ওরা তিনজনেই তিরস্কারের চোখে বুলার দিকে তাকাল।

পরে কুমারেশ বুলাকে সাবধান করে দেয়—'দেখো, ওরা কিন্তু বৌদ্ধ। বুদ্ধকে ওরা ভগবান বলে মানে। ওদের সামনে ওভাবে বুদ্ধকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা কোরো না।'

—'তুমিই তো ঠাট্টার কথা বললে। আমি তো ঠাট্টা করিনি।' বুলা অবাক হয়ে বলল, একটু পরে বলল—'আমি যদি বলি ওইখানেই সেই স্পট যেখানে ক্ষেমা এসে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রথমে দেখেছিলেন বুদ্ধকে, এর বিপক্ষে তুমি কোনও প্রমাণ দিতে পারবে?'

—'আড়াই হাজার বছর আগে কোথায় কী ঘটেছিল সে প্রমাণ আবার কেউ দিতে পারে না কি?' কুমরেশ বলল বেশ অবজ্ঞার সঙ্গেই।

—'প্রমাণ না পেলে আর ইতিহাস রচনা হচ্ছে কী করে?'

—'তা অবশ্য। কিন্তু বুলা, তুমি যে বৌদ্ধযুগের ইতিহাস এত জানো সেটা আমি জানতাম না।'

'জানিই তো!'

জেদি মেয়ের মতো বুলা বলে—'ধরো যদি বলি আজ যেখানে এই ট্যুরিস্ট বাংলো সেইখানেই বিম্বিসার রাজামশায়ের কোষাধ্যক্ষর কোয়ার্টার্স ছিল। যদি বলি এইখান দিয়ে, এই করিডর দিয়ে নূপুরের নিক্কণ তুলে হেঁটে যেতাম তখন গরবিনীর মতো!' বুলা তার নূপুর মেঝেতে ঠুকে ঠুকে বাজায়। ছুন ছুন ছুন শব্দ হয়।—'যদি বলি এক ভীষণ দস্যি আবদেরে মেয়ে ছিলাম আমি, বাবা-মা আমাকে সামলাতে পারতেন না! যখন যা ধরব, তা-ই চাই!'

'সে তো এখনকার কথাই বলছ। এর জন্যে আড়াই হাজার বছর আগে যেতে হবে কেন?'—কুমারেশ হেসে বলল।

দু'জনে বারান্দায় দুটো চেয়ার টেনে বসেছিল। সামনে বিস্তৃত লন। ধারে ধারে ফুলগাছ। সন্ধের ছায়ায় এখন সব আবছা হয়ে এসেছে। বুলা বলল—'ওই তো সেই জানলা, যেখান দিয়ে পথের দিকে তাকিয়ে এক দিন তোমায় দেখতে পেলাম। লভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট। কিছু একটা শয়তানি করেছিলে, বুঝলে? তোমাকে তখনকার পুলিশে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল।'

বুলা হেসে উঠল। কুমারেশ বলল,—'তখন পুলিশও ছিল?'

'ছিল বই কি, নইলে একটা রাজ্য চলে?'

—'তো তারপর?'

'তারপর আমি আবদার ধরলাম, তোমাকে আমার চাই। তখনও নিশ্চয়ই এখনকার মতো লালটুস দেখতে ছিলে। বাবা বলে-কয়ে জরিমানা দিয়ে তোমাকে রাজরোষ থেকে

উদ্ধার করলেন। তারপর ঘটাপটা করে বিয়ে হল।'

—'তারপর?'

—'তারপর কাল শুনো। এখন ভীষণ খিদে আর ঘুম পাচ্ছে,' বুলা হাই তুলল একটা, মুখে হাত চাপা দিয়ে আলগা করে, চোখে জল এসে গেছে।

—'এরই মধ্যে ঘুম?'

—'বাঃ, কত হেঁটেছি, কত পাহাড় চড়েছি বলো তো? ব্রহ্মাকুণ্ড দেখে পুরো জরাসন্ধ কা বৈঠক পর্যন্ত উঠে গেলাম। আর সপ্তপর্ণী গুহা তো তারপর ঘুরে, আবার নেমে যেতে হয়। তুমি তো গেলেই না।'

—'তোমাকেই বা কে যেতে বলছিল?'

—'বাঃ, প্রথম বৌদ্ধধর্মসঙ্গীতির অকুস্থল! দেখব না? জানো তো ত্রিপিটক ওইখানেই প্রথম সংকলিত হয়! বিনয় পিটকের এডিটর ছিলেন একজন নাপিত, তাঁর নাম উপালি। ভাবতে পারছ?'

—'উঃ, তুমি তো দেখছি একেবারে ইতিহাসের দিদিমণি হয়ে গেলে?'

—'কবে যে জানতাম! ভুলেই গিয়েছিলাম। এখানে এসে মনে পড়ে যাচ্ছে,'—বুলা আবার হাই তুলল।

মাঝরাত্তিরে কুমারেশকে ডেকে তুলল বুলা, বলল—'মনে পড়েছে, ওই মেয়েটার নাম ভদ্রা, আর ওই লোকটার নাম সম্বুক।'

—'কোন্ মেয়ে?' কুমারেশ ঘুম চোখে জিজ্ঞেস করল।

—'ওই যে, যে মেয়েটা এখানে থাকত, আর যে লোকটাকে সে জানলা থেকে দেখল!' বলে বুলা আবার ধপাস করে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

—যা ব্বাবা। স্বপ্ন-টপ্ন দেখল না কী? কুমারেশ উঠে বারান্দার দিকে জানলা খুলে একটা সিগারেট ধরায়।

শৈলগিরি। গৃধ্রকূট যার শিখর। রোপওয়েতে করে দুলতে দুলতে পৌঁছে যাওয়া। চমৎকার দুপুরে জাপানি বুদ্ধমন্দির শান্তিস্তূপ। পৃথিবীর যাবতীয় কলুষকালির উপর বাটি উপুড় করে দিয়েছে কেউ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিধ্বস্ত জাপানের গড়া। শান্তিস্তূপ। বাইরেও অনুপম বুদ্ধমূর্তি। ভেতরেও। ধ্যানস্থ। তিনটি জাপ যুবক, একটি বাঙালি যুবতী নতজানু। বাঙালি? না মাগধী? বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি বলছে না' কি তোসিকো? 'ধম্মং শরণং গচ্ছামি, বলছে মগধিনী? ধর্মের শরণই আবার নেবে নাকি?

জাপানিরা স্তূপ প্রদক্ষিণ করতে গেল। মধ্যদিন পার হয়ে যায় যায়। ছায়া পড়ে যায় যায়। গৃধ্রকূট। গৃধ্রকূট। গৃধ্র চঞ্চু ক্ষয়ে গেছে কালের প্রকোপ। বাইরে থেকে চেনা যায় না। কিন্তু ভেতরে ভেতরে সে বুঝি.আজও সেই গৃধ্রকূট।

মাঝে মাঝে বড় বড় গাছ। ক্লান্ত শরীর জুড়িয়ে যায়। আজ অনেক ঘোরা হয়েছে। শুধু আজই বা কেন? এই ক'দিন? এ যাত্রায়। ফেরবার সময়ে রাঁচি, রাজরাপ্পায় ছিন্নমস্তার মন্দির। বেড়াতে বেড়াতে দু'জনে রুক্ষ পাথরের উপর অদৃশ্য পায়ের ছাপে পা রেখে রেখে কিনারে গিয়ে দাঁড়ায়। সমস্ত রাজগৃহ নগরটা দিনান্তের রোদে ঝিমিয়ে আছে। দেখা যাচ্ছে বিম্বিসারের কারুগৃহ, সোন-ভাণ্ডার, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে দুটি প্রায় সমান্তরাল পথ নগরীর দৈর্ঘ্য ফিতে দিয়ে মাপছে।

বুলা হঠাৎ ঝটকা দিয়ে উঠে দাঁড়ায়, বলে 'আর কোথাও যাব না বুঝলে? এই রাজগৃহর স্মৃতি নিয়েই এবার ফিরব।'

—'সে আবার কী? টিকিট কাটা, বুকিং রয়েছে।'

—'তাতে কী? আমার আর ইচ্ছে করছে না।'

যতটুকু চিনেছে বুলাকে কুমারেশ জানে এই ওর শেষ কথা। ইচ্ছে করছে না। ইচ্ছে যদি না করে ভগবানের বাবার সাধ্য নেই, ওকে দিয়ে সে কাজ করায়। অতএব এই রাজগির, এই গৃধ্রকূট, এই-ই শেষ। নির্জন গিরিপ্রান্ত। গাছের আড়াল। কোথাও কেউ নেই। চোখে মোহ নিয়ে কুমারেশ ডাকে—'এসো, এসো বুলা। এসো।'

বুলা ঝাঁপিয়ে পড়তে যায় কুমারেশের বুকে। পরক্ষণেই একটা আর্ত চিৎকার গিলে নেয় গৃধ্রকূট। পাথরে ধাক্কা খেতে, খেতে, বাতাসে ওলট পালট হতে হতে নিচে পড়তে থাকে কুমারেশ। নিচে পড়তে থাকে।

বুলা তার ওড়না কোমরে গুঁজে নেয়। একবারও পেছন ফিরে তাকায় না। ও ভেবেছিল বুলা ওর বুকে ঝাঁপাতে গেলেই ও সরে যাবে। ও জানে না বুলা কত সতর্ক খেলোয়াড়। দিয়েছে একটা বিদ্যুৎগতিতে আপার কাট। এখন সে বুঝতে পারছে উশ্রীতে যে বোল্ডারটার দিকে তাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল লোকটা, সেটা কত পেছল, কত গড়ানে, পা দিলে আর দেখতে হত না, সঙ্গে সঙ্গে হড়াস, পাথর-ভর্তি উন্মাদ জলে, যেখানে সাঁতার-শিক্ষা কোনও কাজে লাগে না। এখন বুঝতে পারছে ট্রেন যখন হু হু করে ছুটছিল, তখন বারবার কেন খোলা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছিল লোকটা। স্রেফ তাকে লোভ দেখাবার জন্যে। যাতে ওর দেখাদেখি সে-ও গিয়ে দাঁড়ায়, তারপর সেই আকস্মিক দুর্ঘনাটি ঘটে।

"চলন্ত ট্রেন থেকে দুঃসাহসিনী যাত্রিণীর পতন ও মৃত্যু।" তদন্ত কি আর হত না? হত। কিন্তু এ ক'মাসে বাবা-মার স্নেহ ভালবাসা ভালই আদায় করেছে লোকটা। না হলে বাবা বিশাল খরচ করে ল্যান্সডাউনের শো-রুমটা এত তাড়াতাড়ি...

আর সেই ফোন? দানাপুর জংশন থেকে শান্তিনিকেতনে বাবা-মাকে এস.টি.ডি?

বুলা বলছে...'চমৎকার আছি মা। দারুণ এনজয় করছি। একদম ভাববে না।'

তার হাত থেকে রিসিভারটা কেড়ে নিয়ে কুমারেশ—'চমৎকার ঠিকই। তবে মেয়েকে সামলাবার জন্যে আপনাদের আসা উচিত ছিল মা। ট্রেনের খোলা দরজায় গিয়ে দাঁড়ানো চাই, উশ্রীর জলে কেউ চান করে না, ওর করা চাই-ই।'

মা বলছেন—'সে কী? বুলা বেপরোয়া সাহস ভাল না। কুমারেশের কথা শুনো।'

মনের মধ্যে একটা খটকা লেগে গিয়েছিল। কোথায় বেসুর বাজছে, খচখচ করছে। প্রথমটায় সে বুঝতে পারেনি। ট্রেনের দরজায় ও তো দাঁড়ায় না, দাঁড়ায়নি। কুমারেশই তো দাঁড়ায়। সিগারেট মুখে নিয়ে, বেপরোয়া ভঙ্গিতে। তবে?

রাজগিরের মাটিতে পা দেবামাত্র বুলা বুঝতে পারে। ভদ্রা, ভদ্রাই ওকে বলে দেয়। আড়াই হাজার বছর বয়সের এক সুন্দরী তরুণী, ভদ্রা। মগধ রাজ্যের কোষাধ্যক্ষের একমাত্র আদুরে-আবদেরে মেয়ে। সে এক সুন্দর চোরের মোহে পড়ে। বাবা-মার সম্মতি আদায় করে বিয়েও করে। সবই দিয়েছিল তাকে—সুন্দর বরতনু, গরবিনী মন, সু-উচ্চ উদার হৃদয়। কত সেবা, কত বিলাস, সৎ সুন্দর জীবনযাপননের কত আয়োজন। কিন্তু

জাতচোরের স্বভাব যাবে কোথায়? একদিন পুজোর ছলে ভদ্রাকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত তার সমস্ত অলংকারে মুড়ে নিয়ে সম্ভুক চড়ল গৃধ্রকূটে। তার পর বলে কি না—'সব অলংকার খুলে দাও, অলংকারের জন্যই তোমায় বিবাহ করেছি।' ভদ্রা তীক্ষ্ণধী মেয়ে। বুঝেছিল শুধু অলংকার নিয়েই ক্ষান্ত হবে না দুর্বৃত্ত। তাকে হত্যা করবে। তাই সে অশ্রুমুখী সেজে শেষবার সালংকার আলিঙ্গনের প্রার্থনা জানায়, আর সেই ছুতোয় দুর্বৃত্তকে ঠেলে ফেলে দেয়।

গল্পটা কেমন করে যে তার জানা ছিল, কোথায় যে পড়েছে, কিছুতেই মনে করতে পারছে না বুলা। এখন এই মুহূর্তে তো নয়ই। এখন বুক কাঁপছে। ভীষণ দুঃখ। ভীষণতর হতাশা, ভীষণতম ভয়।

কিন্তু না, সে ভদ্রার থেকে আড়াই হাজার বছরের ছোট হলেও আসলে তো আড়াই হাজার বছরের বড়ই। তখন ভদ্রা নিশ্চয় রাজদ্বারে সুবিচার পেয়েছিল। বিম্বিসার ধরতে পেরেছিলেন, পারতেন, কে প্রকৃত অপরাধী, কে নয়। এখন সে রাজদ্বার নেই, সে বিচারক নেই। নেই সে জনগণ। এখন চলবে দিনের পর দিন খবরে-কাগুজে বিচার। স্টোরির খোঁজে পাপারাৎজি গল্পের মধ্যে গল্প খুঁজবে, উদ্দেশ্যর মধ্যে উদ্দেশ্য। জনগণ হয়তো চেঁচাবে—'মৃত্যুদণ্ড চাই, পতিঘাতিনীর মৃতুদণ্ড চাই!'

আলুথালু বসনে চিৎকার করতে করতে ছুটতে থাকে বুলা শান্তিস্তূপের উদ্দেশে যেখানে তোসিকো আর তার দুই বন্ধু পরম শ্রদ্ধাভরে স্তূপ প্রদক্ষিণ করছে। আছড়ে পড়ে সে পাথুরে জমিতে।

'হোয়াত রঙ? হোয়াত রঙ?'—চকিতে তিন জাপ যুবক ঘুরে দাঁড়ায়। খসা টালি যত্ন করে বসাচ্ছিল জাপ কারিগর। ভেতরে ছিল মন্দিররক্ষক জাপ কর্মচারীকুল। সব বৌদ্ধ। ছুটে আসে। সংখ্যায় খুব বেশি নয়, কিন্তু যথেষ্ট।

—'আমার স্বামী পাহাড়ের ওপর থেকে পা ফসকে পড়ে গেছেন। ফর লর্ড বুদ্ধ'জ সেক সেভ হিম। বাঁচান, বাঁচান ওকে।

ছুটোছুটি পড়ে যায়। আতঙ্কিত ছুটোছুটি। সান্ত্বনাহীন কান্না কাঁদতে থাকে ভদ্রা।

আড়াই হাজার বছরেও লোকটার স্বভাব শোধরাল না?

একটা ছোট মেয়ে

লোকে বলে আমি একটা ছোট মেয়ে। 'এ তো বাচ্চা!' এইভাবে বলে, কিন্তু আমি জানি আমি মোটেই বাচ্চা-টাচ্চা নই। বারো ক্লাসে উঠলুম। সতেরো বছর বয়স হল—আবার বাচ্চা কী? আসলে আমি বেঁটে, চার ফুট সাড়ে দশ ইঞ্চি মোটে হাইট। মোটা-সোটা নই। তাই আমাকে ছোট লাগে। আমার বন্ধু দেবলীনার মা বলছিলেন—'হঠাৎ দেখলে তোকে লীনাদের থেকে অনেক ছোট দেখায়, কিন্তু মুখটা ভাল করে দেখলেই যে কেউ বুঝবে।'

দেবলীনা মজা পাওয়া হাসি হাসতে হাসতে বলেছিল—'তবে কি ঋতুর মুখটা পাকা-পাকা, মা?'

—'না, পাকা নয়,—ঢোক গিললেন দেবলীনার মা—'মানে ওই ম্যাচিওর আর কী।'

সেই মুখই এখন দেখছি আমি। গালগুলো ফুলো ফুলো। চোখ দুটো গোল মতো। পাতা নেই। নেই মানে কম। ভুরু খুব পাতলা, ঠোঁটের ওপর দিকটা সামান্য উঁচু। হেসে দেখলুম দাঁতগুলো পরিষ্কার, ঝকঝকে, কিন্তু বাঁ দিকের ক্যানাইনটা উঁচু। একটু বড় বড়ও দাঁতগুলো। আমার চিবুকে একটা টোল আছে। আমার আর এক বন্ধু রুবিনা বলে—'তোর এই টোলটাই তোকে বাঁচাবে ঋতু।'

কেন একথা রুবিনা বলল, তার মানে কী, বুঝতে হলে আমার বন্ধুদের কোনও কোনও আলোচনার মধ্যে ঢুকতে হবে।

ভুরু প্লাক করা নিয়ে কথা হচ্ছিল একদিন। দেবলীনার ভুরু খুব সরু, বাঁকানো। বৈশালী বলল—'এরকম ভুরু আজকাল আউট অব ফ্যাশন।'

রুবিনা বলল—'না থাকলে করবেটা কী? যা আছে তার মধ্যেই তো শেপ আনতে হবে। এই যেমন ঋতু। ভুরু বলে জিনিসই নেই, তার প্লাক।'

অমনি আলোচনাটা দেবলীনার থেকে আমার দিকে ঘুরে গেল। যেটাকে আমি ভয় করি। এবারে ওরা আমাকে নিয়ে পড়বে।

—'ঋতুর অ্যাট লিস্ট ব্রণর সমস্যা নেই।' বৈশালী বলল।

—হ্যাঁ, কালো হলেও ওর স্কিনটা খারাপ না'—রুবিনা বলল।

—'এই ঋতু, স্কিনের জন্যে কী করিস রে?'

আমি ক্ষীণ গলায় বললুম—'তুই কী করিস?'

—'আমি? আমার তো হাজার গণ্ডা ব্রণ, কোনও ক্রিম মাখার জো নেই। রেগুলার মুসুর ডাল বাটা আর চন্দন মাখতে হয়। বৈশালী কী করিস রে?'

—'আমার আবার মিক্সড স্কিন, জানিস তো। নাক চকচক করবে, কপাল চকচক করবে, আর গাল দুটো শুকিয়ে বাসি পাউরুটি হয়ে থাকবে। আমার অনেক জ্বালা। কোথাও ভাপ লাগে, কোথাও বরফ। কোথাও মধু, কোথাও চন্দন। সে অনেক ব্যাপার, মা জানে।'

—'তুই একটা মিস সামথিং না হয়েই যাস না।' দেবলীনা ক্ষ্যাপাল।

—'তবু মন খুলে মিস ইউনিভার্সটা বলতে পারলি না তো?' বৈশালী চোখ ছোট করে হাসছে।

—'মিস ইউনিভার্স হোস না হোস মিস সেন্ট অ্যানথনিজ তো তুই হয়েই আছিস।'

আমি বৈশালীর দিকে তাকালুম। শীতকালে ওর গাল দুটো একটু ফাটে। লালচে ছোপ পড়ে। এমনিতেই একটু লালচে ফরসা রং ওর। মুখটা এত মিষ্টি যে চোখ ফেরানো যায় না। লম্বা, দোহারা, ফুলহাতা লাল সোয়েটার আমাদের স্কুলের ইউনিফর্ম, পরেছে ব্লু স্কার্টের ওপর। ওকে দেখাচ্ছে যেন স্নোহোয়াইটের গল্প থেকে নেমে এসেছে। এখনও মিস সেন্ট অ্যানথনিজ আখ্যা ও পায়নি, কিন্তু টিচাররা ওকে আড়ালে 'ব্লাডি মেরি' বলে ডাকেন। ইতিহাসের ওই কুখ্যাত রানির নামে ওকে ডাকা হয় কেন

আমরা ভেবে পেতুম না। দেবলীনাই জ্ঞান দিল। ওটা একটা ককটেলের নাম। ভোদকার সঙ্গে টোম্যাটো রস পাঞ্চ করে নাকি ব্লাডি মেরি হয়। দারুণ খেতে।

রুবিনা বলল,—'ঘাবড়া মৎ ঋতু, তোর চিন-এর টোলটাই তোকে বাঁচাবে, মানে কাউকে ডোবাবে। ইটস ভেরি সেক্সি।'

আমি এখন আয়নার দিকে তাকিয়ে আমাকে দেখছি। মস্ত বড় আয়না। মাঝখানে একটা, দু-পাশে দুটো। তিনটে ছায়া পড়েছে আমার। ভুরু নেই, গোল গোল চোখ, দাঁত উঁচু, বেবি ফেস, বেঁটে, কালো, সোজা সোজা চুল; সুদ্ধ-মাত্র চিবুকের টোল সম্বল। একটা গরম তরল কিছু উঠে আসে ভেতর থেকে। আমি শৌনককে চাই। কবে থেকে চাই। প্রেপ থেকে পড়ছি ওর সঙ্গে। ও আমার খাতা নিয়েছে, আমি ওর খাতা নিয়েছি। এক সঙ্গে বাড়ি ফিরেছি, ওর বাড়ি আমার একটু আগে। একটা বড় বড় ছায়াঘেরা গলিতে ওকে বেঁকে যেতে হয়। ওর ওপর যেন আমার একটা জন্মগত অধিকার জন্মে গেছে। কিন্তু ও সেটা বুঝলে তো? ও আমাদের স্কুলের সেরা অ্যাথলিট। ক্রিকেট টিমের ক্যাপ্টেন। মিক্সড ডাবলসে ব্যাডমিন্টনে ওর পার্টনার দেবলীনা। শৌনকের চোখ কিন্তু সবসময়ে বৈশালীকে খোঁজে। এ সব আমি বুঝতে পারি। খেলাধুলোয় আমি নেই। একটুআধটু টেবিল টেনিস খেলার চেষ্টা করি। ছোট থেকে নাচ শিখছি, ফুট-ওয়ার্ক ভাল হওয়া উচিত, কিন্তু রুবিনা আমার চেয়ে অনেক দ্রুত, অনেক চৌখস। নাচ শিখছি বলে যে স্কুল কনসার্টে হিরোইনের রোল পাই, তা-ও না। সেখানে বৈশালী আমার চেয়ে অনেক খারাপ নেচেও হিরোইন। আমি সখীদের দলে। বৈশালীকে খুঁটিনাটি স্টেপিং শেখাতে আমার প্রাণ বেরিয়ে যায়। বাড়ি ফিরলে মা বলে—'কি রে শ্যামার রোলটা পেলি?'

—'না, মা। এই ফিগারে শ্যামা?'

—'সে কী? তবে? বজ্রসেন?'

—'কী যে বল মা, চার ফুট সাড়ে দশ ইঞ্চিতে বজ্রসেন হয়?'

মা যেন এই প্রথম আমাকে দেখে। ভাল করে তাকায়। চোখের দৃষ্টিতে একটা বিস্ময়। যেন মা বলতে চাইছে—সত্যি? এই ফিগারে হয় না বুঝি? ও তোর হাইট কম বুঝি? তাই তো... তাই তো...

মায়েরা স্নেহান্ধ। নিজের মেয়েকে প্রত্যেকেই হয়ত অপ্সরী ভাবে।

—'অত ভাল করে ভরতনাট্যমটা শিখলি! কোনও কাজেই...' দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে মিলিয়ে যায় শেষ কথাগুলো।

মাকে আমি বুঝতে পারি। আমি একমাত্র মেয়ে, একমাত্র সন্তান। আমার একটা ভাই হয়েছিল। হয়েই মারা যায়। মা বাবা কেউই সেই শোক কাটাতে পারেনি। কেমন বিষণ্ণ, সব সময়ে যেন ভাবিত, মনের মধ্যে কী একটা ভার বইছে। আমাকে নিয়ে মা-বাবার অনেক আশা। ছোট্ট থেকে মা বাড়ির সব কাজ সামলে আমাকে নিয়ে সাঁতার, নাচ, ছবি-আঁকার স্কুলে নিয়ে যাচ্ছে, আসছে। আমার একটু গা গরম হওয়ার জো নেই। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার, সঙ্গে সঙ্গে ওষুধ। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেও ভীষণ সাবধান। ব্যালান্সড্ ডায়েট, ব্যালান্সড্ ডায়েট করে দুজনেই পাগল। তা ছাড়াও আমাদের সব কিছু ছকে বাঁধা। মাসে একদিন মামার বাড়ি, দুমাসে একদিন জেঠুর বাড়ি,

বছরে একবার বড় বেড়ানো, একবার ছোট বেড়ানো।

মাধ্যমিক পর্যন্ত বাবা-মা মোটামুটি আমার লেখাপড়া দেখিয়ে দিয়েছে। মাধ্যমিক পর্যন্ত আমি বেশ ভালও করেছি। কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক থেকে আর কূল পাচ্ছি না। বাবা-মাও না। তিনজন টিউটর এখন আমার। নশো টাকা আমার টিউটরের পেছনে খরচ, নাচের স্কুলে দেড়শো, এখন স্পেশ্যাল কোচিং নিতে হয়। এ ছাড়াও আছে নাচের পোশাক, নাচের ট্রুপে এখানে-ওখানে যাওয়ার খরচ। আমার মা তো চাকরি করে না, বাবা একা। আমার একেক সময়ে খুব খারাপ লাগে। দেবলীনা বা বৈশালীদের মতো আমরা ধনী তো নই! ওরা আমার বন্ধু বলেই বাবা-মা কয়েক বছর ধরে ভি সি আর, ওয়াশিং মেশিন কিনল, এবছর জন্মদিনে আমাকে একটা নতুন মিউজিক-সিস্টেম কিনে দিয়েছে। সি ডি প্লেয়ার পর্যন্ত আছে। জন্মদিনে বন্ধুরা এসে ওটা দেখে হুশ হাশ করছিল।

দেবলীনা বলল,—'ইশ্‌শ্‌ মাসি, আমি যে কেন ওনলি চাইল্ড হলাম না। দাদাটা সব মাটি করল।'

আমার মা হাসতে গিয়ে কাঁদো কাঁদো মুখে বলল,— 'কত ভাগ্যে একটা দাদা পেয়েছ তা যদি জানতে। ঋতুটা বড্ডই একা।'

বৈশালী বলল,—'দাদা তবু স্ট্যান্ড করা যায়, কিন্তু দিদি?'

রুবিনা বলল,—'যা বলেছিস।'

শৌনক বৈশালীর দিকে চেয়ে বলল,—'যাক্ বাবা, দাদা স্ট্যান্ড করতে পারিস। তাহলে অন্তত তুই ফেমিনিস্ট নোস।'

জন্মদিনের উৎসবের শেষে কেমন মনমরা লাগল। মাকে বললাম,—'কেন যে এত দামী উপহার দাও।'

মা বলল,—'তোকে আরও কত দিতে আমাদের সাধ যায়!'

—আরও? মা, আর কত দেবে? আমি কী করে তোমাদের এতসব ফেরত দেব? মনে মনে বলি।

মা একটু দ্বিধা করে বলল,—'তুই যেন নিজেকে কারও থেকে ছোট, কারও থেকে কম না ভাবিস।'

কিন্তু মা ওয়াশিং মেশিন, ভি সি আর, মিউজিক সিস্টেম এই দিয়েই কি আমি ওদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারব? হতে পারব বৈশালীর মতো সুন্দরী, দেবলীনার মতো খেলোয়াড়, রুবিনার মতো চৌখস, বিদিশার মতো ব্রিলিয়ান্ট?

অনেক করে বাবা-মাকে বুঝিয়েছিলাম আমি সায়েন্স নেব না, অঙ্ক আমার বাঘ। খেটেখুটে মাধ্যমিকে পঁচাত্তর পার্সেন্ট পেয়েছি বটে কিন্তু ভয় আমার ঘোচেনি। কেমিস্ট্রি আমি মুখস্থ করতে পারি না, ফিজিক্স আমার মাথায় ঢোকে না, বায়োতে প্র্যাকটিক্যাল করতে আমার ঘেন্না করে। আমি বোঝালাম। বাবা বলল, 'তুই একটা স্টার পাওয়া মেয়ে। ফিজিক্স-কেমিস্ট্রিতে লেটার পেলি, জিওগ্রাফি আর ম্যাথসে সামান্য কয়েক নম্বরের জন্য লেটার মিস করেছিস। তুই সায়েন্স পারবি না? এটা কি একটা কথা হল?

মা বলল,—'তাহলে কি তোর ভাল লাগে না?'

—'ভালও লাগে না, কঠিনও লাগে মা, কেন বুঝতে চাইছ না?'

—'কিন্তু আমরা যে কবে থেকে ভেবে রেখেছি, তোকে এঞ্জিনিয়ার করব!'

বাবা বলল,—'জানিস তো, আমি হেলথ পরীক্ষায় পাশ করতে পারিনি বলে এঞ্জিনিয়ারিং পড়তে পারলাম না।'

মা স্বপ্ন-ভরা চোখে বলল,—'নিতু মাসিকে মনে আছে তো? আমার মামাতো বোন? মনে আছে?'

—'হ্যাঁ। এখন তো কানাডায় থাকে।'

—'শুধু থাকে? কত বড় এঞ্জিনিয়ার, আমার সমবয়সী বোন, সে মন্ট্রিঅলে বসে বড় বড় মেশিনের ডিজাইন করছে। আর আমি? আমি বোকার মতো সায়েন্স পড়লুম না, ফিলজফিতে দিগ্‌গজ হয়ে এখন দিনগত পাপক্ষয় করে যাচ্ছি।'

—'কিন্তু মা, সায়েন্স পড়লেই যে আমি জয়েন্ট পারব, পারলেও যে নিতু মাসির মত ব্রিলিয়ান্ট হব, তা কে বলল?'

—'কে বলতে পারে কে কী হবে?' মায়ের চোখ যেন শূন্যে স্বপ্নের পাহাড় দেখছে।

বাবা বলল,—'ঠিক আছে ঋতু; তোর যা ভাল লাগে পড়। আমরা কোন চাপ দেওয়ার ব্যাপারে নেই। তোর যা ইচ্ছে। তবে তুই যে মিথ্যে ভয় পাচ্ছিস এটা আমি তোকে বলতে পারি। ঠিক আছে ডিফিডেন্টলি কিছু করা ঠিক না। ইচ্ছের বিরুদ্ধে চাপাচাপি আমি পছন্দ করি না।'

বলল বটে, কিন্তু বাবার মুখে কোনও আলো নেই। মার মুখ করুণ।

তা সে যাই হোক, একবার যখন বাবা-মা'র মৌখিক অনুমতি আদায় করতে পেরেছি আমি আর্টসই পড়ব। পাখির মতো উড়ে যাচ্ছি। স্কুলে যাবার পথেই দেবলীনা, তারপর শৌনক। ওরা দুজনেই সায়েন্স। আমি আর্টস নিচ্ছি বলতে দুজনেই থেমে গেল। তারপর শৌনক বলল,—'ঋতু স্কুলে গিয়ে কাজ নেই। তুই ডাক্তারের কাছে যা, ওই যে ডাক্তার কাঞ্জিলাল।'

—'দূর ওঁর কাছে গিয়ে কী করব? উনি তো...'

—'পাগলের ডাক্তার, তা তুই কি ভেবেছিস তোর মাথাটা ঠিক আছে?'

দেবলীনা বলল,—'হিউম্যানিটিজ নিয়ে পড়ে তুই কী করবি? কেরিয়ার তো একটা তৈরি করতে হবে।'

এই সময়ে রুবিনা আর বিদিশা এসে আমাদের সঙ্গে মিশল। রীতেশ আর শৃঞ্জয়ও আসছে দেখলাম।

দেবলীনা বলল,—'শুনেছিস? ঋতু আর্টস নিয়ে পড়বে। হিস্ট্রি, লজিক, এডুকেশন, পল সায়েন্স...।'

বিদিশা বলল,—'কী ব্যাপার রে ঋতু? আমাদের এবার থেকে অ্যাভয়েড করতে চাইছিস, নাকি? 'আমার এ পথ/তোমার পথের থেকে অনেক দূরে?'

বিদিশাটার আসলে আমার ওপর একটু দুর্বলতা আছে। সব সময়ে আমি ওর সঙ্গে সঙ্গে থাকি। বা বলা যায় পেছন পেছনে থাকি। বিদিশা ফার্স্ট গার্ল, সৃঞ্জয় সেকেন্ড, আমি থার্ড আসি, কখনও কখনও ফোর্থও এসে যাই। মাধ্যমিকে সেকেন্ড এসেছি।

বিদিশাকে ছুঁতে পারিনি। আমাকে বিদিশা ওর সহচরী বলে মনে করে। ল্যাংবোট আর কি। আমি আশেপাশে থাকলে ওর প্রতিভাটা আরও খোলে। মাধ্যমিকে সেকেন্ড এসেও আমার মান বিশেষ বাড়েনি। বিদিশাই বলে,—'টেন্যাসিটি থাকলে কী না হয়? ঋতুকেই দ্যাখ না।'

—'ঋতুর মতো দিনরাত বইয়ে মুখ গুঁজে থাকা আমার দ্বারা হবে না বাবা—দেবলীনা ঘোষণা করল। বেশি না খেটেও দেবলীনা স্টার পেয়েছে।

ফর্ম নিলাম। লিখতে যাচ্ছি, শৌনক একলাফে এগিয়ে এসে আমার হাতদুটো পিছমোড়া করে ফেলল। বিদিশা লিখল কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, ম্যাথমেটিক্স। আমার দিকে তাকাল।—'ফোর্থ সাবজেক্ট কী নিবি বল্, এইটা তোর পছন্দমত দেব।'

আমি বললাম—'সাইকো'।

সই করতে হাত ব্যথা করছিল, এমন জোরে ধরেছিল শৌনক। সই করার আগে শৌনকের দিকে তাকালুম, বিদিশার দিকে তাকালুম, —'দায়িত্ব কিন্তু তোদের।'

—'ঠিক হ্যায় ভাই। কাঁধ চওড়া আছে।' শৌনক শ্রাগ করল।

মা-বাবা বলল,—'আমরা কিন্তু জোর করিনি ঋতু, নিজের ইচ্ছেয় সায়েন্স নিলি। ভাবিস না। টিউটর, বইপত্র, লাইব্রেরি যা লাগে সব বলবি হয়ে যাবে।'

সেই দৃশ্যটার কথা মনে করে আমার চোখ জ্বালা করছিল। আজ এইচ এস শেষ হল। আর সপ্তাহখানেকের মধ্যেই আমাদের চণ্ডীগড়, কুলু-মানালি বেড়াতে যাবার কথা। কিন্তু আমি কি উপভোগ করতে পারব কিছু? ম্যাথস আমার যাচ্ছেতাই হয়েছে। কেমিস্ট্রিতেও বোধহয় অনেক ভুল করেছি। এইচ এস যে এত টাফ হবে, আমি কেন আমার বন্ধুরাও বুঝতে পারেনি। কেউ খুশি না।

শৌনক বলল,—'আগে থেকেই তোদের গুডবাই জানিয়ে রাখছি।'

—'কেন, কোথায় যাচ্ছিস? স্টেট্স? টোয়েফল-এ বসলি নাকি?'

—'খেপেছিস?' শৌনক বলল,—'ড্রপ-আউট। স্কুল ড্রপ-আউট বলে একটা কথা আছে জানতাম। শৌনক বিশ্বাস কথাটা এবার রিয়্যালাইজ করতে চলেছে। বাবাকে বলেছি একটা ফোটোকপি মেশিন নিয়ে বসব। কোর্টের পাশে জায়গা দেখুক।'

বৈশালী বলল,—'ভ্যাট, তুই তো স্পোর্টস কোটাতেই যে কোনও জায়গায় পেয়ে যাবি। আমারই হবে মুশকিল।'

শৌনক শুকনো মুখ করে বলল,—'পাস কোর্সে বি-এসসি পড়ে কী হবে, বল্?

সুমিত বলল,—'আগে থেকে অত ভেঙে পড়ার কী আছে? আমিও তো ফিজিক্সে গাড্ডু খাব মনে হচ্ছে। তো কী? জয়েন্ট তো আছে এখনও। এ বারে না হয় পরের বছর।'

শৌনক বলল,—'জয়েন্টে তো স্পোর্টস কোটা নেই।'

বৈশালী আঙুল চিবোচ্ছিল। বলল,—'ঋতু তুই কি জয়েন্টে বসছিস?'

—'বসতে তো হবেই। না হলে বাবার মুখ থেকে আলো নিবে যাবে। মায়ের চোখদুটো...না না সে আমি সহ্য করতে পারব না।'

আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে সরে এলুম। শুনতে পেলুম বিদিশা বলছে,—'ঋতুটার পরীক্ষা আসলে খুব ভাল হয়েছে। বুঝলি?'

ঠিক সতেরো দিন বাদে জয়েন্ট। শেষ হলেই মনে হল মায়ের গর্ভ থেকেই যেন পরীক্ষা দিতে দিতে আসছি। কবে যে নিবে-আসা দিনের আলোয় পড়িনি, রাত জেগে লেখা প্র্যাক্টিস করিনি, কবে যে টেনশন ছাড়া, প্যানিক ছাড়া দিন কাটিয়েছি, মনে করতে পারছি না। এত দিনে কি শেষ হল? জয়েন্টে যদি এসে যাই, তো চার বছর এঞ্জিনিয়ারিং, সে মেকানিক্যাল থেকে আর্কিটেকটার পর্যন্ত যেটা পাই। তারপর ওঁ শান্তি। সার্টিফিকেটটা মা-বাবাকে ধরিয়ে দিয়ে বলব—কী? খুশি তো? খুশি? আর কিছু না। কিছু পারব না। থিসিস না, বিদেশ না, নিতু মাসি দীপু কাকারা নিজেদের মতো থাক, আমিও আমার মতো থাকব। একটা চাকরি তো পেয়ে যাবই। তারপর দুমদাম করে বড় হয়ে যাব। টিউটরদের মুখ আর দেখতে হবে না। নাচটাও ছেড়ে দেব। ধু-র ভাল্লাগে না। কী হবে আর?

আজ রেজাল্ট বেরোবে। জয়েন্টেরটা আগেই বেরিয়ে গেছে। বেড়ালের ভাগ্যে শিকে আর ছিঁড়ল কোথায়? বিদিশা, শৌনক দুজনেরই কিন্তু হয়ে গেছে। এত দিন ছিল শৌনক-বৈশালী জুটি। এবার বোধহয় শৌনক-বিদিশা! দুজনেই ওরা বেঙ্গল এঞ্জিনিয়ারিং-এ যাচ্ছে।

এল্ সিক্সটিন আসছে। এই বাসটা পয়া। চড়ে পড়েছি। স্কুল স্টপে নামতেই শৃঞ্জয় একদিক দিয়ে দেবলীনা আরেক দিক দিয়ে যেন ছিটকে বেরিয়ে গেল।

—'দেবলীনা! এই লীনা! কী রকম হল?'

দেবলীনা কাঁচুমাচু মুখ করে একটা বাসে উঠে পড়ল। লীনার কী ভাল হল না? সেকেন্ড ডিভিসন হয়ে গেল নাকি? শৃঞ্জয়ের দিকে তাকাই। কোথায় শৃঞ্জয়।

ভিড় ঠেলেঠুলে ঢুকতে থাকি। বেশিরভাগ ক্যান্ডিডেটই বাবা কি মা কি আর কাউকে সঙ্গে করে এনেছে। আমার মাও আসতে চেয়েছিল। কদিন মায়ের জ্বর হয়েছে। আমি বারণ করলাম। আজকে জাস্ট রেজাল্ট বেরোচ্ছে, আসল বাঘের খেলা মার্কশিটের দিনে। সে দিন মাকে আনব।

আমাদের নোটিস বোর্ডটা বড্ড উঁচুতে। তার ওপর কাঁচে আলো ঝলকাচ্ছে, কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না।

—'বলো, বলো তোমার রোলটা বলো, আমি দেখে দিচ্ছি।' বাবা-জাতীয় একজন বললেন।

—'এফ এইচ এ থ্রি টু সেভেন ওয়ান।'

—'এফ এইচ এ থ্রি টু কী বললে?'

—'সেভেন ওয়ান, ওয়ান, এই তো, সেভেন টু। নাঃ সেভেন ওয়ান তো নেই।'

—'সে কী? এফ এইচ এ থ্রি টু সেভেন ওয়ান! দেখুন না!'

—'আমি সরে যাচ্ছি, মাই গার্ল, তুমি নিজেই দেখো।'

আমার পায়ের তলাটা হঠাৎ সমুদ্রের বেলাভূমি হয়ে যাচ্ছে। বালি সরছে, বালি সরছে, আমার রোল নাম্বার নেই, নেই। সত্যিই নেই। এ কী? এরকম হয় নাকি? এ রকম ঘটে? আমার...আমি...আমার ক্ষেত্রে ঘটছে এটা? ঋতুপর্ণা মজুমদার... আমার... রোল নম্বর নেই?

আমার দুপাশ থেকে সমুদ্রের তীরে বালির মতো ভিড় সরে যাচ্ছে। আমি ডান হাত বাড়িয়ে পথ করে নিচ্ছি। কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু সামনে চলেছি ঠিক। চোখে জল? না, না, জল নয়। কেমন একটা ধোঁয়াশা, যা এই সাতসকালে থাকার কথা নয়, বুকের মধ্যেটা কেমন স্তব্ধ। আমার হৃৎপিণ্ডটাও শৃঞ্জয় আর দেবলীনার মতো ছিটকে সরে যাচ্ছে।

রাস্তা, রাস্তা...অনেক পরে খেয়াল হল আমি রাস্তা পার হচ্ছি। যন্ত্রের মতো জেব্রা ক্রসিঙে এসে দাঁড়িয়েছি। যন্ত্রের মতো পার হচ্ছি রাস্তা। আমি কোন্‌দিকে যাচ্ছি? বুঝতে পারছি না। আমাদের গলিটা যেন কেমন? দূর, শরীর যখন আমায় এতদূর টেনে এনেছে বাকিটাও টেনে নিয়ে যাবে। প্রতিবর্ত ক্রিয়া না কি একটা বলে যেন! আমি ভাবব না। ভাবছি না তো! চলছি। চলছি শুধু। আমার হাতে এটা কী? ও এটাকে বোধহয় পার্স বলে। এর ভেতরে কী থাকে? টাকা-পয়সা। টাকা-পয়সা মানে কী? কত টাকায় কত পয়সা হয়। কত পয়সায় কত টাকা হয়?

আরে! এই বাড়িটা তো আমি চিনি। উঁচু বাড়ি। দশতলা বোধ হয়। তুমি দশ গুনতে জানো ঋতু, যে দশতলা বললে? আচ্ছা গুনে দেখি তো। লিফ্‌টে যাব না। আমি গুনতে গুনতে উঠব। সেই কারা যেন কী গুনতে গুনতে গিয়েছিল? দোলা, ছ পণ, হ্যাঁ হ্যাঁ দোলায় আছে ছ পণ কড়ি গুনতে গুনতে যাই।

আস্তে আস্তে উঠছি আমি। এইটাই কি আমার বাড়ি? না তো! এটা বোধহয় আমার বাড়ি না। কিন্তু এটাতে আমি আসি। রোজ আসি না। শনি-মঙ্গলবারে আসি। শনি মঙ্গলবার...এসব কথার মানেই বা কী? এই তো পেতলের নেমপ্লেটঅলা দরজাটা। ওহ, এটা সেই অঙ্ক-ফিজিক্সের স্যারের বাড়ি। এখখুনি দরজাটা খুলে যাবে, স্যার চশমা মুছতে মুছতে জিজ্ঞেস করবেন।...

আমি পড়ি কি মরি করে ওপরের দিকে ছুটতে থাকি। এতক্ষণ পরে আমার দেহে গতি এসেছে। ছুটতে ছুটতে আমি চলে যাই ছাদের শেষপ্রান্তে। তারপর নিজেকে ছুঁড়ে দিই শূন্যের কোলে। হে শূন্য আমায় কোল দাও।

আর ঠিক সেই সময়ে যখন আর ফেরবার কোনও উপায়ই নেই, তখনই পৃথিবী তার সমস্ত ঐশ্বর্য উজাড় করে দেয় মেয়েটির কাছে। জীবন উজাড় করে দেয় তার সমস্ত নিহিত মানে।

রোদ দেখে সে জীবনে যেন এই প্রথমবার। বুঝতে পারে রোদে এই সেঁকা হওয়া, উলটে পালটে ঘরবাড়ি গাছপালা গরুছাগল মানুষটানুষ সমেত...এইটাই জরুরি ব্যাপার, পরীক্ষার ফলাফলটা নয়। গাছও দেখে সে। একটা গুলঞ্চ, তিনটে বটল পাম। তার জ্ঞাতি এরা, প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে এদের সঙ্গে তার, তাদের পারস্পরিক টান। একশো ফুটের কাছাকাছি উচ্চতা থেকে পড়তে পড়তে তার হৃৎপিণ্ডে ফুসফুসে মাধ্যাকর্ষণ ও হাওয়ার অমানুষিক চাপ তবু সে উলটো দিকের এগারো তলা বিল্ডিঙের সাততলার আলসেয় বসা একজোড়া ঘুঘুর গলার চিকন ময়ূরকণ্ঠি রংটা পর্যন্ত দেখতে পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বৈশালী বা শৌনক নয়, নিজেরই মুখের অনন্য সৌন্দর্য আর একবার দেখবার জন্য ব্যস্ত হয় পড়ে।

সমস্তটাই ভগ্নমুহূর্তের একটা ঝলক। একটা বোধ শুধু । এমনই অলোকসামান্য এই বোধ যে এর জন্য জীবন দেওয়াই যায়। কিন্তু মুশকিল এই যে জীবনটা চলে গেলে বোধটারও আর কোনও মানে থাকে না।

পাঞ্চজন্য

আজ আমি চিত্রার বাড়ি যাব। চিত্রলেখা, যাকে ছোট করে বলি চিত্রা। এবার কলেজ রি-ইউনিয়নে গিয়ে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে ওদের, আমার চার বন্ধুর ঠিকানা জোগাড় করে এনেছি। এক এক করে ওদের সঙ্গে আবার যোগাযোগ করব। কি করে যে এতদিন ওদের না দেখে, দিনান্তে একবারও ওদের সঙ্গে কথা না বলে কাটিয়েছি ভেবে অবাক লাগছে! স্কুল-কলেজে আমরা অবিচ্ছেদ্য ছিলাম, স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল বলতেন কুইনটুপলেটস। বাংলার প্রোফেসর সুনেত্রাদি আদর করে নাম দিয়েছিলেন পাঞ্চালী। এক বেঞ্চে পাশাপাশি বসতাম। এক কম্বিনেশন নিয়েছিলাম। এক সময়ে কমনরুমে পরস্পরের টিফিন ভাগ করে খেতাম। চিত্রলেখা, সীতা, ভদ্রা, লুপ আর আমি। রি-ইউনিয়নে গিয়ে ফাংশন দেখিনি বললেই হয়, খালি মুখ উঁচু করে খুঁজে খুঁজে বেড়িয়েছি কলেজ জীবনের সেইসব পরিচিত প্রিয়মুখ। কাউকে কাউকে অপ্রত্যাশিত ভাবে পেয়েও গেছি। কিন্তু ওদের পাইনি। কি করে যে আশা করেছিলাম তা অবশ্য জানি না। আমি নিজেই তো এলাম আজ তেরো চোদ্দ বছর পর। প্রথম কলেজ ছাড়বার পর যতটা টান, যতটা উৎসাহ থাকে, পরে তো ততটা থাকে না। অকূল জলধির মাঝ মধ্যিখানে কম্পাসের কাঁটা দেখতে দেখতে কোথায় হারিয়ে যায় বন্দরের স্বর, কবে কোন্ সবুজ ডাঙায় হাত ধরাধরি করে কী গান গেয়েছিলাম স্বপ্নে ছাড়া মনে পড়ে? তবে আমার একটা কৈফিয়ত আছে। বহুদিন ভারতের বাইরে আছি। ভীষণ একটা ডামাডোলের মধ্যেও ছিলাম। কীভাবে যে ওদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেল আজ এতদিন পর আর মনে করতে পারছি না। কিন্তু চিঠিপত্রও তো চালিয়ে যেতে পারতাম। কূর্মের মতো নিজের মধ্যে নিজে গুটিয়ে যেন কেটে গেল এতগুলো সৃষ্টিছাড়া বছর। আজ আমি যাবই। দুপুরবেলা। শীতের ঠাণ্ডা আমেজে ভরা আরামের দুপুর। এই সময়ে বাঙালি গৃহিণীরা অবধারিত ভাবে ঘুমোয়, কিংবা উল কাঁটা এমব্রয়ডারি নিয়ে বসে, কিংবা ঢাউস-ঢাউস উপন্যাস পড়ে সময় কাটায়। চিত্রা নিশ্চয় ব্যতিক্রম নয়, এর যে কোনও একটাই করছে। ওর বাড়ির বেল বাজাবো। কাজের লোকটোক দরজা খুলে দেবে। তারপর? তারপরের কথা ভেবে ভীষণ আনন্দের উত্তেজনায় আমার মুখ থেকে আগাম হাসি ঝরতে লাগল।

হালকা সবুজ শিফনের শাড়িটাই পরে নিলাম। প্রথম বর্ষার নবদূর্বাদলের রোমহর্ষ এখন আমার সর্বাঙ্গে। হালকা ব্র্যনলনের ময়ূরকণ্ঠী কার্ডিগানটাতে একটা হাত আলতো করে গলিয়ে রাখলাম। শ্রাবণে বৃষ্টির পর পশ্চিম আকাশে এমনি ময়ূরকণ্ঠী বিকেল

মাঝে মাঝে দেখা যায়। কতদিন পর রি-ইউনিয়নে যাচ্ছি না? নরম ফোমের স্যান্ডালে পা গলালাম। বড় সাদা ব্যাগটায় দরকারি চাবির থলো, ডায়েরি, কলম আর পার্সটা ভরে নিয়ে তুলসীকে বললাম 'দরজাটা বন্ধ করে দিস!'

প্রথম 'এস' বাসটাই একেবারে ফাঁকা। দুপুরবেলা, কেনই বা ভিড় হবে! জানলার ধারে বসে রাস্তা দেখতে দেখতে চলেছি। ছাত্র জীবনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। হাসতে হাসতে চলেছি পাঁচজনে ফুটপাথ জুড়ে। কলেজ-স্কোয়্যারের বেঞ্চিতে বসেছি পাশাপাশি, গ্রীষ্মের গা-জ্বালানো দুপুরে শরবতের দোকানে মালাই স্পেশ্যাল। ফুচকাওলার পাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আমরা পাঁচজন— 'হাত খুলকে-ধনিয়াপাতা দো না বাবা' 'দো চার ফুচকা ভি ভাঙকে ভাঙকে দো, মুচমুচে হোগা,' চীনে রেস্তোরাঁর কেবিনে পাঁচজনের ব্যাগের সমস্ত খুচরো পয়সা টেবিলে উপুড় করে ঢেলে মেনু দেখছি। বেয়ারা ঢুকে পড়েছে। পাঁচজনের পাঁচহাত জিভ-কাটা দেখে ভাবলেশহীন চীনে মুখে পর্যন্ত চোরা হাসির চীনে লণ্ঠন।

কলকাতার রাস্তাগুলো কি রোজই আরও আরও নোংরা হয়ে যাচ্ছে? ভিড় কি আরও বেশি! এই দুপুরেও ফুটপাথ ফাঁকা নেই? সব সময়েই যেন পুজোর বাজার। এই অ্যাতো মানুষ একটা মাত্র শহরের মধ্যে জীবনযাত্রার সর্ববিধ সমস্যার সমাধান খুঁজছে? আশ্চর্য। যেখানে সেখানে খানিকটা ন্যাতা ক্যাতা পেতে ছেলে কোলে ভিখারিণী কিংবা ঠুঁটো হাতে পায়ে ব্যান্ডেজ কুষ্ঠরোগী বসে গেছে, সামনে টিনের মগ। গঙ্গার ধার, কালিঘাটের রাস্তা ছেড়ে এরা এখন সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে। তুলোর আঁশের মতো হাওয়ায় উড়ছে দৈন্যের বীজ, রোগের বীজ, বংশবিস্তার করছে অলিতে গলিতে, সর্বত্র। এইসব দেখতে দেখতে ঝট করে পৌঁছে গেলাম। কতটুকুই বা দূর।

বাড়িটা খুঁজে পেতে একটু দেরি হল। আসলে খানিকটা ভেতর দিকে। আমি আবার একেবারে রাস্তাকানা। অলিগলি দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে দেখি, বা রে! এই তো! রাস্তার শেষ প্রান্তে দৈত্যের মতো হাই রাইজ। ঝকঝক করছে শীতের হলুদ রোদ বারান্দায় বারান্দায়। ছোট ছোট টবে ক্যাকটাস। জানলায় জানলায় সুদৃশ্য প্রিন্টেড পর্দা টানা। মানুষের মুখ দেখা গেল না। মুখ উঁচু করতে শুধু দেখতে পেলাম অ্যানটেনার পর অ্যানটেনা এক চিলতে আকাশের ওপর এলোপাথাড়ি কাটাকুটি খেলে রেখেছে। ভেতরে গিয়ে দাঁড়ালাম। লিফটের পাশেই নেম-প্লেট। এই তো। মিঃ অ্যান্ড মিসেস শুভেন্দুশেখর রায়, নাইনথ ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং থার্টি সিক্স। লিফটে চড়ে ফ্লোর নম্বর বলতে বোতাম টিপে দিল লিফটম্যান। আমার পেটের মধ্যেটা কুলকুল করছে, গলার কাছটা চিনচিন। চিত্রাটা আবার মুটিয়ে যায়নি তো? কলেজের সেরা সুন্দরী ছিল, নাচত দারুণ, কলেজ সোশ্যালের নৃত্যনাট্যে মেন রোলটা বরাবর ওরই বাঁধা ছিল। নাচ ছেড়ে দিলে, পরে বড় বীভৎস মোটা হয়ে যায়, যদি তাই দেখি খুব বকবো।

'আভি ডাহিনা'—লিফটটা ঝাঁকুনি দিয়ে থেকে গেল। স্লাইডিং ডোরটা সরিয়ে দিয়ে, নেমে ডাইনে ফিরতেই দেখি ছত্রিশ নং ফ্ল্যাট। দরজার হাতলে ব্রোঞ্জের বাঘ্‌টু মুখ, পাশে চীনেমাটির আধারে চমৎকার পাতাবাহার। বেল টিপতে মিষ্টি সেতার/ সেতার-সরোদ বেজে উঠল ভেতরে। আমিও একটা এইরকম লাগাবো। কোন্ মান্ধাতার আমলের বেল। বাজলেই মনে হয় চাঁদা চাইতে এসেছে। চ্যাঁ চ্যাঁ করে আমারটা। চিত্রা

যদি নিজেই খুলে দেয়?

দরজাটা সামান্য ফাঁক হল। ক্রিশ্চান নার্সের মতো দেখতে, ধবধবে শাড়ি ঘুরিয়ে পরা খুব পরিচ্ছন্ন একটি বয়স্ক মহিলা। 'চিত্রা আছে? চিত্রলেখা রায়?' আরেকটু ফাঁক হল দরজাটা। ওপরে চেন লাগানো। কলকাতায় ডাকাতি বেড়েছে। প্রতিষেধক নানা ব্যবস্থা নিচ্ছে দেখছি শহরবাসীরা।

মহিলাটি কিছু বলবার আগেই হঠাৎ এক ঝলক হাওয়ায় ও প্রান্তের একখানা ঘরের দরজার পর্দা সমস্তটা উড়ে পেলমেটের ওপর আটকে গেল। এক পলক দেখতে পেলাম ঘরের মধ্যে নিচু ডিভানে পেছন ফিরে বসে চিত্রা। মুটিয়ে যায়নি তো! খুবই তন্বী। চুল ছেঁটে ফেলেছে। কিন্তু এ কি সাজ। ছি! ছি! কলকাতার উচ্চবিত্ত মহলের অন্দর কি আজকাল ক্যালিফোনির্য়ার সী বীচ হয়ে গেছে? চিত্রার পাশে এক রোমশ মোটা ভদ্রলোক, হাতে গ্লাস, টেবিলে আরেকটা গ্লাস নামানো। চিত্রার কাঁধে ভদ্রলোকের ময়ালসাপের মতো প্রকাণ্ড একখানা হাত। আমার কান ঝাঁঝাঁ করতে লাগল, কী সময়েই এসে পড়েছি। চিত্রাটাই বা কী! ছি! ছি! এই দিনদুপুরে, একটা আব্রু নেই কিচ্ছু নেই।

এই সময়ে এদিকে কি হচ্ছে জানবার জন্যে মোটা গলায় হেঁকে উঠলেন ভদ্রলোক। চিত্রাও মুখ ফেরালো। দেখলাম মেয়েটা চিত্রা নয়। কিন্তু পুরুষটি? চিত্রলেখার বিয়েতে একে আমি ভালো করেই দেখেছি। হতে পারে বয়স বেড়েছে, ভুঁড়ি হয়েছে, চুল কমেছে কিন্তু এ যে সেই টোপর-মালা-চন্দন-পরা একদা দোহারা শুভেন্দুশেখর যার সঙ্গে চিত্রার মালাবদল হয়েছিল তাতে কোনও ভুল নেই। দাসীটি দরজা ভেজাতে ভেজাতে নিচু গলায় বলল 'মেমসাব মা কী পাস যানে সে ঘরমেই অ্যায়সা চলতা। বেশরম।' ঘরটার দিকে সঘৃণায় ইঙ্গিত করল সে। দরজা বন্ধ করে দিল। লিফট নিতে ভুলে গিয়েছিলাম। তিনটে তলা উর্দ্ধশ্বাসে পার করে হঠাৎ খেয়াল হল। এতক্ষণ কিচ্ছু ভাবিনি। কিচ্ছু না। মনটা একদম ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। পা দুটো এখনও ঠকঠক করে কাঁপছে। বাঁ দিকে সরে গিয়ে লিফটের জন্য বেল টিপলাম। উঠে এলো খাঁচাটা। মনে হল লোকটা কেমন অবাক চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছে। খুব অস্বাভাবিক কিছু দেখাচ্ছে কি? রাস্তায় নেমে বাইরের হাওয়া গায়ে লাগতে যেন সাড় এলো। এই শীতেও বিনবিন করে ঘেমেছি। ঠাণ্ডা ঘাম। ব্যাগ থেকে রুমাল বার করে মুখ ঘাড় গলা ভালো করে মুছে ফেললাম। মোড়ের পানের দোকানটা থেকে একটা মিঠে পান কিনলাম। কেমন গা বমি-বমি করছে।

চিত্রার একটা মেয়ে হয়েছিল না? তার তো এখন বারো-তেরো বছর বয়স হয়ে যাবার কথা। সেও মার সঙ্গে মামাবাড়ি গেছে? কোন্ স্কুলে পড়ে। যতদূর জানি চিত্রার বাপের বাড়ি উত্তরে হেমন্ত কুমারী স্ট্রীট-এ। এদিককারই কোনও স্কুলে পড়ে নিশ্চয়। অতদূর থেকে স্কুলে আসছে? না স্কুল কামাই করছে? না মেয়ে ফিরে আসার আগেই সব চিহ্ন এরা মুছে ফেলতে পারবে? না মুছে ফেলার প্রয়োজন বোধ করবে না। বুকের ভেতর বরফ। নির্জন রাস্তার একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে ডায়েরিটা বার করলাম। হাত থরথর করে কাঁপছে। আঠা-আঠা আঙুলে পাতা ওলটালাম। মনে হচ্ছে কম্প দিয়ে জ্বর আসবে। যাদবপুর সীতার ঠিকানা। চিত্রা। চিত্রা। আজকের দিনটা শুদ্ধু তোরই জন্য রেখেছিলাম।

দুই

গড়িয়াহাটের মোড় অবধি রিকশা। তারপর পাঁচ নম্বর পেয়ে গেলাম। গাদাগাদি ভিড়। দীর্ঘ রুট। কোনও সময়েই বোধহয় এ-বাস খালি থাকে না। লেডীজ সীটে জায়গা মিলল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝাঁকুনি খেতে লাগলাম। অবশেষে ব্রিজ পেরোতে একজন মোটামতো মহিলা অনেকটা জায়গা খালি করে দয়া করে নেমে গেলেন। বসতে পেয়ে যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। ট্রামে বাসে ওঠা অনেকদিন অভ্যাস নেই। উঠতে বাধ্য হলে মাথা ধরে যায়। দম বন্ধ হয়ে আসে। যাদবপুর ইউনিভার্সিটি ছাড়িয়ে গেল। কি একটা ফ্যাকটরি। সামনে কাঁচা রাস্তা। নতুন বাড়ি উঠছে এদিক-ওদিক। ডায়েরির নির্দেশ অনুযায়ী এইখানেই নামবার কথা।

দুটো তিনটে সমান্তরাল গলির এমোড়-ওমোড় ঘুরে একটা অর্ধসমাপ্ত একতলা বাড়ির সামনে এসে ঠিকানা মেলালাম। হ্যাঁ এটাই সীতার বাড়ি হওয়া উচিত। একেবারেই গৃহস্থপাড়া। দুটো তিনটে ছেলে রাস্তায় ক্রিকেট খেলছে। ঠিক দুপুরবেলায় এসে বিরক্ত করছি। আস্তে কড়া নাড়লাম। কেউ শুনতে পেল না। বাড়িতে কেউ নেই না কি? বেশ কিছুক্ষণ কড়া নাড়ার পর এক ভদ্রলোক ঘুম চোখে দরজা খুলে দিলেন। রোগা লম্বা, একটু যেন কোলকুঁজো। আধময়লা একটা ধুতি লুঙ্গির মতো করে পরা।

—'সীতা মুখার্জী বলে কেউ এখানে থাকে?'

—'হ্যাঁ। আপনি?'

—'আমি ওর বন্ধু। বলবেন কৃষ্ণাক্ষী চ্যাটার্জি।'

—'বলবার কিছু দরকার নেই। আপনি আসুন।'

কাঁচা উঠোনে পা দিলাম। সড়সড় করে একটা তেঁতুলে বিছে চলে গেল। উঠোনের এক ধার থেকে অন্যধার পর্যন্ত দু ফেরতা নারকোল দড়ি টাঙানো। অজস্র কাঁথা, ন্যাকড়া আর বাচ্চাদের ছোট ছোট জামাকাপড় শুকোচ্ছে। বাতাসে বার সাবানের গন্ধ। ওদিককার একটা ঘর থেকে কর্কশ মহিলা কণ্ঠ ভেসে এলো—'কে র‍্যা?' ভদ্রলোক দাওয়ার ওপর একটা ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন—'ওই ঘরে আছে, চলে যান।' তারপর অন্যদিকের জিজ্ঞাসু মহিলাকণ্ঠওলা ঘরটার দিকে কি যেন বিড়বিড় করে বলতে বলতে চলে গেলেন।

ইটের দাওয়ার ওপর চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। ভদ্রলোক কি সীতার বর? উনি অসময়ে অতিথি আসায় বিরক্ত হলেন? ছেঁড়া বিছানার চাদরের একফালি একটা পর্দা এখন আমার আর সীতার মাঝখানে। দুহাতে পর্দা সরিয়ে দিলাম। দুধ আর পেচ্ছাপ মেশানো বোঁটকা একটা শিশুগন্ধ সপাটে এসে নাকে চড় মারল। দেখলাম তক্তাপোষের চিট ময়লা বিছানার ওপর আমাদের সীতা, যাকে এককালে স্বর্ণসীতা বলে ডাকতাম, এখন আর স্বর্ণ নেই, বসে বসে একটি শিশুকে স্তন্য দিচ্ছে। আমায় দেখে প্রথমে ব্যতিব্যস্ত হয়ে শিশুটিকে নামিয়ে হকচকিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল। তারপর নিষ্পলকে আমার মুখে দিকে চেয়ে বিস্মিততম কণ্ঠে বলে উঠল—'কৃষ্ণা তুই?'

আমি প্রথমটা কথা বলতে পারিনি। আমার সামনে সীতার প্রেত। মাথার সামনে চুল নেই, দগদগে ক্ষতের মতো সিঁদুর সেখানে। নাকের দুপাশে দুটো গভীর ফাটল। শুকনো বেগুনের মতো শিশুর লালমাখানো আধখানা স্তন। হাতে ঢলঢল ঢাউস ঢাউস

শাঁখা, রুলি, লোহা। শিশুটি তখন তারস্বরে চিৎকার শুরু করেছে। শুকনো গলায় শুধু বলতে পারলাম—'হ্যাঁ আমিই। তুই যা করছিলি করে নে, তারপর কথা হবে।'

সীতা বাচ্চাটার পেছনে একটা থাপ্পড় মারল। তারপর দুপায়ে টান মেরে তাকে একদিকে সরিয়ে ঘরের অপরপ্রান্তে তাক থেকে গুঁড়ো দুধ নামিয়ে গুলতে লাগল। বোতলে ভরা হয়ে গেলে ক্রন্দনরত শিশুটিকে আবার কোলের ওপর টেনে নিয়ে মুখে বোতলটা গুঁজে দিল। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল— 'নিজেও যাবে, আমাকেও খাবে, খা খা তাই খা বাঁচি আমি।'

এতক্ষণ খেয়াল করিনি শিশুটি অস্বাভাবিক ছোট, বড্ড রোগা, হাড়সার, এবং তক্তাপোষের ওপর প্রান্তে ঠিক অমনি আরেকটি শিশু শুয়ে শুয়ে বোতল ধরে নিবিষ্ট মনে চুষে খাচ্ছে। বললাম 'কি ব্যাপার রে? যমজ নাকি?'

—'হ্যাঁ, দ্বিতীয়বার।'

—'মানে?'

—'আগেও এক জোড়া হয়েছিল, বাঁচেনি। আড়াই তিন বছর বাদে আবার এই। এবারেও বাঁচবে বলে মনে হয় না। আর না বাঁচলেই ভালো।'

বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। শিরায় টান ধরেছে। একহাতে বিছানার চাদর মুঠো করে ধরে বললাম—ছিঃ! এসব কি বলছিস? বলতে আছে?'

—'ঠিকই বলছি কৃষ্ণা। সাতটা হয়েছে সব সুদ্ধ। প্রথম দুটি দু তিন বছরের মধ্যে গেছে। তৃতীয়টি এখন আট বছরের। স্কুলে যায়। তারপর যমজ, কয়েক মাসের মধ্যেই গেছে। আবার এই। এগুলো যাবেই। বাঁচাবার শক্তি নেই। চাই ওই আট বছরের ছেলেটা, আমার টুকু ও বাঁচুক। দু চোখ চেয়ে পৃথিবীটা দেখেছে, মা বাপের স্নেহ চিনেছে, এদের জন্যে ও যদি না বাঁচে, কি করব বলতে পারিস?'

বললাম— 'এদের জন্য ও বাঁচবে না এসব কি যা তা বলছিস? বালাই ষাট।'

—'বলব না তো কি? ঘরদোরের অবস্থা দেখে বুঝতে পারছিস না? রাজনীতির দৌরাত্ম্যে ফ্যাক্টরি ক্লোজড আজ দেড় বছর। অন্য কোথাও জুটছেও না। এদিকে ইউনিয়নের লীডার তো। কি করে চলছে তা এক আমিই জানি। এই দুধটুকু ফুরোলে আর বোধহয় দিতে পারব না, তারপর যদ্দিন বাঁচে' বলতে বলতে সীতার চোখ দিয়ে ধারা নামল।

আমি বললাম, একটু কঠোর গলাতেই বললাম—'এটা বিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশক। তুই করেছিস কি? সাত সাতটা সন্তান তোর হয় কি করে? এত দায়িত্বজ্ঞানহীন তুই একটা গ্র্যাজুয়েট মেয়ে হয়ে হলি কি করে?'

সীতা বলল—'দায়িত্বজ্ঞান শুধু একারই দরকার হয়, না রে কৃষ্ণা?'

অস্থির পায়ে উঠে দাঁড়ালাম। সীতার ঘর টলমল করে টলছে। পায়ের তলার মাটি বুঝি এখুনি ফাঁক হয়ে যাবে। বললাম—'আমি একটু আসছি। তুই বাচ্চাদের খাইয়ে নিয়ে প্লীজ জামাকাপড় বদলে নে। তোকে নিয়ে একটু বেরোব।'

—'সে কি রে?'

—'তোর শাশুড়ি রয়েছেন। অনুমতির দরকার হবে, না? সে আমি ম্যানেজ করে নিচ্ছি ঠিক। তোর টুকু ছেলে কোথায়?'

—'আপাতত মামার বাড়ি থেকে পড়ছে। মামারা আর কদ্দিন রাখবে জানি না।'

—'ঠিক আছে। তুই রেডি হয়ে নে।' বলতে বলতে আমি বেরিয়ে গেলাম।

বেশ খানিকটা গিয়ে একটা ফার্মাসি মিলল। দুটো দুধের টিন, দুটো টনিক কিনলাম। সীতার শরীরে রক্ত নেই। ও কি বাঁচবে? কিছু আপেল, কলা চোখে পড়ল। সন্দেশ, রসগোল্লা। একটা প্লাস্টিকের ঝুড়িতে সব নিয়ে সীতাদের দরজায় যখন পৌঁছলাম প্রায় কুড়ি মিনিট কেটে গেছে। সীতা খোলা দরজার সামনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে। 'ব্যাগটা ওর হাতে দিয়ে বললাম—'এটা ঘরে রেখে দিয়ে আয়। তারপর চল্ শাশুড়ির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিবি।' শাশুড়ির ঘরে পর্দা ছিল না। সীতা বাইরে থেকে ডাক দিল— 'মা, আমার বন্ধু কৃষ্ণা এসেছে, আপনার সঙ্গে দেখা করবে।'

—'এসো মা, ভেতরে এসো...।'

শীর্ণ, কোটরগত চক্ষু বৃদ্ধার হাতে সন্দেশের বাক্স তুলে দিয়ে প্রণাম করে বললাম —'মাসিমা, জানেন তো সীতা আমার প্রাণের বন্ধু। বোধহয় একযুগ পরে দেখা হল। কিছুক্ষণের জন্য ওকে আজ আমি নিয়ে যাই, হ্যাঁ? বাচ্চারা তো শুধু দুধ খায়, আপনারা দুজনে মিলে একটু সামলে রাখতে পারবেন না?'

বৃদ্ধা আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললেন—'নিশ্চয় বাছা, যাবে বইকি, যমজ দুটোর একটা বড় ঘ্যানঘ্যানে। বাপ দেখবে এখন, অন্যটা আমার কাছে দিব্যি থাকে। কিচ্ছু অসুবিধে নেই। তা ফিরবে কখন?' সে কথার সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে বললাম — 'আমি ওকে গাড়ি করে পাঠিয়ে দেবো। রাতের খাওয়া সেরে আসবে। আপনার কোনও চিন্তা নেই।'

সীতা শাড়ি-ব্লাউজ বদলে নিয়েছে! মুখে একটু পাউডার, কপালে একটা বড় সিঁদুরের টিপ। মাথায় আলগা খোঁপা। কণ্ঠার হাড় বেরোনো, চোখ গর্তে-ঢোকা, শাঁখের মতো সাদা, বুড়িয়ে যাওয়া এই মহিলাটির দিকে তাকিয়ে আমার চেনা শান্ত, শ্রীময়ী বান্ধবীটি যাকে সোনার বরণের জন্য স্বর্ণসীতা বলে ডাকতাম, তাকে দেখতে পেলাম না।

রাস্তার মোড় থেকে একটা ট্যাক্সি নিতে হল। প্রথমে ভেবেছিলুম পৌষ-দুপুরের এই কমলালেবুর রসের মতো রোদ সীতার রক্তহীন শরীরে একটু লাগা দরকার। খানিকটা হাঁটবো। কিন্তু দেখলাম দুপা হেঁটেই ও হাঁপাচ্ছে। পার্ক স্ট্রীট। বার-রেস্তোরাঁর আধা-অন্ধকার ঘরে বসে সীতা করুণ কণ্ঠে বলল—'কৃষ্ণা তুই আমায় দয়া করছিস?'

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম—'তোর লজ্জা হওয়া উচিত সীতা।'

খাওয়ার শেষে ওকে সামান্য একটু চেরি-ব্র্যান্ডি খাওয়ালাম। খেতে চাইছিল না। শেষে বললাম—'সীতা, এবার তুই আমায় দয়া কর। তোর ওই সাদা মুখের দিকে আমি আর তাকাতে পারছি না।' আস্তে আস্তে সীতার গালে উৎসাহের ছোঁয়া লাগল। হাতে পয়সা জমলেই আগে চলে আসতাম এখানে। কারও সঙ্গে এখন যোগাযোগ নেই। আমার সঙ্গে তো নয়ই। সীতার সঙ্গেও না। বসে-বসেই ঠিক করলাম লোপার ডেরায় হানা দেবো। এখনও যথেষ্ট বেলা আছে। তিনজনে মিলে প্রাণ ভরে আড্ডা দেওয়া যেতে পারে।

তিন

সুরেন ব্যানার্জি রোডের একটা ওয়ার্কিং গার্লস হোস্টেলে লোপার বর্তমান ঠিকানা। আগেও ওর হোস্টেলে গিয়ে আমরা জমাট আড্ডা মেরেছি। শুধু ঠিকানাটাই বদলেছে। তবে লোপা কলেজের প্রোফেসর, পাওয়া না-ও যেতে পারে। আজ অবশ্য একটা ছাত্র-ধর্মঘট আছে, কাগজে দেখেছি। চান্স নেওয়া যাক। পুরনো আমলের দোতলা বাড়িটা। চৌকো ঘেরা দালান। চারপাশে ঘর। হোস্টেল করার উদ্দেশ্যে তৈরি হয়নি বোঝাই যাচ্ছে। কোনও বড় যৌথ পরিবারের বাস ছিল এককালে। এখনও তাই, তবে অন্যরকম। একরকম যূথ ভেঙে আরেক রকম। বেশির ভাগ ঘরেই দেখি তালা ঝুলছে। অর্থাৎ অধিকাংশ বোর্ডারই অফিসে-টফিসে চাকরি করেন। ল্যান্ডলেডি নিচে নিজের ঘরে দিবানিদ্রা দিচ্ছিলেন, দাসী ডেকে তুলতে ভালো করে আমাদের পরিচয় নিয়ে তবে ছাড়লেন। বললেন—'দোতলার সব শেষ ঘর। চলে যান, মিস দত্ত ঘরেই আছেন। লোপা আমাদের চিনতে পারবে তো? যা চেহারা হয়েছে সীতার! আমিও আজ কত বছর দেশছাড়া। তা ছাড়া, লোপা, লুপ আমাদের ছাড়িয়ে কত উঁচুতে চলে গেছে। আমাদের মতো মামুলি কী! ওকে নিয়ে আমাদের কী গর্বই ছিল। সব পরীক্ষায় বরাবর প্রথম। ডি.লিট করেছে। বহুদিন। উচ্চ-প্রশংসিত। ভিজিটিং প্রোফেসর কি ডেলিগেট হয়ে দেশ-বিদেশের কনফারেন্সে প্রায় যায়। কাগজে খবর দেখি।

দোতলায় ওর ঘরের দরজা ভেজানো। সারপ্রাইজ দেবার জন্য পা টিপে টিপে ঢুকলাম। কিন্তু ওকে দেখলাম না। একধারে টেবিলে শুধু স্তূপীকৃত বই আর জার্নাল। পেপার-ওয়েটের তলায় কিছু লেখা কাগজ। হাওয়ায় উড়ে শব্দ হচ্ছে শিরশির। সামনে হাতলহীন দুটো চেয়ার। একটার ওপর ভাঁজ-ভাঙা একটা সিল্কের শাড়ি। ছোট চৌকির ওপর পরপর দুটো স্যুটকেশ। ওপরেরটার ডালা ফাঁক হয়ে আছে। লোপাটা এখনও তেমনি আগোছালো রয়েছে দেখছি। চেয়ার দুটোয় বসলাম দুজনে। আমরা ওকে সারপ্রাইজ দেবো কি, লোপাই দেখি আমাদের সারপ্রাইজ দিচ্ছে ! আমি কাগজপত্রগুলো ঘাঁটছিলাম, সীতাই হঠাৎ ওকে আবিষ্কার করল। এমন চিৎকার করেছে যে চমকে আমার হাত থেকে কাচের পেপার ওয়েটটা পড়ে খানখান হয়ে গেল। অদূরে এখানে খাটের কাছে গিয়ে দেখি খাটের ও প্রান্তে মেঝের ওপর অদ্ভুত ভঙ্গিতে শুয়ে ঘুমোচ্ছে লোপা। আওয়াজে ঘুম ভেঙেছে, কিন্তু ঘোর কাটেনি। চেয়ে দেখি ওর চুলে বেশ পাক ধরেছে। কালোতে একটা তীক্ষ্ণ শ্রী ছিল আগে ; এখন শুধুই কালো। চোখের তলায় গভীর কালি। মুখটা সামান্য হাঁ। অ্যালকোহলের গন্ধ।—'কে, কে ওখানে?'— বেশ কিছুক্ষণ ঘোলাটে চোখে চেয়ে থেকে থেকে বলল লোপা। কাছে গিয়ে বললাম— 'আমি কৃষ্ণা রে। চিনতে পারছিস না? এটা সীতা।' যেন পাতলা একটা অর্ধস্বচ্ছ পর্দার ওপার থেকে আমাদের দিকে চেয়ে লোপা বলল— 'তোরা কোত্থেকে?' তারপর চশমাটা তুলে নিয়ে একটা কলিং বেল বাজাল। একটা বাচ্চা চাকর এসে দাঁড়াতে বলল—'দু কাপ ভালো করে কফি নিয়ে আয় তো। আর এক কাপ কালো কফি আনিস, জলদি।' ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গিয়ে বাথরুম থেকে চোখে-মুখে জল দিয়ে এলো লোপা। কালো কফিটা চুমুকে চুমুকে শেষ করে ফেলল। তারপর সীতার শুকনো গালে একটা চুমু

খেয়ে আমায় জড়িয়ে ধরল। বলল—'প্রকাশ করতে পারছি না এত আনন্দ হচ্ছে। জানিসই তো, উচ্ছ্বাস আমার বড় একটা আসে না!'

বললাম—'উচ্ছ্বাস তো মন্দ প্রকাশ করলি না। কেমন আছিস বল্। কী খবর?—'খুব ভালো। খু-উ-ব।' বলে লোপা আচমকা হাসতে আরম্ভ করল। হাসি আর থামে না। সীতার ফ্যাকাশে মুখ আরও ফ্যাকাশে। শেষে ওকে ঝাঁকানি দিয়ে বললাম —'করছিস কি? তোর ল্যান্ডলেডি যেরকম কড়া মেজাজের লোক, এবার তেড়ে এসে আমাদের তিনজনকেই তাড়িয়ে দেবে।' লোপা হাসি থামাল, মুখ বিকৃত করে বলল—'হ্যাঁ, ওইটুকুই বাকি আছে। যে কোনদিন এই ঘাটের মড়াকে টেনে এবার কেউ গাছতলায় ফেলে দেবে। সৎকার হবার আশাও নেই। না, না। কীসব সৎকার সমিতি আছে না, বেওয়ারিশ লাশ দাহ করে সোশ্যাল ওয়ার্ক করে।'

বললাম—'বলছিস কি লোপা? এতকাল পরে দেখা হল, আর তুই আমাদের এইসব অকথা-কুকথা শোনাচ্ছিস?'

—'শোনাব না?' সীতার দিকে চেয়ে ও বলল—'সিঁথিতে ডগডগে সিঁদুর, কপালে সিঁদুর টিপ', আমার দিকে ফিরে বলল—'বিবাহবার্ষিকীতে বরের দেওয়া শিফন শাড়ি পরে হাসি-হাসি ঢলো-ঢলো, সুখী-সুখী-ছলোছলো মুখে আমার মতো ঘাটের মড়া বাপে-তাড়ানো মায়ে-খেদানোর কাছে এসে কেমন আছি কী খবর জিজ্ঞেস করতে লজ্জা হয় না তোদের।'

সীতা কেঁদে ফেলল। আমি বললাম— 'তুই জানিস না কী বলছিস লুপ। সীতার স্বামীর আজ দেড় বচ্ছর কাজ নেই, বেকার। সাতটি সন্তানের চারটি মারা গেছে। এখনও কোলে যমজ। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারছিস না ও কোন্ খাদের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে!' এতক্ষণ সীতার দিকে ভালো করে চাইল লোপা। তারপর ওর হাত দুটো নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে তুলে নিয়ে শক্ত করে ধরে বসে রইল। চোখ ছলছল করছে।

লোপার ঘরে সন্ধ্যার ছায়া-মাখা গোধূলির আলো এসে পড়েছে। শুনলাম। শুনলাম লোপার জীবনও ওইরকম কালিমাখা, শুধু গোধূলির লালচে আলোটুকু তাতে নেই। দীর্ঘদিন ধরে একজন কীভাবে ওকে ঘুরিয়েছে, নিজের থিসিস আদ্যন্ত করিয়ে নিয়েছে, তারপর ফাঁকি দিয়েছে, শুনলাম। লোকটা আসলে বিবাহিত, ছেলেমেয়ের বাপ। শুকনো আঁধার চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল লোপা। বললাম—'লক্ষ্মীটি আজ আমার বাড়ি চল। তিনজনে মিলে একটা রি-ইউনিয়ন প্ল্যান করা যাবে। আর কখনও আমরা আলাদা হব না।' লোপা বাক্যব্যয় না করে তৈরি হয়ে নিল। সঙ্গে সঙ্গে শাড়ি পালটে, কাঁচাপাকা চুলে একটা লম্বা বেণী ঝুলিয়ে তৈরি। সীতা বলল— 'কপালে একটা টিপ দে।' লোপা বলল— 'হাসাসনি।' যাবার সময়ে ল্যান্ডলেডিকে ডেকে বলল— 'বিভাদি, আজ আর আমি ফিরছি না। কি রে কৃষ্ণা, থাকতে দিবি তো? না তোর বর আবার রাগ করবে।'

আমি বললাম— 'রাগ করবে না, বর এখানে নেই।'

ট্যাকসিতে যেতে যেতে চিত্রার কথা ওদের দুজনকে বললাম। দুজনে স্তব্ধ হয়ে রইল। লোপা একেবারে চুপ। সীতা বলল, 'কী বীভৎস!'

চার

বাড়িতে যখন পৌঁছলাম তখন শীতের সন্ধে। ধোঁয়াশার পাতলা আস্তরণ পড়তে শুরু করেছে। ঠাণ্ডা বেশ। অদৃশ্য বরফের কুচির মতো আকাশ থেকে হিম ঝরছে। তুলসী দরজা খুলে দিয়ে বলল— 'ওপরে কারা তোর সঙ্গে দেখা করতে এয়েচেন যে রে! অনেকক্ষণ বসে রয়েচেন।'

কে আবার এখন এলো? আমাদের তিন বন্ধুর জমাট পার্টি বুঝি মাটি করে দেয়। সীতা আড়ষ্ট, লোপা বলল- 'দূর আমি চলি।' বললাম— 'দ্যাখই না, আমি ঠিক ম্যানেজ করে নিচ্ছি এখন।'

বকুলবাগানের এই বাড়ি আমার নিজস্ব। দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে একার পক্ষে বিশাল। বাবা-মা গত হবার পর আমি তাঁদের একমাত্র সন্তান এ বাড়ির উত্তরাধিকার পেয়েছি। তুলসী আমাদের দেশের পুরনো লোক। আমাকে প্রাণেরও অধিক ভালবাসে। বড্ড বুড়ো হয়ে গেছে, চোখে দেখে না, কানে শোনে না, তবু আমাকে ছাড়ে না। আমিও ওকে ছাড়া ভাবতে পারি না। যা কিছু আমার নিজস্ব সে-সব এতদিন আমার জন্যে বুক দিয়ে আগলে রেখেছে। আমার বাড়ির সামনে এক চিলতে জমিতে দুটি ইউক্যালিপটাস। একটা চাঁপা। মা-বাবার নিজ হাতে তৈরি। চাঁপার এখন ফুলের সময় নয়। কিন্তু ইউক্যালিপটাস পাতার তীব্র গন্ধ দোতলায় উঠতে উঠতে আমার নাকে এলো। কেউ কি পাতা দু হাতে চটকেছে? ঘরময়, বারান্দাময় ইউক্যালিপটাসের সরু সরু পাতা ছড়িয়ে চারিয়ে গেছে। ঘরে ঢুকতেই সোফা ছেড়ে একরকম দৌড়ে যে আমাদের দিকে এগিয়ে এলো সে চিত্রা। অপরজন ভদ্রা। দেখলাম চিত্রাটা দারুণ সেজেছে। লাল শাড়ি, লাল চোলি, জমকালো শাল। সাঙঘাতিক সুন্দরী হয়েছে চিত্রা। প্রচণ্ড জৌলুষ ওর চেহারায়।

· আমি বললাম—'তুই? তোরই বাড়ি গিয়েছিলাম যে আজ!' চিত্রা আশ্চর্য তারপর আতঙ্কিত হয়ে বলল—'আমার বাড়ি!' তারপর ও যখন আমার দিকে সীতার দিকে, লোপার দিকে চাইল, আমরা বুঝলাম ও বুঝেছে আমি জানি, সীতা জানে, লোপা জানে। ভদ্রা একটা বিবর্ণ ছবির মতো বসেই ছিল। ভাঙা গাল, সাদা মুখ, কোথাও কোনও পারিপাট্য নেই। কাছে গিয়ে হাত ধরে বড় ভয়ে ভয়ে বললাম—'আজ এতদিন পর আমার বাড়ি এলি, এমন বিবাগীর বেশে কেন রে ভদ্রা? কী হয়েছে তোর? ভাল আছিস তো?' চিত্রা বলল, 'ও আসতে চাইছিল না। আমি জোর করে ধরে এনেছি। আজ তিনমাস হল ওর একমাত্র ছেলে মারা গেছে যে!' তিনজনে সমস্বরে বলে উঠলাম— 'সে কি?' চিত্রাই জবাব দিল... 'খেয়ে-দেয়ে সুস্থ ছেলেটা স্কুলে গেল, ফেরবার পথে দুর্বৃত্তরা ওকে ধরে নিয়ে যায়। চোদ্দলাখ টাকা চেয়েছিল। আমার আর ওর গয়না বেচে, বাড়ি বন্ধক দিয়ে, ধার করে ঠিকসময়ে টাকাটা পৌঁছে দিয়েছিল ওরা, ছেলেকে ফিরে পায়নি। ওরা সাতজনে হাত-পা বেঁধে গলায় পা দিয়ে ছেলেটাকে...' আমরা চারজনে শব্দ করে কেঁদে উঠলাম। শুধু ভদ্রা মাটির দিকে চেয়ে চুপ। তাড়াতাড়ি পর্দা টেনে দিলাম। জানলা ভেজিয়ে দিলাম। আমাদের বুকফাটা হাহাকার যেন কেউ না শোনে। মেঝেতে আগুন রঙের কার্পেট। পাঁচজনে সেখানে গোল হয়ে বসলাম। পরস্পরের গায়ে গা লাগিয়ে। ঘন হয়ে। দরজায় কি শত্রু সৈন্য? আমরা কি জহর-ব্রত করব?

চিত্রাকে জিজ্ঞেস করলাম— 'তোর মেয়ে কোথায়?'

—'হোস্টেলে দিয়েছি।'

ভদ্রাকে জিজ্ঞেস করলাম—'তোর স্বামী?'

—'দেওঘরে গুরুর আশ্রম আছে, আপাতত সেখানে।'

—'তুই?'

—'গুরু এখন আর ওর কি করবেন বলতে পারিস?' চিত্রা বলল।

পাঁচ

পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম গড়গড় করে উঠে যাচ্ছে সেই যাদু-দেয়াল এতদিন যা আমাদের আলাদা করে রেখেছিল। একই অন্ধকূপে বন্দী পাঁচজন। একই শৃঙ্খলে। সহসা চিত্রা আর্ত গলায় বলে উঠল—'কৃষ্ণা ভাই, অন্তত তুই যে সুখী হয়েছিস এটুকুই আমাদের সান্ত্বনা। বিশ্বাস কর, আমরা তোকে হিংসে করছি না। সুখের গরবে গরবিনী হয়ে যদি আমাদের ভুলে যেতিস, তাচ্ছিল্য করতিস, তাহলে হয়ত করতাম। কিন্তু তুই তো তা করিসনি। তুই আমাদের সেই কৃষ্ণাই আছিস। বিশ্বাস কর আমরা সবাই তোর সুখে সুখী।' আমি দুহাতে মুখ ঢাকলাম, আঙুলের ফাঁক দিয়ে আগুন ঝরছে। রুদ্ধকণ্ঠে বললাম— 'আমার স্বামী নপুংসক। তার চোরাকারবারের কাজে আমায় টোপের মতো ব্যবহার করত। আমি পতিপুত্রহীনা।'

পরিত্যক্ত কবরখানার মতো শীতল, নিথর, নিস্পন্দ ঘর। চরাচর আমাদের নিয়ে পাতালপ্রবেশ করছে। আকাশ অদৃশ্য। মাথার ওপর শুধু স্তরের পর স্তর কঠিন, দুর্ভেদ্য, অনমনীয় শিলাসন। সন্ধ্যা ঘন হয়ে উঠেছে। রজনী নিষ্প্রদীপ। হাওয়ার দাপটে সহসা জানলা খুলে গেল। জানলা দিয়ে একসঙ্গে উত্তুরে হাওয়া এবং অলৌকিক জ্যোৎস্নার স্রোত।

আলমারি থেকে একটা কাঠের চৌকো বাক্স এনে পাঁচজনের সামনে নামিয়ে রেখেছি। অন্ধকারে ভালো করে কেউ কারও অবয়ব দেখতে পাচ্ছি না। জ্যোৎস্নার ছায়াবাজিতে জোড়া জোড়া চোখে শুধু উদ্‌ভ্রান্ত চাউনি, গাল চকচক করছে, আঁচল উড়ছে, চুল উড়ছে। দেখছি অতিকায় এক বীভৎস দানব আমাদের সর্বস্ব হরণ করতে মহাবেগে ছুটে আসছে। চুলের মুঠি ধরে এখুনি হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাবে। সর্বাঙ্গ ছিঁড়ে রক্ত ঝরবে। বীভৎস, নিষ্ঠুর, আগ্রাসী যন্ত্রণা অট্টহাস্য করতে করতে মেদিনী কাঁপিয়ে ধেয়ে আসছে। এক্ষুনি ধর্ষণ করবে। পাঁচজনে হাত জোড় করে চিৎকার করে উঠলাম —'কে আছো হে, কে কোথায় আছো, বাঁচাও!' আর্তনাদ হলঘরের দেয়ালে দেয়ালে ধাক্কা খেতে খেতে ফিরে এলো। কাঠের বাক্সটা খুলে এবার উপুড় করে দিলাম। বহুদিন ধরে একটি একটি করে জমিয়েছি এই বড়ি। বড়ো ঈপ্সিত, বড় পবিত্র একটি ফুলের স্তবকের মতো পড়ে রইল বড়িগুলো। ঘরের কোণ থেকে কুঁজো আর জলের গ্লাসটা নিয়ে এলাম। বললাম— 'আর কেন? চিত্রা, সীতা, ভদ্রা, লোপা, আর কেন? এই তো সামনে রয়েছে আমাদের মুক্তি। আয় মুঠো মুঠো তুলে নিই।' অন্ধকারের মধ্য দিয়ে এগিয়ে এলো পাঁচটি প্রায়ান্ধকার মুখ, পাঁচটি প্রসারিত হাত, শবের মতো সাদা। আর ঠিক সেই মুহূর্তে বাইরের কোন বাড়ি থেকে যেন শীতসন্ধ্যার ঘুম

আচমকা ভাঙিয়ে গম্ভীর নিনাদে শাঁখ বেজে উঠল। একটার পর একটা। গান্ধারে, ধৈবতে, মন্দ্র ষড়জে, তারপর সুতীব্র নিখাদে। তিন সপ্তকের ছত্রিশ স্বরে ঘুরে ফিরে বাজতে লাগল শাঁখ। আজ পূর্ণিমা, বৃহস্পতিবার, পৌষলক্ষ্মীর পুজো। বকুলবাগানের বাড়িতে বাড়িতে শাঁখে ফুঁ পড়েছে।

করুণ মধুর গলায় ভদ্রা বলল—'কৃষ্ণা, তোর এ দুঃখ কাটিয়ে উঠতে পারবি না ভাই?' আমি বললাম—'একটি শিশুর জন্য আমার বুক যে খাঁ খাঁ করে। দুঃসহ অপমান তাও সওয়া যায়, কিন্তু এই শূন্যতা?'

ভদ্রা বলল—'পেয়ে হারানো সে যে আরও মর্মান্তিক!'

সীতা বলল—'কৃষ্ণা, আমার যমজদের একটাকে তুই নে না। আমার গর্ভের শিশুরা বড় সুন্দর হয়, তাছাড়া এখনও তো খুবই ছোট, নিজের বলে ভাবতে তোর কোনও অসুবিধে হবে না।'

লোপা বলল—'ভদ্রা, তুই ছেলের শোক ভুলতে পারছিস না। আরেকটি হতে তোর বাধা কি?'

শিউরে উঠে ভদ্রা বলল—'বলিস কি! সমস্ত দিয়েও তাকে রক্ষা করতে পারি নি, এই গর্ভে কি আবার শিশু ধারণ করা যায়?'

সীতা বলল—'আমার যমজদের আরেকটি যদি তোকে দিই?'

ভদ্রা হাত বাড়িয়ে বলল—'তাই দে, তাই দে সীতা। খালি মনে হয় সে কোথায় পথ হারিয়ে মা মা করে কেঁদে বেড়াচ্ছে।'

চিত্রা চাইল লোপার দিকে—'তুই যা পাস নি, আর কি চাস তা?'

লোপা বলল—'না।'

আমি বললাম—'মাত্র সাতদিন আগে কাগজে-কলমে আমার মুক্তি সম্পূর্ণ হল। অনেক গেছে আমার। তবু অনেক গিয়েও আজও অনেক আছে। তোদের কারও কোনও অসুবিধে হতে দেব না। চিত্রা, লোপা, ভদ্রা, আয়, আমরা সবাই মিলে সীতার লবকুশদের মানুষ গড়ে তুলি।'

দেখলাম বিশ্ব জুড়ে সভাস্থ নির্লিপ্তি। চিত্রার্পিতবৎ। মুখ ফিরিয়ে রয়েছে বয়স্ক বিচার। একটার পর একটা বস্ত্র খুলে যাচ্ছে—প্রেম, আশা, আশ্রয়, সম্মান...। নিষ্ঠুর হাওয়ায় হু হু করে উড়ছে হৃত বস্ত্রের রক্তাক্ত জাঙ্গাল। তবু আমরা বীতবস্ত্র হইনি। জুড়ে গেছে ধরণীর বুকে গভীর ফাটল। ভুবন ভরে বাজছে পাঞ্চজন্য। আমাদের জন্য। আমাদের পাঁচ জনেরই জন্য।

আমরা যে পাঞ্চালী!

প্লুটনিক

শীতকালে বৃষ্টি বড় বিরক্তিকর। ঘরে বসে তবু একরকম। কিন্তু বেড়াতে গিয়ে ভোগ করতে হলে সব মাটি। জায়গাটা গোপালপুর। যাকে আগে লোকে বলত গোপালপুর-অন-সি। আমাদের বড় প্রিয় জায়গা। গ্রীষ্মে, বর্ষায়, শীতে। সমুদ্রের রূপ এখানে মে-জুন মাসে উত্তাল, দুর্ধর্ষ, জল যেন টগবগ করে ফুটছে মনে হয় একেক সময়।

শীতকালে আবার সেই সমুদ্রকেই চেনা যাবে না। একেবারে সুনীল জলধি। গুঁড়ি-মেরে-এগিয়ে-আসা নিচু ব্রেকারগুলো নয় নয় করেও কিছু তো থাকেই। না থাকলে মনে হত মানস সরোবর। যে-সব ভাগ্যবানরা মানস সরোবরে গেছেন তাঁদের তোলা ছবিতে এই রকমটাই যেন দেখেছি। দু-এক বছর বাদ বাদই আমরা গোপালপুরে বেড়াতে আসি। গ্রীষ্মেও আসি। শীতেও আসি। উঠি ব্যাবিংটন সাহেবের বাংলোয়। বরাবর। আমরা আসছি শুনলেই উনি বেরহামপুর স্টেশনে শওকতকে দিয়ে জিপ পাঠিয়ে দেন। আরামে চলে আসি।

এই বাংলোর ওপর আমাদের এত ঝোঁক কেন সেটা চট করে এক কথায় বোঝানো যাবে না। কারণ বাংলোটা সুন্দর নয়, আধুনিক তো নয়ই। আশেপাশেই কয়েকটা আছে এটার চেয়ে অনেক সুদৃশ্য। ব্যাবিংটন সাহেবের বাংলো পথের শেষে একটা বালিয়াড়ির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। অর্ধেকটা তার বাঁধানো রাস্তায়, অর্ধেকটা বালির আঁটসাঁট উঁচু স্তূপের ওপর। দাঁড়িয়ে আছে বললেও ভুল হবে। হেলে আছে। পেছন দিকে সমুদ্র। এই পেছন দিকটায় বালিয়াড়িটা এমন ক্ষয়ে ক্ষয়ে গেছে যে, সমুদ্রের দিক থেকে দেখলে মনে হবে বাড়িটা যে কোনও মুহূর্তে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। কিন্তু পড়ে না তো! ছ-সাত বছর ধরে দেখছি! একই রকম বিপজ্জনক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে! হয়তো কোনওদিন আমরা থাকা-কালীনই হুড়মুড়িয়ে পড়বে। তা সত্ত্বেও কী রকম একটা আকর্ষণ আছে বাড়িটার। ভেতরে ঢুকলে মনে হয় পুরনো ইংল্যান্ডের কোনও পড়ো কানট্রি-হাউজে এসেছি। ঢুকে পড়েছি ভিন দেশের অতীত ইতিহাসের পোকায় খাওয়া পাতার ভেতরে। সামনের দিকে বেশ বড় হাতা, তার একদিকে একটা ছোট্ট আউট হাউজ। হাতাটা ঢালু। শান বাঁধানো হলে কি হবে, বালিতে ভর্তি থাকে সব সময়। ধারে ধারে কেয়ারি করা। তেমন কিছু গাছপালা নেই। কে-ই বা যত্ন করবে! তবে বেশ কিছু টবের পাতাবাহার আর ফুলগাছ আছে। এই-ই বাংলোর বাগান।

ঢুকে প্রথমে বাঁদিকে ব্যাবিংটনের নিজের ছোট্ট ঘর। ডানদিকে একটা লাউঞ্জ মতো। সেটা ব্যাবিংটন সাহেবের অফিস। একদিকে কটা বেতের চেয়ার। সামনে কাউন্টার। তার পেছনে ব্যাবিংটন সাহেব শর্টস আর আলগা টি শার্ট পরে খুব কায়দা মেরে বসে থাকে। গাবদা একটা খাতা নিয়ে সারা সকাল খুটখাট কাজ করে। কত তো ওর গেস্ট আসছে! কুল্লে ঘর তো তিনখানা। লাউঞ্জে দিয়ে ঢুকতে পেল্লাই একটা হল। তার বাঁদিকে ওই হলের মতোই প্রায় লম্বা আর একটা পেল্লাই ঘর। উঁচুতে বোধহয় বিশ ফুটেরও বেশি। এই ঘরটা ওর চারজনের। তবে দরকার হলে ছ জনের দলকেও অনায়াসেই দেওয়া যায়। দেয়ও। ডান দিকে দুখানা ঘর ডবল বেড। হল পেরিয়ে সমুদ্রের দিকে গেলে আগে একটা ঢাকা দালান, তার বাঁদিকে রান্নাঘর আর স্টোর।

দালানটাতে কিচেন টেবল আছে, আরও নানা খুচখাচ ঘরকন্নার জিনিস। এই দালানটার শেষে বিরাট, মোটা কাঠের দরজা। তার ওদিকে আবার চাতাল। খোলা। মাথার ওপর অর্ধেকটা টালির ছাদ আছে। বাকি সব দিক খোলা। এইখানে বসে সমুদ্র দেখা যায় অবাধ।

হলটা দারুণ। যেমন লম্বা তেমন চওড়া। মেঝে ভর্তি পুরনো দিনের মেরুন রঙের কার্পেট। মাথায় ঝাড়বাতি। যদিও জ্বলে না। একদিকে গ্র্যান্ডফাদার ক্লক। বাজে না। ঠিকঠাক সময়ও দেয় না। কিন্তু চলে। আপন খেয়ালে, সময়ের কোনও তোয়াক্কা না রেখে টিক-টিক টিক-টিক চলে। হলে ঢুকতেই বড় বড় গদি দেওয়া সোফাসেট। আর রান্নার চাতালের ধার ঘেঁষে বহুদিন আগেকার ডিমের মতো আকারের বিরাট ডিনার-টেবিল। চেয়ারগুলো লাল ভেলভেটের গদি-মোড়া, বাঁকানো পায়ের। পিঠের দিকে বেশ কারুকার্যও আছে। সব আসবাবই সেগুন কাঠের. চকচকে পালিশঅলা, আকারে বড়। কাবার্ড, আলমারি সবই। বেমানান খালি একদিকে একটা খুব খুদে ফ্রিজ। আর তার ওপরে টেলিফোন। এই দুটো জিনিস বাদে ঘরখানাতে একটাও এ শতাব্দীর জিনিস নেই, বাজি ধরে বলতে পারি।

ঘরের আসবাবও ওই রকমই। ওয়ার্ডরোব, খাট, দেরাজ-আয়না। শুধু অতিরিক্ত বিছানা দিতে হলে, স্টীল ফ্রেমের ফিতে-লাগানো খাট দেওয়া হয়। ওপরে ডানলোপিলোর তোষক বা গদি যাই হোক।

এখানে বেশিরভাগ বাড়িই পোর্তুগিজ গোত্রীয় সাহেবদের। এটাই বোধহয় একমাত্র কলকাতাইয়া অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানের। অন্তত আমি যদ্দুর জানি। ব্যাবিংটন সাহেবের রং বেশ লালচে ফর্সা, অনায়াসেই আসল সাহেব বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। পঞ্চাশের ওপর বয়স মনে হয়, কিন্তু খুব মজবুত শরীর। কটা চুল। পাকা টাকা বুঝি না। সব সময়েই দেখি শর্টস পরে ঘোরে। খালি শীতের শর্টসটা একটু মোটা ধরনের, আর গরমেরটা পাতলা। গরমে অনেক সময়ে খালি গায়েও ঘুরতে দেখেছি।

চব্বিশে ডিসেম্বর পর্যন্ত আবহাওয়ায় শীতের কোনও লক্ষণই নেই। এমনিতেই সমুদ্রের ধারে শীত তত বোঝা যায় না। এবার যেন একটু বাড়াবাড়ি রকমের শৈত্যাভাব। এমনিতে বেশ মনোরম কিন্তু একটু রোদ উঠলেই আর সী-বীচে থাকা যাচ্ছে না। চান করে উঠে আমাদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে কুহু আর গোবিন্দ বলতে বলতে গেল—'ভাবো তো, পৃথিবীর নানান জায়গায়, এমনকি ভারতবর্ষেও কোথাও কোথাও এখন বরফ পড়ছে!' এরা স্বামী-স্ত্রী বোধহয় অল্পদিন বিবাহিত, বিয়ের ঠিক পরেই বেরোবার সুযোগ পায়নি, এখন কমাস পরে এসেছে হনিমুনে। আছে আমাদের ডানদিকের ঘর দুটোর একটায়। আমরা ওদের নিজেদের মধ্যে বলি কুহু ও কেকা। খুব একটা ভাব না হলেও কুহুর সঙ্গে মাঝে মাঝে আমার ভালোই কথাবার্তা বিনিময় হয়। বেশ মিশুক মেয়েটা। আরেকটা ঘরে আছেন বি. সেন বলে এক ভদ্রলোক। এঁরও বয়স পঞ্চাশের ওদিকে। কিন্তু নিশ্চয় করে বলাও কিছু যায় না। মাথার চুল বেশির ভাগই পাকা হলে হবে কি, বেশ তাগড়া চেহারা। হাঁটা-চলা সবল, দ্রুত। থলথলে না হলেও একটু মোটার দিকেই। তামাটে রং গায়ের। খুব শৌখিন। মাথায় বিদেশি ক্রিম-ট্রিম মাখেন বোধহয়, সবসময়ে একটু মৃদু গন্ধ বেরোয়, মনে হয় মাথার চুল থেকেই। গন্ধটা

ঠিক ধরতে পারি না। জামাকাপড় জুতো সব ফিটফাট, যখনকার যা তখনকার তেমনটি। সবুজ রঙের সুইমিং ট্রাংক পরে চান করতে নামবেন, বিরাট একটা টার্কিশ তোয়ালে গায়ে জড়িয়ে। বীচ দিয়ে হাঁটছেন দেখবো পাতলা লাটখাওয়া ট্রাউজার্স আর আলগা টি শার্ট পরে, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো। আবার সন্ধেবেলায় বসবেন, স্যুট-টাই হাঁকিয়ে, পালিশ করা কেতাদুরস্ত জুতো। তাই এঁকে আমরা বলি বড়সাহেব। এঁর কাছে ব্যাবিংটন আপাতত ছোট সাহেব হয়ে গেছেন। কুন্থ আর গোবিন্দ বা কুন্থ ও কেকা যেমনি হাঁসকুটে, গপ্পবাজ, তেমনি একালষেঁড়ে ওই বি. সেন। কারও সঙ্গেই যেন আলাপ করার গরজ নেই। গতিবিধিও আমাদের সঙ্গে মেলে না।

দুই সাহেব সন্ধে থেকেই বোতল নিয়ে বসে। সমুদ্রের দিকের চাতালটায়। দৃশ্যটা ভারি মজার। বাঁ পাশে এক সারি মরকুটে ঝাউগাছ। আধভাঙা বালিয়াড়ির ওপর সিমেন্ট-চটা চাতাল। চাতালের ওপর গোল স্টিলের ফোল্ডিং টেবলটা পেতে ফেলে ব্যাবিংটন। শওকত, তার হুকুমবরদার, স্টিলের ফোল্ডিং চেয়ার পেতে ফেলে যেন অন্তত আধডজন লোকের মজলিশ বসবে। পাপাম্মা, ব্যাবিংটনের আরেক হুকুমবরদার, একটি তেলেঙ্গি মেয়ে, বড় এক প্লেট কাজুবাদাম, বোতল গেলাস সব সাজিয়ে রেখে যায়। ওরা দুজনে সমুদ্রের দিকে চেয়ে বসে থাকে, হাতে গেলাস, মাঝে মাঝে চুমুক দিচ্ছে, নামিয়ে রাখছে, আবার তুলে নিচ্ছে। পাশাপাশি চেয়ারে বসে দুজনেই একেবারে আকাট চুপ। গম্ভীরভাবে, কেউ কারও দিকে না তাকিয়ে বসে বসে গিলে যাচ্ছে। অন্তত আমি তাই বলি। যাই হোক, গেলার প্রভাব কিন্তু কারও ওপরই বিন্দুমাত্রও পড়ে বলে মনে হয় না। ব্যাবিংটন আগেও যেমন হাসিখুশি সদাশয় ভদ্রলোক, পরেও ঠিক তেমনি। বি. সেন আগেও যেমন গোমড়া, পরেও তেমন গোমড়া।

এই সময়টা কুন্থ-কেকা ফেরেই না, কোথায় কোথায় বেরিয়ে যায়, আমরা বুঝতেই পারি না। আমরাও সাড়ে সাতটা-আটটা পর্যন্ত বাংলোর কাছাকাছি সমুদ্রের ধারে বসে থাকি। যতক্ষণ দিনের আলো থাকবে ততক্ষণ বিচ ধরে বেড়াবো, অন্ধকার হলেই বসে পড়ব। লাইট-হাউজটা কাছেই। অন্ধকার জলের ওপর লাইট-হাউজের আলোটা যতক্ষণ না ঘুরতে আরম্ভ করছে, ততক্ষণ আমাব ছেলে বাবাই আমাদের উঠতেই দেবে না। এখান থেকে দুই সাহেবের পান-দৃশ্যটা দেখা যায়। বাবাই বলে, 'মা, ওরা কত থামস আপ খাবে!'

ঘোষ সাহেব অর্থাৎ বাবাইয়ের বাবা বলে, 'ওরা থামস আপ খাচ্ছে? তুই তো দেখছি বুদ্ধু দা গ্রেট।'

আমি চিমটি কেটে থামাবার চেষ্টা করলে কী হবে, ঘোষ সাহেব তার সদা-সত্য বলিবে কদাচ মিথ্যা-বলিবে না নীতি অনুসারে বলে, 'থামস আপের বোতল তুই চিনিস না? ইয়ার্কি পেয়েছিস?'

'তবে কী খাচ্ছে বাবা, মদ?' মদটা খুব চুপিচুপি বলে বাবাই।

'এই তো ঠিক ধরেছিস ব্যাটা', বলে বাবা ছেলের পিঠে একটা বিরাশি-সিক্কা ওজনের তারিফ-সূচক থাবড়া দিয়ে, জনান্তিকে আমাকে বলে, 'থামস আপ, ধোঁকা দিতে শিখেছে কেমন দেখেছ! তোর বাপ চেনে আর তুই চিনিস না?'

আমরা তিন ঘর অতিথিই এক ডিনার-টেবিলে খাই। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সময়ে।

সবচেয়ে প্রথমে আটটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে খেয়ে নেয় ব্যাবিংটন আর বি. সেন। নটা নাগাদ খাই আমরা। নব-দম্পতির খাওয়া সবচেয়ে দেরিতে। ওরা যখন খায় তখন আমরা সামনের, কি পেছনের চাতালে বসে গল্পগাছা করছি। নয়তো শুয়েই পড়ছি কোন কোন দিন। ওদের হাহা হুহু কানে আসে। পাপাম্মা বলে তেলেঙ্গি মেয়েটি, আমরা যতদিন আসছি, দেখছি ব্যাবিংটনের বাংলোতেই আছে। খুব ভালো রাঁধে, বিশেষ করে পশ্চিমি রান্না। খাওয়ার জন্যে আলাদা চার্জ দিতে হয়, যে যা খেতে চায় তা-ই রেঁধে দেয়। স্পেশ্যাল তেল-ঘি বা কোনও ডিশ খেলে সেগুলো কিনে দিতে হয়। এসব থেকে দু হাতে মারে, বুঝতে পারি। কিন্তু এত ভালো রাঁধে, আর এত ভালো ব্যবহার যে মেনে নিই। মেয়েটা আঁটসাঁট গড়নের, কুচকুচে কালো। মাথার বেণীতে সবসময়ে ফুল থাকবে, নাকের দুদিকে দুটো নাকছাবি। খুব পরিষ্কার। শাড়ি ব্লাউজ ঝকঝক করে, ভালো ট্যালকম পাউডারের গন্ধ বেরোয় গা থেকে। কাজেই আমাদের কোনও অসুবিধেই হয় না। হ্যাঁ বলতে ভুলেছি, ব্যাবিংটনের বাংলোর সবচেয়ে মজাদার অধিবাসী হল প্লুটো, একটা তাগড়া অ্যালসেশিয়ান। সবসময়ে নখের ক্লপ ক্লপ শব্দ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সকালবেলা মুখে করে কাগজ নিয়ে আসবে। পাপাম্মার সঙ্গে বাজারে যাবে, ভারী থলিটা মুখে করে কামড়ে নিয়ে আসবে। যতক্ষণ পাপাম্মা টেবিলে পরিবেশন করবে, টেবিলের একধারে থাবা দিয়ে দাঁড়িয়ে হ্যা-হ্যা করবে জিভ বার করে। একমাত্র ব্যাবিংনের খাওয়ার সময়েই পাপাম্পা পরিবেশন করে, ব্যাবিংটন আর বি. সেনকে। আমাদের টেবিল সাজিয়ে দিয়ে চলে যায়। প্রথম প্রথম পরিবেশন করত, কিন্তু টেবিলের ধারে কুকুরটার অমনি দাঁড়িয়ে থাকা আমাদের মোটে পছন্দ হয় না, তাই ওকে বলি কুকুর নিয়ে চলে যেতে, হয়ে গেলে সব তুলে-টুলে নেয়। রাতে আবার কুন্থ-কেকা খেতে এলে, সব গুছিয়ে দিয়ে চলে যায়। দশটার পর ও আর বাংলোয় থাকতে চায় না। আউট-হাউজে চলে যায়।

যাই হোক, চব্বিশে পর্যন্ত বেশ ছিল। পঁচিশে সকাল থেকেই আরম্ভ হল বৃষ্টি। ঘ্যানঘেনে, প্যানপেনে। সেইসঙ্গে হাওয়া চলছে খুব। আমরা জানি ব্যাবিংটন ক্রিসমাস করে খুব ঘটা-পটা করে। জানি মানে জানতাম, ওর কাছ থেকেই শুনেছিলাম। এবার দেখবার সুযোগ হল। মাঝের হলঘরটা চব্বিশ তারিখে সারাদিন ধরে পরিষ্কার হল। লোক বলতে শওকত, সেই আধবুড়ো ড্রাইভার, পাপাম্মা, ব্যাবিংটন আর প্লুটো। একটা অ্যান্টিরুমে ক্রিসমাসের সব সাজ-সরঞ্জাম থাকে। সেখান থেকে ওর কৃত্রিম ফারগাছ বেরোল, বেরোল চকচকে সব কাগজের শিকলি। চীনে লণ্ঠন, গুচ্ছের নানান আকার, নানান আয়তনের বেলুন, জাপানি ফিতের ফুল। আর একটা বিরাট সোনালি বেথলিহেম স্টার। বেশিরভাগ জিনিসই মুখে করে করে নিয়ে এলো প্লুটো। আমার ছেলেও মহা উৎসাহে হাত লাগালো। ব্যাবিংটন বলল—তার ফারগাছের শাখা থেকে উপহারের প্যাকেট ঝুলবে, ভালো করে প্যাক করে আমরা যেন সব রাত্তিরে টেবিলে রেখে যাই। কার উপহার বোঝা যাবে, কিন্তু কে দিচ্ছে বাইরে থেকে বোঝা গেলে চলবে না। যা ববা বা। ঘোষ সাহেব বললে, 'পড়েছি ব্যাবিংটনের হাতে, খানা তো খানা, আরও কত কী সঙ্গে করতে হয় দেখো।' তা যা পারলাম, করলাম।

কিন্তু ওই যে বললাম সকাল থেকে ঘ্যানঘ্যানে বৃষ্টি। হাওয়া ভীষণ জলো। ঠাণ্ডা।

গায়ে যেন ভিজে কম্বল লেপটে আছে। দু-একবার পেছনের চাতালে যাবার চেষ্টা করলাম। দেখি এলোমেলো হাওয়া দিচ্ছে, অর্থাৎ ক্রমশই সাইক্লোনিক হয়ে যাচ্ছে ওয়েদার। ব্যাবিংটন বলল, 'মিসেস ঘোষ, খবরদার ওদিকে যেও না। হঠাৎ দমকা হাওয়া এসে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে একেবারে আছড়ে ফেলে দেবে সি-বিচের ওপর।'

সর্বনাশ! তাড়াতাড়ি শওকতকে ডাকি। আমি না হয় না গেলাম। কিন্তু বাবাই! সারাদিন ঘরের মধ্যে থেকে উত্ত্যক্ত হয়ে রয়েছে, যা দস্যি, টুক করে সবার অলক্ষ্যে ওদিকে চলে গেলেই হল। শওকত, পাপাম্মা, ব্যাবিংটন সবাই মিলে ঝড়ো হাওয়ার মুখে সেই বিশাল দরজা বন্ধ করে দিল। দুপাশ থেকে দুটো চওড়া লোহার খিল পড়ল। লাউঞ্জের দিকের দরজাও বন্ধ। আমাদের সব ঘরের জানলার শার্সিও বন্ধ। এবার ঝড় এ চত্বরের বাইরে যত খুশি মাতামাতি করুক।

সন্ধে হতেই ঝাড়লণ্ঠনে মোম জ্বলে উঠল। চীনে লণ্ঠন জ্বলে উঠল, ক্রিসমাস ট্রির গায়ে ছোট ছোট টুনি বাল্ব জ্বলে উঠল। চারদিক ঝিকমিক ঝিকমিক করছে। বিশেষ করে হলের দরজার মাথায় সেই সোনালি রঙের বেথলিহেম স্টারটা। সেটা থেকে রীতিমতো আলো ঠিকরোচ্ছে।

'কী মাস্টার বাবাই, এবার তোমার মন ভালো হয়েছে?' ব্যাবিংটন বলল। জবাবে বাবাই দুম করে একটা বন্দুক ফাটালো। সবাই হা-হা করে হেসে উঠল। ব্যাবিংটন বলল, 'ব্যাস, আমাদের ক্রিসমাস উৎসব আরম্ভ হয়ে গেল।' প্লুটো পর্যন্ত দেখি প্রচণ্ড ল্যাজ নাড়াতে নাড়াতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অর্থাৎ তারও খুব আহ্লাদ।

ভোজ হল জমাট রকম। ছোট ছোট চিকেনের গোটা রোস্ট। বাঙালী পোলাও, প্রতি গ্রাসে কাজু, কিসমিস, মটরশুঁটি। পমফ্রেটের ফ্রাই। দু রকম স্যালাড। আর ক্রিসমাস পুডিং। পাপাম্পা সত্যিই দারুণ রাঁধিয়ে। একেবারে ওস্তাদ। ওর রান্নার লোভেই বোধহয় ব্যাবিংটনের ভুতুড়ে বাড়িতে সারা বছর একটা গেস্টের ধারা অব্যাহত থাকে। আজকের ভোজটা আবার ব্যাবিংটনই দিতে চেয়েছিল। আমরা সবাই আপত্তি করেছি। জোরজার করে চাঁদা দিয়েছি। কাউন্টারে গাবদা খাতা খুলে বসে হিসেব কষলেও, তেমন কিছু উপার্জন ওর নেই। নইলে গত ছ-সাত বছর ধরে দেখছি তো! রঙ তো দূরের কথা, বাড়িটাকে চুনকাম পর্যন্ত করায়নি একবারও। শুধু কিছু কিছু প্লাস্টারের তাপ্পি চলছে জায়গায় জায়গায়।

সবাই যে যার গিফট পেয়ে গেছি। বাবাইয়ের কোলে তো অ্যাত্তোগুলো জড়ো হয়েছে। তার পরেই ব্যাবিংটনের। আমরা সবাই দু-তিনটে করে পেয়েছি। খুলতে যাব, ব্যাবিংটন বলল, 'ধৈর্য ধরো মিসেস ঘোষ, প্যাকেট খুলবে একেবারে রাত্তিরে, যে যার ঘরে গিয়ে। এখন আড্ডা। খালি মাস্টার বাবাই যা ইচ্ছে করতে পারে।' বাবাই তৎক্ষণাৎ তিন লাফ দিয়ে একটার পর একটা প্যাকেট খুলতে লাগল। টিনটিনের কমিকস পেয়েছে দুটো, ব্যাবিংটন দিয়েছে। একটা ইয়াব্বড় টয়লেট সাবান, বিদেশি—বি. সেন দিয়েছেন অবশ্যই। কাজুবাদামের প্যাকেট—কুহু ও কেকা। আমরা আসবার সময়ে একটা স্ক্র্যাবলস গেম কিনে এনেছিলাম, সেটাই দিয়েছি। ভাগ্যিস, ওকে আগে দেখাইনি।

বাবাই তার উপহারের প্যাকেট সব দু হাতে আঁকড়ে ধরে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। এখন ও কমিকস দুটো গোগ্রাসে গিলবে।

ব্যাবিংটন বলল, 'কী? আড্ডায় সবাই রাজি তো?'

আমাদের তো কোনও আপত্তিই নেই। কুহুরাও দেখলাম খুব উৎসাহী।

'কী মিস্টার সেন? বসছেন তো?' ঘোষ সাহেব জিজ্ঞেস করলেন।

বি. সেন ধীরেসুস্থে একটা পাইপ ধরালেন, তারপর এই প্রথম চাপা হাসিতে উজ্জ্বল মুখে বললেন, 'ইয়েস। অফ কোর্স। তবে অন কন্ডিশন। যদি ইন্টারেস্টিং গল্প শুনতে পাই।'

ব্যাবিংটন বলল, 'ইন্টারেস্টিং গল্প? মানে ভূতের?'

বি. সেন বললেন, 'প্রেমেরও হতে পারে।'

'প্রেম আর ভূত?' কুহু খিলখিলিয়ে হেসে উঠল।

'একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন দুটোর মধ্যে কিন্তু প্রচুর মিল আছে', বি. সেন মিটিমিটি হেসে বললেন।

ঘোষ সাহেব বললেন, 'কেন? প্রেমও ভূতের মতো হুট করে ঘাড়ে চাপে, তারপর পট করে ঘাড় মটকায় বলে?

ব্যাবিংটন বললে, 'ছিঃ, মহিলারা মনে কষ্ট পায় এমন কথা না-ই বললে মিঃ ঘোষ!' বলছে বটে, কিন্তু তার মুখে দুষ্টু হাসি।

'আর কোনও মিল? দুটোর মধ্যে?' বি. সেন চারদিকে চোখটা ঘুরিয়ে নিলেন একবার, যেন কুইজ-মাস্টার!

কেকা অর্থাৎ গোবিন্দ বলল, 'আমি একটা মিলের কথা বলতে পারি 'ভূতও নেই, প্রেমও নেই।'

ব্যাবিংটন এবারে সশব্দে প্রতিবাদ করে উঠল, 'নো, নো, ইয়াং ম্যান। তুমি একটা সদ্য-বিবাহিত যুবক। হনিমুন কাটাতে এসেছ, তোমার মুখে এসব কথা! নো, নো....' ব্যাবিংটন মাথা নাড়তে লাগল।

'বললে আর কী করবেন? ঠ্যাঙাতে পারবেন? দিন না বেশ করে দু ঘা।' কুহু হাসতে হাসতে বলল।

এরই মধ্যে বি. সেনের গলার আওয়াজ শোনা গেল।

'উঁহু। প্রেম আছে, যেমন ভূতও আছে। কী বলেন, মিসেস ঘোষ!'

সবাইকে ছেড়ে আমাকেই ভদ্রলোক সাক্ষী মানলেন কেন বোঝা গেল না। বললাম, 'হ্যাঁ কবি বলেছেন বটে বোঝা গেল না, গেল না। ওকি মায়া কি স্বপনছায়া? ও কি ছলনা?'

কুহুর যেমন অভ্যেস। সে হেসে গড়াতে লাগল। অন্য সবাইয়েরও স্মিত মুখ। ব্যাবিংটনের সুদ্ধ। যদিও এত শক্ত বাংলা ও বুঝতে পেরেছে কিনা আমার সন্দেহ আছে। কিন্তু বি. সেন যেন হাসিটা গিলে নিয়ে বললেন, 'এ তো রোমান্টিক ব্যাপারস্যাপারের কথা বলছেন। প্রেমের রহস্য কিন্তু আরও অনেক সিরিয়াস।'

রোমান্টিক হলে সেটা কেন আর সিরিয়াস হবে না আমি বুঝতে পারলাম না। রোমান্টিক শুনলে নিউ জেনারেশন নাক শিটকোয়, ইনি নিউ জেনারেশন না হয়েও নাক শিটকোচ্ছেন। অথচ এ যুগের রোবো, ডাইনোসর, মাইকেল জ্যাকসন এসব যেন আর রোম্যান্টিক নয়! তবে বি. সেন লোকটা যে রকম ঘোড়েল, ও যে চূড়ান্ত রকমের

আনরোমান্টিক হবে তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই।

এই সময়ে ব্যাবিংটন চোখ গোলগোল করে বলল, 'প্রেম আর ভূত দুই-ই আছে, এমন একটা গল্প শুনবে না কি?'

কুহু এগিয়ে বসে বলল, 'বলুন মিঃ ব্যাবিংটন প্লিজ।'

'তাহলে কফি খাওয়াও। পাপাম্মা আউটহাউজে চলে গেছে। তোমার হাতের কফি খাই।' কুহু কোমরে শাড়ি জড়িয়ে উঠে পড়ল। বলল—'নিশ্চয়ই।' রান্নাঘরের দিকে চলে গেল ও। মিনিট কয়েক পরেই ওদিক থেকে ডাকল, 'রীণাদি, একটু হেল্প করবে এসো না।'

আমি উঠে পড়ে রান্নাঘরে যেতেই খুব উত্তেজিত কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, 'কী গিফট পেয়েছ রীণাদি?'

'এখনও তো খুলিনি।'

'আমি আর কৌতূহল সামলাতে পারিনি ভাই, খুলে ফেলেছি এই দ্যাখো, একটা কী রহস্যময় গিফট পেয়েছি!' বলে ও একটা দামি কাগজ মেলে ধরল। তার মধ্যে একটা লিপস্টিক। কাগজটাতে লেখা—'উইথ কিসেস।'

'কে বলো তো?'

আমি হেসে উড়িয়ে দিলাম। বললাম, 'তোমার বর আবার কে?'

ও চিন্তিত হয়ে বলল, 'এটা মোটেই ওর হাতের লেখা নয়। ওর কাগের ঠ্যাং বগের ঠ্যাং আমি চিনি।

আমি হেসে বললাম, 'আমার বরেরও নয়, একটু আশ্বাস দিতে পারি।' ও ভুরু কুঁচকে কফি তৈরি করতে লাগল, ইতিমধ্যে আমি চট করে ওই চাতালের দিকের দরজা দিয়ে নিজেদের ঘরে ঢুকে দেখি বই-টই, খেলনা-টেলনা ছড়িয়ে বাবাই ঘুমিয়ে কাদা। আমার প্যাকেটগুলো খুললাম। এক প্যাকেট খুব সুন্দর বাহারি মোমবাতি। কে দিয়েছে নাম নেই। আমার কর্তা কিসসু দেয়নি মনে হল, কিন্তু এ কী? কুহুর মতোই একটা কাগজের প্যাকেট না? খুলে দেখি ভেতরে একটা ছোট্ট পারফুমের শিশি, কাগজে লেখা, টোয়েন্টি সেভেন্থ, মিডনাইট, হোয়েন দা ওয়ার্ল্ড ফলস অ্যাস্লীপ লাস্ট চান্স। ওবলাইজ। ভেনু-ব্যাক টেরেস।

এ কি রে বাবা! আমরা অবশ্য আঠাশে সত্যিই চলে যাচ্ছি। কিন্তু এ লেখার কী মানে? কেউ ঠাট্টা করেছে? ব্যাবিংটন জানে আমরা কবে যাব। অন্যরা জানলে জানতে পারে। কিন্তু ঠাট্টাও যদি হয়, কী জংলি অপমানজনক ঠাট্টা! আমার মাথার মধ্যেটা জ্বলতে লাগল। কাগজটা বালিশের তলায় কোনওমতে দুমড়ে গুঁজে রেখে রান্নাঘরে ফিরে গেলাম। কুহুর কফি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। আমি নিয়ে গেলাম ট্রে-টা। পেছনে আর একটা ট্রেতে বিরাট পট-টট নিয়ে ও।

কুহু বসে পড়ে বলল, 'নিন এবারে বলুন। প্রেমিক ভূত, না ভূতুড়ে প্রেম' বলতে বলতে কুহু আমার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইল। বুঝতে পারছি ও ব্যাবিংটনকে সন্দেহ করছে।

'ভয় পেলে কিন্তু চলবে না।' ব্যাবিংটনের মুখ এখন আরও গোল হয়ে গেছে।

আমি বললাম, 'ভয়? যা নেই তাকে ভয়-টয় আমরা করি না মিঃ ব্যাবিংটন। তবে

যা আছে কিন্তু লুকিয়ে আছে তাকে একটু ভয় পাই।' কুহু মুচকি হেসে আমার দিকে চাইল।

ব্যাবিংটন বলল, 'হেই প্লুটো, এদিকে আয় তো!'

গরগর গরগর করে একটা চাপা আওয়াজ করে অ্যালসেশিয়ানটা এগিয়ে এলো, ব্যাবিংটনের চেয়ারের পাশে থাবা গেড়ে বসল। ল্যাজটা খুশিতে যেন লাফাচ্ছে।

'এর কত বয়স হবে বলো তো?'

'কত হবে? দশ কি এগারো।' বড়সাহেব বি. সেন বললেন। বলবার হক ওঁরই আছে মনে হল। আমার আবার কুকুর-টুকুর আসে না।

কুহু আমার কানে কানে বলল, 'নেড়ি কুকুর ছাড়া আর কোনও কুকুরেরই বয়স বাবা আমি বলতে পারি না।'

আমি চুপিচুপি জিজ্ঞেস করলাম, 'নেড়ি কুকুরেরটাই বা কী করে পারো?'

'আমাদের বাড়ির একতলার গুদোমঘরে একটা নেড়ি বাচ্চা পেড়েছিল। পাঁচটার মধ্যে চারটে বছরখানেকের মধ্যেই মরে গেল। পঞ্চমটা সাত বছর পরে, ঠিক যে গুদোমে জন্মেছিল সেইখানেই এসে মরে।'

এই সময়ে ব্যাবিংটন ঘোষণা করল, 'প্লুটোর উনিশ বছর বয়স পেরিয়ে গেছে।'

'ইমপস্‌সিবল'—বি. সেন বললেন।

ব্যাবিংটন বলল, এগজ্যাক্‌টলি। আমিও তাই বলি। কিন্তু সম্ভব হয়েছে। হয়তো প্লুটো প্লুটো নয়। অন্য কেউ।'

'মানে?' বি. সেন মুখ থেকে চুরুট সরিয়ে ফেলেছেন।

ব্যারিংটন বলল, 'তোমরা ট্রান্সমাইগ্রেশন অফ সোলস মানো? বিশ্বাস করো?'

বি. সেন বললেন, 'আরে জন্মান্তরবাদ তো আমাদের সংস্কারের মধ্যে ঢুকে বসে আছে। মানি বা না মানি।'

আমার কর্তা বলল—'না না, উনি বোধহয় সেই পিথ্যাগোরাসের থিওরির কথা বলছেন, একজন মারা গেল তো তার আত্মা হয়তো অন্য কেউ, এমনকি কোনও জন্তুজানোয়ারকেই গিয়ে আশ্রয় করল। বহু পুরনো তত্ত্ব। তাই না, মিঃ ব্যাবিংটন?'

ব্যাবিংটন নীরবে মাথা নাড়ল।

'অলরাইট', বলো তোমার গল্প'—বি. সেন চুরুটের ছাই ঝেড়ে বললেন।

ব্যারিংটন বলতে লাগল, 'পাপাম্মাকে দেখেছ তো! অন্ধ্রের মেয়ে। ক্রিশ্চান। সব কিছুতে এক্‌সপার্ট। তেমনি বিশ্বাসী। প্রথমে ওর মা এখানে কাজ করত, ও স্কুলে পড়ত। তারপর ওর মা হঠাৎ মারা যেতে ও আমার কাছে আশ্রয় চাইল। আপন আর কেউ নেই। সেই থেকে কাজ করতে আরম্ভ করল এখানে। ওর মা থাকত দূরে, ওদের বস্তিতে, ও কিন্তু এইখানে আউটহাউজটা পরিষ্কার করে থাকতে আরম্ভ করল। কিছুদিনের মধ্যেই কাজকর্মে মাকে তো বটেই, আরও অনেককেই ছাড়িয়ে গেল। আমার তো একেবারে ডান হাত। গেস্টদের এমন যত্ন করত যে কিছুদিনের মধ্যেই আমার বাংলোর কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সারা বছর গেস্ট। আর আমাকেও এমন দেখাশোনা করত যে, আমি বলতাম ও একাধারে আমার পাপা আর মা। এইভাবে বেশ চলছিল। ইতিমধ্যে একটি ক্রিশ্চান ছোকরা ওর প্রেমে পড়ল। অন্ধ্রেরই ছেলে। বোধহয়

সাত-আট ক্লাস পর্যন্ত পড়েছে, তাইতেই নিজেকে নিজেদের কমিউনিটির মধ্যে একটা কেউকেটা গোছের ভাবতে শুরু করেছে। শুঁটকি মাছ চালানের ছোটখাটো কারবার করে সেই যোসেফ এসে পাপাম্পাকে বিয়ে করতে চাইল। কী আর করি! বললাম—করতে পারো, কিন্তু আমার আউটহাউজে তাই বলে থাকতে দেব না! যোসেফের মতলব ছিল ওকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু পাপাম্মা এতদিন এই পরিবেশে মানুষ। এত বড় বাড়িতে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ায়; নানান রকমের মানুষ দেখে, কত মেমসাহেবদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে, আমার কাছ থেকে লেখাপড়াও আরও শিখছিল, ভালো ভালো খানা রান্না করে, ফুলবাগান করে, তার ওখানে পোষাবে কেন? সে যেমন আমার কাজ করছিল করতে লাগল। কিন্তু আর এখানে থাকত না।'

কফিতে চুমুক দিল ব্যাবিংটন। কুহু বর বলল, 'মিঃ ব্যাবিংটন, শেষ পর্যন্ত আমাদের চাকরানির প্রেমের গল্প শোনাচ্ছেন?'

বি. সেনের মুখের ওপরও এক চিলতে তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটে উঠল। ব্যাবিংটনের মুখটা থমথম করছে, বলল, 'ওহ্, তার হাতের রান্না খেয়ে রোজ তারিফ করতে পার, তার পাতা বিছানায় শুয়ে স্বপ্ন দেখতে পার, আর তার যে একটা প্রাইভেট লাইফ আছে, সেটাও ইন্টারেস্টিং হতে পারে, তা মানতে চাও না! বেশ আমি আর বলছি না।'

প্লুটো গরগর করে দুবার ল্যাজ ওলট-পালট করল।

কুহু তিরস্কারের দৃষ্টিতে গোবিন্দর দিকে তাকিয়ে বলল, 'না না, মিঃ ব্যাবিংটন বলুন, প্লিজ, ও না শোনে, না শুনুক, আমাদের খুব ভালো লাগছে।'

ব্যাবিংটন আর এক চুমুক দিল কফিতে। পট থেকে আরও একটু ঢালল। আমার কর্তা ঘোষ সাহেব বলল, 'আরে, বলোই না ব্যাবিংটন। আমরা সবাই এখন মেজাজে আছি। এমন করে কেউ দুম করে সুইচ অফ করে?'

ব্যাবিংটনের বলবার ইচ্ছে ষোল আনা। আমার ভেতরের রাগ আর জ্বালা এখনও থামেনি। অর্ধেক মন দিয়ে শুনছি। আর অর্ধেক মন দিয়ে ভাবছি লোকটা কে? কী করে এর শোধ নেওয়া যায়। ওদিকে ব্যাবিংটন বলে চলেছে।

'যোসেফের সব ভালো। রোজগার ভালো করত। ফিটফাট বাবু থাকত সব সময়ে। পাপাম্মাকে ভালোও বাসত খুব। কিন্তু এক দোষে সব গুণ বরবাদ। ভয়ানক মদ খেত। আর মাতাল হয়ে গেলে তার আর জ্ঞান থাকত না। বউকে মেরে ধরে একসা করে দিত। সন্দেহ বাতিকও ছিল প্রচণ্ড। ওদের পাড়ায় পাপাম্মার মতো মেয়ে তো আর ছিল না। স্মার্ট, শিক্ষিত, রুচি বলে একটা জিনিস আছে, কেতাদুরস্ত। ব্যাস, অমুকের সঙ্গে কথা বলেছিলি কেন? তমুকের সঙ্গে বাজার গেলি কেন? মার, প্রচণ্ড মার।

'চোখ মুছতে মুছতে মেয়েটা কাজ করতে এলে বলতাম, 'দূর, মদ খেয়ে নিজের পয়সাগুলোও উড়োচ্ছে, তোরগুলোও উড়োচ্ছে। রোজ ঠেঙাচ্ছে। দে ওকে ছেড়ে, না হয় অন্য কাউকে বিয়ে কর।'

ও বলত, 'ভাবি তো সায়েব, কিন্তু যোসেফ তাহলে পাগল হয়ে যাবে, নেশা কেটে গেলে অন্য মানুষ একেবারে। পায়ে ধরে কান্নাকাটি করবে, এই দ্যাখো কেমন নাকছাবি গড়িয়ে দিয়েছে। আর অন্য কাউকে বিয়ে! যোসেফ বেঁচে থাকতে? যোসেফকে ছেড়ে? যোসেফ তাকে খুনই করে ফেলবে।'

বি. সেন একটু হেসে বললেন, 'যাক, এতক্ষণের লভের মোটিফটা স্পষ্ট হচ্ছে।'

ব্যাবিংটন তখন গল্পের ঘোরে। সে অত লক্ষ্যই করল না। সে বলে চলল।

'তার পর একদিন মেয়েটা আমার কাছে এসে একেবারে আছড়ে পড়ল। সারা পিঠে দাগড়া দাগড়া লাল দাগ। বেত না লাঠি কী দিয়ে নির্মমভাবে পিটিয়েছে। সর্বাঙ্গে কালশিটে, ফুলো, মাথা ফেটে রক্ত পড়ছে, চোখমুখ ফুলে গেছে। আমি বললাম, এ কী? এ যে তোকে খুন করে ফেলতে বাকি রেখেছে। আমি এখুনি যাচ্ছি থানায়, ডায়েরি করতে। তো মেয়েটা বললে—'থানায় যেও না সাহেব, ও ওর যা খুশি করুক, জাহান্নামে যাক, আমি আর ওর কাছে ফিরছি না।" বলে আউটহাউজে ওর পুরনো জায়গায় গিয়ে শুয়ে রইল। ডাক্তার ডাকলাম। কপালে স্টিচ হল, মাথায় ব্যান্ডেজ হল। ওষুধ ইঞ্জেকশন।

'এটা সকালের কথা, দুপুরবেলায় যোসেফ এলো। ত্যাণ্ডাই-ম্যাণ্ডাই নেই। ভয়ে একেবারে এতটুকু হয়ে গেছে, আমি বললাম—গেট আউট, আভভি নিকালো হিঁয়াসে। পায়ে পড়ে গেল। "এমন আর কখনও হবে না সাহেব, মা মেরির দিব্যি, যিশুর দিব্যি, আমি আর মদ ছোঁবো না। মাতাল হলেই আমার ভেতর থেকে শয়তান বেরিয়ে আসে।" কিছুতেই যাবে না। ছিনে জোঁক একেবারে। সকালে আসছে, দুপুরে আসছে, সন্ধেয় আসছে—"একবার, একটিবার ওর সঙ্গে দেখা করিয়ে দাও সাহেব।" কত আর হাঙ্গামা সইব। একদিন বললাম, 'ঠিক আছে যাও। কিন্তু কোনও ঝামেলা করবে না।' নিক বাবা, নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া নিজেরাই করে নিক।

'আউটহাউজের জানলা খোলা। আমার অফিস থেকে দেখা যায়। দেখতে পাচ্ছি—পাপাম্মা শুয়ে রয়েছে। কপালে ব্যান্ডেজ, মুখের নানা জায়গায় স্টিকিং প্লাস্টার আটকানো। যোসেফ ঘরে ঢুকে আস্তে আস্তে গিয়ে কপালে হাত রাখল। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠে বসল মেয়েটা। ওর হাতটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। খাট ছেড়ে ঘরের কোণে চলে গেল। কী বলছে শুনতে তো পাচ্ছি না। কিন্তু ভঙ্গি দেখে বুঝতে পারছি বেরিয়ে যেতে বলছে। আরও কদিন এলো। খিল এঁটে পড়ে রইল মেয়েটা। দরজাই খুলল না। ভালো হয়ে উঠে একদিন রান্নাঘরে কাজ করছিল, দূর থেকে যোসেফকে আসতে দেখেই রান্নাঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। ভেতর থেকে শাসাতে লাগল, যোসেফ এক্ষুনি চলে না গেলে পুড়ে মরবে। সে এক কেলেঙ্কারি ব্যাপার।'

'এর কদিন পরে শুনলাম যোসেফ বিষাক্ত মদ খেয়ে মরে গেছে। এ রকম এখানে মাঝে মধ্যে হয়। মেছোগুলো প্রচণ্ড টানে, যত সস্তা পাবে, তত টানবে। নানারকম বিষক্রিয়া হয় তাতে। একটু ধর পাকড় হয়। আবার যে কে সেই। আরও কয়েকটা লোকও অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, কিন্তু মারা গেল একা যোসেফ। লোকটা কি আত্মহত্যা করল? না কি ব্যাপারটা কাকতালীয়? ঠিক বুঝলাম না। যা জ্বালাচ্ছিল, মনে মনে ভাবলাম আপদ গেছে। পাপাম্মারও কোনও ভাবান্তর নেই। মুখ টিপে আছে একেবারে। চোখে জল-টল কিছুই দেখলাম না।

'সেই সময়ে প্লুটো কিছুদিন হল আমার কাছে এসেছে। নেহাত ছেলেমানুষটি নয়। ছিল এখানকারই ডি-সুজা সাহেবের কুকুর। আমায় ভালোই চিনত। ডি-সুজা সব বেচেবুচে চলে গেল অস্ট্রেলিয়া, কুকুরটাকে আমার কাছে দিয়ে গেল। "ক-বছরই বা

বাঁচবে আর, কোথায় ফেলব, একে একটু যত্ন করো ব্যাবিংটন।" সঙ্গে, ওই যে ড্রেসারটা দেখছ ওটাও উপহার দিয়ে গেল। তা তো দিল। প্লুটোকে নিয়ে পড়লাম মহা মুশকিলে। আমাকে চেনে, কোনও অসুবিধে করে না, কিন্তু কদিন পর থেকে নিজের মনিবকে দেখতে না পেয়ে ভীষণ মন-মরা হয়ে গেল। যোসেফ যখন হাঙ্গামা করছে সে সময়টা আমি প্লুটোকে নিয়ে অস্থির। খেতে দিলে খায় না। জল পর্যন্ত খুব তেষ্টা না পেলে খাবে না। বাইরের চাতালে গিয়ে মুখ উঁচু করে করুণ সুরে কাঁদে। ক্রমশই শীর্ণ হয়ে পড়ছে। কমজোরি হয়ে পড়ছে। থাবায় মুখ গুঁজে শুয়ে থাকে আর শরীরটা থর থর করে কাঁপে। মাছি ঘোরে আশেপাশে। বুঝলাম একে বাঁচাতে পারব না। যে কোনও মুহূর্তে মরে যাবে।

'ঠিক আগের দিন যোসেফ মারা গেছে, খবর এসেছে পরদিন সকালবেলা। আমি বাগানে কাজ করছি। হঠাৎ দেখি ঝাঁঝরি হাতে পাপাম্মা রান্নাঘরের দিক থেকে দৌড়তে দৌড়তে আসছে। মুখে প্রচণ্ড আতঙ্ক।

"সায়েব, সায়েব" ওর পেছন পেছন দেখি প্লুটোও আসছে। মাংসপেশীগুলো ফুলে উঠেছে শীর্ণ, কমজোরি ভাবটা আর নেই।

'দেখেতো আমি খুব খুশি। বললাম ডর খাচ্ছিস কেন? এতদিনে কুকুরটা পোষ মানল।

পাপাম্মা তেমনি ভয়ের সঙ্গে বলল—"যোসেফ, যোসেফ এসেছে।"

কোথায় রে? আচ্ছা তো! দিনের বেলায় ভূত দেখছে! এদের যা কুসংস্কার না! বললাম চল দেখি কোথায় তোর যোসেফ।

আঙুল দিয়ে প্লুটোকে দেখিয়ে বলল—'ওই যে ওর মধ্যে ঢুকেছে। রান্নাঘরে একেবারে আমার কাপড়ের মধ্যে ঢুকে গেছিল।' আমরা সবাই হেসে উঠেছি। আমি সুদ্ধু। বি. সেন সুদ্ধু।

ব্যাবিংটন গম্ভীরভাবে আমাদের সবার দিকে তাকিয়ে বলল 'আমিও প্রথমটা হেসেই ছিলাম। কিন্তু তারপর ব্যাপারটা লক্ষ্য করলাম। পাপাম্মা খেতে না দিলে খাবে না, খেতে খেতে মাঝে মাঝেই ওর দিকে চাইবে, চোখে যেন জল। কালো কালো কী রকম চোখ দেখছ তো? চাউনি যেন কুকুরের মতো নয়। কোনও মতেই নয়। আস্তে আস্তে মেয়েটার ভয় কেটে গেল। আমাকে বলল—"দেখো সাহেব, ও যে যিশুর নামে দিব্যি গেলেছিল ভাল ছেলে হবে, দেখো হয়েছে।"

'কিরে প্লুটো? হয়েছিস ভাল ছেলে?' ব্যাবিংটন অ্যালসেশিয়ানটার দিকে তাকাল। প্লুটো অমনি পেছনের পায়ে ভর দিয়ে, ব্যাবিংটনের কাঁধের ওপর দুই থাবা রেখে উঠে দাঁড়াল।

দেখে কুহু আমার দিকে ঘেঁষে এসে বলে উঠল 'বাবা রে!'

প্লুটো বলল—ঘাঁউ ঘাঁউ। তারপরে আবার থাবা নামিয়ে শান্তশিষ্ট হয়ে যেমন বসেছিল, বসে পড়ল।

বি. সেন মুচকি হেসে নিবে-যাওয়া চুরুটে অগ্নিসংযোগ করে বললেন, 'আচ্ছা একখানা আষাঢ়ে গল্প শোনালে যা হোক।'

ব্যাবিংটন গম্ভীর হয়ে গেল, বলল—'ও কীভাবে বাজারের থলি বয়ে নিয়ে আসে,

কাগজ নিয়ে আসে মুখে করে, দুধঅলা, ডিমঅলা, মাছঅলা এলেই চেঁচিয়ে ডাকে পাপাম্মাকে খেয়াল করেননি? দেখেননি কীভাবে গাল চেটে পাপাম্মাকে আদর করে, সারাটা দিন ওর পায়ে ঘোরে, রান্নাঘরে ওর হাতা-বাসন পর্যন্ত এগিয়ে দেয়!'

বি. সেন বললেন 'অনেক কুকুরই এরকম করে থাকে মিঃ ব্যাবিংটন। শেখালেই করে। আমার তিনটে কুকুর আছে, আমি জানি। মনিবকে, যে খেতে দেয় তাকে, এরা, বিশেষত এইসব পেডিগ্রি ডগগুলো ভীষণ মানে। আমার তো মনে হয় তোমার কুক ওই মেয়েটির থেকে ও তোমারই বেশি ভক্ত। খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে, এখন আর ওর খোঁজ করছে না। তোমার সঙ্গে সেঁটে রয়েছে।'

ব্যাবিংটন আরও গম্ভীর হয়ে বলল, 'সে কথা নয় আসলে রাত হলে ও আর আমার কাছছাড়া হতে চায় না।'

'কেন? এর মধ্যে বিশেষত্বই বা কী আছে?' ঘোষ সাহেব বলল।

ব্যাবিংটনের মুখ ঈষৎ লাল। বলল, 'দেখো না কেমন বেয়াড়া লোকটা। এক্কেবারে সন অফ এ বিচ। যত বলি ও মেয়েটা আমার বাপ-মা, সব। আমাকে বিশ্বাস করতে চায় না। সারা রাত আমাকে ঠায় পাহারা দেবে। টয়লেট পর্যন্ত হুশ হুশ করে ঢুকে যাবে। টয়লেটটা আউটহাউজের দিকে মুখ করে কি না। পাঁড় জেলাস শয়তানটা। দেখবে?' বলতে বলতে ব্যাবিংটন হাত বাড়িয়ে দেয়ালে একটা সুইচ টিপল।

কিছুক্ষণ পরই হলঘরের লাউঞ্জের দিকের দরজাটার বেল বাজল। ব্যাবিংটন আমার দিকে তাকিয়ে বলল 'মিসেস ঘোষ, যদি কিছু মনে না করো তুমিই গিয়ে দরজাটা খুলে দাও। একটু কষ্ট হবে, তবু তুমিই দাও, দেবে?'

আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই।'

কিন্তু তার আগেই লাফিয়ে উঠেছেন বি. সেন। দরজার দিকে যেতে যেতে বলছেন, 'হোয়াট ননসেন্স, এই ভায়োলেন্ট ওয়েদারে একজন মহিলাকে দরজা খুলতে পাঠানো?'

ব্যাবিংটন বলে উঠল—'না সেন, তুমি যেও না, লেট মিসেস ঘোষ গো, শি শিওরলি ওন্ট মাইন্ড!'

কিন্তু ততক্ষণে বি. সেন দরজার কাছে পৌঁছে গেছেন। ব্যাবিংটন হাঁ হাঁ করে ছুটে যেতে না যেতেই দরজাটা খুলেও ফেলেছেন। আমরা বিদ্যুতের মতো কতকগুলো ঘটনা চমকাতে দেখলাম। বি. সেন প্রাণপণে দরজাটা খুলে ধরলেন, সাইক্লোনিক ঝড়ের ঝাপটা সামলাতে সামলাতে পলিথিনের ওয়াটারপ্রুফ পরে ভেতরে ঢুকে এলো পাপাম্মা। এবং প্লুটো উল্কার মতো ছুটে গিয়ে পাপাম্মা আর বি. সেনের মাঝখানে তার ভয়াবহ বিশালতা নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, দুই থাবা বি. সেনের কাঁধে। দেখলাম হিংস্রভাবে সে বি. সেনের গাল থেকে মাংস খাবলে নিচ্ছে।

'শুনেছিস? অরি বিশ্বাস বেপাত্তা'—সুদেব সরকার বলল সমীরকে, 'এখনও পাবলিক জানে না।'

—'বলিস কি? এ তো অবিশ্বাস্য খবর? ফার্স্ট পেজের অ্যাঙ্কর-এ যাবে।'

—'হ্যাঁ। সে ডিটেলস বার করতে পারলে। খুঁজে আনতে পারলে তো আর দেখতে হচ্ছে না। এখন ব্যাপারটা খুন, না অ্যাবডাকশন, না স্বেচ্ছা-পলায়ন...সেটা সার্কামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স থেকে বার করতে হবে। একটু টিকটিকিগিরি আর কি।'

সমীর বলল, এই সেদিন নতুন ছবির মহরত হল অত ঘটা-পটা করে, অত খানা-পিনা নাচা-গানা। এত উল্লাসের কেন্দ্রীয় কারণই তো অরি বিশ্বাস।

—'আবার কি? কত দিন থেকে জাল পেতেছে বল তো। এতদিনে ধরা পড়ল। ধাড়ি কাতলা। আগের ছবিগুলোর দুটোই তো পাবলিক গপাগপ খেলো। প্রথমটা একটু বেশি নাটুকে হয়ে গেছিল, তা-ও।'

—'এবারেরটা জানিস তো? অরিজিৎ প্রতিভার বিভিন্ন দিকের দর্পণ বিশেষ।'

—'কী রকম?'

—'আরে আমি তো প্রেস-কার্ডে গিয়েছিলাম। পরিচালক সামন্তই বলল—এবার উনি পঁচিশ বছরে সা-জোয়ান ছোকরা থেকে বাহাত্তুরে বুড়ো পর্যন্ত সাজছেন। লিডার। অরিজিতের অ্যাকটিং, অরিজিতের মেকআপ-এর উপরই ছবিটা দাঁড়িয়ে আছে।'

সমীর বলল—'হতেই পারে। স্টেজের উপর তো চাষাভূষো সাজলে মনে হয় এই বুঝি দেহাত থেকে ধরে নিয়ে এল। আবার আঁতেল হয়ে নামলে মনে হয় আরে, এই তো সেদিন ইনিই কফি-হাউসের লর্ডস-এ বসে যুক্তি-তক্কো-গপ্পো ফেঁদেছিলেন। আচ্ছা সুদেব ওঁর 'অম্বরীষ'-এর কী হবে? বা হচ্ছে?'

—'চলছে। একেবারে তো ছেড়ে দেননি। টিমটা গড়ে ছিলেন প্রাণ দিয়ে। কাজেই চলছে। ওঁর নামেই এখন পয়সাগুলো উঠে আসছে সব। তবে ওরা একটু মিইয়ে গেছে। আমার ভাইয়ের বন্ধু আছে তো ওখানে। বলছিল টিম-ওয়ার্ক খুব ভাল কথা। কিন্তু সেটা করাতে ব্যক্তিত্ব লাগে। জ্ঞান, ভালবাসা এবং ক্রোধও লাগে। সে সব অরিজিৎ বিশ্বাসের মতো আর কারও নেই। সত্যি, ওই রকম চলা-বলা-গলা পালটাতে আর কাউকে দেখলাম না। এক কেয়া চক্রবর্তী পেরেছিল 'ভালোমানুষ'-এ।'

অরিজিৎ বিশ্বাসকে শেষ দেখা গিয়েছিল শর্মিলি সেনের গাড়িতে। শর্মিলি সেন মানে শ্যামলী তরফদার। প্রচারের প্রয়োজনে পালটে ফেলা হয়েছে নামটা। প্রাচীন শ্যামলী হয়েছে মডার্ন শর্মিলি। তরফদারটা সেতারে ছাড়া চলে না এ বিষয়ে সবাই এক মত। এবং পদবী খুঁজেতে খুঁজতে স্বভাবতই সেন। সেন পদবীটা বাংলা-জয়ী। যেমন বল্লাল সেন, সুকুমার সেন, বনলতা সেন, সুচিত্রা সেন...। দুষ্টু লোকেরা বলে শর্মিলি নয়, এঁটুলি। অরি বিশ্বাসের লেটেস্ট। শর্মিলিও রয়েছে ছবিটায়। তারই সাদা অ্যামবাসেডার-এ অরিজিৎকে শেষ দেখা গিয়েছিল। শর্মিলির শফার, ক্যামেরাম্যান ধীরু ব্যানার্জি এবং অরিজিতের নিজস্ব মেকআপম্যান শিবসাধন সেনাপতি ঠেসেঠুসে তাঁকে সাদা অ্যামবাসেডরটায় তুলেছিলেন। অরিজিৎ স্ববশে ছিলেন না।

চোদ্দ পনেরো লাখ খরচ হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। বাংলা ছবির পক্ষে যথেষ্ট। প্রচার দেওয়া হচ্ছে খুব। ডিস্ট্রিবিউটার মুখিয়ে আছে। সবারই ধারণা ছবি পড়তে পাবে না। এমত সময়ে অরিজিৎ সেটে এলেন না। প্রথমেই ফোন করা হল শর্মিলির ফ্ল্যাটে। হয়তো সেখানেই মশগুল হয়ে রয়েছে। আর্টিস্টরা যে যত প্রতিভাশীল হোক না কেন আসলে সব... সামন্ত একটা মধুর গালাগাল উচ্চারণ করল মনে মনে। কিন্তু না, শর্মিলি জানে না। না, সেদিন ওঁকে ওঁর হোটেলের ঘরেই পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। না, উনি শর্মিলির ফ্ল্যাটে যাবার অবস্থায় ছিলেন না।

এবার কোথায়? হোটেলে।

না, সাতাশে অক্টোবর থেকে অরি বিশ্বাসের চাবি ম্যানেজমেন্টের কাছে, ঝুলছে। আসেননি। না, একবারও না।

'অম্বরীষে'র অফিসে ফোন করা হল।

—'আপনারা জানেন না, আমরা জানব?' অভিমানী উত্তর।

—'সত্যি সত্যি জানেন না?'

—'মানে? আপনারা কি ভাবেন ওঁকে আমরা কিডন্যাপ করব?'

তবে 'অম্বরীষ' থেকে কিছু ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবদের ঠিকানা মিলল। প্রায় সকলেই বললেন, অরি বিশ্বাসের কোনও সংবাদই তাঁরা রাখেন না। একজন রেগে মেগে বললেন, —'আপনারা, এই আপনারাই চাঁদির জুতো মেরে তাকে আমাদের কাছ থেকে ফুসলিয়ে নিয়েছেন। আবার এত বড় আস্পদ্দা যে আমাদের কাছেই তার খোঁজে এসেছেন। পালিয়েছে? খুব ভাল কথা। এমনটাই চাইছিলুম। খোঁজ পেলেও বলব না।' পরবর্তী অভিযান আত্রেয়ী ভট্টাচার্যর আস্তানায়। আত্রেয়ী অরিজিতের ভূতপূর্ব স্ত্রী। অনেক চেষ্টা করে তাঁর ঠিকানা জোগাড় হয়েছে। আসলে ব্যাপারটা খুব যাকে বলে ডেলিকেট। আত্রেয়ী দেবীও এক সময়ে বহুদিন 'অম্বরীষ'-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, নাটকে অংশ নিতেন না। উনি ছিলেন শিল্পী। সেট তৈরি করা, আঁকাজোকার কাজ, পাবলিসিটির জন্যে লে-আউট তৈরি করা— এইসব দায়িত্বে ছিলেন। অরিজিতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিঁড়ে যাবার পর 'অম্বরীষ'কেও উনি ছেড়েছেন। 'অম্বরীষ'-এর ক্ষতির খাতায় উনি দু নম্বর। আজকাল এক ইনটিরিয়র ডেকোরেটর্স সংস্থায় কাজ করেন। তা, তাঁর অফিসে ফোন করায়, অরিজিতের খবর জিজ্ঞেস করা হচ্ছে শুনে উনি দ্বিতীয় শব্দ উচ্চারণ না করে ফোন নামিয়ে রাখলেন। অগত্যা ওঁর বাড়ি। দু কামরার একটা ছোট্ট ফ্ল্যাট। উত্তর কলকাতার একটা সরু গলিতে। সামন্তকে উনি চিনতেন না বলেই বোধহয় দরজা খুলে দিয়েছিলেন। অরিজিতের প্রসঙ্গ তুলতেই বললেন—'আর কত সরবো?'

—মানে? আপনি কী বলছেন আমি ঠিক...

—'বলছি, আর কত সরবো? এই দেখুন, আট বাই দশ দুখানা ঘর কুল্লে, রান্না আর খাওয়া এক জায়গাতেই সারি। বাথরুমটা রান্নার জায়গার একেবারে পাশেই। উত্তর-পশ্চিমের ফ্ল্যাট। শীতকালে কী ঠাণ্ডা ধারণা করতে পারবেন না। বাবা, মা, ভাই, বোন কেউ নেই। মানে, থেকেও নেই। আর কোথায়? আর কত সরবো?'

—'যদি একটা ধারণাও দিতে পারতেন। একটা আইডিয়া... উনি কোথায় যেতে পারেন'।

—'আইডিয়া? আমার মাথায় অত আইডিয়া আবার খেলে না, বুঝলেন? কী নাম আপনার? সামন্ত? আমি ওই ব্রথেল-ট্রথেল পর্যন্ত জানি। তারপর জাহান্নমের পথে যেতে ঠিক কতগুলো, কতরকম স্টপ আছে, থাকে, আমার জানা নেই। এবার আপনি আসুন। কই উঠুন? কুইক। আমার কাজ আছে।'

সামন্ত কপালের ঘাম মুছতে মুছতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। বাপরে। কী মহিলা। দিব্যি ঠাণ্ডা, শান্ত-শিষ্ট মনে হয় দেখলে। এ যেন কোল্ড ড্রিংক-এর বোতল। হাত বোলালে ঠাণ্ডা। ছিপি খুললেই ফোঁস্‌স।

* * *

ট্রেনটা আরও স্পিড নিচ্ছে না কেন? কী হবে এতগুলো চোতা স্টেশনে থেমে? নিদারুণ অধৈর্যে, বিরক্তিতে ষষ্ঠতম সিগারেটটা শেষ না করেই বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেন অরিজিৎ বিশ্বাস। এক ব্যাটা ভিখিরি লোপপা ক্যাচের মতো সেটা লুফে নিল। এটাই একটা অকাট্য প্রমাণ যে যতটা স্পিডে স্টেশন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কথা ততটা স্পিড নিচ্ছে না গাড়িটা। প্লেনে যাওয়ার জায়গা নয়। গাড়িতে গণ্ডগোল। গ্যারাজে অতএব। একগাদা টাকা দিয়ে ঘটা করে বিদেশি গাড়ি কেনবার মজাটা এবার বোঝো হে বিশ্বেস। অতীন, সর্বেশ্বর, মণীশ সব্বাই বারণ করেছিল। হো-হো করে তাদের কথা উড়িয়ে দিয়েছিলে। দিয়েছিলে তো? ভেবেছিলে গ্রুপ থিয়েটার হল শো-বিজ-এ মিডল ক্লাস। একেবারে মিডল মিডল ক্লাস। বড় বড় বক্তিমে করো সুযোগ পাবে। ফটাফট হাততালি। হ্যাঁ, তা-ও। রিভিউ?—প্রচুর প্রচুর। কিন্তু লক্ষ্মী কখনও ঝেড়ে কাশবে না, দাদা! ঢাকের দায়ে মনসা বিককিরি। তা সেই গ্রুপ থিয়েটারের ওরা দেশি-বিদেশির তফাত আর কী বুঝবে?

যেমন চোতা ট্রেন, তার তেমনই চোতা ফার্স্ট ক্লাস। বাথরুমে বেসিনটা ফটাস করে খুলে এল। মানে কোনও শ্রীমান তাকে সরাবেন শিগগিরই। কাজ এগিয়ে রেখেছেন। সপ্তম সিগারেটটা ধরালেন অরিজিৎ। রাত বাড়ছে। রাত। আহা কত? রাত বড় ভাল মাল। ঝিকমিক ঝিকমিক আলো। চেনা মুখ অচেনা। অচেনা মুখ যেন বড় চেনা চেনা ঠেকে হে। খাও দাও বেপাত্তা হয়ে যাও। কে তোমায় চ্যাং-দোলা করে তুলে নিয়ে গেল, কার সঙ্গে কী বোঝাপড়া হল, কাকে কাকে চুমু খেলে, সব রঙিন বুদবুদের মতো ফেটে যায়, আবার গজায়, আবার ফাটে, আবার গজায়। আর সকাল? সকাল হল শালা ঘেয়ো কুকুরের বাচ্চা। ছাল চামড়া সুদ্দু উঠে গেছে। ছ্যাঃ। খোঁয়ারি ভাঙার সকাল। অন্য সময়। অন্য সময়ে মেজাজে থাকলে তুমি সকাল, দুপুর-বিকেল কিছুর পরোয়া করো না অরি বিশ্বেস। করো না কি? নাঃ, করি না। কাজ করি। কা-জ। এমন কাজ যে হোল ওয়ার্ল্ডের তাক লেগে যায়। এই পাঁচ ফুট সাড়ে এগারো ইঞ্চির খোলে ডিনামাইট ঠাসা আছে হে সামন্ত। পাল্লা দিতে চেষ্টা কর। পারবি না।

আরেকটু পরেই এরা ডিনার দেবে বলেছে। ইংলিশ ডিনার আবার। হাঃ হাঃ। পায়রার ঠ্যাং, বেমালুম পায়রার ঠ্যাং চালাবে মোরগার ঠ্যাং বলে। ঘোড়ার পেচ্ছাপের মতো চা খাইয়েছে কয়েকবার। এবারে পায়রার ঠ্যাং। রাসকেল সব, স্কাউন্ড্রেল। গোটা রেলওয়েজ, রেলওয়ে মিনিস্ট্রি। এদের চাকরিতে যে যেখানে আছে, সব, স—ব। পয়সা নেবে, গলায় গামছা দিয়ে, দেবার বেলায় লবডঙ্কা। এদিক থেকে হিন্দি ফিলমও

সৎ। পাবলিক রেপ চায়, রেপ দেয়, মারদাঙ্গা চায়, মারদাঙ্গা দেয়। আধ ন্যাংটো মেয়েছেলে দেখতে চায়, তো তাই দেয়।

সুটকেসটা খুললেন অরিজিৎ। মাল বার করতে হবে। নইলে পায়রার ঠ্যাং গলা দিয়ে নামবে না। সামনে আবার তিনটি পুঙ্গব বসে। বহুক্ষণ থেকে গবাদি পশুর মতো চেয়ে আছে। হয় বাইরের দিকে, নয় তাঁর মুখের দিকে। চিনতে পেরে থাকবে। চেনো বাবা, চেনো। খালি ভাব জমাতে যেও না। আর 'চরণামেত্তো'ও আশা কোর না। যারা একা একা মাল এনজয় করতে পারে না, অরিজিৎ তাদের দলে নয়। তা কয়েক ঢোক খাবার পরে দেখলেন পুঙ্গবগুলি প্রকৃতি দেখছে। অদূর ভবিষ্যতে যখন গপ্পো ফাঁদবে তখন কিন্তু ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে যাবে—'জানিস ফটিক, অরিজিৎ বিশ্বাসের সঙ্গে সেবার ট্রাভল করছিলুম। কী সদাশয় ভদ্রলোক : খুব গপ্পে। যা জমেছিল না। শেষ কালটা মানিক-অরিজিদ্দা, অরিজিদ্দা-মানিক'...ইত্যাদি ইত্যাদি।

ট্রেনটা হঠাৎ হেঁচকি তুলে থেমে গেল। এতক্ষণ বেশ 'আমি যাব না, তুমি যাবে না, তুমি যাবে না আমি যাব না' করে যে করে হোক চলছিল। এখন যেন গোঁত্তা খেয়ে ঘুড়ি লাট খেয়ে পড়েছে। বোতলটা ঢুকিয়ে সুটকেসের ডালা বন্ধ করে দিলেন অরিজিৎ। বাইরে পৃথিবীর আদি রঙ, নিকষ কালো। বন-জঙ্গলের মতো মনে হচ্ছে জায়গাটা। উঠে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। উলটো দিকের সিট থেকে একটি যুবক চেঁচিয়ে উঠল—'স্যার, এখানে নামতে যাবেন না, অন্ধকার, অনেক নিচু, তাছাড়া ভীষণ ডাকাতি হয় এ লাইনে। দরজা একদম খুলবেন না, কাইন্ডলি।'

অপাঙ্গে একবার চেয়ে দেখলেন অরিজিৎ। ডাকাত। মানে দস্যু। মানে গুণ্ডা? অর্থাৎ মাফিয়া? সর্বনাশ। তিনি ফিরে এসে অষ্টম সিগারেটটা ধরালেন। হঠাৎ মনে হল পকেটে বিছে কামড়াচ্ছে। টেলিগ্রাম। টেলিগ্রাম। হোটেলের কাউন্টারে খোঁয়ারি ভাঙার সকালে আকাট টেলিগ্রাম একখানা। পাঁচ দিন না সাড়ে ছ দিন পার হয়ে গেছে। পোস্টাল সার্ভিস কী তোর বাপের? যে টেলিগ্রাম করলেই সঙ্গে সঙ্গে দিতে হবে। কী আছে ওতে জানেন অরিজিৎ, তবু আরেকবার খুলে পড়তে লাগলেন। তিনটে শব্দ। ব্যাস আর কিছু না। এখন তাহলে আমি কী করব। হাততালি কুড়োতে পারি, কনট্র্যাক্ট সই করতে পারি, মাল খেতে পারি। কিন্তু হনুমানের মতো লম্ফ তো দিতে পারি না। আর সব স্পোর্টস ছেড়ে এখন পশ্চিমবঙ্গে এই লম্ফ দেওয়ার খেলাটিই প্রোমোট করা উচিত। ট্রেন ধরবে? পাথর পাতা স্ট্র্যান্ড রোড দিয়ে রে রে করে আসছ! জ্যাম। কুছ পরোয়া নেই। গুনে গুনে দশ পা পিছিয়ে যাও তারপর রই রই করে স্পিড নিয়ে লাফ ঝাড়ো, এক লম্ফে হাওড়ার পুল, দুই লম্ফে হাওড়ার নতুন অ্যানেক্স। হাজরা মোড় থেকে ঠনঠনে পর্যন্ত জলে ভাসছে? পঁচিশ মিনিটের প্রবল বর্ষণে কলকাতার জনজীবন বিপর্যস্ত? আবারও ওই উল্লম্ফন ভরসা। লাফ দাও বঙ্গ সন্তান, লাফ দাও। লাফ দিতে দিতে শিরদাঁড়ার তলার হাড়টি বাড়তে পারে। কার্টিলেজ, শক্ত হাড় নয়। এর নাম অভিযোজন। সোজা বাংলায় অ্যাডাপ্টেশন। এয়ার পিলো মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়লেন অরিজিৎ।

*　　　　*　　　　*

—'আমি এবার যাই খোকা, আমার কেমন সব ত্যাগ হয়ে যাচ্ছে।'

—'সে কী? রাগ করেছ? এত অভিমান করে না মায়ি। বিহার শরিফে ট্রাক নিয়ে

গেছি। ন দিনের জায়গায় পনেরো দিন। এরকম একটু আধটু হয়েই থাকে মাগো। অপরাধই যদি হয়ে থাকে এবারের মতো মাফ করে দে মা। আর কখনও এমন হবে না।'

—'না রে, অভিমান-টান নয়। একটুও উদ্বেগ হয়নি আমার। সেটাই আশ্চর্য। জানিসই তো আগে তোর ফিরতে দেরি হলে কেমন মুখ শুকিয়ে আমসি করে থাকতুম। এখন, এবার এসব কিছু হল না খোকা। তুই সাবালক হয়ে গেছিস। নিজের পথে চলবি।'

—'মা, মা, মা, তুমি বেঁচে আছ তো? কথা আছে। কথা ছিল। অনেক।'

—'মা তুমি চুপ করে থেকো না। একটু কথা বলো। একটু।'

—'স্যার, স্যার আপনার কি কোনও কষ্ট হচ্ছে?'

ধড়ফড় করে উঠে বসলেন অরিজিৎ।

—'ঘুমের মধ্যে খুব যন্ত্রণার শব্দ করছিলেন।'

—'ওহ্‌ সরি। সরি টু হ্যাভ ডিসটার্বড ইউ।'

অরিজিৎ মাথার এলোমেলো চুলের মধ্যে দিয়ে আঙুল চালালেন। ঢক ঢক করে জল খেলেন খানিকটা। নবম সিগারেটটা ধরালেন। ভোর হয়ে আসছে। ঘুমজড়ানো প্ল্যাটফর্ম সব পার হয়ে যাচ্ছে। আধো আধো গলায় 'চা-গ্রম।'

এই এদিকে দেখি, দু গ্লাস, হ্যাঁ। যাক পৌঁছনো গেল। তাহলে পৌঁছনো যায়।

ফাঁকা ফাঁকা জায়গাটা। যখন মাকে রাখতে এসেছিলেন, তখন আরও ফাঁকা ছিল। এখন অনেক বাড়ি ঘর। দোকান পাট। চায়ের স্টল। ধাবা। টেম্পো, অটো, সাইকেল রিকশা। কিন্তু বাগান-ঘেরা ছোট্ট বাড়িটিতে বসে মনে হল কিছুই নেই। যা কিছু আপাত পরিচিত, জীবন-যাপনের যন্ত্রাংশ, কিছুই নেই। মা-ও তো নেই। মা সেবা-ভবনে। অথচ এই ছোট বাড়িটাতে মা যেন আছে। সেই গর্ভধারিণী যিনি এক হাতে বড় করে তুলেছিলেন একটি শিশুকে, একটি বালককে। একটি কিশোরের, একটি যুবকের যিনি সব বুঝতেন। এক সময়ে তিনি মা বাবা-দাদা-দিদি-বন্ধু-সবই ছিলেন। সেই মা-ই তো? না, মা তো নয়। যেন জননী-জননী মনে হয়।

অল্পবয়সী ডাক্তারটি বললেন—'সঙ্কটটা কেটে গেছে। হার্ট ডাইলেটেড। এদিকে প্রেশার বড্ড ফ্লাকচুয়েট করছিল। ভাবিনি বাঁচাতে পারব।'

মা ক্ষীণকণ্ঠে বলে—'হ্যাঁ, ওকে ভাল করে বলো। নইলে ও ভাববে...'

ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে মার দিকে চেয়ে অরিজিৎ বললেন—'থামো তো তুমি....!'

মা বিছানা ছাড়ল। ধীরে ধীরে বাগানে বেড়াচ্ছে আজকাল। ভোরে একবার, সন্ধ্যায় একবার। সঙ্গে অরিজিৎ —'মা তুমি বল পাচ্ছ তো শরীরে?'

—'পাচ্ছি। কিন্তু খোকা কত দীর্ঘদিন আমাকে দেখিস না। আমি থাকলেই বা কী? গেলেই বা কী! যুক্তি দিয়ে বোঝ। বোঝবার চেষ্টা কর।'

—'ঠিক আছে। যুক্তি দিয়েই বুঝি। মা, তুমি আছ, কোথাও আছ, এই জ্ঞানটা আমার বেঁচে থাকার পক্ষে, কাজ-কর্ম করার পক্ষে দরকার। তুমি দূরে থাকলেও আছ তো! ইচ্ছে করলেই দেখতে পাব। না হলে আমার সব গোলমাল হয়ে যায়।'

মা খুব মৃদু কণ্ঠে বলল—'আমি থাকলেও কি গোলমাল আটকাতে পারি খোকা?'

অরিজিৎ অনেকক্ষণ ধরে ভাবলেন, তারপর বললেন—'হয়তো পারো। ইচ্ছে করলে।' তাঁর মাথার মধ্যে একটা স্তব্ধতা, আশরীর কেমন একটা শৈথিল্য, আলস্য। প্রবল ঝঞ্ঝাবাত্যা থেকে কোনও গতিকে রক্ষা পেয়ে যদি তার নৌকো পায় সুবাতাস, শান্ত জল, সবুজ দ্বীপ, তাহলে নাবিক যেমন ডাঙা আর ছাড়তে চায় না, তেমনই।

হঠাৎ একদিন খেয়াল হল। জিজ্ঞেস করলেন—'মা, তাই তো! তোমার গুরু কই?'

মা হাসল, বলল—'কই? গুরু নেই তো!'

—'তবে? তোমার ঠাকুর? যার জন্য তোমার নাকি সব ত্যাগ হয়ে গেল?'

মা সন্তর্পণে ফুলের গাছগুলোতে হাত বোলাতে লাগল—'এখানে তোর ভাল লাগছে না?'

'ভাল লাগছে বৈকি! এত সুন্দর জায়গা! এমন নিঃশব্দ। আমার ভিতরটা জুড়িয়ে যাচ্ছে।'

মা নিচু হয়ে একটা গোলাপ গাছের ফুল সুদ্ধু ডাল সাবধানে তার দিকে ফিরিয়ে বলল—'দ্যাখ।'

অদ্ভুত উজ্জ্বল মভ্ রঙের গোলাপ। আকারে প্রায় একটা মাঝারি চন্দ্রমল্লিকার মতো। মভ্ গোলাপ অরিজিৎ কখনও দেখেননি। শিশিরে ভেজা। অদ্ভুত কোমল, মসৃণ স্পর্শ।

—'আরও আছে' মা বললো।

গাছে গাছে যেন তারা ফুটে রয়েছে। সাদা তারা, নীল তারা, আলতা রঙের তারা। বিশাল সাদা ক্যাকটাসের ফুল ফুটেছে। তার বাইরেটা সাদা, ভিতরটা হলুদ।

একদিন আবিষ্কার করলেন খুব ভোরবেলায় মেয়েরা সব ঝুড়ি ঝুড়ি ফুল আনে। আর একটা বেদির উপর মা তাদের সঙ্গে মিলে ফুলের নকশা বানায়। ঘন ঠাসবুনুনি সব নকশা! গন্ধে-বর্ণে যেন নন্দন-কানন।

—'এই বেদিটাই তাহলে তোমার ঠাকুর!' মা কিছুই বলল না। সব উত্তরই যেন তাঁকে নিজেকে খুঁজে পেতে হবে। কিন্তু রোজই ভোরে এসে তিনি দেখতে থাকেন শ্বেতজবা, মভ্ গোলাপ, কদম্ব, শিরিষ, কুমুদ, যুঁই, ফুলের পরে ফুল, ফুলের পাশে ফুল। অখণ্ড মনোযোগে নকশা তৈরি হচ্ছে।

মেয়েদের জিজ্ঞেস করেন—'কী করিস তোরা? যে যার জীবনের নকশা খানা ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করছিস না কি?'

—'যা বলেন', মেয়েরা দুলে দুলে হাসে, তারপর আবার ফুলের মধ্যে ডুবে যায়। দেখতে দেখতে একদিন কেমন জেদ চেপে গেল। অরিজিৎ বললেন—'ঠিক আছে। আমিও সাজাব। অনেক নির্মাণ তো করলাম জীবনে, দেখি এটা কেমন পারি। দে আমাকে ফুল দে।'

মায়ের বাড়ির মেয়েগুলি হাসে—'নিজের ফুল আপনাকে নিজেকেই বেছে নিতে হবে, এটাই নিয়ম।'

অরিজিৎ হাত বাড়িয়ে তুলে নিলেন। বিচিত্র বর্ণের সব বোগেনভিলিয়ার মতো পত্রালি।

মেয়েরা বলল—'বাঃ, আরক্ষা নিয়েছেন দাদা। ভালো। ভাগ্যবান আপনি।' তখন তিনি তুলে নিলেন লাল রঙের, সাদা রঙের, হলুদ রঙের গোলাপ। মেয়েরা যেন

রুদ্ধশ্বাসে চেঁচিয়ে উঠল—'শরণাগতি। শরণাগতি। আপনি কিন্তু শরণ নিয়ে নিলেন দাদা মনে রাখবেন।'

—'কীসের শরণ? কার শরণ?' সব কিছু উড়িয়ে দেবার হাসি হাসতে হাসতে অরিজিৎ ডবল রজনীগন্ধার ছড়িতে হাত রাখলেন। মেয়েরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল— 'অ্যাসপিরেশন। অভীপ্সা বাছলেন দাদা।' অরিজিৎ তুলে নিলেন আকন্দ। ওরা উদ্বিগ্ন হয়ে বলল—'সাহস, সাহস! ঠিক আছে তবে সাজান এবার। বেদীর নৈর্ঋত কোণটুকু আপনার জন্যে ছেড়ে রাখলাম।'

সেই থেকে অরিজিৎ সাজান। কখনও অভীপ্সার গুচ্ছ মাঝখানে লম্বা ফুলদানে উল্লম্ব রেখায় বসিয়ে তার চারদিক ঘিরে শরণাগতির চক্র রচনা করেন। সাহসের রেখা, চক্রের অরের মতো চারদিক থেকে গিয়ে ছুঁয়ে থাকে শরণের গোলাপগুলোকে। আরক্ষার পত্রালি দিয়ে দুর্ভেদ্য বৃত্ত রচনা করেন তারপরে। কখনও রজনীগন্ধা দিয়েই শুরু করেন। তার কেন্দ্র নেই। সব সোপান। তাদের দুপাশ ঘিরে জমাট হয়ে থাকে রক্তগোলাপ। তারপরে আকন্দ, হলুদ গোলাপ। এইভাবে নানা নকশা বুনতে থাকেন অরিজিৎ। সাজাতে সাজাতে একদিন নিজেই বললেন, বাঃ। নানা রঙের বোগেনভিলিয়ার পাপড়ি পুরো নকশার উপর ছড়িয়ে দিতে থাকেন অরিজিৎ। পত্রং পুষ্পম। পত্রং পুষ্পম। কানে আসে বাড়ির দিক থেকে একটা তুরীয় উল্লাস, একটা কোলাহল যেন ভেসে আসছে। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ে।

উঠতে উঠতে অরিজিৎ একটা আলোর ঝলক দেখতে পেয়ে ভেবেছিলেন বিদ্যুৎ চমকাল। কিন্তু মুসাণ্ডার ঝাড়ের ওপার থেকে সুদেব সরকার উঠে দাঁড়াল। পাশে সমীর। সে-ই ফটোটা তুলেছিল।

—'কী দাদা। চিনতে পারছেন?' অনেকগুলো দিনের অনভ্যাস, অরিজিৎ ভুলে গিয়েছিলেন। এখন সমস্ত ব্যাপারটা ফ্ল্যাশ-গানের ঝলকের মতোই ঝট করে বুঝে ফেললেন। সুদেব তো একজন সাংবাদিক, খুব ভালো করেই ওকে চেনেন অরিজিৎ। ও-ই তাঁর সব কাজকর্মকে সবচেয়ে ভালো কভারেজ দ্যায়।

'আরে চলো, চলো। বিষ্টি পড়ছে। খোলা আকাশের নিচে কথা হয়?'

—'কীভাবে যে আপনার ঠিকানা বার করেছি। চিন্তা করতে পারবেন না অরিজিৎদা।'

—'তাই না কি? কীভাবে করলে?' উৎসুক গলায় অরিজিৎ বললেন।

—'যে সব ট্রেড-সিক্রেট বলা হবে না।' সুদেব সমীরের দিকে চোখ রেখে হাসল। ঘরে পৌঁছে অরিজিৎ পা তুলে বসলেন তাঁর তক্তাপোশে। সুদেব বসল সামনের চেয়ারে। অরিজিৎ দেখলেন সুদেব টেপ-রেকর্ডারের সুইচটা অন করছে। চমৎকার ব্যাটারি-সেটটা ওর। ঘুরে ঘুরে ছবি নিতে থাকল সমীর। সুদেব ষড়যন্ত্রীর হাসি হাসছে— 'হঠাৎ অজ্ঞাতবাসের কারণটা কী অরিজিৎদা?'

—'প্রয়োজন ছিল নিশ্চয়ই!' গলা গাঢ় করে বললেন অরিজিৎ।

—'প্রেশার না কি? খুব চিন্তা?'

—'হ্যাঁ। তবে আমার না। মায়ের। চিন্তা তাঁর জন্য?'

—'তা একটা খবর দিলেন না কেন?'

—'খবর? ...তাই তো।' ভীষণ রকমের অবাক হয়ে অরিজিৎ বললেন—'ভুলে

গিয়েছিলাম... একেবারে ভুলে...'

—'আমাকেও ঠিক কথাটা বলবেন না দাদা! সাউজি আর সামন্তর সঙ্গে টার্মস নিয়ে গণ্ডগোল তো আপনার গোড়া থেকেই! আপনাকে দিয়েই লাভ তুলবে, অথচ আপনি যা চেয়েছেন তার অর্ধেকও দেবে না...'

—'তাই তো... তুমি জানলে কোথা থেকে?'

—'আরে দাদা, আমাদের সব জানতে হয়, আমরা অবিকল জাগ্রত ঠাকুরের মতো।'

—'তা বটে। কিন্তু সে-জন্যে তো আমি চলে আসিনি সুদেব!'

—'জানি দাদা, শর্মিলি সেন... প্লিজ কিছু মনে করবেন না, ওকে এড়ানো ভগবানের বাবারই সাধ্য নেই, তো আপনি!'

—'শ-র্মি-লি সেন? ও হ্যাঁ। শর্মিলি! একটু নাছোড়বান্দা টাইপের বটে। কিন্তু ওকে এড়ানোর জন্যে আমি চলে আসতে যাব কেন? একেবারে পিওর অ্যান্ড সিম্পল কারণটা। মা মরণাপন্ন শুনে মাথার মধ্যে সব কেমন হয়ে গিয়েছিল।'

টেপ-রেকর্ডারের নব খটাশ করে বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল সুদেব। মুখে হতাশা।

—ঠিক আছে দাদা, আজ বিশ্রাম করি।

'এঁদের গেস্ট-হাউসটা ভা-রি সুন্দর। শান্ত। আরে আমাদের তো স্বস্তি-শান্তি দরকার। যেভাবে বেঁচে থাকি ওকে কি আর বাঁচা বলে? বলে কোনওমতে টিকে থাকা। প্রচণ্ড ঝড় চারদিকে, এলোমেলো বাতাস, তার মধ্যে দৌড়তে হচ্ছে। এখন, পায়ের ব্যালান্স কে কতটা ঠিক রাখতে পারে। এই তো কথা।' দু হাত ছড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল সুদেব। গেস্ট-হাউজে ফিরতে ফিরতে সমীর বলল—"অরিজিৎদাকে কেমন নার্ভাস লাগছিল, খেয়াল করেছিলি?'

সুদেব আড়চোখে তাকিয়ে বলল—'উনি একজন নট, মনে রাখিস।'

—'তুই বলছিস, সবটাই অভিনয়?'

—অফ কোর্স। মায়ের অসুখ! লাখ লাখ টাকার প্রজেক্ট, বন্ধু-বান্ধবী, এত্তো জানাশুনো কাউকে কোথাও কোনও খবর দেওয়া নেই। ইয়ার্কি নাকি?'

—'অন্য কিছু বলছিস?'

—'আই বেট।'

—'অগাথা ক্রিস্টির কেসটা মনে আছে? স্বামী আর বান্ধবীর বিশ্বাসঘাতকতার শকে স্মৃতিভ্রংশ হয়ে গিয়েছিল। শর্মিলির সঙ্গে... সে রকম কিছু...'

—'শর্মিলি নয়। শর্মিলি নয়। যবনিকার অন্তরালে কেউ আছে... কেউ... উঃ' সুদেব নিজের বাঁ হাতের পাতার ওপর ডান হাত দিয়ে ঘুঁষি মারল।

—'মায়ের অসুখ দিয়ে স্মৃতিভ্রংশ হয় না। স্টোরিও হয় না। ঠিকই।' তারের পাপোশে জুতোর কাদা তুলতে তুলতে সমীর মন্তব্য করল।

—'কাল আবার...'

—উহুঁ। কাল নয়। দুটো দিন সময় দে। আমরাও চারদিকটা একটু দেখে নিই। কে জানে সেই শ্রীমতী এখানেই কি না!'

—'ইতিমধ্যে আর কেউ গন্ধে গন্ধে এসে পড়লে?'

—'সম্ভব নয়। তবু যদি আসে, আসবে। ঘাবড়াচ্ছিস কেন?'

—'ও কী তুললেন দাদা?' মায়ের বাড়ির মেয়েগুলি শিউরে উঠল।

মুঠো ভরা বড় বড় নীল অপরাজিতা নিয়ে অরিজিৎ বললেন—'কেন? কী হল?' তিনি তুললেন রক্তকরবী। মেয়েগুলি কাঁপছে। অরিজিৎ বললেন—'রোজ রোজ একই ফুল দিয়ে কত আর নকশা করা যায়। আজ নতুন কিছু বানাব। এই করবীকে তোরা কী বলিস?'

—'সংগ্রাম।'

—'আর এই নীল অপরাজিতা?'

মেয়েদের দলে কাজের ধুম পড়ে গেল। ভীষণ ব্যস্ত। কেউ দীপ সাজাচ্ছে, কেউ ধূপ জ্বালাচ্ছে। কেউ রাশীকৃত পাতা ঝাঁট দিচ্ছে। কেউ ঝারিতে করে জল আনছে। অরিজিৎ শেষ উত্তরটা পেলেন না।

নীল অপরাজিতা আর রক্তকরবী, ডগডগে গাঢ় সব রঙ। তবু বড় সুন্দর মানিয়েছে। মাঝখানে উঁচিয়ে আছে মুদিতকলি রজনীগন্ধা। গোলাপের পাপড়ি দিয়ে বৃত্তের পরিধি শেষ করলেন অরিজিৎ।

...প্রচণ্ড ঝড় দিচ্ছে চারদিকে। তারই মধ্য দিয়ে দৌড়তে হচ্ছে। এখন পায়ের ব্যালেন্স কে কতটা ঠিক রাখতে পারে। ... কোন নাটকে ছিল সংলাপটা। কে কাকে বলেছিল? মাথার মধ্যে বোলতা ঘুরছে, ভোঁ ভোঁ। এলোমেলো বাতাস। প্রচণ্ড ঝড়। পা রাখা যাচ্ছে না। কিন্তু রাখতে হবে। কোথায়? কোথায় এমন পরিস্থিতি? বোলতাটা এখনও বেরল না। আরও যেন ডেকে আনছে। বোলতার ঝাঁক এখন। আলগা হয়ে যাওয়া মোটা তামার তারের ভ্যাঁ ভ্যাঁ শব্দ করে ঘুরপাক খাচ্ছে।

ডাক্তার বললেন—'এত জ্বর! সামলাতে পারছি না। অ্যান্টিবায়টিক দিই মা!'

—'দাও।'

জ্বর কমেছে। কিন্তু অরিজিৎ নিস্তেজ, নিথর, প্রেশার নেমে যাচ্ছে। আচ্ছন্ন ভাব।

—ডাক্তার বললেন—'সেবা-ভবনে নিয়ে যাই মা?'

—'যাও।'

নৈর্ঋত কোণে কী রচনা করেছে অরিজিৎ। মা এসে দাঁড়ায়। নীল, নীল, ঘন নীল। কেন এত নীল? কেন খোকা? পাশে পাশে লালের বুনট। সংগ্রামী লাল। রজনীগন্ধাগুলি খুলে গেছে। আকাশের দিকে মুখ। মৃদু সুগন্ধে সবাইকে যেন হারিয়ে দিতে চায়। গোলাপের পাপড়িগুলো মাটি কামড়ে পড়ে থাকে। জমাট। মা দেখতে থাকে। দেখতে থাকে।

সুদেব, সমীর সেবা-ভবনে রোজ আসে, যায়। ক্যামেরা খাপে বন্ধ। টেপ-রেকর্ডার চুপ। পাঁচ দিনের দিন অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠল। ডাক্তার গম্ভীর। কোনও কথাই বলতে চান না। ছ-দিনের দিন সমীরকে চলে যেতেই হয়। মা বললেন—

—'সুদেব, তুমিও যাও। কাজের ক্ষতি হচ্ছে।'

—'আমরা ওদিকের একটা ব্যবস্থা করেই আবার... তাছাড়া বড় ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করি। এতবড় একটা প্রতিভা... এভাবে...।

—'না, আসতে হবে না। অন্য ব্যবস্থার দরকার হলে করা হবে। তেমন কিছু হলে

তোমরাই আগে খবর পাবে। ঠিকানা, ফোন নম্বর সব রেখে যাও।' চমকে মুখ তুলে তাকায় সুদেব, তাকায় সমীর। মার মুখের একটি পেশীও কাঁপছে না। ভাবান্তর নেই।

নীল ফুলগুলি সব শুকিয়ে, হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে। করবীর লাল নিশান উড়ছে ঠিক। প্রস্ফুটিত রজনীগন্ধার দণ্ডগুলি ঊর্ধ্বমুখ, সমান সতেজ। গোলাপের পাপড়ি মাটি কামড়ে আছে।

ড্রিপের ছুঁচ যেখানটায় ফোটানো ছিল ইঙ্গিতে সেখানে আঙুল দেখিয়ে অরিজিৎ মাকে জিজ্ঞেস করল—'কী?'

মা হাত বুলিয়ে দেয়। আস্তে আস্তে সব তুলে নেওয়া হয়। নাড়ি স্বাভাবিক। প্রেশার স্বাভাবিক। বিছানায় আজ প্রথম উঠে বসেছে অরিজিৎ বিশ্বাস। হাতে ছোট কাচের গ্লাসে কমলালেবুর রস। মাথার দিকে মা, পায়ের কাছে মা। অরিজিৎ দেখতে পাচ্ছে খানিকটা। বুঝতে পারছে বাকিটা।

—'কী হয়েছিল বলো তো ডাক্তার?'

অপ্রতিভ মুখে ডাক্তার বলে—'যখন কিছুতেই কিছু ধরা যায় না, তখন সত্যি কথা বলতে কি আমাদের একটা স্টক ডায়াগনোসিস আছে।'

—'কী? কী সেটা?'

আমতা আমতা করে লজ্জিত ডাক্তার বলে—'ভাইরাস। কোনও অচেনা ভাইরাস।'

—'বাঃ, তাহলে বাঁচালে কেমন করে?'

—'আমি বাঁচাই নি তো? মেডিকাল টার্মসে বলতে গেলে... আসল কথা, আপনি নিজেই নিজেকে বাঁচিয়েছেন।

বেদির চারধারে মায়ের বাড়ির মেয়েগুলি অখণ্ড মনোযোগে ফুল সাজাচ্ছে। নানা রকম ফুল, নানা রকম নকশা। সাজাতে থাকে। সাজাতে থাকে।

ব্রহ্মহৃদয়

অনেক আছে, তবু কিছু নেই। অনেক লোক তবু যেন খাঁ খাঁ করছে সব। দিনে রাতে কত কাজ তবু মন পাওয়া তো দূরস্থান কাউকে যেন ছুঁতেই পারি না। বুকের মধ্যেটা কেমন হু হু করে। অথচ বিয়ের আগে সুশান্ত তো সবই বলেছিল। বলত বেশ গর্বের সঙ্গে। একটি কথাও বেচারি মিথ্যে বলেনি। সমস্ত মিলিয়ে নিয়েছি। মফঃস্বল টাউনে বাড়ি হলে কি হবে, নাকি এককালের জমিদার বাড়ি, বিশাল বাড়ি। একশবার ঠিক। দেউড়ি পেরোলে বিরাট উঠোন। চকমিলোনো। গাড়ি বারান্দার কোলে কোলে উঁচু উঁচু ঘর। কিন্তু গঙ্গার ধারে বাড়ি তো। দোতলাতেও তাই নোনা লেগেছে। তারই ওপর নীলচে চুনকাম। ঘরে ঢুকলে কেমন মন খারাপ হয়ে যায়। সুশান্তর বাবারা সাত ভাই। ছ'জন জীবিত। তাঁদের সাত স্ত্রী বর্তমান। তারও আগের পুরুষের রয়েছেন এক পিসি-ঠাকুমা। সাত ভাইয়ের ছেলে-মেয়ে, তাদের ছেলে-মেয়ে সব মিলিয়ে সাকুল্যে কত জন

হবে গুনতিতে, আমার ঠিক জানা নেই। সবার হদিস এখনও পাইনি। অর্থাৎ জমজমাট সংসার। অথচ সে রকম আড্ডা তো দেখি না, দেখি না জমিয়ে খাওয়াদাওয়া, পুজো-আচ্চা। হা হা হাসি। হাঁকডাক। ঘরগুলোতে মানুষ যেন চাক বেঁধে বেঁধে আছে। আড্ডার বদলে জটলা। অট্টহাস্যের বদলে গলা খাঁকারি, হাঁকডাকের বদলে ফিশির ফিশির।

হতে পারে আমার এই টাউনে যাকে বলে 'ভাবের বিয়ে', তাই এমনি অভিজ্ঞতা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যেবেলা রেজিস্ট্রি করে লোকাল ট্রেনে চেপে আমি শ্বশুরবাড়ি এলুম। সুশান্তর পরনে পায়জামা-পাঞ্জাবি, কাঁধে ঝোলা। পায়ে চটি। আমার পরনে গোলাপি আর হলুদ চেক-চেক দক্ষিণী সিল্ক। কানে মাকড়ি, গলায় সরু সোনার হার, হাতে একগাছি বালা, আর ঘড়ি। পাতলা স্যুটকেস হাতে নিয়ে যখন সুশান্তর সঙ্গে ভেতর-উঠোনে গিয়ে দাঁড়ালুম, কোনও পুরুষ মানুষকে ত্রিসীমায় দেখিনি। সিঁড়ির নানান ধাপে, এ ওকে ধরে কিছু কৌতূহলী নারী জনতা আমাকে অবাক হয়ে দেখছিল। শাশুড়ি গম্ভীর মুখে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে একটা সোনা-বাঁধানো লোহা পরিয়ে দিয়েছিলেন। একটু রাতে দালানে খেতে বসতে বিরাট কাঁসার বগি থালায় অনেক রকম পদ দেখেছিলুম, দিদিশাশুড়ি কাঁসার ফুলবাটিতে রুইমাছের লেজা আর মুড়ো এগিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'খেতে হয় মা, খেয়ে নাও।' সে সময়েও গয়নার ঝমঝম, ঘোমটা, খোঁপা, আলতা-পরা পা, আর চোখ ভর্তি কৌতূহল আমার আশেপাশে ঘোরাফেরা করেছিল। কিন্তু কেউ আলাপ করতে, বন্ধুত্ব করতে এগিয়ে আসেনি। কে জানে একে ভাবের বিয়ে, তায় বেজাতের মেয়ে, এইসব ভয় বোধহয় দুর্জয় মেয়েলি কৌতূহলের মুখেও কুলুপ এঁটে দিয়েছিল।

পরে আমার নিজের জায়ের মুখে শুনেছি। অমন অনাসৃষ্টির বৌ বরণ নাকি তারা জন্মেও দেখেনি। সে এসেছিল বেনারসী দলমলিয়ে, গয়না ঝলমলিয়ে, দুধে-আলতায় পা রেখে। চতুর্দিকে উলু উথলে ছিল। শাঁখের আওয়াজে আর সব আওয়াজ ডুবে গিয়েছিল। হাতের মুঠোয় ছটফটে মাছ, কপালে বরণডালা। গালে দিদি-শাশুড়ির চুমো, আর সারা বিকেল, সারা সন্ধ্যে, রাত, পরের দিন সকাল, বিকেল, সন্ধ্যে রাত, খালি জমকালো পোশাকের আসা-যাওয়া আর উপহার, চিবুক ধরে আদর আর 'আহা চমৎকার বউ হয়েছে।'

সুশান্তটা একদম বোকা। আশ্বাস দিয়েছিল 'আদর না পাও, খাতির পাবে। পল্লে বাড়ির তিনকুলে কেউ ডক্টরেটওয়ালা কলেজ প্রোফেসর বউ দেখেনি।' শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার পর দিন থেকেই আমি যথা নিয়মে ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করে কলেজে চাকরি করতে যাচ্ছি। সুশান্তর থিসিস শেষ হয়নি। সে ফীল্ড ওয়ার্কের জন্যে তখন বাঁকুড়া চষে ফেলছে। কদিন ছুটি নিয়ে যে মধু-চন্দ্রিমা না হোক মিছরি-চন্দ্রিমাও করব সে গুড়ে বালি। দিন পাঁচেক পরে আমার নিজস্ব শাশুড়ি ডেকে বললেন, 'নতুন বউমা, আমাদের যৌথ পরিবার, মোটা ভাত-কাপড়টা এখনও এস্টেট থেকেই হয়। সবাইকেই কিছু-কিছু কাজ করতে হয়। তুমি যদি তোমার ভাগের কাজটুকু না করো আমার মাথা কাটা যাবে।'

আমি বললুম—'বেশ তো, কী করতে হবে বলুন না, নিশ্চয়ই করব।'

—'সকালটা তো ইস্কুলে বেরোও, বিকেলবেলা জল খাবারের নুচি, রাতে যেটুকু রুটি হয়, তার ময়দাগুলো তুমি মেখো, বেলো।'

চারটে, কোনদিন পাঁচটায় বাড়ি ফিরে, গা ধুয়ে, চুল বেঁধে,—সুতরাং তাল তাল ময়দা মাখি, বেলি। শেষ হতে হতে রাট আটটা তো বটেই। যদি কোনদিন সন্ধে সাতটা পেরিয়ে যায় ফিরতে, ট্রেনের গণ্ডগোল বা কলেজে মিটিং থাকলে এরকম হয়েই থাকে, শাশুড়ি বলে যান—'কাল সকালে একটু ভোর-ভোর উঠো। আজ তোমার ময়দার পালা ন'বউমা সেরে দিয়েছে, ওর সকালের চা-জলখাবারটা তোমায় করে দিতে হবে।' পরদিন আমার দশটা পঁয়তাল্লিশে ক্লাস। সাড়ে ন'টার ট্রেনে যেতে না পারলে সেটা হয়ে গেল। রাতে বা ভোরে কোনও পড়াশোনা নিয়ে বসলে, হঠাৎ যদি কোনও কাজ পড়ে, কেউ কেউ বলেন, এত পড়ে-শুনেও তাহলে তেমন কিছু শিখে উঠতে পারেনি, এখনও ইস্কুলের পড়া করতে হয়! তো এই আমার খাতির।

তখন ভাদ্রমাস। প্রচণ্ড গুমোট, রুটি বেলতে বেলতে সাড়ে আটটা বাজল। কোমর ভেঙে যাচ্ছে। দোতলায় নিজের ঘরে গিয়ে জানলার ধাবে দাঁড়ালুম। ঘামে ভিজে শপ শপ করছি। কিন্তু বিকেলে এক বার গা ধুয়েছি, এখন আবার কলঘরে চানের জল পাওয়া যাবে না। জানলা দিয়ে হু হু করে হাওয়া আসছে। দূর দিয়ে একটা নৌকো চলে যাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। রাতের গঙ্গা। যেন হালকা কালি মেড়ে দিয়েছে কে নদী আর আকাশের গায়ে। একটা বাঁকা ডালে দেখলুম তিন চারটে শকুন বসে আছে, অন্ধকারে তাদের সাদা গলা ফুটে আছে। কেমন মন খারাপ হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি জানলার ধার থেকে চলে এসে বিছানার এক পাশে বসে পড়লুম। সুশান্ত টেবিলে কাগজপত্র মেলে লিখছিল। বলল, 'কী হল?'

—'কী হবে? কিছু না।'

একটু পরে ও হাতের কলম নামিয়ে রেখে বলল, 'তোমার এখানে ভালো লাগছে না, না?'

আমি কিছু বললুম না। কী হবে, বলে? ও বলল—'কতকগুলো অসুবিধে আছে ঠিকই। কিন্তু ভেবে দ্যাখো, সুবিধের পরিমাণ কিন্তু তুলনায় অনেক বেশি। কিছু কিছু কাজ করে দিতে হয়, কিন্তু দায়িত্ব নেই। অসুখ-বিসুখ করলে আপনা থেকে ডাক্তার আসবে, ওষুধ আসবে। মুখের গোড়ায় ভাত, যত দেরিতে আসো, ঠিক পাবে। বেড়াতে যেতে চাও, ঘর ফেলে চলে যাও, সেফ। যদি নিজেদের এত সব করতে হত, ভাবতে হত তবে কি আর এত নিশ্চিন্তে থিসিসটা শেষ করতে পারতুম! না, নাটকগুলোই লিখতে পারতুম।' তারপরে আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল—'একবার থিসিসটা জমা দিতে দাও না, দেখবে যাযাবরের মতো বেরিয়ে পড়ব দুজনে।'

মাঝে মাঝে যাযাবরের মতো বেরিয়ে পড়লেই যে আমার সমস্যার কোনও সমাধান হবে না একথা ওকে বুঝিয়ে লাভ নেই। মানুষ একচক্ষু। যে দিকটা দেখতে, ভাবতে অভ্যস্ত সেদিকটাই দেখে, ভাবে। অন্য দিকে চোখ ঘোরাতে পারে না। আমার এত অভিমানই বা কিসের? বাপে-তাড়ানো মায়ে-খেদানো বই তো নই, বাবা অবশ্য অনেক আগেই গত হয়েছেন। কিন্তু মা দাদারা কেউ এ-বিয়ে মেনে নিলেন না বলেই তো এত অসম্মানের মধ্যে দিয়ে আমায় শ্বশুরবাড়ি আসতে হল। সুশান্ত ভেবেছিল

পি.এইচ.ডি. ডিগ্রি আছে বলে, কলেজে পড়াই বলে আমার খাতির হবে। ও জানে না মেয়েদের সম্মান তাদের চাকরি, শিক্ষা, ডিগ্রি এসব দিয়ে হয় না। সমাজের এমন স্তর এখনও অনেক আছে যেখানে এগুলো বরং মেয়েদের অসম্মান বাড়ায়। চাকরি করে?—এ মা! কলেজ? ওই হল। মাস্টারনি! পি.এইচ.ডি? এম.এ.-র পরেও আরও পড়েছে? বয়সের কী গাছপাথর নেই গা? মেয়েদের সম্মান হয় তাদের রূপে, তাদের বাবা, স্বামী এদের পদমর্যাদায়, আর যৌতুকে। আমার রূপ? নেই। বাবা? চলে গেছেন। স্বামীর পদমর্যাদা? এখনও তৈরি হয়নি। আর যৌতুক? ভাঁড়ে মা ভবানী।

তাই এঁদের বাড়ির সব বউয়ের গুণ আছে, খালি নতুন বউমার কোনও গুণ নেই। বড় বউয়ের চোখ ঝলসানো রূপ। সেজ বউটি কেমন সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, টিপটপ, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। মেজ বউমা ছুঁচের কাজে এক্সপার্ট, বড় বড় শাড়ি, বেড-কভার ফুলে লতাপাতায় ভরিয়ে ফেলছে, অবাক মানতে হয়। ন বউমা তো সাক্ষাৎ ষষ্ঠী দেবী, মমতাময়ী জননী, কোলে কাঁখে দেবশিশুর দল। কনে বউমা! হিসেব জ্ঞান টনটনে। কোথাও এতটুকু অপচো করো তো! কনে বউমার চোখে না পড়ে পারে না। নতুন বউমা? সব চুপ।

শাশুড়ি একদিন একগোছা সোনার চুড়ি আর একটা মটর দানা দিয়ে বললেন, ‘এগুলো পরো বউমা। ন্যাড়া গায়ে ঘোরো ফেরো, আমার বড় লজ্জা করে।’

আমি বললুম—‘ট্রেনে, বাসে যাতায়াত করি, এসব তো ডাকাতি হয়ে যাবে মা।’

—‘তো বাড়িতে ফিরে এসে পরো।’ এইভাবে আমার কিছু গহনা বা সম্মান লাভ হল। আদর করে উপহার দেওয়া নয়, দায়ে পড়ে নিতান্ত ব্যাজার হয়ে হাত-উপুড়। তা তা-ই সই। সঙ্গগুণে আমারও কেমন একটা হীনম্মন্যতা জন্মে গেছ। গয়নাগুলো পরে মনে হল জাতে উঠলুম।

জগদ্ধাত্রী পুজোর দিন দুপুরবেলা দিদিশাশুড়ি বললেন—‘বউমা ভাত-পাতে আগে ঠাকুরের প্রসাদটুকু খেয়ে তারপর অন্যসব খেও।’ খিচুড়ি আর পায়েস, একমুঠো। খেয়ে চমৎকৃত হয়ে জিজ্ঞেস করলুম—এ প্রসাদ কোথাকার দিদি?’

—‘ও মা, জানো না? বামুন বাড়ির! বামুন-কর্তা বারোমাস সমস্ত শক্তি পুজো নিজের হাতে করেন যে। বামুন-মা নিজের হাতে ভোগ রাঁধেন।’

বড় জাকে জিজ্ঞেস করে জানলুম বামুন-বাড়ি আমাদের পেছনেই। নাম তারানাথ ভট্টাচার্য। পেশায় পুরোহিত বা পণ্ডিত কিছু নন, কোন মার্চেন্ট অফিসে কাজ করেন। কিন্তু অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। ভক্তিমান। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই। তাই আজ সারাদিন ধরেই খুব শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসর ইত্যাদির আওয়াজ পাচ্ছি। এ বাড়ি থেকেও ঠাকুরের পুজো বাবদ শাড়ি, মিষ্টি ইত্যাদি কীসব গেল। দিদিশাশুড়ি জোড় হাত কপালে ঠেকিয়ে বললেন—‘পুজো তো কতই হয় কিন্তু বামুন-কর্তার পুজো একেবারে সাক্ষাৎ ঠাকুরের আবাহন করে এনে প্রতিমার মধ্যে বসিয়ে দেওয়া। এমন জায়গায় পুজো পাঠাতে পারাও অনেক পুণ্যি, অনেক ভাগ্যির কথা।’

ফর্সা মতো ছোটখাটো একজন লালপেড়ে শাড়ি পরা মহিলা আমাকে আশীর্বাদ করতে এসেছিলেন বটে এ বাড়ি আসার পর। শুনলুম তিনিই বামুন মা। আর তারানাথবাবুকে আমি মাঝে মধ্যেই ট্রেনে দেখি। যাওয়ার সময়েই বেশি। আসবার

সময়েও কখনও কখনও। ফর্সা দোহারা চেহারা, চমৎকার প্রশান্ত মুখ। চুলগুলো বেশিরভাগই সাদা হওয়ায় খুব সৌম্য লাগে। শার্ট-প্যান্ট পরে প্রৌঢ় মানুষ ভিড় ট্রেনে ওঠা-নামা করেন, সৌম্যদর্শন হওয়া সত্ত্বেও কোনদিন আঁচ করতে পারিনি তিনি এত ভক্তিমান, কিম্বা নিজের হাতে সব মাতৃপুজো করবার মতো শক্তি ধরেন।

খুব কৌতূহল হল। পুজো অর্চনার আমি বিশেষ কিছুই জানি না। আমার বাপের বাড়িতে খুব একটা রেওয়াজ ছিল না। কিন্তু আমার ওই ধূপ-ধুনো, শঙ্খ-ঘণ্টা, মন্ত্র পাঠ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে যে আবহাওয়া তৈরি হয় সেটা ভীষণ ভাল লাগে। স্কুল-কলেজে পড়তে সরস্বতী পুজোয় আলপনা দেওয়া, ফল-কাটা, প্রসাদ-বিতরণ, অঞ্জলি, বা আরতির সময়ে জোড়হাতে দাঁড়িয়ে থাকা—এসব আমার ভাল লাগত।

সরস্বতী পুজোর দিন শাশুড়িকে জিজ্ঞেস করলুম—ভট্চায বাড়ির পুজো দেখতে যাব কি না। এ বাড়িতে আবার বড়দের অনুমতি না নিয়ে পাড়ার কোনও বাড়ি যাবার নিয়ম নেই। উনি সানন্দেই সম্মতি দিলেন। যখন পৌঁছলুম তখন তারানাথবাবু আরতি করছেন, বিচিত্রভাবে পঞ্চপ্রদীপ নাচিয়ে নাচিয়ে। বামুন-মা শাঁখে ফুঁ পাড়ছেন। কাঁসর বাজাচ্ছে ওঁদের নাতি, বড় মেয়ের ছেলে, আরও দুচার জন নাতিনাতনি দাঁড়িয়ে আছে। বড় মেয়েও রয়েছেন। কিন্তু পরিবেশ সত্যিই অপূর্ব।

শুধু ধূপ-ধুনোর পবিত্র ভাবদ্যোতক গন্ধই নয়, মঙ্গলবাদ্যই নয়, গাঁদা ফুলের মালায় সজ্জিত ছোট্ট সরস্বতী বিগ্রহের দেবীভাব, উপস্থিত সকলের মগ্নতা, তারানাথ ভট্টাচার্য মশাইয়ের বাহ্যজ্ঞানশূন্য তদ্গত তন্ময় পুজোর ভঙ্গি সব মিলিয়ে আমাকে মুগ্ধ করে দিল।

উপুড় হয়ে প্রণামের মন্ত্র উচ্চারণ করে, পুজো শেষ করে এদিকে ফিরলেন ভট্টাচার্যমশাই। আমাকে দেখবামাত্র ওঁর মুখে আনন্দের আভা ছড়িয়ে গেল। কেমন একটা উল্লাসের সঙ্গে বললেন—'জানতুম, আমি জানতুম, মা আমার ডাক শুনেছেন, সশরীরে এসে নিজেই নিজের পুজো নিচ্ছেন সন্তানের হাত থেকে', আমাকে জোড় হাতে নমস্কার করলেন উনি।

এগুলো বয়স্ক মানুষের অভ্যস্ত কথার কথা বলেও ধরে নেওয়া যেতে পারত, যদি না তাঁর মুখের সেই দ্বিধাহীন প্রত্যয়ের ভঙ্গিটা থাকত। বামুন-মা বলে উঠলেন 'উনি ঠিকই বলেছেন মা, তুমি যে একাধারে লক্ষ্মী-সরস্বতী। তোমার সব কথা শুনেছি মা আমরা, ঠিক চিনেছি তোমাকে।'

আমার চোখ ভর্তি করে জল এসেছিল, মুখ নিচু করে কোনওমতে বললুম—'কী যে বলেন কাকিমা, কবে থেকে ভাবছি আপনাদের পুজো দেখব, আজ এসে এত ভালো লাগল।'

ওঁরা তিনজনে স্বামী-স্ত্রী ও কন্যা আমাকে যত্ন করে বসিয়ে প্রসাদ না খাইয়ে ছাড়লেন না। খিচুড়ি, বাঁধাকপির ডালনা, বেগুনি, কুলের অম্বল, পায়েস। কী অসাধারণ যে সেই প্রসাদের স্বাদ! আমি বললুম—'এমন রান্না আমাকে শিখিয়ে দিতে হবে।' কাকিমা বললেন—'নিশ্চয়ই দেব মা। তুমি আবার এসো, তুমি এলে আমরা ভাগ্যি মানব।'

বাড়ি ফিরে এসে ঘরের দরজা বন্ধ করে আমি কেঁদে ফেললুম। জীবনে অনেক দিন

পর, কিম্বা বোধহয় এই প্রথম কেউ আমায় বড় সমাদর করল, বড় সম্মান! আমার সব কথা শুনেছেন ওঁরা? কোন কথা? অসবর্ণ-বিবাহ, পিতৃকুল শ্বশুরকুল উভয়েরই অসম্মতি, তৎসত্ত্বেও জোর করে কাগজের বিয়ে করে শ্বশুরবাড়িতে ঢুকে পড়া, স-ব? চিনেছেন আমাকে? কী চিনেছেন? কী দেখলেন যে অত আদর! আমার এতদিনের মুখের ম্লানিমা, চোখের জল, অন্তরের গ্লানি সব যে একেবারে ধুয়ে গেল। কোনকালে বাবাকে হারিয়েছি। মায়ের মুখখানা দেখিনি কতদিন হয়ে গেল। বাপের বাড়ির কারুর সঙ্গে রাস্তা-ঘাটে দেখা হলে চোখ-ফিরিয়ে নেয়। এখানে আমি আছি যেন অনাহূত অতিথির মতো। আর এই রক্ষণশীল, ভক্তিমান দম্পতি কি না অনায়াসে বলে দিলেন—'তোমাকে ঠিক চিনেছি। তুমি একাধারে লক্ষ্মী-সরস্বতী।' অন্য কিছু না, কত বড় মন, কত স্নেহ গড়া অন্তর হলে তবে কেউ একথা বলতে পারে!

এতদিন পরে আমার বোধহয় একটা জুড়োবার জায়গা হল। মাঝে মাঝেই যাই। ভট্টাচার্য দম্পতিকে কাকাবাবু কাকিমা ডাকি। গল্প করি। আমি আর কী গল্প করব, আমার জগতের লোকই নন ওঁরা। আমি শুধু শুনি। কাকিমার বাপের বাড়ির গল্প। শ্বশুরবাড়ির দেশের গল্প। একটা কোনও সূত্র পেলেই হল, সেটাকে উপলক্ষ করে উনি অনর্গল কথা বলে যেতে পারেন. সব কথা বুঝতে পারি না, তাড়াতাড়ি বলেন, তার ওপর ঢাকাই টান, কিন্তু স্নেহ আর আন্তরিকতা বুঝতে কোনও অসুবিধে হয় না। একেকদিন কাকাবাবু এসে বসেন, হেসে বলেন—'কাকিমা তোমার কানের পোকা বার করে দিচ্ছেন, না?' কাকিমা তখন বলেন—'সত্যি! তুমি কত বিদুষী। তোমার কাছে আমি মূর্খ বকবক করে মরি। কিছু মনে করো না তো মা।' আমি বলি—'বিদুষী-টিদুষী বলে আমায় লজ্জা দেবেন না কাকিমা।' আন্তরিকভাবেই বলি। বিদ্যার মূল্য কতটুকু? তা যদি ভাব দিতে না পারে?

কাকিমা একদিন বললেন—'তোমায় প্রথমদিন দেখেই লক্ষ্মী ঠাকরুণ বলে বুঝতে পেরেছিলাম মা। উঠোনে এসে দাঁড়ালে মুখ নিচু করে কিন্তু কেমন সোজা, কোথাও কোনও মিথ্যে সংকোচ নেই। লক্ষ্মী যে! নিজের সিংহাসনে দাঁড়াতে কি মায়ের মনে সংকোচ আসে?' আমি আর থাকতে পারলুম না। আস্তে আস্তে বললুম—'কিন্তু কাকিমা আমাকে তো কেউ লক্ষ্মী ভাবে না। আমি তো উড়ে এসে জুড়ে বসা একটা আপদ,—

'লক্ষ্মী যখন কাউকে দয়া করেন, তখন সব সময়ে তাঁকে চিনতে পারবে, এত সৌভাগ্য মানুষের হয় না মা।' দেখি কাকাবাবু এসে দাঁড়িয়েছেন। বললেন, 'লক্ষ্মী কে? লক্ষণ কী? শ্রী-সম্পদ যখন কল্যাণের সঙ্গে, সংযমের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখনই লক্ষ্মীর আবির্ভাব হয় মা। তোমার শ্বশুরগৃহে সম্পদ ছিল মা, শ্রী ছিল না, কল্যাণ ছিল না, সংযমও ছিল না। এবার হল। আমি মায়ের পূজা করি, টের পাই কখন তাঁর অকারণ কৃপা প্রকাশিত হয়। তোমার মধ্যে দিয়ে সেই কৃপা প্রকাশ পেয়েছে। বিদ্যার সঙ্গে সংযম, বিনয়, সম্পদের সঙ্গে মঙ্গল। তাই বলেছিলাম তোমাকে চিনেছি। তুমি নিজে চেনো না মা নিজেকে। মেয়েদের মধ্যে যখন শক্তির প্রকাশ হয় তাঁরা কি নিজেদের চিনে কাজ করেন?'

কাকিমা আসবার সময়ে বললেন—'তোমার কাকাবাবু যে তোমাকে কী চোখে দেখেছেন মা। আমাকে সবসময়ে বলেন তোমাকে যেন বিশেষ যত্ন করি।'

আমি হেসে বলি—'আপনাকে কি যত্ন করা শেখাতে হয় কাকিমা?'—

'তা নয়, কিছুই তো পারি না।' উনি বললেন, 'কিন্তু তোমাকে বড় ভালো লাগে।'

ধীরে ধীরে ভট্‌চায্যি বাড়ির বিশেষ আদরের হাওয়া আমার শ্বশুরঘরেও লাগল। প্রথমদিককার সেই বিরূপতা, উদাসীনতা, অশ্রদ্ধা এখন যেন আর নেই। বরং জায়েরা মাঝে মাঝে আমার পরামর্শ নিয়ে যান, শাশুড়িও আমার মতামত উপেক্ষা করেন না। দিদিশাশুড়ি কথায় কথায় বলেন—'বাব্বা, বামুন-কর্তা স্বয়ং তোমাকে যা মান্যি করেন নাতবউমা!' বুঝতে পারি ওঁদের মতামতই এ বাড়ির হাওয়া পালটে দিচ্ছে।

কাকা-কাকিমার স্নেহ যে অকৃত্রিম, যে কোনও কারণেই হোক আমাকে যে তাঁরা শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন, এ বিষয়েও কোনও সংশয় নেই। খালি একটা কথা আমার মনে বার বার উঠতে থাকে। ওঁরা যেমনি ভক্তিমান, শাস্ত্রজ্ঞ তেমনি কিন্তু নিষ্ঠাবানও বটে। অর্থাৎ আচার-বিচার মানেন। খুব বেশি রকম। অতিরিক্ত আচারপরায়ণতা থেকেই তো মনুষ্যত্বের যত অপমান! আমাকে ওঁরা মা বলছেন, আমার মধ্যে শক্তির প্রকাশ দেখতে পেয়েছেন। অব্রাহ্মণ বলে আমার আত্মার অপমান ওঁরা করেননি। ঠিক কথা। এই সহনশীলতা, মমতা, অন্তর্দৃষ্টি যদি ওঁরা ভক্তি থেকে পেয়ে থাকেন তো ওঁরা সত্যিই অসামান্য। কিন্তু আমার পরীক্ষা করে দেখতে খুব ইচ্ছে হয় কতটা, কতটা উদারতা ওঁদের আছে। আমি যে যুক্তিবাদী! পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর গবেষণাই আমার স্বভাব! তাই একদিন বললুম—'কাকিমা, আমাকে তো আপনারা যখন-তখন খাওয়ান। আমারও কিন্তু নিজের হাতে আপনাদের খাওয়াতে ইচ্ছে করে।'

কাকাবাবু হাসি-হাসি মুখে বললেন—'আমি যে স্বপাক ভিন্ন খাই না মা, নেহাত অসুখে-বিসুখে অপারগ হলে তোমার কাকিমা রেঁধে দ্যান।'

কাকিমা বললেন—'সে-ও কি কম হাঙ্গামা! তসর পরতে হবে। সদ্য চান করে তবে রাঁধতে হবে। রান্নার সময়ে কথা বলতে পারব না।'

আমি বললুম—'রান্নার সময়ে কথা না বলা, খুবই বৈজ্ঞানিক নিয়ম। কিন্তু তসর কেন কাকিমা? তসরের শাড়ি কি কেচে নিয়ে পরেন?'

—'না, তোলা থাকে, পুজো-টুজোর সময়ে বার করে পরি, ময়লা হলে কাচি।'

আমি বললুম—'এটার কিন্তু কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। পবিত্র মানে যা একেবারে পরিষ্কার। সাবান দিয়ে কাচা কাপড় যত শুদ্ধ, তুলে রাখা সিল্ক কাপড় কি তত শুদ্ধ হতে পারে? কাকিমা বললেন—'নাও এবার কী জবাব দেবে দাও। সরস্বতীর সওয়াল এ। শক্ত ঠাঁই।' কাকাবাবু বললেন—'সুতিবস্ত্রে যত সহজে ময়লা লাগে, তসরে তত সহজে লাগে না মা। অবশ্য তুমি ঠিকই বলেছ, ব্যাকটিরিয়ার কথা ভাবতে গেলে পরিষ্কার সাবান-গরম জলে কাচা বস্ত্রই শুদ্ধ। তবে কি জানো মা, শাস্ত্রের অনেক বিধানের পিছনেই কিন্তু যুক্তি আছে। যুক্তিগুলো কালের প্রভাবে হারিয়ে গেছে। আমরা অন্ধের মতো আচার বলে পালন করে যাই সবাই। যেমন তুলসী গাছকে পবিত্র বলা হয়ে থাকে। বাড়িতে তুলসী রাখার নিয়ম। আমি শুনেছি তুলসীর অক্সিজেন উৎপাদন করার ক্ষমতা অন্য গাছের থেকে বেশি। তাছাড়াও তুলসী ঔষধি। বহু রোগের নিরাময়ের উপায় আছে তুলসীর পত্রে, ছালে। বাড়িতে সব সময়ে যদি একটি ঔষধিবৃক্ষ থাকে গৃহস্থের কত সুবিধে বলো তো?'

আমি হেসে বললুম—'বুঝলুম। নিশ্চয়ই তুলসী-ভক্তির পেছনে বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে। কিন্তু আমি যদি চান করে পরিষ্কার শাড়ি পরে, না হয় তসরই পরলুম, আপনাকে রেঁধে দিই আপনার না খাওয়ার কোনো শাস্ত্রীয় বা বৈজ্ঞানিক কারণ থাকে কী?'

চোখ বুজিয়ে কাকাবাবু স্মিত মুখে বললেন—'যা দেবী সর্বভূতেষু অন্নরূপেণ সংস্থিতা, নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ। আমি কারো হাতে খাই না মা, শাস্ত্রীয় অন্ধতাই হবে হয়ত, কিন্তু অভ্যাস হয়ে গেছে, তবে তুমি আমার মা, তোমার যখন এত আগ্রহ নিশ্চয়ই খাব।'

আমার মনের ভেতরটা আলোয় আলো হয়ে গেল। চান করে, বাড়িতে ধোয়া সাদা কাপড় পরে রেঁধে দিলুম, খেতে বসে আমার দিকে চেয়ে বললেন—'তোমার খুব আনন্দ হচ্ছে, না মা?'

আমি শুধু হাসলাম। উনি বললেন—'আনন্দরূপং যদ্বিভাতি... আনন্দই ঈশ্বর। আমাকে খাইয়ে যদি তুমি আনন্দ পাও মা, তো সেও একরকম ঈশ্বরকেই পাওয়া। তোমার সেই পাওয়ার উপলক্ষ্য হতে পেরেছি বলে আমি ধন্য।'

মনে মনে ভাবি আমিও ধন্য, এমন একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের দেখা পেলুম যিনি আবেগের বশেই অব্রাহ্মণ-কন্যাকে মানুষের অধিক সম্মান দেন নি, মনে প্রাণে যিনি আচার-বিচারের ক্ষুদ্রতার উর্ধ্বে, সত্যিকারের শ্রেয় লাভ হলেই মানুষ এমন হয়। বিজ্ঞান-শিক্ষার বাইরেও হয়।

কাকাবাবুর মধ্যে আমি আমার বাবাকে ফিরে পেলুম, কাকিমার মধ্যে মাকে। ওঁরাও আমাকে মেয়ে বলে মনে করেন। কাকিমার অসুখ করলে আমি ওঁদের বাড়ি গিয়ে যতদূর পারি সেবা-শুশ্রূষা করে আসি। ওঁরা আমার কাছ থেকে সেবা নিতে কোনওরকম কুণ্ঠা করেন না।

শীতকালটাতে কাকাবাবুর হাঁপানি বাড়ে। খুব কষ্ট পান। কলকাতা থেকে আমার এক সহকর্মিণীর চেনা ভালো ডাক্তারকে সেবার আনলুম। তাঁর চিকিৎসায় থেকে উনি খুব আরাম পেলেন। কিন্তু ডাক্তারবাবু আমাকে আড়ালে ডেকে বলে গেলেন—'এতদিন ফেলে রেখেছেন, চিকিৎসা করাননি কেন? এ তো কার্ডিয়্যাক অ্যাজমা। হার্টের অবস্থা মোটেই ভাল নয়, যে কোনোদিন খারাপ টার্ন নিতে পারে।' ওষুধ-পত্রর ব্যবস্থা হল, খাওয়া-দাওয়ার নিয়ম হল। শিশুর মতো উনি আমার সব কথা মেনে নিলেন। ওঁদের ছেলে নেই। তিনটি মেয়েরই বিয়ে হয়ে গেছে। বড়জন ছাড়া বাকি দুজন খুবই দূরে দূরে থাকে। হার্টের কথা কী করে ওঁদের বলি। মনটা খারাপ হয়ে গেল। তবে কাকাবাবু প্রেসক্রিপশনটা হাতে করে ভালো করে দু-তিনবার পড়লেন। কিছু বললেন না।

আগস্ট মাসের সন্ধ্যেবেলা। সারাদিন মেঘ করে আছে। ভীষণ গুমোট। বিকেলের দিকে ঠিক বেরোবার মুখে ঝমঝম করে বৃষ্টি এলো। গরম কমল না। মাঝখান থেকে রাস্তাগুলো কাদায় কাদা হয়ে গেল। বাড়ি ফিরে সবে গা ধুয়ে বেরিয়েছি, বিজলি চলে গেল। গঙ্গার দিকের জানালাগুলো খুলে দিয়ে একটু দাঁড়িয়েছি, আমার এক ভাসুরের মেয়ে বলে গেল—'ও বাড়ির বামুন-মা তোমায় সকাল থেকে খোঁজাখুঁজি করছেন কাকিমা।'

—'কেন রে?'

—'কি জানি! বোধহয় বামুন-কর্তার শরীর ভালো নেই।'

মনের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। সুশান্তকে বললুম—'চলো তো আমার সঙ্গে।'

অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে ওঁদের দোতলায় উঠতে কাকিমার গলা পেলুম—'এখন কেমন বোধ করছ? কথা বলছ না কেন?'

উত্তর নেই। তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকে টিমটিমে হ্যারিকেনের আলোয় দেখলুম কাকাবাবুর মারাত্মক টান উঠেছে। চোখ বেরিয়ে আসছে একেকবারের টানে। সুশান্ত সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার আনতে চলে গেল। কাকিমাকে জিজ্ঞেস করলুম—'কখন থেকে এমন হয়েছে?'

কাঁদো-কাঁদো গলায় উনি জানালেন, কাল রাত থেকে জ্বর, সকালে প্রায় কিছুই খাননি। খালি দুধ। শেষ দুপুর থেকেই টান উঠেছে। কাকিমা ওঁর বুকে মালিশ করে দিচ্ছিলেন। বারণ করলুম, হার্টের ব্যাপার! দেখতে দেখতে টানটা প্রচণ্ড বেড়ে গেল। ওষুধপত্র যা খাওয়ার ছিল খাওয়ালুম, জিজ্ঞেস করলুম—'কাকাবাবু, কষ্ট হচ্ছে খুব? একটু ধৈর্য ধরুন, এক্ষুনি ডাক্তাব এসে পড়বেন।' বললে কী হবে, দেখছি বুকটা ওঁর হাপরের মতো ওঠানামা করছে। অনেক কষ্টে বললেন—'জল, একটু জল'। কাকিমা তাড়াতাড়ি গ্লাসে করে জল নিয়ে এলেন। তাঁর হাত কাঁপছে, বললেন—'আমার বড্ড ভয় করছে শান্তা, তুমিই খাইয়ে দাও।' আমি ফিডিং ক্যাপে জলটা ঢেলে ওঁর গলায় একটুখানি ঢেলেছি কি না ঢেলেছি, হঠাৎ উনি প্রাণপণ শক্তিতে কাপটা আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিলেন। বুকে ভর দিয়ে উঠে বসেছেন। যন্ত্রণায় চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। তারপর খানিকটা জল গলায় ঢেলে দিয়েই বিছানার ওপর কাত হয়ে পড়ে গেলেন। চোখ আধখোলা, নিশ্চল।

কাকিমা কেঁদে উঠলেন—'কী হল? কী হল? শান্তা একী ওঁর পা এমন ঠাণ্ডা কেন? অজ্ঞান হয়ে গেলেন, না কী? কী হল, বুঝতে পারলুম, কিন্তু কোন্ প্রাণে বলি? ওঁকে সান্ত্বনা দিতে নিজের চোখের জল সামলে ঠাণ্ডা সাদা পা ঘষে ঘষে গরম করবার চেষ্টা করতে লাগলুম। সুশান্ত ডাক্তার এবং অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে ফিরল। ডাক্তার ওঁর ডান হাতখানা একবার তুলে ধরেই নামিয়ে রাখলেন।

এমনি করেই শেষ হয়ে গেল কয়েক বছরের সুন্দর সম্পর্কের গল্প। বেচারি কাকিমা! খালি বলেন—'জল খাবার জন্যে অমন তেড়েফুঁড়ে উঠতে গেল বলেই বোধহয় প্রাণটা বেরিয়ে গেল, না? জলটা বোধহয় গলায় আটকে গিয়েছিল। না?' কীভাবে শোকার্ত মানুষটিকে বোঝাই যে বিশাল হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল, তার থেকে পরিত্রাণ পাবার কোনও আশাই ছিল না কাকাবাবুর।

শ্রাদ্ধ-শান্তি হয়ে গেছে। কাকিমা একদম একা। ওঁর বড় মেয়ে কলকাতায় থাকেন, তিনিই আপাতত ওঁকে নিয়ে যাবেন। বাড়ির বিলি-ব্যবস্থা হচ্ছে। ওঁর অন্য দুই মেয়েও উপস্থিত। সবাই মিলে গোছগাছ চলছে। আমিও রোজ সন্ধেয় বাড়ি ফিরেই যাই। যতদূর সম্ভব সাহায্য করি। দিন কয়েক পর। পরদিনই কাকিমা চলে যাবেন, মনটা বিহ্বল হয়ে রয়েছে, কাকিমার বড় মেয়ে একটা সুন্দর লালপাড় শাড়ি আমার হাতে তুলে দিলেন, কাকিমা বললেন—'শেষ সময়ে মুখে জল দিলে একটা শাড়ি দিতে হয়

মা আমাদের, নাও।' শেষ সময়ে? মুখে জল? সহসা শেষ দিনের শেষ দৃশ্যটা নির্মম ভাবে ঝলসে উঠল আমার চোখের সামনে। বাক্‌রোধ হয়ে গেছে, চোখ ঠিকরে আসছে, কাকাবাবু তাহলে ভালো করেই বুঝতে পেরেছিলেন মহাকাল সামনে! বিদ্যুচ্চমকের মতো এক লহমায় আমি সমস্তটা বুঝতে পারলুম। গলা বুজে আসছে, শাড়িটা ফেরত দিয়ে বললুম—'আপনি ভুল দেখেছেন কাকিমা, শেষ জল দেবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। জলটা উনি নিজে নিজেই খেয়েছিলেন।'

পরলোকের আধখোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের গতি সম্পর্কে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন আজীবন শক্তির পূজারী। শূদ্রাণীর হাতের জল পান করবার ঝুঁকিটা কিছুতেই নিতে পারেন নি।

কৈলাস থেকে কলকাতায়

কৈলাসে শোরগোল পড়ে গেছে। বোধন শেষ। এখনও মায়ের গোছগাছ শেষ হল না। মহাদেব বললেন, 'অত গুছোচ্ছ কী? বন্যায় তো সব ভেসে গেছে শুনছি। পুজো দেবে এখন তোমায়! আচ্ছা করে দেবে।' মা ফুঁসে উঠে বললেন, 'বন্যা কি আমি পাঠিয়েছি? নদীনালাগুলো সব ভেতর থেকে বুজে আসছে! তার ওপর প্ল্যানিং-এর মাথামুণ্ডু নেই। নিজেদের কর্মফলে যদি নিজেরাই ভোগে? আমার বাবা বচ্ছরে একটিবার যাওয়া, সে আমি বন্ধ করতে পারব না।'

সরস্বতী তখন লক্ষ্মীর লাল বেনারসীখানা নিয়ে গায়ে ফেলে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মা বললেন, 'তোর কি আবার মতিচ্ছন্ন হল না কি রে ছোট? খামখা লাল শাড়িখানা নিয়ে টানাটানি করছিস কেন?'

সরস্বতী ঠোঁট ফুলিয়ে বললেন, 'আজকাল মামার বাড়িতে লালের খুব ফ্যাশন। দাওই না বাবা একবার পরতে।'

লক্ষ্মী ট্যারচা চোখে তাকিয়ে বললেন, 'ইচ্ছে হয় পরো, তবে ওয়ার্নিং দিইনি বলে পরে যেন আবার দোষ দিসনি। সাদা ফ্যাকফেকে রঙের ওপর টকটকে লাল পরে জেল্লা যা খুলবে না। যেন শ্বেতকুষ্ঠ।'

সরস্বতী রাগ করে বেরিয়ে যেতে মা বললেন, 'অমন আঁতে ঘা দিয়ে কথা বলিস কেন রে বড়? তোর স্বভাব যেন দিনকে দিন বেয়াড়া হচ্ছে।'

'দেখো মা, লক্ষ্মী-লক্ষ্মী বলে অনেক দিন ভুলিয়ে রেখেছ। এই করতে নেই, আর সেই করতে নেই করে করে আমার সমস্ত প্রবৃত্তি অবদমিত হয়ে এখন অগ্ন্যুৎপাত ঘটাতে চাইছে, তা জানো? এখন তোমাদের লক্ষ্মী মেয়ে-টেয়ের কোনও দামই নেই। তা ছাড়া মুখ বুজে সব মেনে নিতেও আমি আর রাজি নই। এই রইল তোমার গাছকৌটা আর এই রইল তোমার প্যাঁচা। ক্যাটর ক্যাটর বাক্যি ওর আর সহ্য হয় না আমার।' লক্ষ্মী দুম দুম করে চলে গেলেন।

মা মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। বলে কি এরা? লক্ষ্মী গাছ কৌটো নেবে না। সরস্বতী লাল ধরবে! নাঃ, তাঁর মাথার মধ্যে সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

দূর থেকে কেকাধ্বনি ভেসে আসতে মা সাড় ফিরে পেলেন। কার্তিক আসছে। দেখা যাক ছেলেটা যদি একটা বিহিত করতে পারে। কিন্তু মায়ের সমস্যার কথা শুনে কার্তিক বললেন, 'ধুস, যত মেয়েলি কারবার! লাল পরবে না নীল পরবে, গাছ-কৌটো নেবে না কসমেটিক্স বক্স নেবে—এ আবার একটা সমস্যা হল না কি? আমার বরং একটা রিয়্যাল দরকার ছিল মা। শুনবে?'

'না শুনলে তুই ছাড়বি?' মা বিরক্ত সুরে বললেন।

'বেশি কিছু নয় মা, একটা টেম্পোর‍্যারি বোম্বাই বউ' কার্তিক লজ্জা-লজ্জা মুখ করে বললেন।

—'বলিস কি রে? তোর ইমেজ কুমার দেবতার তা জানিস! সর্বনাশ হয়ে যাবে যে রে!'

কার্তিক অভিমানী মুখ করে বললেন, 'আমি তো কুমার পরিচয় বিসর্জন দিচ্ছি না, কিছুদিনের জন্যে একটু লিভ টুগেদার করতে চাইছি কেবল। ইন্দ্র বা বৃহস্পতির মতো পরদার নয়, সুদ্ধু একটি মর্তের মেয়ের সঙ্গে লিভ-টুগেদার। গ্রীকদের জিউস যেমন করত। তোমাদের বাবা সব কিছুতেই যেন বজ্র আঁটুনি।

মা গম্ভীর মুখে বললেন, 'স্বর্গে এতো অপ্সরী থাকতে মর্তের মেয়ে? তারা তোমার সঙ্গে থাকতে রাজিই বা হবে কেন? গ্রিকদের কথাই যদি তুললে তো অ্যাপলো-ড্যাফনির ঘটনাটা কি মনে নেই? অ্যাপলোকে এড়াতে ড্যাফনি তো লরেল গাছই হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত।'

'সে ভাবনা তুমি করো না মা', কার্তিক বললেন, 'পাবলিসিটি আর টাকার জন্যে করতে পারে না হেন কাজই আর পৃথিবীর মেয়েদের অভিধানে নেই। কার্তিক ঠাকুরের গার্ল ফ্রেন্ড হয়ে দাঁড়াতে পারলে পাবলিসিটিটা কী রকম হবে আন্দাজ করতে পারছ? আর অপ্সরীদের কথা যদি বলো তো ওই পুরনো ধাঁচের ছলা-কলা আজকাল আর চলে না, বুঝলে? চৌষট্টি কলার কত অগ্রগতি হয়ে গেল তার খবরাখবর রাখে তোমার ওই রম্ভা-মেনকা-ঘৃতাচীরা?'

মা বললেন, 'এই যে শুনছি সেখানে উইমেনস লিব এসেছে। মেয়েদের নাকি নতুন আত্মসম্মানজ্ঞান। তারা নাকি আর ভোগ্যবস্তুর মতো ব্যবহৃত হয়ে চায় না।'

কার্তিক বললেন, 'রাখো রাখো, ওসব লিব-ফিব যারা করে তারা করে, সবাই কি ইয়ে মানে অত ইয়ে নাকি?'

মা নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'তুই এখন যা কার্তিক, আমায় একটু ভাবতে দে।'

'একটু তাড়াতড়ি ভাবো মা, ষষ্ঠীর সকাল হয়ে এল।' কার্তিক তুতুতু তুতু তারা বলে শিস দিতে দিতে চলে গেলেন। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঢুকলেন গণেশ দাদা পেটটি নাদা। 'মাগো।' এসেই এক ঢিপ করে পেন্নাম। গজমুণ্ড এই ছেলেটিকে বড্ড ভালবাসেন মা। যেমন বাধ্য তেমনই বিনীত। করিৎকর্মা তার ওপরে। পুরো মহাভারতখানা লিখে ফেলেছে।

গণেশ বললেন, 'কেতোটা কেন এসেছিল মা?'

‘সে আর তোর শুনে কাজ নেই বাছা।’ মা জানেন গণেশ বড্ড সরলমতি, শুদ্ধ, পূতচরিত্র, তার কানে কি ও সব সৃষ্টিছাড়া কথা তুলতে আছে?

‘আমার একটা প্রার্থনা ছিল মা’, গণেশ শুঁড় লুটিয়ে বললেন।

মার মুখ শুকিয়ে গেল, বললেন, ‘কী চাস বাছা?’

‘আমি ডিভোর্স করব।’

‘কী ভোস করবি?’

‘ডিভোর্স গো ডিভোর্স। বিবাহ-বিচ্ছেদ। কলাকে নিয়ে আর চলছে না। তুমি অনুমতি দিলই কাগজপত্র রেডি করি।’

‘কলাকে নাইয়েই তো সপ্তমী পুজো আরম্ভ হবে রে।’ মা হতভম্ব।

‘জানতুম, জানতুম। আমি কিছু চাইতে গেলেই তোমার মাথায় বাজ ভেঙে পড়বে। আমি তোমাদের ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো বই তো নয়। কোথায় ছিল একটা হাতির মুণ্ডু, ফটাস করে লাগিয়ে দিলে আমার ধড়ে, মাটির তলায় গর্ত খুঁড়ে কিচকিচ করছিল ইঁদুর ব্যাটা, ঝটাস করে তাকে আমার বাহন বহাল করলে। নুয়ে পড়া, ন্যাতানো জড়ভরত কলা, দিয়ে দিলে দুম করে তার সঙ্গে আমার বিয়ে। খেলা পেয়েছ, না? আমি কিছু বুঝি না। কার ধবধবে রাজহাঁস, কার গোলাপি পেঁচা, কার বেলা প্যাখনা-মেলা ময়ূর, নিজের এতখানি এক সিঙ্গি, খালি আমার বেলাতেই কেলে কুচ্ছিত নোংরা হাড় বজ্জাত এক ইঁদুর...’

গণেশের শুঁড় সাপের ফণার মতো ফোঁস-ফোঁস করতে লাগল। চোখ দিয়ে যেন আগুন বেরোচ্ছে। গণেশ হলকা ছড়াতে ছড়াতে বেরিয়ে গেলেন।

মা অনেকক্ষণ হতচেতনের মতো পড়ে রইলেন। কে যেন মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। মহাদেব নাকি? চোখ তুলে মা দেখলেন, নন্দী। নন্দী হাত জোড় করে বলল, ‘মা জ্ঞান হারিয়েছিলেন, অনুমতি না নিয়েই অঙ্গ স্পর্শ করেছি, ক্ষমা করুন।’

মা ক্ষীণস্বরে বললেন, ‘ক্ষমা কিসের নন্দী। ভালই করেছ, শরীরটা তেমন ভাল ঠেকছে না।’

সরিষা-পরিমাণ বিশল্যকরণী খেয়ে চাঙ্গা হয়ে গেলেন মা। উঠে বসতে নন্দী বলল, ‘একটা নিবেদন ছিল মা।’

‘তোমার আবার কীসের নিবেদন?’ মা এবার সত্যিই ভীত হয়ে পড়ছেন।

‘বলছিলাম এবার শুনছি অসুর আরও বেড়েছে মা।’

‘সে কী? আরও অসুর? অসুর তো সদা-সর্বদাই জন্মাচ্ছে, ঘুরেও বেড়াচ্ছে, তাই বলে আমার বেদিতে চড়বার আস্পদ্দা তাদের কবে থেকে হল?’

‘তা যদি বলেন, অনেক দিনই হয়েছে মা, শনৈঃ, শনৈঃ, বেড়েছে, আর তো ধ্বংস না করলে চলছে না। মানুষের বড় বিপদ।’

‘কী কী অসুর নন্দী?’

‘আজ্ঞে ড্রাগাসুর, এডসাসুর, রাজনীত্যসুর, আর করাপশনাসুর।’

‘বলো কী?’

‘হ্যাঁ মা, দশ প্রহরণে আর হবে না, অনুমতি করেন তো ব্রহ্মাস্ত্রখানা দিয়ে দিই।’

‘দাও’ বলে মা ধ্যানে বসলেন।

পাল মশাই এবার বড্ড মুশকিলে পড়েছিলেন। পঞ্চাশের পল্লীর অর্ডার পাঁচখানা অসুর করতে হবে। পাঁচ রঙের। ষাটের পল্লী এক ফিল্‌ম স্টারের ছবি দিয়ে গেছে। তার মতো মুখ বসাতে হবে মায়ের। লক্ষ্মী-সরস্বতী পরবে চোলি ঘাঘরা। সত্তরের পল্লী বলেছে সাইকেডেলিক আলোর খেলা হবে। ঠাকুর সব ফটফটে সাদা থাকবে, কিন্তু ব্রেক-ডান্সের পোজ আনতে হবে। আশির পল্লীর বায়না... উঃ!

পালমশাই আর পারেন না। এতদিন তিনি জানতেন প্রতিমা পূজা আর পৌত্তলিকতা এক নয়। অবাঙমনসগোচর ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা সহজ নয়। তাই ধ্যানের প্রথম ধাপে দেবদেবীর মূর্তি কল্পনা করা হয়। উপাসকানাং কার্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা। মূর্তিতে তিনি দিতে চান সেই সব গুণের প্রতিফলন যা মানুষের আয়ত্তে নেই, অথচ সে আয়ত্ত করতে চায়। কিন্তু অর্ডারি ফর্মে শিল্পীর ধর্মে বিরোধ বাধিল আজ। কী করবেন এখন? অনেক টাকার ব্যাপার যে! সুদ্ধু কতকগুলো পুতুলই গড়ে দেবেন; হায়, হায় এ কী বিড়ম্বনা! মাঝরাত্তিরে পালমশাই লাফিয়ে উঠলেন। যদি শাস্ত্র না মেনেই মূর্তি গড়তে হয়, তো তিনি নতুন শাস্ত্র গড়বেন। শিল্পীর দৃষ্টি দিয়ে নতুন মূর্তি।

পঞ্চাশের পল্লী ঠাকুর নিতে এসে তাঁকে এই মারে তো সেই মারে। 'এ কী? লক্ষ্মী-সরস্বতী কোথায় গেল রে? আর কার্তিক গনশা? সব চুল্লুর ঠেকে চলে গেল নাকি?' কারিগররা সব মুখ চুন করে দাঁড়িয়ে আছে, ঘর থেকে পালমশাই সিংহের মতো কেশর ফুলিয়ে বেরিয়ে এলেন। বললেন, 'পাঁচ দুর্ধর্ষ অসুর পাঁচ দিক থেকে ঘিরে ধরেছে মাকে, এই মহারণক্ষেত্রে আর কারুর স্থান নেই। আছে শুধু শক্তি। আর আছে প্রজ্ঞা। লক্ষ্মী-সবস্বতী-কার্তিক-গণেশে যত মাটি লাগত সবই মায়ের শক্তিময়ী দেহে লাগিয়ে দিয়েছি। দশ হাতে আর কুলোবে না, তাই বারো হাত দিয়েছি। নব প্রহরণ তৈরি করছি। এখন এই মূর্তি যদি পছন্দ হয় নাও। নইলে বায়নার টাকা ফেরত দিচ্ছি।

পুজো কমিটির জয়েন্ট সেক্রেটারি পান্তু বললে 'বোম্বাই সাইজ হয়েছে কিন্তু রে ঘোঁতনা। দুদ্দান্ত। তা ছাড়া এখন আর ভাল ঠাকুর পাবোই বা কোথায়? তা পালদাদু, পাড়ার বুড়োরা আবার মারতে আসবে না তো? আর পুরুত? রাজি হবে তো এ ঠাকুর পুজো করতে?'

পাল মশাই বললেন, 'না পেলে আমায় জানিও।'

ছেলে মেয়েরা সব যে যার মতো কিম্ভূতকিমাকার সেজে বসে আছে। কাঁই নানা, কাঁই নানা করতে করতে কলা গঙ্গাচ্চান করে এল। মা আড়ে দেখলেন কোরা কাপড়ের আড়ালে কলার মুখখানি শুকনো, লম্বোদর শুঁড়ের তলা থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁকে ভেঙাচ্ছেন। ও দিকে ষড়াননের নজর মণ্ডপে যত মেয়ে সেজে গুজে আসছে যাচ্ছে সব্বার ওপর দিয়ে চক্কর দিয়ে দিয়ে ঘুরছে। জুতসই গার্লফ্রেন্ড খুঁজছে। মা বললেন, 'দুর দুর, ছাইয়ের সপ্তমী পুজো। নন্দী, আমার দেখছি এবার বাপের বাড়ির পাট সত্যি সত্যিই উঠল। সান্ধ্য আরতি শুরু হয়েছে কি হয়নি পুষ্পক হুশ করে ওপরে উঠে গেল। একের পর এক মণ্ডপ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে পুষ্পক। হঠাৎ নন্দী বলল, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও তো ভৃঙ্গি, মা দেখুন দিকি একবার!' ঠিক পঞ্চাশের পল্লীর মণ্ডপের সামনে পুষ্পক ভাসছে। তৃতীয় নয়নের দৃষ্টি বস্ত্রসজ্জা ভেদ করে চলে গেল। মা দেখলেন মহিমময়ী মূর্তি। একলা

একলেশ্বরী। গুনগুনিয়ে বললেন, 'এইখানে মোর স্থান।'

নন্দী-ভৃঙ্গি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে মাকে নামিয়ে দিল। কৈলাসে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হলেই হয়েছিল আর কি! শক্তিময়ী হলে হবে কী। কেঁদে কেটে একসা করতেন। ড্যাং-ড্যাড্যাং-ড্যাং করে মহাসমারোহে সন্ধিপুজো হয়ে গেল। পঞ্চাশের পল্লী নাকি এবার প্রতিমায় ফার্স্ট প্রাইজ পাচ্ছে। উল্লাসও তাই আকাশ ছোঁয়া। ধুনোর ধোঁয়ায় মায়ের চোখ দিয়ে গলগল করে জল পড়ছে। আওয়াজে কানের দৈবী পর্দাও ফেটে যাবার জোগাড়। তবু মায়ের মুখে প্রশ্রয়ের মৃদু হাসি। আহা, করুক করুক, করে নিক। চৈতন্য হলে আর করবে না।

গলায় কাঁচা ঢেলে ধুনুচি নাচছে মাতব্বররা। নবমীর রাত। হঠাৎ ঘোঁতনা বলল, 'হাজার পঁচিশেক টাকার হিসেব পাচ্ছি না কেন রে পান্তু? রিসিটটা কাটা রয়েছে অথচ টাকা নেই! সব শালা তুই যে অ্যাডগুলো এনেছিলি তার টাকা!'

পান্তু বলল, 'সেক্রেটারিকে কোশ্চেন করছিস? তাও আমোদ-আহ্লাদের মাঝ মধ্যিখানে? জানিস তোকে ধুনুচিতে ফেলে নেত্য করতে পারি?'

'তবে রে চোট্টা। ওই টাকা তুই হয় গাপ করেছিস, নয় অখিলদার পার্টি ফান্ডে দিয়েছিস। কদিন ধরেই দেখছি তুই অখিল বিশ্বাসের পেছন-পেছন ঘুরছিস!'

'ভাল হবে না ঘোঁতনা,' বলে একখানা পাকসাট দিয়ে পান্তু ঘোঁতনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রথম দিকটায় কেউ ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি। সেক্রেটারি আর ট্রেজারারের টাকা-পয়সা নিয়ে ঝগড়া এটা বোধগম্য হতেই সব্বাই দু ভাগ হয়ে গেল। এ বলছে ও ঠিক, ও বলছে এ ঠিক। কে কাকে মারছে, কে কার বুকের ওপর চড়াও হচ্ছে, দেয়ালের সংে মাথা ঠুকে দিচ্ছে শেষ পর্যন্ত আর হিসেব রইল না। সে এক কুরুক্ষেত্র কাণ্ড। পিলপিল করে অত লোক কোথা থেকে হঠাৎ মারামারিতে সামিল হয়ে গেল তাও বোঝা গেল না। অনেকেই আবার তারস্বরে মত দিতে লাগল এ সব ও পাড়ার কারসাজি। এ পাড়ার পুজো ভণ্ডুল করতে লোক লাগিয়েছে। সুতরাং লাঠি সোঁটা, ছোরা পেটো নিয়ে ও পাড়ার উদ্দেশেও ছুটে গেল বহু লোক।

মা প্রথমটা নবমী পুজোর ঘোরে ছিলেন। ঘোর ভাঙতে দেখলেন পুলিশ। কাঁদানে গ্যাস, লাঠি চার্জ, পালটা ইট-পাটকেল, বোমা, সোডার বোতল, গুলি। বেশ কয়েকটা লাশ পড়ে গেছে। কিন্তু পুলিশ তো মারছে মানুষ। মনুষ্যবাহন অসুর তো তারা মারতে পারবে না। অতএব মা তাঁর একাদশতম আয়ুধ কোষমুক্ত করলেন। ওপর থেকে একটা বিপবিপ সংকেত না? মা বুঝে গেলেন হায়ার অথরিটি চার্জ নিচ্ছে। তবে কি কল্পান্ত হয়ে এল। এ সব মহাপ্রলয়ের মহড়া? খেয়োখেয়িতেই এবার মনুষ্য জাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে?

দর্পণ বিসর্জনের অনেক আগেই মা থমথমে মণ্ডপ ছেড়ে গজে উঠে বসলেন। প্রতিমাটির চকচকে চোখে কিছু চোখের জল ফেলে গেলেন। হাজার হোক মা তো! মেয়েও তো।

পঁচিশ শো-র এঞ্জেল সিটিতে

এঞ্জেল সিটির ফর্টিসেভেনথ স্ট্রিটে অর্থাৎ শহরের প্রায় প্রাণকেন্দ্রে কালকন বা কালী কনশাসনেসের অফিস, কনফারেন্স হল, টেম্পল। সবই একটি বহুতলের পঁয়ষট্টিতলায়। সেপ্টেম্বরের গোড়ায় অফিসে বসে কার্যনির্বাহী সমিতির কয়েকজন সদস্যর মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল। এরা হল যুবশাখার কর্মী। বেশির ভাগ কাজকর্মই করে এরাই। যদিও গেরেম্ভারি ওপরওলারাও আছেন।

অনন্থই প্রথম তুলেছিল কথাটা। শুধু বলেছিল 'শেম।'

—'কার কথা বলছ? কেন?' রুয় ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করেছিল।

—'ক্রিসকন যেভাবে জুলন সেলিব্রেট করল...'

'কেন, চমৎকার হল তো! গর্জাস! পাপেটস বলো, ড্রেস বলো... ফ্যানটাসটিক!'

'রিং-এর মধ্যে পুরো শোটা স্লো মোশনে ঘুরে যাওয়ার আইডিয়াটাও বেশ। আচ্ছা রিং-এর মাঝখানে ক্রিসমাস ট্রি-র মতো ওটা কী ছিল বলো তো?—রিকি জিজ্ঞেস করল।'

অনন্থ বলল—'কদম গাছ। লর্ড কৃষ্ণার ফেভারিট ট্রি।'

আর্ভিন বলল—'গর্জাস অ্যান্ড ডেলিশাস! চমৎকার ভেজ ফ্রসাড ছিল। ম্যাক ফার্সনস-এর সুপারফাস্ট ফুডগুলো খেয়ে খেয়ে আমার জিভ থেকে লিভার পর্যন্ত সব পচে গেছে। মার্ভেলস অ্যান্ড ডেলিশাস ওদের ওই ম্যালপুয়া। আ উইশ আ কুড হ্যাভ মোও। আমার মাম্মি বলছিল মনে হচ্ছে গুড ওল্ড ক্যালকাটায় ফিরে গেছি।'

'শিট! তোর মাম্মির মাম্মি কখনও ক্যালকাটায় গেছে?' ঠোঁটে একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করে বলল লিজ।

'তোর মাম্মিজ মাম্মি গেছে নাকি?' আর্ভিনের গলায় যথেষ্ট রাগ।

'স্টপ ইট। আমাদের কারুরই বোধহয় চোদ্দপুরুষ ক্যালকাটায় যায়নি। তাতে কী? আর্ভিন ক্যালকাটা কালচার, ক্যালকাটা অ্যাটমসফিয়ারের কথা বলছে। সত্যি, ক্রিসকন একটা কাজের মতো কাজ করছে। সারা বছর জুলন, ডোল, রথ ইয়াত্রা কতরকম সেলিব্রেট করে আমাদের ঢার্মা অ্যান্ড কালচার বাঁচিয়ে রেখেছে—' অনন্থ মহা খেদের সঙ্গে বলল।

'করেছে ভাল করেছে, তো আমরা কী করতে পারি?' লিজ এখনও গোঁয়ার। 'পাঁচ পাঁচ দিনের গর্জাস ফেস্ট করার স্কোপ আমাদের আছে—' অনন্থ দৃঢ়গলায় বলে — 'তোরা গডেস ডুর্গার নাম শুনেছিস?'

আর্ভিন বলল—'ওহ শিওর। কিন্তু ডুর্গার সঙ্গে কালকন-এর সম্পর্ক কী?'

অনন্থ বলল— 'সম্পর্ক এই যে কালীও মাদার গডেস, ডুর্গাও তাই।'

'কিন্তু কালী জেট ব্ল্যাক...ডুর্গা...?

'রেড বা ইয়োলো। সো হোয়াট? গডেস কালীর জিভ বেরিয়ে আছে টু ব্যালান্স দ্য ফোর্সেস অফ দা ইউনিভার্স। ডুর্গার? জিভ ভেতরে আছে। মে বি টু এক্সপ্রেস দা ইনার হার্মনি অফ দা ইউনিভার্স।'

'বাট হোয়াটস ইন আ জিভ? আফটার্ল দুজনেই ওয়ারিয়র গডেস। দুজনকেই মা

ডাকা হয়। দুজনেই শকটি। এখন আর কী কী মিল বা অমিল আছে দুজনের সেটা একটু উদ্যোগ নিলেই আমরা জানতে পারি। মনে রেখো ফাইভ ডে লং ফেস্টিভ্যাল, গর্জাস ইমার্শন অ্যান্ড ডেলিশাস ফ্রসাদ। নন ভেজ।'

অনন্থকে যুবশাখার সকলেই একটু বিশেষ খাতির করে। কারণ, প্রথমত অনন্থের প্রপিতামহই কালকন স্থাপন করে হিন্দু অ্যামেরিকানদের নতুন করে নিজেদের বহুমুখী ধর্মীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছিলেন। ইউ.এস. এ.-র বেশ কয়েকটা বড় বড় শহরে কালকনের অফিস ও মন্দির আছে। প্রতিবছর সুবিধেমতো সময়ে ধুমধামসহকারে কালীপূজা হয়। মেডিটেশন, সেমিনার ইত্যাদিও বসে। নিয়মিত। দ্বিতীয়ত অনন্থের ভারতীয় নাম। অনন্থ গর্ব করে বলে থাকে আর সবাই ভুললেও তাদের ফ্যামিলি কখনও নিজেদের রুটস ভোলেনি। তাই তার নাম অনন্থ, ইনফিনিটি। নামটা প্রথমে সবাই অ্যানান্থ উচ্চারণ করত। এখন অনেক ঘষে মেজে 'অ' উচ্চারণটা আনা গেছে। যেমন কালীকেও ক্যালী হওয়ার দুর্গতি থেকে রক্ষা করা গেছে।

একুশ শতকের গোড়ার দিকে চতুর্থ প্রজন্মের ভারতীয়রা টিউটনিক নাম নেওয়া পছন্দ করছিল। বিল বাসু, হার্বার্ট বিলিমোরিয়া, ডিক চ্যাটার্জি ইত্যাদি। কিন্তু তারপর থেকেই তারা এক ধরনের স্বরূপ-সংকটে ভুগতে থাকে এবং ক্রমশ নাম তথা সংস্কৃতি-সচেতন হতে আরম্ভ করে। নবজাতকের নাম ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারেই হয়। এমনকি যে দম্পতির একজন ভারতীয় অপরজন ভিনদেশি তাঁরাও অনেকেই সন্তানের নাম ভারতীয় রাখতে আপত্তি করেননি। যেমন রূপা গলব্রেথ, শ্যামল ক্লিন্টন, সূর্য বুশ...ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু লোকের মুখে মুখে নামগুলো এত বিকৃত হয়ে যায় যে আর ভারতীয় বলে চেনার উপায় থাকে না।

যেমন অর্ভিন—অরভিন্দ—অরবিন্দ। লিজ—ল্যাজা-লজ্জা। রুয—রুরু। রিকি—রিকট্যা—রিক্তা। লজ্জার লিজ আর এলিজাবেথের লিজে কোনও পার্থক্যই বোঝা যায় না। কিন্তু অনন্থ খুব সাবধানে নিজের নামের উচ্চারণের বিশুদ্ধতা বজায় রাখবার চেষ্টা করে।

দেখা গেল কালকনের ভারতীয়-আমেরিকান সভ্যদের চেয়ে ব্রিটিশ-অ্যামেরিকান, জার্মান-অ্যামেরিকান, জাপানি-অ্যামেরিকান সভ্যদেরও দুর্গাপূজার ব্যাপারে উৎসাহ কিছু কম নয়। কালকনের সর্বপ্রথম অধিবেশনের আলোচনাচক্রে যে সব বক্তৃতা হয়েছিল সেগুলো ওরা রিপ্লে করে মন দিয়ে শুনল। ইশিকো সামুরি, আলিওশা সিং, জোহান উইটেনগেনস্টেন, স্তেফান আমুন্দসেন প্রভৃতি যুবশাখার সদস্যরা অনেকেই উপস্থিত ছিল। বরিস চাকিনস্কি নামে এক তুলনামূলক ধর্মের গবেষক বলেছেন : 'রিলিজনের প্রধান কাজ হল ভীত মানুষের মনের মধ্যে নিরাপত্তাবোধ জাগানো। কিন্তু এই পঁচিশ শো শতকের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আমরা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের কুরুক্ষেত্র থেকে বেঁচে ফেরা মানুষরা জানি নিরবচ্ছিন্ন নিরাপত্তাবোধও কত ক্লান্তিকর হয়ে উঠতে পারে। (প্রসঙ্গত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বলতে চাকিনস্কি মহোদয় যা বুঝিয়েছিলেন তা কিন্তু সামরিক স্তরে লড়া হয়নি। হয়েছিল বাণিজ্যিক স্তরে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যনীতি নিয়ে অনেক কচলাকচলির পর সুপার পাওয়ারদের তৈরি গাউম্‌স্ চুক্তি বা গ্লোব্যাল এগ্রিমেন্ট রিগার্ডিং আনকনডিশন্যাল মার্কেট-সারেন্ডার চুক্তির পর পৃথিবীর ধনীতম দেশগুলি পর্যায়ক্রমে তাদের সর্বগ্রাসী আমদানি-রফতানি নীতি দরিদ্রতর দেশগুলির ওপর চাপিয়ে

দেয়। ফলে ওই দেশগুলির অর্থনীতি একেবারে বেহাল হয়। ওই সব দেশের ধনকুবেররা অর্থাৎ ফিল্‌ম স্টার, রাজনৈতিক নেতা, বড় ব্যবসাদার, বড় ঠগ ও মস্তানরা সব সুইজারল্যান্ডে ইমিগ্রেট করে যান। বাকিদের খবর বিজয়ী মিত্রপক্ষ আর জানে না, জানবার প্রয়োজনই বা কী?)। যাই হোক, এখন আমরা দেখছি রিলিজনের আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। সেটা হল নানান পুরাণ, প্রতিমা, ভাবসম্পদ ইত্যাদি দিয়ে আমাদের কল্পনা-দীন জাতি মানসকে চাঙ্গা করা। এবং এদিক দিয়ে সমৃদ্ধতম রিলিজন হচ্ছে হিনডুইজম (এইখানে চচ্চড় চচ্চড় করে হাততালি)। তাহলে ব্যাপারটা এই দাঁড়াচেছ হিনডুইজম আমাদের নিরাপত্তাবোধ তো দিচেছই। নীতিবোধ ও কল্পনাশক্তিকেও সক্রিয় করছে। কালী হলেন হিনডুইজমের একজন কী গডেস। প্রতীকধর্মী। এই প্রতীকের একেক রকম ব্যাখ্যার ওপর একেকটা দর্শনতত্ত্ব দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। তা ছাড়াও কালী হলেন সম্বৎসরের দেবী। এঁর আবার মরশুমি রূপও অনেক আছে। যেমন চাণ্ডী, ডুর্গা ইত্যাদি।' এই পর্যন্ত শুনিয়ে ডান হাতের কড়ে আঙুল তুলে শততম প্রজন্মের লেজার ডিসক প্লেয়ারটা বন্ধ করে দিল অনন্থ। বলল 'শুনলে?'
'ও খে, বোঝা গেল পেরিনিয়্যাল কালীর সীজন্যাল রূপ হচ্ছে ডুর্গা। ঠিক আছে ডুর্গাপূজার সম্পর্কে লেটেস্ট খবরাখবর নেওয়া যাক।'

ইস্ট কোস্ট কালচার‍্যাল নেট ওয়ার্কের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওরা 'দুর্গাপূজা ইন দ্যা স্টেটস' ফাইলটা কালকনের কম্প্যুটারে আনল। জানা গেল—দ্বাবিংশ শতকের গোড়ার দিকেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও লন্ডনের ভারতীয় বিশেষত বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চলে দুর্গাপূজা হয়েছে। তবে একেক জায়গায় একেক দিন। কেউ যদি সেভেনথ্ ডে বা সপ্তমী পালন করল তো কেউ করল এইটথ ডে অষ্টমী। তবে টেন্থ ডেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ ওই দিনেই ইমার্শন আর তারপরে গেট-টুগেদার। ইমার্শন অবশ্য একটা সমস্যা ছিল, কেন না বড় বড় জলাশয়ে বিসর্জনের সরকারি অনুমতি মিলত না। যাঁরা নিজেদের জমিতে পুকুর রাখতেন, তাঁরা বিসর্জনের জন্য সেগুলি ব্যবহার করতে দিতেন। পরে পরিষ্কার করাবার খরচটা নিয়ে। কাপড়ের মূর্তি করাই সবচেয়ে সুবিধে ছিল। মূর্তি আঁকা কাপড়টি ভাঁজ করে তুলে ফেললেই হল।

এরপর প্রতিমার রূপ। লেটেস্ট দুর্গাপূজা, যা নিউজার্সিতে হয়েছিল তারই ছবি কম্প্যুটারের পর্দায় ভেসে উঠল।

জোহান ভাল করে দেখতে দেখতে বলে উঠল 'আচ্ছা গডেস কি ওপর দিকে না নীচের দিকে?'

রিকির রাগ হয়ে গেল, বলল, 'তার মানে? নীচের দিকে তো একটা পশু!'

জোহান বলল 'ভাল করে দেখো অর্ধেক পশু ঠিকই, কিন্তু অর্ধেক মানুষও। তোমাদের ঘানেশও তো এমনি। স্ট্রেঞ্জ কম্বিনেশন। গ্রীকদের প্যান যেমন।'

র‍্যু বলল—'স্ট্রেঞ্জ কম্বিনেশন হলে তুমি। দেখতে পাচ্ছ না ওই হাফ হিউম্যান ইমেজটার একটা মস্ত বড় গোঁফ হয়েছে! আমাদের তো গডেস!'

রিকি বলল—'শুনলেই তো, ইনি হচ্ছেন কিলার অব দা বাফেলো ডেমন। বাফেলোর ধড় থেকে যে লোকটা বেরিয়ে এসেছে ওটাই ডেমন। ওর বুকে একটা লানস বিঁধে আছে। গডেস ওকে হত্যা করছেন।'

তখন ইশিকো বলল—'দেখো রিকি, আরও একটা পশু কিন্তু রয়েছে। বাফেলো-ডেমনের থাইয়ের ওপর থাবা বসিয়েছে। ওটাই গডেস। পশু দানবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে মাদারও পশু হয়েছেন। ওপরের দিকে ওসব ডেকোরেটিভ আর্ট।'

অনন্থ গম্ভীর মুখে বলল—'তোমরা কিছুই বোঝনি। ওটা হল লায়ন। গডেস ডুর্গার বাহন মানে মাউন্ট।'

'লায়ন? সে তো কোন্ কালে পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে। আমি ভেবেছিলাম ওটা একটা ডবারমান পিনশার।'

অনন্থ যতই বলে 'লায়ন এই সেদিন পর্যন্ত আফ্রিকার সংরক্ষিত অরণ্যে ছিল, এবং পৌরাণিক কালে লায়ন ইন্ডিয়ায় মেষের মতো চরে বেড়াত,' তার কথা কেউ মানতে চায় না। শেষ পর্যন্ত গণভোটে ঠিক হল দুর্গার মাউন্ট হিসাবে একটি হিংস্র ডবারমান কুকুরকেই মডেল করা হবে।

কিন্তু মুশকিল হল আসল দেবীকে নিয়ে। কেউ এ মূর্তি মানতে চায় না, বলে এ কী? আটটা পা-অলা এ কি স্পাইডার না ক্র্যাব না অক্টোপাস?

অনন্থ প্রাণপণে ব্যাখ্যা করতে লাগল— 'তোমরা গডেস কালীরও তো চারখানা হাত দেখেছ। এই গডেসের আট নয়, দশ হাত। পা লংড্রেসে ঢাকা বলে দেখা যাচ্ছে না। দশ হাতে দশ রকম অ্যান্টিক ওয়েপনস। শিল্পী একটু বাড়াবাড়ি করেছেন ঠিকই, হাতগুলোকে মুখের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, বডি বলতে কিছুই রাখেননি। কিন্তু...'

কেউই মানতে চাইল না। রিকি, র‍্যু, আর্ভিন পর্যন্ত না।

সত্যিই, একটা ফ্রেমের আধখানা জুড়ে বাফেলো-ডেমন এবং লায়ন না ডবারমান। বাকি আধখানারও আধখানায় দেখা গেল কয়েক রকম পৌরাণিক পাখি — ময়ূর, পেঁচা এবং রাজহাঁস যারা অনেকদিন আগেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। পরিষ্কার চেনা গেল একমাত্র র‍্যাট মহোদয়কে। ইতি এখনও আছেন বহাল-তবিয়তে। মাঠে-ঘাটেও আছেন। ভাষাভঙ্গিতেও আছেন, যেমন র‍্যাট-রেস। সরস্বতী ও লক্ষ্মীকেও ওরা খুঁজে বার করতে পেরেছিল। লক্ষ্মীকে তাঁর পিগি ব্যাঙ্ক দিয়ে আর সরস্বতীকে দা গ্রেট রভিশঙ্কর সিটার দিয়ে।

অবশেষে ঠিক হল দেবী যখন প্রতীকী, তখন বিমূর্তভাবেই তাঁকে কল্পনা করা হবে। ফ্রেমের তলার দিকে থাকবে মহিষ ও ডবারমান। দুদিকে যথাক্রমে ইঁদুর-পেঁচা ও ময়ূর-হংসরাজ। গ্রাফিকস টার্মিনাল থেকে বিভিন্ন প্রজাতির পশু পাখিগুলো স্কেচ করে নেওয়া হবে। ওপর দিকে দুর্গার প্রতীক হিসেবে থাকবে একটি লানস। লক্ষ্মীর প্রতীক পিগি ব্যাঙ্ক ও সরস্বতীর প্রতীক দা সিটার। স্থানীয় শিল্পী লিন চ্যাং হালদার এরকম একটি বিষয়বস্তু পেয়ে দারুণ উল্লসিত। মরা গাছের ডাল এবং গুঁড়ি, টয়লেট ব্রাশ, ফেলে দেওয়া রঙের টিউব, সিনথেটিক কেন, কাঠ-কাঠরা, রবার এবং এক ধরনের প্লাস্টার দিয়ে তিনি একটি নতুন ধরনের ভাস্কর্যের পরিকল্পনা করেছেন। বিমূর্ত হতে পারে, কিন্তু লুপ্ত প্রজাতির পশু পাখি পুরাণ, ইতিহাস, শিল্পবোধ, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি সম্পর্কে ভাস্কর্যটি দর্শকদের মধ্যে নানা প্রশ্ন চিন্তা ও ঔৎসুক্য জাগাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

জমজমাট ভাস্কর্যই হল। গোল ফ্রেমের মধ্যে পশু-পাখি-যন্ত্র-বাদ্য সব মিলিয়ে

একটা ভয়-বিস্ময় জাগানো সংহতি। কেন কে জানে এই পুজো মাইক্রো পুজো বলে খুব খ্যাতি পেল। আকারে যথেষ্ট বড়, সেদিক থেকে মাইক্রো হতে পারে না। চিন্তার ওয়েভ-লেনথে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কোনও কম্পন জাগিয়ে দিয়েছে কি না তা-ও কেউ বলতে পারল না। কিন্তু সবাই বলতে লাগল মাইক্রো-পূজা, মাইক্রো-পূজা। যেন একটা হুজুগ।

খ্যাতি হল। কিন্তু মূল সভ্যদের মনের অশান্তি আর যেতে চায় না। ওল্ড এজ হোম থেকে অনন্থের ঠাকুর্দার বাবা ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়ে সেলুলার ফোন মারফত বিপ বিপ করে তাঁর অসন্তোষ জানাচ্ছেন। অতিবৃদ্ধ মানুষটি কিছুই প্রায় করতে পারেন না। খালি মাথাটা এখনও মোটামুটি পরিষ্কার আছে। এই ভাবেই তিনি তাঁর ঘনীভূত অসন্তোষ জানাচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত নাইনথ ডে-তে ওরা ঠিক করল আসল ক্যালকাটার পুজো একবার ওরা দেখবে। অন্তত পক্ষে ইমার্শনটা যেন ঠিকঠাক হয়। এঞ্জেল স্যাট ফোর স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ওরা কলকাতা দেখবার চেষ্টা করল। প্রথমে কিছুই দেখতে পেল না। অন্ধ তমস। এ কি রে বাবা! খুব নাকি আলোর কারসাজি হয় ওখানে পুজোর সময়ে? সে সব কই? বারে বারে চ্যানেল ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাডজাস্ট করে, বারে বারে শুধু ওই একই দৃশ্য ফিরে ফিরে আসে। নিস্তরঙ্গ ঘন কালো জল।

অবশেষে ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে ওরা ইস্ট কোস্টের সবচেয়ে বড় আন্তর্জাতিক খবরাখবর কেন্দ্রের প্রাচ্য-বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করল। সেখান থেকে যে সংবাদ কম্প্যুটারের পর্দায় ভেসে উঠল তা হচ্ছে এই : বিংশ শতকের শেষ দশক থেকে কলকাতা মেগাসিটির পতন খুব দ্রুত ঘটতে থাকে। এক সময়ের প্রাসাদ-নগরী, মিছিল-নগরী, হকার-নগরী ক্রমে প্রচণ্ড জনসংখ্যার ভারে বস্তি-নগরী হয়ে যায়। পথবাসী লক্ষ লক্ষ মানুষের মূত্র-পুরীষের দুর্গন্ধ ও প্রবাহের জন্য এ নগরী এক সময়ে প্রস্রাব-নগরী আখ্যাও পেয়েছিল। জঞ্জাল-নগরী নামকরণের কিছুকাল পরে আবর্জনার পাহাড় যখন প্রায় সমস্ত নগরীকে ঢেকে ফেলেছে তখন অতি ভয়ানক মহামারীতে কয়েক দিনের মধ্যেই কলকাতা সন্নিহিত অঞ্চল সব মহাশ্মশানে পরিণত হয়। তারপর কালক্রমে তার ওপর ভেঙে পড়তে থাকে একটার পর একটা বহুতল। সেই সঙ্গে আরম্ভ হয় জমিয়ে রাখা নানা ধরনের বোমার বিস্ফোরণ। প্রচণ্ড চাপে কলকাতার আশে পাশে যত নদী ও জলাশয় ছিল তার জল উৎক্ষিপ্ত হয়ে কলকাতা মেগাসিটিকে ঢেকে দেয়। এই জলও সাঙঘাতিক কলুষিত। কলকাতার নাম এখন ক্যালহোল। কৃষ্ণ বিবর। ইন্ডিয়ার বেশির ভাগ অংশই ক্রমশ এরকম কৃষ্ণ বিবরে পরিণত হচ্ছে। এর ধারে কাছে গেলেও এই কালো গর্তের মারাত্মক বিষ যে কোনও জীবিত প্রাণীকে মৃত্যু-আকর্ষণে টেনে নেবে। প্রকৃতপক্ষে, মুমূর্ষু কলকাতার অদম্য সাংস্কৃতিক প্রাণশক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবার জন্যই এই সময়ে নিউ ইয়র্কের নতুন নাম হয় নিউ ক্যালকাটা।

ওরা এতক্ষণে বুঝল শুধু দুর্গাপ্রতিমা নয়, গোটা ক্যালকাটারই বিসর্জন হয়ে গেছে বহু বহু কাল আগে। বিশেষজ্ঞরা ছাড়া বাকি পৃথিবীর, এমনকি এক সময়ের কলকাতাবাসীরাও আর তার খবর রাখেন না।

বাচ্চু কেন ফিরে এলো

সুস্মিতার স্বামী অলকেশ যখন স্কুটার অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেল, তখন সুস্মিতার বয়স চল্লিশও পার হয় নি। আর বাচ্চু একটা নেহাত বালক। অলকেশ পাঁচ মাসের কাছাকাছি সময় কোমায় পড়ে রইল জীবন্মৃত হয়ে। ডাক্তাররা বললেন ক্লিনিক্যাল ডেথ হয় নি। নাড়ি জানান দিচ্ছে, শারীরিক ক্রিয়াকর্ম হয়ে যাচ্ছে, শুধু জ্ঞান নেই। তাঁরা খুব সম্ভব জানতেন, এই জ্ঞান আর ফিরবে না। কিন্তু সুস্মিতা বা তার কোনও আত্মীয়-স্বজনকেই কথাটা বলা ভালো মনে করেন নি। পাঁচ মাস ধরে সুতরাং তিনটে প্রক্রিয়া চলল। প্রথম—সুস্মিতার প্রতিদিন নতুন আশা নিয়ে মিলিটারি হাসপাতালে প্রবেশ করা, আজ নিশ্চয়ই সে অলকেশের চৈতন্যলাভের কোনও না কোনও লক্ষণ দেখবে। দ্বিতীয়—আত্মীয়-স্বজনদের প্রতিদিন অলকেশের একটু একটু করে শীর্ণ-হয়ে-যাওয়া ছোট-হতে-থাকা অচৈতন্য শরীরটার দিকে তাকাতে তাকাতে তার মৃত্যু-কামনা করা। কারণ এই শরীরে যদি কোনদিন সাড় ফিরে আসেও, এ যে কোনদিন আর স্বাভাবিক হতে পারবে না, দুর্বহ এক বোঝা হয়ে থাকবে—এ কথা তাঁরা বুঝতে পারছিলেন এবং মৃত্যুশোক উত্তীর্ণ হয়ে ধীরে ধীরে যুক্তিপূর্ণ মনোভঙ্গিতে পৌঁছাচ্ছিলেন, সুস্মিতার পক্ষে যেটা সম্ভব ছিল না। এবং তৃতীয়— বাচ্চুর হঠাৎ বড় হয়ে যাওয়া।

এই তৃতীয়টাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সবচেয়ে অস্বাভাবিক। বাচ্চু প্রতিদিন হাসপাতালে বাবার শয্যার পাশে বসে নির্নিমেষে তার বাবার মুখের দিকে চেয়ে থাকত। ডাক্তাররা কী বলতেন, তার মা কী বলছে, কাকা-মামা-মাসি-পিসিরা কে কী বলছে, কীভাবে প্রতিক্রিয়া করছে সে কিছুই দেখত না। খালি নির্নিমেষে বাবার মুখ দেখত। মাঝে মাঝে বাবার মুখ-হাত-পা খিঁচিয়ে উঠছে, চোখের ভেতর তারা নড়ছে। অন্য কারো কথা, কারো আশ্বাস বা হতাশার কোনও মূল্যই তার কাছে আর নেই। সে নিজে নিজে বুঝতে চাইছে তার এই বাবা, যে মাত্র কদিন আগে কমাস আগেও অদ্ভুত জীবন্ত ছিল, ছোট মাসি-মেসোর জন্য দই আনতে গিয়ে যে বাবা লরির ধাক্কায় নর্দমায় পড়ে গিয়ে লোকবাহিত হয়ে ঘরে ফিরল কর্দমাক্ত এবং রক্তাক্ত হয়ে, সেই বাবার কথা-না-বলা, না-হাসা এই নিশ্চুপ-পড়ে-থাকার মধ্যে কী রহস্য আছে। তার মনোযোগের সারাৎসার দিয়ে সম্পূর্ণভাবে বুঝে নিতে চাইছে।

অবশেষে বাবার হৃৎ-স্পন্দন থেমে গেলে তাঁর মুখাগ্নি করে বাচ্চু বাড়ি ফিরেই কাছা গলায় পড়তে বসল। তার বার্ষিক পরীক্ষা সামনে। সে আর সময় নষ্ট করতে পারে না। পাশের ঘরে যখন তার মাকে ঘিরে অন্যান্য মহিলারা কান্নায় ভেঙে পড়ছিলেন, সে হঠাৎই একবার উঠে গেল। দরজাটা খুলে বলল— 'এতো শব্দ করলে আমি পড়বো কী করে?' তার গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যাতে উপস্থিত সবাই চুপ করে গেল। তার আচরণ সবার কাছেই খুব অস্বাভাবিক ঠেকল। সুস্মিতা পাঁচ মাস ধরে নিজের অজান্তেই স্বামীর মৃত্যুর জন্য হয়ত প্রস্তুত হয়ে ছিল, তাই তার নতুন করে ভাবনা হল আকস্মিক আঘাতে বাচ্চুর কিছু হয় নি তো? সে উঠে গিয়ে বাচ্চু যে ঘরে পড়ছিল, সেই ঘরে পাতা তক্তাপোষের ওপর গিয়ে বসল, বাচ্চু বলল—'দরজাটা বন্ধ করে দাও মা। শোও। ঘুমিয়ে পড়ো।'

বাচ্চু সে বছর বার্ষিক পরীক্ষায় প্রতিটি বিষয় অদ্ভুত নম্বর পেয়ে ফার্স্ট হল। সে যখন পড়ে, এমন নিবিষ্ট হয়ে পড়ে যে ডাকলে শুনতে পায় না।

অলকেশের মৃত্যুর প্রথম ধাক্কাটা কেটে যাবার পর, তার আত্মীয়রা অর্থাৎ জ্যাঠাকাকারা ক্রমে ক্রমে সুস্মিতার ওপর তাদের দাবি বাড়াতে লাগলেন। এরকম কথা শোনা যেতে লাগল, অলকেশ চিরকাল বাইরে বাইরে থেকেছে, বাড়ির জন্য কিছু করে নি, সুতরাং বাড়ির ওপর তার স্ত্রী-পুত্রের দায় বর্তায় না। বরং তাদের ভরণ-পোষণের জন্য খরচের টাকাটা তো বটেই, আরও কিছু সুস্মিতা দিক। নানা ছলছুতোয়, সুস্মিতা ও বাচ্চুকে দোতলায় যে ঘরে তারা কলকাতায় এলে থাকতে অভ্যস্ত ছিল, সেখান থেকে একতলার স্যাঁতসেঁতে ঘরে নির্বাসিত করা হল। এবং তার টাকাকড়ির হিসেব চাওয়া হতে লাগল। এই নিয়ে অশান্তি ও অপমান যেদিন চরমে পৌঁছলো, হঠাৎ দেখা গেল বাচ্চু তার সাইকেলের ক্যারিয়ারে তার চেয়ে বেশ বড় একটি বন্ধুকে নিয়ে আসছে। সে উঠোনের মধ্যে দাঁড়িয়ে বিনা ভূমিকায় বলল—'মা, তুমি রেডি হয়ে নাও। বাড়ি ঠিক করে এসেছি। মালপত্র নেবার জন্যে টেম্পো আসছে। এই খোকনদা সব ব্যবস্থা করবে, তুমি শুধু জামাকাপড়, বইপত্র গুছিয়ে নাও।'

সুস্মিতার দেওর বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠে চেঁচামেচি করে বলল — 'মনে রেখো এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে আর কোনদিন ঢুকতে পারবে না—বাড়ির অংশ দাবি করতে এলে দেখিয়ে দেবো মজা।'

সুস্মিতা ইতস্তত করছিল। এতটুকু একটা ছেলের কথায় নিশ্চিন্ত না হোক নিশ্চিত আশ্রয় ছেড়ে যাওয়া! বাচ্চু তখন এগিয়ে এসে কঠিন হাতে তার হাত ধরল। বলল— 'কই, রেডি হও!' সুস্মিতার মনে হল বাচ্চু তার হাত মুচড়ে দেবে তার কথা না শুনলে। বাচ্চুর তখন ঠিক চোদ্দ বছর বয়স।

তারা যেখানে এসে উঠল, সেটা মফঃস্বল। বাচ্চুর এক বন্ধুর মামারবাড়ির একতলা। নতুন বাড়ি। সবকিছুই আলাদা। সদর দরজা পর্যন্ত। বাচ্চু বলল— 'আমরা দিল্লিতে, বরোদায়, কান্‌সভালে ঠিক যেভাবে ছিলাম সেইভাবে বাড়িটাকে সাজাও মা।' সে শুধু বলেই ক্ষান্ত হল না। নিজেও হাত লাগাল। বন্ধু-বান্ধবের দল নিয়ে কদিনের মধ্যেই বাড়িটাকে ছিমছাম করে ফেলল। যেখানে ছবি থাকবার ছবি রইল, যেখানে ফুলদান গাছদান থাকবার ফুলদান গাছদান বসালো, টেবিলের ওপর ফটোফ্রেমে বাবা-মা-বাচ্চুর ছবি শোভা পেতে লাগল।

রাতে হা ক্লান্ত হয়ে শুতে যাবার আগে বাচ্চু বলল—'মা, তোমার টাকাপয়সা কোথায় কী আছে, কত আছে, কীভাবে আছে একটু বোঝাও তো!'

যতক্ষণ না বুঝল সে কিছুতেই ছাড়ল না। তারপর হিসেব করতে বসল। করে দেখিয়ে দিল বাড়িভাড়া দিয়ে, সংসারখরচ করে, তার পড়াশোনার জন্য ব্যয় হয়েও তাদের ঠিক কত থাকবে। সমস্ত করে-টরে সে মাকে বলল—'গোয়াবাগানের একতলার খাটালের-গন্ধ-আসা মশা-অলা ঘরটার চেয়ে এখানেই তো আমরা ভালো থাকব। তা ছাড়া গালাগাল, খারাপ কথা, গোলমাল এসবের কোনটাই আমার ভালো লাগে না।'

সুস্মিতারা চলে আসায় গোয়াবাগানের বাড়িতে এবং পাড়ায় একটা প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। জনমত সুস্মিতাদের পক্ষে। —'মা বেঁচে থাকতে বিধবা বউটাকে, নাতিটাকে

বাড়ি ছাড়া করল গা, এমন ইতর চামারও তো দেখিনি!' ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই প্রতিক্রিয়ার ধাক্কাতেই হোক, অনুশোচনাতেই হোক ধীরে ধীরে সুস্মিতার শ্বশুরবাড়ির কেউ-কেউ তার নতুন বাড়িতে আসতে লাগল, পুজো এবং জন্মদিনে বিশেষ করে বাচ্চুর জন্য উপহারাদি নিয়ে। সুস্মিতা বেশ পুলকিত। হাজার হলেও নিজের দেওর, জা, ননদ, শাশুড়ি। হয়ত মনে মনে শ্বশুরবাড়ির ন্যায্য ভাগ পাওয়ার আশাও তার মনে জেগে থাকবে। সে সুগন্ধি চা, জলখাবার ইত্যাদি তৈরি করে তাঁদের আপ্যায়িত করে। এভাবে পুজো গেল, জন্মদিন এলো। তাঁরা আবার এসেছেন। হাতে বাচ্চুর জন্য শার্টপ্যান্টের প্যাকেট। বাচ্চু সেদিন বাড়ি ছিল। সে ঢুকে গত পুজোয় দেওয়া জামাকাপড়গুলো টেবিলের ওপর রাখল, শান্তভাবে বলল—'যেগুলো এনেছ সেগুলো এবং এগুলো নিয়ে যেও। চা-টা খাও, তারপর এগুলো নিয়ে চলে যেও। আর এসো না। আমার অসুবিধে হয়।' তার বয়স পনেরো পূর্ণ হয়েছে। তার ঠাকুমা, জ্যাঠা ও জেঠিমা দেখলেন তাঁদের সামনে যেন ছোট অলকেশ দাঁড়িয়ে রয়েছে। অবিকল!

অপমানের চেয়ে বেশি যেন আতঙ্ক নিয়ে ওঁরা চলে গেলেন। অলকেশই কি ছেলের মধ্যে দিয়ে এসে তাঁদের ভর্ৎসনা করে গেল? সুস্মিতা বাচ্চুকে বকতে ভয় পায়। বাচ্চু যেন তার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। সে কিন্তু-কিন্তু করে বলল—'বাচ্চু, তোর চেয়ে আমি তো কম ভুগি নি, আমিও জানি কে কী রকম, তবুও আপনজন, নিজে থেকে যখন আসছে আসুক না। ক্ষতি তো কিছু নেই!'

বাচ্চু সংক্ষেপে বলল—'আপনজন চিনতে শেখো।'

আস্তে আস্তে বাচ্চুর যেমন নিজস্ব বন্ধুর বৃত্ত গড়ে উঠেছিল, সুস্মিতারও তেমনি অনেক নতুন বন্ধু হল। প্রতিবেশিনী, বাচ্চুর বন্ধুদের মায়েরা। সুস্মিতা ভুলে যেতে থাকল তার নিঃসঙ্গতা, আত্মীয়ের অভাব। তার অনেক গুণ। সে ভালো গাইতে পারে, অভিনয় করতে পারে, রান্নাবান্নায় সে দ্রৌপদীবিশেষ। তাকে ঘিরে আপনা-আপনিই একটা সাংস্কৃতিক ক্লাব গড়ে উঠল। সুস্মিতা গান গাইছে, গান শেখাচ্ছে, রান্নার বই লিখছে। সরস্বতী-পুজো উপলক্ষ্যে ফাংশন করাচ্ছে। একে একে তিনটে কুকুর হয়েছে। সুস্মিতার ভাবনা-চিন্তা করবারই বা অবসর কই? সর্বক্ষণ সুস্মিতা। সুস্মিতাদি! সুস্মিতা মাসি।

বাচ্চু হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করল, সাংঘাতিক ভালো ভালো মার্কস পেয়ে। সে যাদবপুরে ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে যাচ্ছে। কিন্তু থাকে শ্রীরামপুরে, যেতে হবে যাদবপুর। হোস্টেলেও আপাতত সীট পাওয়া যাচ্ছে না। কী হবে?

এই সময়ে সুস্মিতার এক জাঠতুত বোন, তার ছেলেবেলার সখী, বলল, আমি থাকতে ভাবছিস কেন? হোস্টেলে সীট পেলেও বাচ্চুর সেখানে থাকার প্রশ্ন উঠছে না। আমি থাকি ম্যান্ডেভিল গার্ডনস-এ। সেখান থেকে যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কতদূর? আমি থাকতে আমার বোনের ছেলে যাবে হোস্টেলে?'

বাচ্চুকে অগত্যা রাজি হতে হল। তার মাসিরা বিশাল ধনী। তাদের প্রাসাদোপম বাড়ি। মাসি মেসো, বিশেষ করে মেসো, বেশির ভাগই ব্যবসা উপলক্ষে লন্ডনে থাকেন। মাসির দুই ছেলে-মেয়ে বিরাট বাড়িতে একা। দুজনেই লেখাপড়ায় যথেষ্ট

ভালো। বাচ্চুর আলাদা ঘর, সঙ্গে ডব্লু সি। মাইক্রোওয়েভ আভেনে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে রান্না হয়ে যায়। সকালে, বিকেলে, দুপুরে, রাতে মাসির লোকজন বিশেষভাবে দেখাশোনা করে বাচ্চুকে। সকালে যে জামা কাপড় ছেড়ে সে কলেজে যায়, ফিরে এসে সেগুলো খুঁজে পায় না। বেশি খুঁজতে থাকলে মাসির লোক এসে বলে— 'কাচা, আয়রন করা সব ক্যাবিনেটে সাজানো আছে।' মাসি বলে— 'যা ছাড়বি সঙ্গে সঙ্গে ওয়াশিং মেশিনে চলে যাবে। ভাবিস কেন? তিনটে ওয়াশিং মেশিন কাজ করছে। ছাড়া জিনিস ভদ্রলোকে পরে আর?'

সকালে ব্রেকফাস্ট এনে দেয় বেয়ারা। এত ব্রেকফাস্ট যে দুপুরে খাওয়ার জন্যে পেটে জায়গা থাকে না। এ বাড়িতে কেউ সেভাবে লাঞ্চ বোধহয় খায়ও না। শেষ দুপুরের দিকে খিদে পায়, তখন বাচ্চু কলেজ-ক্যানটিনে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারতে মারতে কিছু খেয়ে নেয়।

সন্ধ্যেবেলায় তাড়াতাড়ি খাওয়া। টেবিলে এসে বসে বাচ্চু। মাসির মেয়ে তনিকা, সে বাচ্চুর সমবয়সী, এসে একটা দুটো জিনিস হাতে তুলে নেয়, কামড় দিতে দিতে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে থাকে। বাচ্চু ডাক দিয়ে বলে— 'তনি, বসে খাও না। গল্প করব।' তার এখন আড্ডার মেজাজ। এই সময়েই তার মায়ের সঙ্গে গল্প জমত।

'সময় কোথায়?' তনিকা হেসে চলে যায়। তার নিজের ঘরে ক্যাসেট চালিয়ে এসেছে। কিম্বা ভিডিও। সে ঘরে ঢুকে প্রথমে পর্দাটা টেনে দেয়। তারপর দরজাটা বন্ধই করে দেয়।

ছেলেটি বাচ্চুর থেকে ছোট। সে খেতে খেতে বই পড়ে। বাচ্চু জিজ্ঞেস করে — 'কী পড়ছো?'

মলাট উলটে দেখায় রোহণ—কাফকা। প্রুস্ত।

বাচ্চু এসব লেখকের নামও শোনে নি। কিন্তু সে খুব কৌতূহলী, সাহিত্য-বিষয়েও। সে বলল—আমাকে পড়তে দিও। আলোচনা করব।'

'কী দরকার।' ফিকে হেসে রোহণ বলে।

বেশির ভাগ দিনই সন্ধেবেলায় রোহণ বেরিয়ে যায় গাড়িতে। তনিকা ট্রামে-বাসে। কোথায় যাচ্ছে জিজ্ঞেস করলে হাসে—উত্তর দেয় না। বাচ্চুর জন্যও সকালে-বিকালে গাড়ি প্রস্তুত থাকে। মাসি বলে, 'খবর্দার, তনির মতো ট্রামে বাসে যাস না বাচ্চু! কত জার্ম, কত নোংরা, তনিটা পাগলি!' মাসি নিজেও সন্ধেবেলায় বাড়ি থাকে না। কিন্তু বাচ্চুর সন্ধেবেলাটাই বাড়ি থাকার সময়।

মাস তিনেকের মাথায় বাচ্চু ফিরে গেল। মাসি প্রথমটা বুঝতেই পারে নি। দুদিন তিনদিন পর ড্রাইভার বলল—'বাচ্চুবাবু তো গাড়িতে কলেজ যায় না। গাড়ি তো গ্যারেজে তুলে দিই।' বেয়ারা তখন বলল—'বাচ্চুবাবু তো ব্রেকফাস্ট খায় না, ট্রে নিয়ে ফিরে আসি।' মাসি তখন ঘরে ঢুকে দেখল নিভাঁজ শয্যা পড়ে আছে, ওয়ার্ডরোবের কপাট খুলে দেখল বাচ্চুর টি শার্ট, জীনস এসব ঝুলছে না, টেবিলের ওপর বাচ্চুর বইখাতা নেই। মাসি মেয়েকে জিজ্ঞেস করল— 'তনি, বাচ্চু কোথায় গেল?'

—'বাচ্চু? হাউ ডু আই নো?'

মাসি ছেলেকে জিজ্ঞেস করল— 'রোহণ, বাচ্চু কোথায়?'

—'বাচ্চুদাই জানে। আমি কারো পার্সন্যাল ব্যাপারে থাকি না মা।'

গাড়ি নিয়ে মাসি সোজা শ্রীরামপুরে চলে গেল। ভীষণ উৎকণ্ঠিত। পরের ছেলে। সুস্মিতা দরজা খুলে দিয়েই জড়সড় হয়ে গেল।

—কিরে সুস্মিতা, বাচ্চু এসেছে নাকি?'

—'হ্যাঁ রে। এই তো তিনদিন আগে, বিষ্যুৎবার। কলেজ থেকে চলে এলো সোজা। তোকে বলে আসে নি, না?'

সে কথার উত্তর না দিয়ে মাসি বলল— 'এলো কেন? মায়ের জন্যে হঠাৎ মন-কেমন করে উঠল, না কী?'

সুস্মিতা হেসে ফেলল, বলল— 'হবে হয়ত। তোকে বলে আসে নি, বোধহয় তুই আটকাবি বলে। কী পাজি দ্যাখ্! তা ছাড়া তোকে পায়ও নি বোধহয় হাতের কাছে।'

এসব কথা হাত দিয়ে মাছি তাড়ানোর মতো করে উড়িয়ে দিযে মাসি বলল— 'সুস্মিতা, ওর কিসের অসুবিধে? কোনও অনাদর করেছি! দ্যাখ, আমি নিজের হাতে না করলেও ওর সব কিছুর ওপর নজর রেখেছি...'

—'আরে দূর! তুই তো নজর রেখেছিসই। এই কমাসেই চেহারা পালটে দিয়েছিস।'

—'তবে? ওর অভিমানটা কিসের? ও ফিরে এলো কেন?'

—'অভিমান-টান নয়। ও বড় খেয়ালি। কিছু মনে করিস না। নে, এখন চা খা তো! বাবা-মরা ছেলে, মাফ করে দিস ভাই। '

—'তা যেন হল। কিন্তু ও ফিরে এলো কেন?'

—'জানি না, বলছি না খেয়ালি!'

বাচ্চুর মাসি কোনওমতে চায়ে দুটো চুমুক দিয়ে তাড়াহুড়ো করে চলে গেল। তার ভেতরটা আসলে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে আছে। তার এমন আতিথ্য, এমন শৃঙ্খলা, হাতে-মুখে এমন সেবা, বাজারের শ্রেষ্ঠ খাবার-দাবার! এর আগেও দু তিনটি ছেলেমেয়ে যে তার বাড়িতে থেকে মানুষ হয় নি, তা নয়। কেউ তো এভাবে ফিরে যায় নি! বাচ্চু কেন ফিরে এলো? কোনও কিছুকে খুব গুরুত্ব দেবার অভ্যেস মাসির নেই। কিন্তু এ প্রশ্নটা তাকে ভাবাচ্ছে। বাচ্চু কেন...।

সুস্মিতা বোনকে বলতে বাধ্য হল, সে জানে না। কিন্তু আসলে সে জানে। অর্থাৎ জানে না, বোঝে নি সঠিক। কিন্তু বাচ্চু তাকে বলেছে সে কেন ফিরে এসেছে।

শীতের কুয়াশা-ভরা রাত আটটা নাগাদ তার বড় কালো ব্যাগটা নিয়ে বাচ্চু ফিরে এলো। কমাসেই তার স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে। চোখমুখ জ্বলজ্বল করছে। দরজা খুলে সুস্মিতা অবাক। আহ্লাদে আটখানা। তারপরই খেয়াল হল, শনি-রবি তো নয়! বিষ্যুৎবার! তাছাড়া এই ব্যাগ নিয়েও সে আসে না। বাড়িতে তার একপ্রস্থ জামা-কাপড় থাকে। অসুবিধে হয় না। সে বলল—'কি রে, আজ এখন চলে এলি? —কাল কলেজ নেই?'

—'কেন থাকবে না?'

—'যাবি না?'

—'কেন যাব না?'

—'তা হলে আজ এলি?'

—আমি চলে এলাম' —ব্যাগটা টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে বাচ্চু বলল।

—'চলে এলাম মানে?'

—'চলে এলাম মানে চলে এলাম। আর যাব না।'

—'সে কী? কী হল? কী অসুবিধে...

—'কিচ্ছু না।'

—'কেউ কিছু বলেছে?'

—'না তো!'

—'তা হলে? বাচ্চু, এক এক বাড়ির লাইফ-স্টাইল একেক রকম। তুই... মানে তোর কত অসুবিধে হবে বল তো? এখান থেকে কলেজ করতে হলে?'

বাচ্চু চুপচাপ নিজের ব্যাগের জিনিসপত্র যথাস্থানে রাখতে লাগল মন দিয়ে। তার মা তখনও দরজার কাছে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে।

গোছগাছ শেষ করে নিয়ে বাচ্চু হঠাৎ ফিরে দাঁড়াল। সে এগিয়ে এসে মায়ের কাঁধ-দুটো ধরল। এখন সে মায়ের থেকে পুরো এক হাত লম্বা। মায়ের চোখের দিকে তাকিয়ে সে বলল—'বলব। কিন্তু তুমি কি বুঝবে?'

—'বুঝি না বুঝি, বাচ্চু, তুই বল অন্তত। আমাকে তো কৈফিয়ত দিতে হবে!'

—কৈফিয়ত? আমার কথা থেকে বোধহয় তুমি কোনও কৈফিয়ত তৈরি করতে পারবে না!'

—'তবু বল।'

—'মা, একটা মানুষ বেঁচে আছে, অথচ বেঁচে নেই, এমন অবস্থা দেখেছ? মনে পড়ে?'

সুস্মিতা শিউরে উঠল। তার চোখে এখন আর জল আসে না। শুধু একটু শুষ্ক দুঃখ আর ভয় বিকীর্ণ হতে থাকে। সেদিকে নিবিষ্ট হয়ে তাকিয়ে বাচ্চু বলল—'এই ভয়ংকর কোমা দেখে আমি জীবন শুরু করেছি মা। একটা মানুষ হাত-মুখ খিঁচোচ্ছে, তোমার দিকে চেয়ে আছে অথচ সে জানে না সে কী করছে। কোমা যখন একটা দুর্ঘটনার ফল হয় তখন কারও কিছু করার থাকে না। ব্যাপারটা সইতেই হয়। কিন্তু কোনও কারণ ছাড়াই যখন মানুষ কোমার ভেতরে ঢুকে যেতে থাকে, খাচ্ছে-দাচ্ছে, মল-মূত্র ত্যাগ করছে, অথচ অচৈতন্য, হাত-পা খিঁচোচ্ছে ওই গোয়াবাগানের মতো, কিম্বা সাড়া দিতে পারছে না ঠিকঠাক, ধরো ম্যান্ডেভিলের মতো, ক্লিনিক্যালি অ্যালাইভ, বাট ডেড... ডেড ফর অল প্র্যাকটিক্যাল পার্পাসেস... তখন আমি সেই ভয়াবহ কোমা সইতে পারি না। এর জন্য যদি পৃথিবীর দূরতম বিন্দু থেকেও আমাকে কলেজ যাতায়াত করতে হয়, আমি রাজি আছি।'

বাচ্চু তাই ফিরে এসেছে।

চারপর্ব

তিতুকে আমরা অনেক পরিকল্পনা করে, অনেক অঙ্ক কষে এনেছিলাম। বিবাহ-বার্ষিকীর পাঁচ বছর পরে। প্রথম বছরটা প্রোবেশন পিরিয়ড। আমার বরই বলেছিল কথাটা।—'বিয়েটা টিকবে কি না বুঝতে দাও!' আমার বুক কাঁপিয়ে বলেছিল আমার বর।

—কী করে বুঝবে?

—বাঃ, গুরুতর মতবিরোধ হচ্ছে কিনা, বাড়ির আর সবার সঙ্গে মানাতে পারছো কিনা...

—মানাতে না পারলে?

হাত উলটে ও বলল—কী আর করা, আলাদা সংসার ফাঁদতে হবে। আপনি আর কপনি।

—আর গুরুতর মতবিরোধ হলে?

—একটু ভাবনার কথা হবে। লাঠালাঠির পর্যায়ে চলে যাবার সম্ভাবনা থাকলে বা পরস্পরের কম্প্যানি তেতো বড়ির মতো লাগতে থাকলে, চটপট গাঁটছড়াটা খুলে...

—থাক থাক, চুপ করো—আতঙ্কে শিউরে উঠি আমি।

ও হাসছিল। কিন্তু নিশ্চিন্ত নিরাপত্তার ভাবটা আমার সেই দিনই উবে গিয়েছিল। কত কষ্ট করে, চোখের জল সামলে, মা-বাবাকে চোখের জলে নাকের জলে করে এই নিরাপত্তাটুকুর জন্যেই তো বিয়ে করা! নিজের ওপর যদি ভরসা থাকতো সুজিতদার সঙ্গে ব্যাপারটাই তো চালিয়ে যেতে পারতাম। সুজিত সরকার আমার কলিগ। সব দিক থেকে আমার পছন্দ, আমার উপযুক্ত। চেহারায়, স্বভাবে, গুণে। দোষ শুধু একটাই। মানুষটি বিবাহিত।

যেদিন বাবা-মাকে বললাম বিয়ে করবো, পাত্র দেখো। দুজনেরই তো আনন্দে কাঁদবার অবস্থা। কোনদিন মুখ ফুটে বলিনি, কিন্তু সুজিতের ব্যাপারটা ওঁরা জানতেন, কাঁটা হয়ে থাকতেন।

বলেছিলাম—যাকে-তাকে কিন্তু বিয়ে করব না। শতকরা শত ভাগ সলভেন্ট হওয়া চাই। আমি যদি চাকরি করি নিজের ইচ্ছেয় করব, প্রয়োজনে নয়। বাড়ি আধুনিক হবে। দেওর-ননদে আপত্তি নেই।

আসলে আমি হই-চই করে বাঁচতে চেয়েছিলাম। সব সময়ে একটা হালকা বাতাস বইলে আকাশে মেঘ জমতে পায় না। এমনই আমার বিশ্বাস। বড় চাকুরে ইঞ্জিনিয়ার জোগাড় হল। মা-বাবা এবং একটি বোনের সংসার। বাবা এখনও চাকরিতে আছেন। বোন বি এসসি পড়ছে। আলাপ করে ভাল লেগেছিল। মা বাবা সাধ্যাতীত দিয়েছিলেন। প্রোবেশনের কথায় আত্মারাম আমার খাঁচা ছাড়া। তখন থেকেই আমি তিতুর জন্যে হন্যে হয়ে উঠেছিলাম।

আমার বর কিরকম আড়ো আড়ো, ছাড়ো-ছাড়ো। কাজের কথা ছাড়া কথা নেই। মন বা হৃদয় যে ওর দেহের কোন্‌খানটায় থাকে আমি খুঁজে পাইনি। অথচ মানুষটা দেখতে ভাল, হাসে, হাসাতে পারে, মিশুক। সবই। তবু তবু কেমন যেন। সুজিত সরকারের আমার জন্যে সেই আর্তি! নাঃ, সুজিতই আমার প্রত্যাশা বাড়িয়ে দিয়েছে

হয়তো। হয়তো এমনিই হয়। দেখে-শুনে বিয়ে মানেই তো ম্যারেজ অব কনভিনিয়েন্স।

চার বছর আমরা উড়ে উড়ে বেড়ালাম। হংকং, জাপান, মরিশাস, ব্যাঙ্কক, ম্যানিলা...।

বাচ্চাকাচ্চা থাকলে কি আর ওর সঙ্গে এ ভাবে স্বল্প নোটিসে ঘোরাঘুরি করতে পারতাম।

কিন্তু পঞ্চম বছরে আমি একেবারে মরিয়া হয়ে গেলাম। এবং দেখা গেল কিন্তু চিকিৎসা ছাড়া তিতু আসার বাধা আছে। তো চিকিৎসা করানো গেল। এবং তিতু এল। আমার কোল আলো করে। মন ভাল করে। কেউ জানে না আমি জানি তিতু, তিতুই এখন আমার সব। আমার মনের ভাব আমি ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করি না। কিন্তু নিজের মনের মধ্যে তিতুকে নিয়ে বুঁদ হয়ে থাকি।

আমার মা আলো-আলো মুখে বলেন—কী রে, এবার সুখী হয়েছিস তো?

আমি মাকে জড়িয়ে ধরি—তুমি এরকম সুখী হয়েছিলে মা? আমাকে পেয়ে? টুলুকে পেয়ে?

মা কিছু বলেন না, শুধু আমার পিঠের ওপর মার হাতের উষ্ণ চাপটা অনুভব করি। আর তখনই বুঝি—মা আর তার সন্তান, এই-ই সব। আর যা কিছু শুধু আয়োজন। শুধু ভূমিকা। শুধু নান্দীমুখ। আমার নিজের নতুন উপলব্ধি নিয়ে পৃথিবীর দিকে, সংসারের দিকে তাকাই। গোপন অনুভবের তাড়সে হাসি। উষ্ণ, প্রসন্ন, সব বোঝার, সব মানার হাসি। হয়তো শ্বশুর-শাশুড়িরা দুজনে গল্প করছেন। রাস্তায় সন্ধে, ধূসর তারারা আকাশে, আমি তিতুকে খাওয়াচ্ছি। শরীরের মধ্যে থেকে একটা গভীর তরল আনন্দের স্রোত উঠে আসছে। শ্বশুর-শাশুড়ির দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলি—যতই বল আর যতই কর, তোমাদের প্রাসঙ্গিকতা একজোড়া ভূতপূর্ব জনক-জননীর, যারা নাকি আরও একজনকে জনক হওয়ার জন্যে পৃথিবীতে এনেছিল।

আমার বর অফিস থেকে ফিরে কফি খায়, আরামে চোখ বুজে বলে—আরও একটু ওপরে উঠলাম।

আমি ভাবি—তোমার ভূমিকা অর্ধেকের ওপর পালন করা হয়ে গেছে মহাশয়, এখন তুমি অবান্তর। তবে হ্যাঁ। তোমার উপার্জিত অতিরিক্ত টাকাটা, হয়ত অবস্থানটাও তিতুর কাজে লাগবে।

ননদ বলে—ওঃ বউদি, কি সর্বক্ষণ বাচ্চা নিয়ে লটপট কর বলো তো! চলো একটা ছবি দেখে আসি। ওকে মার কাছে রেখে চলো।

আমি রাজি না হতে ও বিরক্ত হয়ে বন্ধুকে ফোন করতে চলে যায়। আমি বলি—আর কদিন? তৈরি হচ্ছো, তোমার জমিও তৈরি হচ্ছে। কত নাচন-কোঁদন এখন, ভাবছ তুমি একটা তুমি। ভীষণ আলাদা। ভীষণ একটা ভিন্নতা তোমার। অহম। জানো না, তুমি তিতুর জন্য পূর্ব হইতেই বলিপ্রদত্ত। বলি কথাটা শুনতে খারাপ লাগে। কিন্তু বলি মানে কি? ভাগ। তুমি তিতুর ভাগে। তোমার জন্ম একজন তিতুর জন্যে। সারা পৃথিবী জুড়ে এই তিতুদের আনবার খেলা অনন্তকাল ধরে হয়ে চলেছে। তুমি নিমিত্তমাত্র। কিন্তু নিমিত্ত, শুধু নিমিত্ত হওয়ারও কী স্বস্তি! কী আনন্দ।

তিতু হামা দিচ্ছে, বাঘের মতো, বাঘের বাচ্চার মতো। কিছুটা গিয়ে তিতু থুপ করে বসল। কোমর মুচড়ে পেছন ফিরে তাকিয়েছে আমার দিকে। হাসছে। চোখ দুটো? চোখ দুটো কী? আকাশ? সমুদ্র? না। না। আকাশ সমুদ্রের মধ্যে কেমন একটা রহস্যময় গভীরতা আছে। শিশুর চোখে সে সব থাকে না। শিশুর চোখ ভাবায় না। শুধু ভেতরটা গলিয়ে দেয়। শিশুর চোখ বিশুদ্ধ আনন্দ। তিতুর এই ভঙ্গি ও এই হাসি এই চাউনির দিকে তাকিয়ে আমার সুজিত-সংক্রান্ত ব্যথার কথা মনে পড়ে হাসি পেয়ে যায়। খুব অবান্তর লাগে তিতুর বাবার যত ভয় পাওয়ানো কথাবার্তাও।

তিতুর বাবা বলে—কী ব্যাপার? আজকাল তো তুমি আর নালিশ করো না?

—কিসের নালিশ?

—বাঃ, ওই যে তুমি বলতে আমার নাকি হৃদয় নেই, মন নেই, মনের খবর তো কই আর নিতে দেখি না।

—তোমার মনের খবর তুমিই রাখো বাবা, আমার কাজ নেই—আমি হেসে উড়িয়ে দিই।

—সে কী? আচ্ছা ধরো, মনটা যদি আর কাউকে দিয়ে ফেলি?

তিতুকে কোলে নিয়েছিলাম। সে দু হাত বাড়িয়ে বাবার কাছে যায়। আর কাউকে মন দেওয়ার কথা জনক— বেমালুম ভুলে যায়। কী খেলা! কী খেলা! হাম দিতে গিয়ে তিতু বাবার গাল কামড়ে ধরছে। দাঁত উঠবে, মাড়ি সুড়সুড় করছে বোধ হয়। বাবা হেসে অস্থির।

—এই আমার কাতুকুতু লাগছে। কাতুকুতু দিচ্ছিস কেন?

যত অবোধ হাসি ছেলের। তত হাসি বাবার। অর্থাৎ কি না যে মন ছিল না, ফোকলা ছিল মনের জায়গাটা, সেখানে কচি একটা মন গজিয়েছে, মনটা অন্য আর কাকে দেবে? বাবা তিতু সোনাকেই দিয়ে দিয়েছে। কখনও কখনও তিতুর বাবা বলে— আমাকে হয়তো বছর দুয়েকের জন্যে বাইরে পাঠাবে। তুমি, তোমরা যেতে পারবে তো?

—তিন বছরে তিতুকে স্কুলে ভর্তি করতে হবে, তার আগে হলে পারব, নইলে...

—হুঁ, ওর বাবা চিন্তিত হয়ে পড়ে। আমি হাসি। যাও এবার কোথায় যাবে!

শ্বশুরমশাইয়ের সঙ্গে আমার খুব জমে। মানুষটা দার্শনিক প্রকৃতির। একটু শুদ্ধ করে কথা বলবার বাতিক আছে। সেটা ওঁর ছেলে মেয়ের কাছে হাসির জিনিস। স্ত্রীর কাছে বিরক্তিকর। আমার খারাপ লাগে না। সব সময়ে তো বলছেন না। মেজাজ এলে বলছেন।

উনি বলেন—আচ্ছা বউমা, এই যে তিতু আসাতে সংসারের মধ্যে একটা পরিবর্তন এসেছে, এটা টের পাও?

আমি কিছু বলি না, হাসি খালি।

উনি নিজের বলার আনন্দেই বলেন— তোমরা ধরো, আর আগের মতো নেই। খুব গৃহকেন্দ্রিক হয়ে গেছ। বা তিতুকেন্দ্রিক হয়ে গেছ। সে কি বাচ্চাটার তোমাদের প্রয়োজন বলে? কক্ষনো না। আসলে শিশুর মধ্যে দিয়ে আমরা নিজেদেরই নতুন করে পাই। রিনিউ করি। নিজেদের প্রতিচ্ছবি, নিজেদের পুনরাবৃত্তি, নিজেদের চিরায়ণ এটাই গোপন

সত্য।—উনি তো আমার মতামত চান না। নিজের কথা, নিজের উপলব্ধির কথাই বলে চলেন। আমার মত যদি চাইতেন তো বলতাম—প্রতিচ্ছবি, পুনরাবৃত্তি ওসব বাজে কথা। এই যে তিতুটা হয়েছে, ও কি আমার মতো? ওর বাবার মতো? কোন্‌খানটাও নয়। ওর মধ্যে মাঝে মাঝে আমার ভাই টুলুর আদল দেখতে পাই, মাঝে মাঝে আমার শাশুড়ির আদল দেখতে পাই। শ্বশুরমশাই বলেন তিতু নাকি ওঁর বড় ছেলে, তিন বছর বয়সে যে মারা যায় তার মতো দেখতে। তা সেই তিন বছরের পুঁচকে ভাসুরের আমার কোনও ছবিই নেই। তেতাল্লিশ-চুয়াল্লিশ বছর আগে মৃত একটি শিশুর মুখ কি ওঁদের সত্যিই মনে আছে? আসল কথা, তিতু তিতুর মতো। সব শিশুর যা যা সাধারণ লক্ষণ থাকে সেই লক্ষণগুলো মিলিয়ে তাকে অন্য কোনও শিশুর মতো লাগতে পারে, কিন্তু ও নতুন। ও আলাদাও।

দুই

—তিতান, তিতাই এখানে এসো।

—ন্‌না। তুমি দুধ খাওয়াবে।

—দুধ তো খেতেই হবে বাবা।

—কেন?

—ছোটদের খেতে হয়।

—দাদাই কি ছোট? দাদাই তো খায়। দাদাইকে দাও।

—দাদাই তো খেয়েছেন।

—তাহলে দিদাই?

—দিদাইও খেয়েছেন।

—তবে পিয়া?

—পিয়াও খেয়েছে।

—তবে বাবাই?

—বাবাই খাবে, রাত্তিরবেলা।

—তুমি?

—আমি খেতে ভালবাসি না তিতু। হাঙ্গামা করো না।

—আমিও ভালবাসি না।

—তুমি ছোট। চকলেট দিয়ে দিচ্ছি খেয়ে নাও।

—রবিও তো ছোট, ওরও তো জামাপ্যান্ট ছোট, ও দুধ খেতে ভালবাসে। কি রে রবি, বাসিস না?

রবি আমাদের ফরমাশের ছেলে। সে চুপ করে থাকে।

—দাও, ওকে দাও, ও তো রোগা, আমি তো মোটা, আমার তো ভুঁড়ি আছে।

আমি রাগ করে রান্নাঘরের দিকে চলে যাই। তিতু ছুটে আসছে।

—দিলে না? রবিকে দিলে না?

—দিচ্ছি। তাহলে তুমি খাবে তো?

—আর্ধেকটা মা, ও মা, আর্ধেকটা... নেই-আঁকড়া আবদারের সুর তিতুর গলায়। এক গ্লাস দুধ অতএব দুটো কাপে ভাগ করি, হাতল ছাড়া রবির কাপ, আর তিতুর

ফুলকাটা মগ।

রবি খুব কাঁচুমাচু মুখে কাপটা নেয়। এবং সেই মুহূর্তে ওর কাপটা ছিনিয়ে নিয়ে তিতু চোঁ করে দুধটা মেরে দেয়।

আমি হতভম্ব। রবির মুখ যেন অনেক টাকা চুরি করে ধরা পড়েছে।

—তোমাকে তোমার কাপে দিয়েছিলাম। তুমি কেন ওরটা খেলে?

—আমার কাপটায় রোজ খাই। রবির কাপটায় আজ খেতে ইচ্ছে হল।

মস্ত বড় ফুটবল বগলে নিয়ে তিতু ছুট লাগায়—আয় রবি, রবি আয়। রেগেমেগে বলি—রবি আবার কী? রবিদা বলতে পার না? তোমার চেয়ে পাঁচ বছরের বড়।

—রবি তো চাকর। চা করে। চাকরকে আবার দাদা বলে না কি? তিতু ছুটতে ছুটতেই বলে।

চাকর কথাটা আমাদের পরিবারে ব্যবহার হয় না, তিতু কোথা থেকে শিখল, আমি জানি না। চাকর বলে দাদা বলবে না। কিন্তু ছোট বলে তাকে দুধ খাওয়াতে হবে। কী অদ্ভুত এলোমেলো বিচার!

তিতুর দিদা দুটো এক রকমের মগ কিনে দিয়েছেন। একটা সাদা আর একটা হালকা সবুজ। রবি আর তিতুর সামনে রেখেছেন। বল, রবি কোনটা নিবি? তিতু কোনটা নিবি?

তিতু রবির দিকে তাকায়। রবি চোরা চোখে চায় তিতুর দিকে। রবি বুদ্ধিমান ছেলে, বোঝে সাদাটাই ওর নেওয়া উচিত। ও সাদাটা তুলে নেয়। আমার শয়তান ছেলে অমনি ছোঁ মেরে সেটা নিয়ে নেয়।

—আমি রবিরটা নেব দিদা।

দিদা নিজের নৈরাশ্য চেপে বলেন—ঠিক আছে। যে যার পছন্দ করে নিলে। পরে কিন্তু পালটানো চলবে না। আমরা সবাই যে যার কাপে খাই। প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব কাপ দরকার। কেমন?

কাপপর্ব চুকল। কিন্তু রবি পর্ব চুকলে তো!

রবি রান্নাঘরের মেঝেয় বসে খায়। কী মজা! টেবিলে খেতে হয় না। তিতুও মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে খাবে। খাক, তাই খাক। রবিকে টেবিলে তোলার চেয়ে তিতুকে মেঝেতে নামানো ভালো। খালি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখি রবির পাত থেকে কিছু তুলে না খায়। স্বাস্থ্যের নিয়মকানুন শেখাই। রবিকে টুথপেস্ট ব্রাশ কিনে দিয়েছি। নতুন জামাকাপড়। দু জোড়া জুতো। বাড়িতে রবি চটি পরে চ্যাটাং চ্যাটাং করে ঘুরবে কেউই সইতে পারবে না, সুতরাং তিতুই খালি পায়ে ঘোরে। শ্বশুরমশাই সান্ত্বনা দেওয়ার মতো করে বলেন—পায়ের সঙ্গে মেঝের মাটির কনট্যাক্ট ভালো বউমা, নার্ভের পক্ষে তো বিশেষ ভালো। দেখবে, প্রথম প্রথম সর্দি-কাশি হলেও পরে ইমিউনিটি গ্রো করবে।

কিন্তু তিতু ভীষণ বাড়াবাড়ি শুরু করেছে ক্রমশ। নিজের ঘর ছেড়ে সিঁড়ির তলায় রবির বিছানায় গিয়ে শুয়ে থাকবে। কী? না চায়ের দোকানের গল্প শুনবে। রবি কিছুদিন চায়ের দোকানে কাজ করেছিল। কারখানার গল্প শুনবে। কী না, রবি কিছুদিন পেলাস্টিকের কারখানায় কাজ করেছিল। ভিক্ষের গল্প শুনবে। রবি কিছুদিন নাকি ভিক্ষেও করেছিল।

একটা ন বছরের ছেলের কত ঘাটে জল খাওয়ার অভিজ্ঞতা তাই ভাবি। ওর মা

বাবা না কি রোগে মারা যায়, রাস্তায় ঝুপড়িতে থাকত। সেই সময়ে ভিক্ষে করত।

—বাবু, আমার মা বাপ মরে গেছে, পঁচিশটা পয়সা দাও বাবু, মুড়ি খাব-ও-ও।

একদিন তিতু সুর করে বলতে বলতে বলতে ঢুকল। চোখ আধবুজনো, মুখটা জলে মাখামাখি।

—কি করছ, তিতু? ছিঃ, বাবা বলল।

—ভিক্ষে করছি তো? আমার বাবা মা মরে গেছে। উলাউঠো হয়েছিল গো বাবু!

—তি-তু! জোরে চেঁচাই।

ও কি কাঁদছেও—ওর বাবা জিজ্ঞেস করে।

—জল লাগিয়েছি তো মুখে। বাবা মা মরে গেলে কাঁদতে হয়!

তিতু জ্ঞান দিয়ে সরে পড়ে।

আমার স্বামী বলে—এ সব কি?

—রবি। রবির থেকে...

—তাড়াও, তাড়াও, অবিলম্বে তাড়াও রবিকে।

—যদি কিছু হয়?

—কী আবার হবে, ও সব চরে খাওয়া ছেলে, গোটা পঞ্চাশ টাকা এক্সট্রা দিয়ে বিদায় করো।

—আমি রবির কথা বলছি না। তিতু ওকে খুব ভালবাসে। ওর যদি...

—কিছু হবে না, মনকে শক্ত করো, বাচ্চারা খুব তাড়াতাড়ি ভুলে যায়।'

আমি তা সত্ত্বেও ইতস্তত করি। শিশু মন! কীভাবে যে কী আঘাত করে। কিন্তু রবি নিজেই একদিন চলে যায়। চলে যায় তিতুর অত্যাচারেই। রবিকে পড়তে হবে। ওর সঙ্গে। রবি একদম পড়তে ভালবাসে না। পয়সার হিসেব করে চমৎকার। ছবি দেখতেও খুব ভালবাসে। কিন্তু কিছু শেখাতে গেলে ওর মাথায় আর কিছু ঢোকে না। পড়াশোনার মতো বিচ্ছিরি কাজ তিতু একা করবে, রবি পার পেয়ে যাবে, এটা তিতুর পছন্দ নয়। এ ফ' অ্যালিগেটর, বি ফ' বেবুন, সি ফ' ক্যামেল, ডি ফ' ডগ। সে রবিকে পড়াতে থাকে। রবি ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে, বলে—যখন মা-বাবার সঙ্গে থাকতুম, এইরকম কুমির দেখেছিলুম, সাতটা আটটা, মা বললে কাগচের। কিলবিল করে বেড়াচ্ছিল।

তিতু বলে—ভ্যাট, কুমির নয় অ্যালিগেটর।

—না কুমির।

তিতু এক ছপটি মারে রবিকে। —আবার ভুল বলছিস। পড়াটা রবির কাছে একটু অতিরিক্ত হয়ে গেল। একদিন দোকানে জিলিপি কিনতে গিয়ে আর ফিরল না। নতুন জামা-কাপড়, দু জোড়া জুতো, নতুন ফিকে সবুজ মগ, দুধ, বই, খেলাধুলো সব ফেলে স্রেফ পড়ার ভয়ে রবি পালিয়ে গেল।

তিন

পারিবারিক অবস্থা ক্রমে ঘোরালো হয়ে উঠছে। কোথা থেকে যে কী হয়ে গেল, কখন হয়ে গেল আমি বুঝতেই পারিনি। ঝড়ের আগে আকাশে তো লালরঙ দেখা দেবে? প্রকৃতি থমকাবে? কোনও সূচনাই যদি না থাকে তো মানুষ বুঝবে কী করে যে

আবহাওয়াটা খারাপ হতে যাচ্ছে? কী ভাবে সতর্কীকরণ করবে কূল উপকূল?... 'সমুদ্রগামী ধীবরদের সতর্ক করা যাইতেছে যে আগামী আটচল্লিশ ঘণ্টা...' কিছুই বুঝিনি। হঠাৎ যেন ঘুম ভেঙে উঠে দেখলাম একটা অপরিচিত বাড়িতে বাস করছি। দুজন অনতিবৃদ্ধবৃদ্ধা আমার সঙ্গে কথা বলেন না, বা বলেন, মেপে মেপে, কেটে কেটে। একটি তরুণী—বাড়িতে প্রায় তাকে দেখাই যায় না, রাতে শুতে আসে, একটি অনতিযুবক অফিস এবং নিজের ঘরের মধ্যে স্বেচ্ছাবন্দী থাকে। মুখ গম্ভীর, আর আমি একটি অনতিযুবতী, আমার আবহাওয়াও খুব ভালো না, আমি ঝেঁকে ঝেঁকে কথা বলি। যদি সামান্য হ্যাঁ বা না বলি, তাতেও আমার ক্ষোভ, ক্রোধ ভরা থাকে।

বিয়ের পরে চাকরিটা আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। আমার স্বামী বারণ করেছিল। বলেছিল— 'ছাড়ছো ছাড়ো' পরে ঠ্যালা বুঝবে। মেয়েরা যত ঘর-বসা হয় ততই প্রবলেম তৈরি করে...।' আমি কিছু না বলে শুধু হেসেছিলাম, আত্মপ্রত্যয়ের হাসি। তা ছাড়া কর্মক্ষেত্রে যে সুজিত সরকার আছে সে কথা তো আমার স্বামী জানে না! তার আর দোষ কী! কিন্তু আমি একটা অন্ধ গলি থেকে বেরোতে চেয়েছি, চেয়েছি চূড়ান্ত পুরুষকারের সঙ্গে, কাজেই আমি বেসরকারি অফিসের চমৎকার চাকরিটা এক কথায় ছেড়ে দিয়েছিলাম।

এখন বাড়িতে চব্বিশ ঘণ্টা থাকি বলেই আমার চোখে পড়ে যায় দাদুর এঁটো চা সসারে ঢেলে তিতু চুমুক দেয়। চোখে পড়ে হাজাঅলা হাতে দিদা তিতুকে ভাত মেখে দিচ্ছেন। এবং কী সর্বনাশের কথা তিতু ছাতে গিয়ে পাশের বাড়ির মজনুকে ইশারা করছে, তার লায়লা অর্থাৎ তিতুর পিয়া অর্থাৎ আমার ননদ মিতালি তাকে ছাতে ডাকছে। মিতালি আর পাশের বাড়ির ইন্দ্রনীলের প্রণয়-কাব্যে আমার পাঁচ বছরের তিতু মেঘদূত। আরও সর্বনাশের কথা আমার স্বামী আজকাল রোজ অফিস থেকে ফিরে মদ্যপান করছে। নেশা বড় সাঙ্ঘাতিক জিনিস। কর্মক্ষেত্রে প্রয়োজনে এধার সেধার পার্টিতে গিয়ে গ্লাস হাতে ঘোরাফেরা করাটাই তো কেতা। তা সেই গ্লাসের ভেতরের জিনিস কখন ভেতরে চলে যাচ্ছে, আরও যাচ্ছে, আরও যাচ্ছে...যেতে যেতে প্রয়োজন তৈরি হচ্ছে, পিপাসা তৈরি হচ্ছে, নেশাড়ু তা বুঝতে পারে না। আমার স্বামীও বুঝতে পারেনি। তা ছাড়া মদ্যপান নিয়ে তুলকালাম করা আজকাল একেবারেই অচল। একটু উচ্চঘেঁষে মধ্যবিত্ত বাড়িতেই সন্ধেবেলা গেলে মদ অফার করছে আজকাল। আমার স্বামী যে চোখের বাইরে অন্যত্র খেয়ে আউট হয়ে ফিরছে না, ঘরে বসে অভিজাত ভঙ্গিতে খাচ্ছে, এবং ঈষৎ টং হয়ে থাকছে, ঈষৎ উত্তেজিত, খুশি-খুশি যেন কোনও টুর্নামেন্ট জিতেছে টেনিস কি ব্যাডমিন্টনে—এই-ই তো আমার অনেক সৌভাগ্য।

কিন্তু এই সমস্ত কিছুর ফলে যা হচ্ছে তা হল বলতে পারছি না বলতে পারছি না করেও একদিন শ্বশুরমশাইকে বলে ফেলেছি—বাবা আপনি এঁটো চা-টা তিতুকে দিলেন?

—কী করে ভাবলে তুমি কথাটা বউমা, আমার কি সামান্যতম সেন্‌সও নেই?

—চা-ই বা ওকে দেওয়া কেন?

—ছেলেমানুষ বড়দের জিনিস একটু-আধটু চাখতে চায়, থাক আর কখনও দোব না।

আর দিলেনও না, আমার সঙ্গে উনি আর স্বাভাবিকও হতে পারলেন না। কেমন একটা চাপা ক্ষোভ পুষে রাখলেন।

শাশুড়িকে হাজার কথাটা কিছুতেই বলতে পারলাম না। ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে মলম কিনে আনলাম। হাতে জল লাগানো বারণ। জল লাগলেই সঙ্গে সঙ্গে মুছে ফেলতে হবে। দিনে রাতে তিনবার ওষুধ লাগিয়ে দিই। দেখতে পেলেই জলহাত মুছিয়ে দিই। কিন্তু জল ঘাঁটা বন্ধ করব কী করে? হাত সব সময়ে ভিজে, হাজা সেরে আসে আবার হয়। খোসা-ওঠা-ওঠা হাত। কী ঘেন্না যে করে! ফলে চাপা ক্ষোভটা আমার মধ্যে জমে থাকে। যখন তখন ঝেঁঝে কথা বলি। খাওয়ার সময় এলেই কাঁটা হয়ে থাকি।

—তিতু নিজে নিজে খাও—

—ন্‌না—দিদাই গরস পাকিয়ে দেবে...

—আচ্ছা আমি দিচ্ছি।

—তুমি যাও না বউমা। আমি দিচ্ছি।

—আপনি গিয়ে বারান্দায় বসুন না, আমি তিতুকে খাইয়ে দিচ্ছি।

—কী বললে? আমি সারাদিন বারান্দায় বসে থাকি?

—উঃ তা কখন বললাম! বারান্দায় বসতেই তো বলছি।

—ওই ঘুরিয়ে বলা হল।

চোখে আঁচল দিয়ে শাশুড়ি চলে গেলেন। আরও বেশি করে জল ঘাঁটতে লাগলেন। বউমা কাজের খোঁটা দিয়েছে কি না। শেষে আমি একদিন চিৎকার করে ফেললাম— উঃ, আমি ছেলেকে নিয়ে কোথাও চলে যাব। হাতময় যা করেছেন, সেই হাতে ওকে খাওয়াতে আপনার প্রবৃত্তি হয়?

আহত পশুর মতো আমার দিকে চাইলেন শাশুড়ি। চোখ ছলছল করছে। মুখে অপার বিস্ময়। আস্তে আস্তে চলে গেলেন। আমার নিজেকে মারতে ইচ্ছে করল। ভালোভাবে বুঝিয়ে সুঝিয়েও তো বলতে পারতাম! কেন পারিনি। তবে বুঝিয়ে বললেও একই ফল হত, বিষয়টা এতোই স্পর্শকাতর।

মিতালিকে সোজাসুজি বললাম—হ্যাঁরে মিতা, তোর লজ্জা করে না পাঁচ বছরের বাচ্চাকে মাঝখানে রেখে প্রেম করছিস। ছি ছি। ওকে মিথ্যে বলতে শেখাচ্ছিস। ইশারা করতে শেখাচ্ছিস।

মিতালি বেমালুম অস্বীকার করে গেল। বলল—বাবাঃ, তোমার ছেলে ওকে যা ভালোবাসে। কাকু কাকু করে অস্থির। আমি কিছুই শেখাইনি, ও নিজের বুদ্ধিতেই ও সব করে। যা পাকা।

আমি চোখ গরম করে বললাম—আর কোনদিনও যেন ওর সামনে এ সব না দেখি। পাকা। না? একটা বাচ্চা ছেলের পরকাল ঝরঝরে করছো আবার বলছো পাকা!

—'যাও যাও'। মিতালি বলল। 'তোমার মতো নীতিবাগীশদের ভেতরের কথা আমার জানা আছে। সুজিত সরকারের ছোট বোন তো আমার সঙ্গে পড়ে!'

আমার বুক হিম হয়ে গেল। কিচ্ছু বলতে পারলাম না। চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। পরে মনে হল চুপ করে গেলাম কেন? কড়া করে আরও দু কথা শোনাতে পারা উচিত

ছিল। সুজিতের সঙ্গে যা ছিল তা চুকিয়ে বুকিয়ে তোদের বাড়ি এসেছি। সে নিয়ে কথা শোনাবার কোনও অধিকার মিতালির নেই। কিন্তু কার্যত কিছুই করতে পারলাম না।

বাড়িতে দুটো টিভি সেট। শ্বশুর শাশুড়িরটা বেশির ভাগই মিতালির দখলে থাকে। নন-স্টপ এম চ্যানেল খোলা থাকে। মিতালি কতটা দেখে জানি না, কিন্তু তিতু দেখে, তিতু নাচে। স্বাভাবিক প্রতিভা ওইটুকু ছেলের, চমৎকার নাচে। মিতালির বন্ধুরা এসে ফরমাশ করে তিতু নেচে দেখায়। আমারও যে একটু-আধটু গর্ব হয় না তা নয়। আরও হয় মিতালির ঘরে। অ্যাকশন ছবি। এ ওকে মেরে দশতলা থেকে একতলায় ফেলে দিল। ও এর গায়ে পেট্রল ঢেলে আগুন জ্বেলে দিল। দেখে আমি শিউরে উঠি। কিন্তু তিতু হাততালি দেয়। হাসে, বলে, মা দিস ইজ ফান। আমাদের আর একটা টিভি সেট আমাদের ঘরে থাকে। তিতুর বাবা সাতটা নাগাদ বাড়ি ফিরে চান টান করে টিভিটা চালিয়ে দেয়। হালকা করে। রঙিন ঘূর্ণি নাচ হতে থাকে। মাথায় ফেট্টি-বাঁধা খালি-গা হুমদো হুমদো ছেলেরা কাঁচুলি পরা, ঝিলিমিলি মেয়েদের সারা শরীর চাটতে থাকে। মেয়েদের পেট নাইকুণ্ডলি সুদ্ধ, সাপের মতন দুলতে থাকে। মিলিত হবার নানান ভঙ্গি করে ওরা। তিতু চোখ সরাতে পারে না। ওর বাবার সামনে নিচু টেবিলে হোয়াইট হর্সের বোতল, লিমকা, মাছের কি মাংসের পকোড়া, আলগাভাবে টিভির ওপর চোখটা ফেলে রাখে সে।

আমি বিরক্ত হয়ে বলি— দেখবার কি আর জিনিস পাও না? এই একই পেট, একই কোমর দোলানো, একই ঠ্যাং নাচানো রোজ দেখতে হবে?

ঢুলু-ঢুলু চোখে চেয়ে তিতুর বাবা বলে—আরে বাবা দেখছি কি আর? মনটাকে অন্যমনস্ক রাখছি। ভাবতে হয় না, মাথাটা ফ্রি থাকে। সারা দিন যা যায়, জানো না তো আর?

—তুমি একটা উচ্চশিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ার মানুষ, তোমার মাথা ফ্রি রাখতে এই অখাদ্য জিনিস দরকার হয়? তিতু পড়তে বসবে চলো। —আর কোনও ঘর আমাদের নেই। শ্বশুর শাশুড়ির ঘর, মিতালির ঘর, আমাদের ঘর, আর একটা বসবার ঘর। বসবার ঘরে লোক আসে, বারবার দরজা খুলতে হয় বলে ওখানে বসতে আমি পছন্দ করি না। কিন্তু কী আর করব? ওখানেই বসি। তিতুকে পড়াই। মিতালির ঘরের দরজা, মিতালির দাদার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিই।

—দেখাও তিতু, আজকে কী হোম-টাস্ক আছে, এ কি! তোমার আঙুলে এমন কালশিটে পড়ল কী করে?

—ক্লাসে বাংলা বলেছিলুম বলে আন্টি স্কেল দিয়ে মেরেছে।

—চমৎকার! বাংলা বলেছিলেই বা কেন?

—আমার যে দাঁত কনকন করছিল মা, আমি যে দাঁত কনকনের ইংলিশ জানি না, উস উস করছিলুম, আন্টি বকল, তাই তো আমি বললুম—আমার দাঁত কনকন কচ্ছে।

—আর উনি তোমাকে মারলেন? দাঁত কনকন করা সত্ত্বেও?

—ডি-সুজা আন্টি হেভি খচ্চর মা।

—তিতু, কী বলছো?

—রাজু তো বলে...

—রাজু বলুক, তুমি বলবে না, খারাপ কথা। রাজুকেও শিখিয়ে দেবে খারাপ কথা না বলতে।

—মা, বাংলা বললে মারে কেন মা? বাংলা বলা খুব খারাপ? বাংলাটা খারাপ কথা মা, খচ্চরের মতো? তোমাদেরও আন্টি মারে! পেরেন্টস ডে-তে?

আমার পিত্তি জ্বলে যায়। আমার সত্যি বলছি, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে হয়—হ্যাঁ হ্যাঁ তোদের ডি-সুজা অ্যান্টি হেভি খচ্চর, কুত্তী একটা, বেজন্মা কুত্তী।

কিন্তু এই নামজাদা প্রেপ-স্কুলে না পড়লে তিতু তো কোনও ভাল স্কুলে ভর্তিই হতে পারবে না!

—ডিং ডং ডিং ডং।

—দরজার ফুটোয় চোখ রাখি। শ্বশুরমশাইয়ের বন্ধু রাখালবাবু।

—আসুন কাকাবাবু— বিনয়ের প্রতিমূর্তি আমি।

—বা বা বেশ বেশ, নাতিবাবু পড়ছেন?

—আর পড়বো না। রাখালদাদু এসছে, ভূতের গল্প বলবে।

তিড়িং তিড়িং নাচতে থাকে তিতু।

আর সয় না আমার। সারাদিন ধরে চাপা রাগ পুষছি। এক থাপ্পড় মারি তিতুর গালে।

—পড়বি না? ইয়ার্কি পেয়েছিস?

তিতু বিরাট চিৎকার করে কাঁদতে থাকে।

রাখালবাবু বলেন— এ হে বউমা মারলে ছেলেটাকে? তুমি পড়ো দাদা। আমি আছি, ভূতের গল্প ভাবতে থাকি, যাবার সময়ে তোমায় ঠিক বলে যাব।

ভূতের গল্প, রূপকথার গল্প এসব আমি পছন্দ করি না। অযথা ভয়-ভীতি ঢোকে ছেলেদের মনে। আর রূপকথার গল্প মানেই তো যত গাঁজাখুরি। রাখালবাবুর আবার অভ্যাস আছে সব গল্পই 'দাদু ভাইয়ের ঠিক রাজকন্যের মতো টুকটুকে বউ আসবে' দিয়ে শেষ করার। একটা পুঁচকে ছেলের মধ্যে বউ-টউ ঢুকিয়ে দেওয়া একেবারে কুরুচির একশেষ বলে আমার মনে হয়। তা ছাড়া বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কহীন কতকগুলো গল্পকথা ছোট থেকে শুনে শুনেই আমাদের বাঙালি জাতটা এমন হাঁদা ক্যাবলা উটমুখো হয়েছে।

আমি অনুযোগের সুরে বলি—কাকাবাবু, ভূতের গল্পগুলো ওর মাথায় আর নাই ঢোকালেন। এ ঘর থেকে ও ঘরে যেতে পারে না রাত্তিরে।

রাখালবাবু হা-হা করে হেসে বললেন—ওইটেই তো মজা বউমা, ভয়ের টিকে দেওয়া রইল ছোটবেলায়।

এবার কড়া গলায় বলি—না। ভূতের গল্প বলবেন না, বাজে ওসব। রূপকথার গল্পও বলবেন না। রাজা-রানী যত সব বুর্জোয়া ইম্যাজিনেশন। রাবিশ।

—রাবিশ? বোকার মতো হেসে রাখালবাবু ভেতরের ঘরের দিকে চলতে থাকলেন।

তিতু গোঁজ হয়ে গিয়ে ঘরে শুয়ে পড়ল। অনেক চেষ্টা করেও ওকে পড়াতে তো পারলামই না, খাওয়াতেও পারলাম না ভালো করে। দু গাল খেয়েই ঘুমে ঢলে পড়ল।

চার

তিতুকে নিয়ে আমার ভাবনা এখন অনেকটাই কমে গেছে। তিতু প্রতি বছর ফার্স্ট হয়ে ক্লাসে উঠছে। অঙ্ক আর ইংরেজিতে নীলোৎপল ওকে মেরে দিচ্ছে। ভাইট্যাল দুটো সাবজেক্টই। কিন্তু বাকিগুলোতে তিতু অনেক মার্কস পায় বলে এগিয়ে থাকছে। নীলোৎপল যে কোনদিন ওকে হারিয়ে দিতে পারে। ওর বাবার কাছে ভাবনা প্রকাশ করতে সে বলল—আমার পোলা অঙ্ক ইংরেজিতে খারাপ করবে? হতেই পারে না। আসলে, মন দিচ্ছে না। অঙ্কে কনসেনট্রেশন চাই। আর ইংরেজি? দেখো ওর আন্টিই কতটা জানে? নীলোৎপলের বাবাকে তো আমি চিনি। কেঁদে ককিয়ে পাস করত। ডাল মে কুছ কালা হ্যায়।—আমরা তিতুকে উৎসাহিত করি। খাট, আরেকটু খাট, নীলোৎপলকে মেরে বেরিয়ে যায়। কিলার ইন্‌সটিংক নেই কেন তোর?

যাই হোক, তিতুর নাচের প্রতিভা দেখে ওকে আমরা নাচেও দিয়েছি। অনেকের ধারণা ছেলেরা নাচ শেখে না। ছেলেরা নাচ না শিখলে উদয়শঙ্কর, বিরজু মহারাজ এঁরা হলেন কোত্থেকে—তাদের জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়। তিতু দারুণ কত্থক নাচছে। ওকে আমরা যথাসম্ভব এক্সপোজার দিচ্ছি। একটা ট্যালেন্ট সার্চ কমপিটিশন আছে শিগগিরই, নাওয়া-খাওয়া ভুলে প্র্যাকটিস করাচ্ছি ছেলেকে। শ্বশুর, সাধারণত আমাদের কথায় থাকেন না, বললেন— 'ছেলেটাকে শেষ পর্যন্ত মর্কট বানাচ্ছ বউমা!'

কী বলব এঁদের। পুরাতাত্ত্বিক ধারণা নিয়ে বসে থাকবেন, কোনও ইসথেটিক সেন্সই নেই।

তিতু বলল—মা, হোয়াট ইজ মর্কট, ইজ ইট রিলেটেড টু মার্কেট? একবার ভাবলুম মিথ্যে বলি। তারপর কেমন একটা পৈশাচিক আহ্লাদে বললুম— তোমার দাদু তোমাকে বাঁদর বলে গেলেন। মর্কট মানে বাঁদর।

—সিলি ওল্ড ফুল। —তিতু বলল।

বড় আনন্দ হল। বহুদিন ধরে চেপে রেখেছি এঁদের বিরুদ্ধে একটা অসন্তোষ, ক্রোধ, এঁরা আমার সঙ্গে স্বাভাবিক ব্যবহার করেন না, নিন্দেমন্দ করেন আত্মীয়স্বজনের কাছে, কিন্তু তিতু এঁদের যথেষ্ট ভালো বসে। ভালোবাসুক। তাতে আমি বাদ সাধতে চাই না। কিন্তু বুঝুক ও-ও বুঝুক এঁরা অচল। বুঝুক— এঁরা ওর মাকে শুধু শুধুই অবজ্ঞা হেনস্থা করে চলেছেন।

মিতালির বিয়ে হয়ে গেছে। বেঁচেছি। ইন্দ্রনীলের সঙ্গে নয়। ওর বিয়ে হল এক এন আর আই ডাক্তারের সঙ্গে। ওর বাবা-মা, এন আর আই-এর সঙ্গে দিতে চাননি। একমাত্র মেয়ে সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পার হয়ে যাবে। কিন্তু মিতালি নিজেই জেদ ধরল। ইন্দ্রনীলকে এড়াতে চায় আর কি! এ পাত্রর সঙ্গে ইন্দ্রনীল তুলনায় আসে না। মিতালি গদগদ একেবারে। আমার কী? আমার কিছুতেই কিছু যায় আসে না—ইন্দ্রনীলই হোক আর চন্দ্রনীলই হোক। কিন্তু তিতু ওইটুকু ছেলে কী রকম মুখ শুকনো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রথমে ভেবেছিলুম—পিয়া চলে যাবে তাই বোধহয় মন খারাপ। কিন্তু সে কথা বলতে ছেলে ঝটকা মেরে চলে গেল। তার পরেই দেখলুম ইন্দ্রনীলের সঙ্গে ঘুরছে। তখনই বুঝেছি। ইন্দ্রনীল আবার ওর কানে কী মন্ত্র দিচ্ছে কে জানে? আমার

হয়েছে জ্বালা।

বউভাতে যাব বলে তৈরি হচ্ছি। তিতু বলল— যাব না।

— সে আবার কি? ড্রেস করো।

—শী ইজ আ চীট— তিতু বলল— ইন্দ্রনীল শুড কিল হার। আমি বললাম— কী বাজে বকছিস তিতু? পিয়া কাকে বিয়ে করেছে তাতে তোর কী? ওদের মধ্যে কী হয়েছে না হয়েছে তুই জানিস? এ সব বড়দের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামিও না। জীবনে এ রকম কত হয়। সবচেয়ে যাতে ভালো হয়, সেটাই বেছে নিতে হয়।

আমার দিকে কটকট করে তাকালো ছেলে। বারো বছরের ছেলে, কী পাকা! পরিপক্ক একেবারে! আজকালকার ছেলেমেয়েরা অন্য ধাতের হয়। হোক বারো বছরের, তার সঙ্গে যে জীবন ও আচরণ সম্পর্কে একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করতে পেরেছি, এতে আমার মনটা প্রসন্ন হয়ে আছে। খুব শিগগিরই ও বড় হয়ে যাবে। আমার, আমাদের বন্ধু হয়ে যাবে। ভাবতে খুব আনন্দ লাগে। এখন থেকে ওর সঙ্গে একটু একটু করে সমানে সমান ব্যবহার করব। এতে ছেলেদের চিন্তাশক্তির বিকাশ হয়। দায়িত্ববোধ বাড়ে, জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা জন্মায়। নানা রকম ঝক্কি ঝামেলার মধ্যে দিয়ে হলেও ছেলেটা আমার মানুষ হতে চলেছে।

ওর যে কত কল্পনাশক্তি, কতটা স্বকীয়তা, স্বনির্ভরতা, আত্মবিশ্বাস তৈরি হচ্ছে, সেটা আরও একটা ব্যাপার থেকে বোঝা গেল। ওদের স্কুলের অ্যানুয়াল কনসার্ট হল। পেরেন্টস ডে-তে আমরা দুজনেই গিয়েছিলাম। ঘোষণা করল, নতুন একটা দল এবার নেচে গেয়ে আসর মাতাবে, দল বা ব্যান্ডের নাম কী? না 'ভ্যাগাব্যান্ড'। একদফা হাসির হররা উঠল। তাব পর সাইকেডেলিক আলো জ্বলতে নিভতে আরম্ভ করল। দেখলুম গানে ওদের ক্লাসের রচপাল সিং, পার্কাশনে জমির আলি, ক্যাসিও বাজাচ্ছে টুম্পা হাজারিকা, মাউথ অর্গ্যান নীলোৎপল আর নাচ তিতু; আমার তিতু। জ্যাকসনের মুনওয়াকিং করছে দেখলুম আমার ছেলে। ব্রেক করছে কী, একদম প্রভুদেওর মতো। মাতিয়ে দিল। হাততালি পড়ছে তো পড়ছেই। পড়ছে তো পড়ছেই।

ওদের প্রিন্সিপ্যাল মিঃ মাথুর পুরো ব্যান্ডের জন্য একটা দেড় হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা করলেন। তিতুর জন্যে বিশেষ পুরস্কার ঘোষণা হল—কে অঞ্জলি দেওল দেবেন।

ওর বাবা বলল—দেখো, তোমার ছেলেকে তুমি স্কলার করতে চাইলে, আমি চাইলুম, ট্রেইনড ম্যানেজার হোক, ও হয়ে গেল শোম্যান। নেভার মাইন্ড। শো ম্যানদেরই তো যুগ পড়েছে।

আমি বললাম—আহা হতাশ হচ্ছ কেন? বারো বছর তো মোটে বয়স। স্কলার হবার সময়ও চলে যায়নি। এম.বি.এ. দিগগজ হবার সময়ও যায়নি।

ছেলে আসতে হ্যান্ডশেক করল বাবা। চাপা গলায় ছেলে আমাকে বলল—এখানে যেন বাচ্চার মতো আমাকে ফন্ডল করো না। আমি হাসতে লাগলাম।

বড় শান্ত, নিবিড়, সুখ-সমুদ্র ঘুম ঘুমোই আজকাল। ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যে দিয়ে জীবনটা আরম্ভ হয়েছিল। ছা-পোষা বাবা-মা, ভাইটা মিডিওকার, আমি নিজেও তাই, কিন্তু বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে একটা ভাল চাকরি জুটেছিল। তা সেখানে গিয়ে একটা

বিবাহিত পুরুষের ফাঁদে পড়লাম। অনেক করেও যখন পুরনো সংসারকে সে গুডবাই জানাতে চাইল না, তখন চোখের সামনে অন্ধকার সমুদ্র দুলছিল। প্রাণপণে চোখ বুজে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। প্রতি মুহূর্তে মনে হয়েছে ভুল করছি। এ লোক আমার নয়। কেটে তো গেল আঠারো বছর। শ্বশুরবাড়ির পরিজনদের সঙ্গে শীতল যুদ্ধও একসময়ে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। আমাব স্বামী অফারও দিয়েছিল আলাদা সংসার করার। আমি শুনিনি। হেরে যাব কেন? জীবনে সব সমস্যার মুখোমুখি হয়ে বীরের মতো তার সমাধান করবার চেষ্টা করেছি। বুড়োবুড়ি যে আমাদের সঙ্গে আছেন, এতে সামাজিক দিকটা কি কম সহজ হয়ে গেছে? ওদিকে কোনও টেনশনও নেই। এক পিসশাশুড়ি তো একদিন বলেই ফেললেন—তোমার বউমা লক্ষ্মী বউমা বউদি। দুযুগ তো কাটিয়ে দিলে তোমাদের সঙ্গে। আর আমার বউগুলো দেখো! একটা ছেলে পড়াবার নাম করে বালিগঞ্জে বাসা নিলে। একটা বিধবা মায়ের দোহাই দিয়ে বাপের বাড়িতেই বছরভর পড়ে থাকে। আর ছোটটা তো একেবারে সাগরপার হয়ে গেল। যতই নিন্দে করো বউ তোমার ভালো।

মনে মনে বলি—কম আত্মত্যাগ করিনি। চাকরি ছেড়েছি। উদ্দাম প্রণয় তা-ও ছেড়েছি। দিনগত পাপক্ষয়, আবেগহীন সংসার জীবন মেনে নিয়েছি। মানিয়ে নিয়েছি রক্ষণশীল শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে, উচ্ছৃঙ্খল, স্বার্থপর, রুচিহীন ননদিনীর সঙ্গে। ছেলের জন্যে যা করেছি—তার হিসেব আমার মনে নেই। সে করা বহু আনন্দের করা।

—ডিং ডং ডিং ডং... এই দুপুরে আবার কে এলো? ফুটোয় চোখ লাগিয়ে দেখি তিতুদের স্কুলের প্রিন্সিপ্যালের গাড়ি। ভেতরে উনি বসে আছেন। ড্রাইভার এসে বেল বাজাচ্ছে। বুকটা ধক করে উঠেছে।

—কী হল? তড়িতের কিছু হয়েছে?

প্রিন্সিপ্যালের মুখ ভাবলেশহীন। বললেন—না, কিন্তু একটু দরকাব আছে, আপনি চট করে রেডি হয়ে আসুন মিসেস সিনহা। সম্ভব হলে আপনার হাজব্যান্ডকেও তুলে নেব।

—ওকেও? কেন? কী হয়েছে? বিপদ? তড়িৎ?

—তড়িৎপ্রভ ইজ অল রাইট মিসেস সিনহা। বাট দেয়ার হ্যাজ বিন আ ন্যাস্টি অ্যাকসিডেন্ট ইন দা স্কুল।

আমি আতঙ্কে বোবা হয়ে যাই। কী বলছেন এঁরা তিতুর কিছু হয়নি, অথচ নাস্টি অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে?—তিতুর কিচ্ছু না হলে ওঁরা কেন আমায় নিতে এসেছেন? এতই জরুরি যে ওর বাবাকেও নিতে চাইছেন।

পুলিশ। স্কুল-কমপাউন্ড ঘিরে প্রচুর পুলিশ। আমরা দুজনে যাচ্ছি ভিড় ঠেলে। প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে। একজন ইন্সপেক্টর। ইন্সপেক্টরই হবেন, আমি অত কাছ থেকে পুলিশ ইনসপেক্টর কখনও দেখিনি। বললেন, মিসেস সিনহা—আপনার ছেলের মধ্যে কোনও ক্রুয়েলটি লক্ষ্য করেছেন? এ স্ট্রীক অফ নিয়ার ম্যাডনেস?

—না তো না।

—ও গুমরে থাকত না? ভিনডিকটিভ নয়?

—কী করে বলব? সেরকম কিছু কখনও দেখিনি। কেন, কী হয়েছে? বলবেন তো? কী আশ্চর্য, বলবেন তো কিছু।

প্রিন্সিপ্যাল ধীরে ধীরে বললেন, তড়িৎপ্রভ একটা হার্ড-পেন্সিল সরু করে কেটে লম্বা করে দাঁড় করিয়ে রাখে সীটের ওপরে। ফেভিকল দিয়ে আটকে। ঠিক নীলোৎপলের বসার জায়গায়। নীলোৎপল না দেখে বসতেই পেন্সিল আমূল ঢুকে গেছে ওর রেকটামে। শকে মারা গেছে ক্লাসের সেকেন্ড বয়। সঙ্গে সঙ্গে।

আতঙ্কে নীল হয়ে আমরা ওর বাবা-মা বলি—কী সর্বনেশে খেলা। ছি। ছি। ছেলেটা একেবারে মারা...

ইনসপেক্টর বললেন—নো মিসেস সিনহা, ইটস নট জাস্ট এ প্র্যাঙ্ক! ইটস মার্ডার। প্রি-মেডিকেটেড। ক্লাসেব ছেলেরা সাক্ষ্য দিয়েছে ফার্স্ট প্লেস নিয়ে দুজনের মধ্যে বিটার রাইভ্যালরি ছিল। তা ছাড়াও টুম্পা হাজারিকা নামে একটি মেয়েকে নিয়ে দুজনে কিছুদিন ধরেই লড়ছিল।

আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। অস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি প্রিন্সিপ্যাল মি: মাথুরের মুখটা ঝুলে পড়েছে।

আমার স্বামী হঠাৎ খ্যাপার মতো চেঁচিয়ে উঠল—এই জন্য? এই জন্য আপনাদের স্কুলে কুড়ি হাজার টাকা ডোনেশন দিয়ে ছেলেকে ভর্তি করেছি? এই শিক্ষা দিয়েছেন তাকে? এই শিক্ষা?

ঝোলা মুখটা সামান্য তুলছেন প্রিন্সিপ্যাল। থেমে থেমে বলছেন—ওই একই প্রশ্ন আমিও তো আপনাকে করতে পারি মিঃ সিনহা?

বাস্তু

শেষ পর্যন্ত বাড়িটি বিক্রি হয়ে গেল। নির্বিঘ্নেই বলা চলে, কেননা রথীনের স্মার্ট ছোট ভাই দিল্লিবাসী হলেও, ভগ্নীপতি বিমানও কম হুঁশিয়ার লোক নয়। ছেলে মেয়ের স্কুলের কথা চিন্তা করে উত্তর কলকাতা ঘেঁষে এখন ওদের বছর দুয়েক বাস করার মতো একটা ব্যবস্থা হয়েছে। তা শিফটিং-এর হাঙ্গামা মিটতে মিটতেই পুজোর ছুটি শেষ।

জয়িতা, রথীনের স্ত্রী, প্রথম থেকেই গুম হয়ে ছিল। পুরো ব্যাপারটাই তার অপছন্দ। কিন্তু রথীন কী-ই বা করতে পারে? ব্রতীন নাকি দিল্লীতেই বাড়ি করছে, টাকা চাই। প্রথমটা খুবই রাগ হয়েছিল, বাড়িটা যেমন রথীনের একার নয়, তেমনি ব্রতীনেরও তো একার নয়! হঠাৎ সে এভাবে ভাগ চাইতে পারে? তারা পুরো পরিবার রীতিমতো বাস করছে এখানে। এখানেই তাদের তিন চার পুরুষের ভিটে। অবশ্য ব্রতীন দাবি করে নি। খুবই ইনিয়েছে বিনিয়েছে। রথীনেরও যে একটা ভালো বাসস্থানের কত দরকার, ইত্যাদি ইত্যাদি।

পরে, রাগটা পড়লে, বিশাল উঁচু উঁচু পলেস্তারা-খসা দেয়াল, ফুটিফাটা ছাদ,

ছ্যাৎলা-পড়া মেঝে এসবের দিকে তাকিয়ে সে ভেবেছিল—উপায়ই বা কী? এই জমিদারি ব্যাপার সারানোর হিম্মৎ তার একার নেই। ছোটর ঘরগুলো তালা দেওয়াই পড়ে থাকে। মিতা অর্থাৎ তার বোনেরও এ বাড়িতে এক-তৃতীয়াংশ ভাগ আছে ঠিকই কিন্তু মেইনটেনান্সের এক-তৃতীয়াংশ ব্যয় ছোটই কোনদিন স্বীকার করল না তো মিতা! তাহলে?

অথচ জয়িতা তার মর্নিং স্কুলের কাজ সামলেও প্রাণপণ চেষ্টায় বাড়িটাকে সাফ সুতরো রাখে। তার অজস্র জানলা। অজস্র দরজা, গ্রান্ডফাদার ক্লক, জালিকাজের টেবিল, পেল্লায় আলমারি...সব। এই করতে করতে জয়িতার হাতগুলো কেমন ছ্যাৎলা পড়া হয়ে গেছে। অতিরিক্ত পরিশ্রমের একটা কালচে ছাপ পড়ে গেছে মুখে।

ছোট গত পুজোয় এসে বলছিল— 'এত কী করে করো বউদি, আর করোই বা কেন? এত খাটুনি।'

'লেবার অব লাভ'—জয়িতা উত্তর দেয়।

জয়িতার এই অস্বাভাবিক টানের কথা মনে করেই রথীন একটা প্রাথমিক বাধা দিয়েছিল।

'জানিস তো, বাড়ি নিয়ে তোর বউদির খ্যাপামি।'

'ব্যাপারটা কি জানো দাদা, বউদিরা তো চিরকাল ভাড়া বাড়িতে থেকেছে। এত বড় একটা নিজস্ব বাড়ির গ্র্যাঞ্জার তাই...মানে...বুঝেছ তো? তা নিজের ফ্ল্যাট তো হচ্ছেই। ভালোই হবে। অনেক ঝামেলা থেকে বাঁচবে।'

কথাটা বোধহয় জয়িতাব কানে গিয়ে থাকবে। ছেলে মেয়ে বেশ শেয়ানা, মায়ের ডান হাত বাঁ-হাত। তারাই হয়ত কানে তুলে দিয়েছে। জয়িতা রাত্রে শুতে এসে বলল —'ছাগল তোমাদের। তাকে তোমরা ল্যাজের দিকে কাটবে না মুড়োর দিকে কাটবে, জবাই করবে না হালাল করবে সে তোমাদের ব্যাপার। আমার মতামতের অপেক্ষা করো না। আমি হলুম চাকরানী।'

'আহা হা হা, রাগ করছ কেন? ভেবেচিন্তে দ্যাখো না কিসে ভালো হয়।'

তার জবাব হল— 'দুর দুর কোনদিন এত বড় বাড়ি চোখে দেখেছি বিয়ের আগে? আমি বাড়ি বিক্রি-বাটার মর্ম কী বুঝবো?'

জয়িতার অভিমান দেখে রথী মনস্থির করে ফেলে। সে সেবার ছোট ভাইকে বলেই দেয় স্পষ্ট— 'দ্যাখো ব্রতী, এ বাড়ির মর্ম সত্যি কথা বলতে আমিও বুঝি না, তুমিও বোঝ না। যে রাখে বাড়ি ধর্মত তার। তোমার বউদিকে কাঁদিয়ে আমি বাড়ি বিক্রি করতে পারব না।'

'তাহলে আমার অংশের ভ্যালুয়েশন করে টাকাটা দিয়ে দাও।'

'বাঃ কী ভাবে দেবো? প্রভিডেন্ট ফান্ড তুলতে বলো? না বউদির গয়না-বিক্রি? তাতেও হবে না, হবে কী?'

চক্ষুলজ্জায় ব্রতী রণে ভঙ্গ দিয়েছিল। তবে খুব সম্ভব সে-ই বিমানকে টিপে দিয়ে যায়।

বিমান বেশ চালু ছোকরা, খোশামুদি করে করে জয়িতাকে পটিয়েছে খুব। কাপ্তানি বেশবাস করে একদিন ভটভটিয়ে চলে এলো।

'বউদি, বউদি।'

'আরে বিমান যে, এসো, এসো। চা খাবে তো?'

'আপনার হাতের চা সে তো খাবোই। আজ আপনাকে একটা জিনিস দেখাই, দেখুন।'

'কী জিনিস?'

'আরে চলুনই না।'

টানতে টানতে জয়িতাকে একতলায় টেনে নিয়ে গেল বিমান। পশ্চিমের ঘরে।

আগেকার দিনের কাঠের কড়ি বরগা সমস্ত উইয়ে উইয়ে শতচ্ছিন্ন। শাখা-প্রশাখা নেমেছে ঘরের চার দেয়ালে।

'আরও দেখুন...'

পুরনো রান্নাঘরের মধ্যে ঢোকালো সে জয়িতাকে। আরশুলা, ইঁদুর এবং চামচিকে, তাছাড়া তাদের নাদি। কাগজপত্র, কাঠকাঠরা যা ছিল সব কেটেকুটে ছারখার। নাকে কাপড় দিয়ে বেরিয়ে এলো জয়িতা।

'দিন এবার চা-টা যা দেবেন দিন।' বিমান হাত দুটো সশব্দে ঝেড়ে বলল।

'চা দিচ্ছি, কিন্তু দেখুন দেখুন করে আমার নিজেরই বাড়ির অন্ধি-সন্ধি আমাকেই দেখাচ্ছ? ব্যাপার কী?'

'বাড়ি দেখাই নি বউদি। বাড়ি না। দেখালাম অতীত। যতই চেষ্টা করুন অতীতকে টিকিয়ে রাখতে পারবেন না। সে গত হবে।'

'সময় তো গত হবেই।'

'বস্তুও গত হবে বউদি। কেন না তার ওপর সময়ের ছাপ পড়ে।'

'বিমান, তোমারও কি খুব টাকার দরকার?'

'ছি ছি বউদি' বিমান দশ হাত জিভ কেটে প্রায় জয়িতার পায়ে পড়ে গেল — 'আপনি শেষটা আমায় এই ঠাউরালেন? দেখুন বউদি, আমি জামাই হতে পারি। কিন্তু যে জামাইরা জন এবং ভাগনার মতো কিছুতেই আপনা হতে চায় না আমি কদাচ তাদের দলে নই। আমার একটি নিঃসপত্ন পৈতৃক বাড়ি আছে। আমার পিতৃদেব শেষ বয়সে করেছিলেন তাই তাতে সময়ের হাত এখনও সে ভাবে পড়ে নি। আমি মিতাকে বলেছি—মেয়েদের পিতৃ সম্পত্তির উত্তরাধিকারের যে আইন তা দুঃস্থ মেয়েদের জন্যে। তোমার মতোদের জন্য নয়। কাজেই এ প্রপার্টি বিক্রিতে আমাদের বিন্দুমাত্র স্বার্থ নেই। আমি চাই আপনারা ভালো থাকুন, বিল্টু, মিলু ভালো থাকুক। এই জমির ওপরেই আপনাদের বাস করার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। একেবারে চকচকে নতুন বাড়িতে।'

'বাড়ি বলো না। বলো ফ্ল্যাটে। মাথার ওপরে ঢনঢন করে হামান দিস্তেয় মশলা গুঁড়োনো হবে। কত্থক প্র্যাকটিস হবে। মাতলামো করে কেউ সিঁড়িতে বমি-টমিও করে রাখতে পারে। পানের পিক তো ফেলবেই।'

'না বউদি, এই ভাবেও ভাবুন, মাসে মাসে একটা অ্যামাউন্ট দিয়ে দিচ্ছেন সমস্ত ঝামেলা মিটে যাচ্ছে। জলের পাইপ, ইলেকট্রিকের লাইন, বাড়ি রঙ, এভরিথিং। তার ওপর গেটে দারোয়ান। বাইরের লোক ঢুকতেই পারবে না।'

'ঠিক আছে, এত ভণিতা না করলেও পারতে বিমান। আমি ডেমোক্র্যাসিতে বিশ্বাস

করি। সবাই মিলে যা ঠিক কররে তা আমার পছন্দ না হলেও মেনে নেব। আমার ইচ্ছে ছিল, অন্তত মিলুর বিয়েটা এখান থেকে হয়। এত বড় দালানগুলোর কোনও সদ্ব্যবহারই আমরা করতে পারলুম না।'

'কথা দিচ্ছি বউদি, বেঁচে যদি থাকি এর চেয়েও বড় দালান আপনাকে ছেলে মেয়ের বিয়ের জন্যে জোগাড় করে দেব।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে জয়িতা বলল— 'থাকগে ওসব কথা।'

'না বউদি, আপনি খুশি মনে মত না দিলে'...

'মত দিচ্ছি এটাই যথেষ্ট বিমান। খুশি কি যুক্তি বোঝে? তোমার ফরমাশে চা-কফি দিতে পারছি বলে কি খুশিও দিতে পারব?'

ব্যারাকপুর থেকে উত্তর কলকাতা। এ বরং শহরের মধ্যে এগিয়ে আসা হল। যতদিন না ব্যারাকপুরেরটা রেডি হচ্ছে এখানেই বসবাস। এটাও নতুনই। রথীন বলল— "আবার তো শিফট করতে হবে। বইপত্র, বাসনকোসন যা প্রতিদিন লাগে না সেগুলো আর খুলো না।' সুতরাং দুটো শোবার ঘরের একটা গুদাম। একটা ঘরেই সবাই শোয়া। দুজন খাটে, দুজন মেঝেতে। খুবই অসুবিধা। ও বাড়িতে তাদের প্রত্যেকের আলাদা-আলাদা ঘর ছিল। কাউকেই মেঝেয় শুতে হত না। অত বড় বড় খাট পালঙ্ক কিছুই আর এই দশফুটি উচ্চতায় ধরবে না। সব নীলাম-বাড়ি চলে গেছে।

একদিন মাঝরাতে বিল্টু চেঁচিয়ে উঠল—'ওই তো, ওই তো আমাদের বাড়িটা... এসেছে—' একেবারে পরিষ্কার গলায়।

পাশ থেকে রথীন বলল—'কী রে? হঠাৎ স্বপ্ন টপ্ন দেখলি, না কী?

'স্বপ্ন কেন হবে? সত্যি!'—দশ বছরের বিল্টু বলল।

'তার মানে? এখানে তুই আমাদের বাড়ি দেখবি কী করে?'

'উঃ তোমাকে আমি কী করে বোঝাবো? বাড়িটা হেঁটে হেঁটে চলে এসেছিল। আমাদের খুঁজছে তো...। আমার ঘুম হচ্ছিল না, চোখ বুজে শুয়েছিলাম। হঠাৎ মনে হল কে মুখে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। চোখ খুলে দেখি সামনে একটা জোছ্নার মতো আলো যেমন আমাদের ও বাড়ির বারান্দায় ভাসতো... আর তার মধ্যে বাড়িটা ছোট্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পুঁচকে। কিন্তু সব আছে, খিলান, থাম, বারান্দা, কার্নিস স-ব। আর বোগেনভিলিয়ার ফুলে দোতলার বারান্দার চালটা ছেয়ে গেছে মা। কী ফুল! কী ফুল! উঃ যেদিকে তাকাও খালি সাদা আর ম্যাজেন্টা ...সাদা আর ম্যাজেন্টা...।

বিল্টু বলে যাচ্ছিল দারুণ উত্তেজিত হয়ে। মিলু মেঝের থেকে গলা বাড়িয়ে বলল, 'অত ছোট কেন বুঝেছিস ভাইয়া?'

'কেন রে?'

'অত দূরে বলে। আমাদের থেকে অনেক অনেক দূরে তো, তাই।'

জয়িতা বলল—'এভাবে একটা জ্যোৎস্নারাতের পট পেছনে রেখে বাড়িটার বাইরের চেহারাটা অনেক দিন দেখি নি।'

রথীন বলল—'তুমিও কি দেখতে পাচ্ছ?

জয়িতা সংক্ষেপে বলল— 'স্পষ্ট।'

একটু পরে নিশ্বাস ফেলে বলল— 'বাড়িটা আমাদের অত সহজে ছাড়বে না একথা

আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলুম।'

মিলু বলল—'না মা, বোগেনভিলিয়াটা তো সব বছর এত ফুল দেয় না। এ বছর খুব ফুল দিয়েছে। আমরা দেখতে ভালোবাসি তাই বাড়িটা দেখাতে এসেছিল।'

'হবে' —বলে জয়িতা চোখের ওপর হাত চাপা দিয়ে শুয়ে পড়ল।

আর ঠিক সেই সময়ে রথীনের মাথার মধ্যে কে যেন একটা সুইচ টিপল। অমনি টুক করে আলো জ্বলে উঠল। জ্যোৎস্না রাতের আলো। বাড়িটা, সত্যিই তাদের ব্যারাকপুরের বাড়িটা, ছোট্টটি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সে ধড়মড় করে উঠে বসে ছিল। বিল্টু বলল—দেখেছ বাবা? দেখতে পেয়েছ, না?

কদিন পর জয়িতা বলল— 'অফিস থেকে ফেরবার সময় একটু হয়ে এসো না গো।'

'কোথায়?'

'ব্যারাকপুরে, আবার কোথায়?'

'ও!'

জয়িতা ঝেঁঝে উঠল—'ও মানে? একটা বেড়াল পুষলেও মানুষের মায়া পড়ে যায়। আর এ? পিতৃপুরুষের এক খানা গোটা বাড়ি। তিন পুরুষকে আশ্রয় দিয়েছে। কোনদিন তার পরিচর্যা করো নি, একটা রং না, কলি ফেরানো না, বিনা প্রতিদানে ও শুধু দিয়েই গেছে, দিয়েই গেছে। আজ তাকে অন্য লোকের হাতে তুলে দিয়ে আবার আধুনিকতা, সুখ এ সব কিনছ, তাতেও তোমাদের কৃতজ্ঞতা আসে না?'

'কী আশ্চর্য! তুমি এমন করে বলছো যেন বাড়িটার প্রাণ আছে। যেন ঠাকুমা-পিসিমা গোছের কেউ।'

'আছেই তো প্রাণ। ঠাকুমা-পিসিমারও বাড়া, তা জানো?'

'তুমি কি পাগল হলে জয়িতা?'

'পাগল? আমি পাগল। তাহলে বিল্টুও পাগল, মিলুও পাগল। তুমি? তুমিও তো পাগল!'

'তার মানে!'

'কেন বাড়িটা সে দিন রাতে আমাদের কাছে আসে নি?'

রথীন হেসে উঠল— 'জয়িতা, ওটা তো একটা বাচ্চার স্মৃতি তার কল্পনা, একটা স্বপ্নই, এত স্পষ্ট যে আমাদের সবাইকে অ্যাফেকট করেছিল। বাড়িটা হেঁটে হেঁটে আমাদের কাছে এসেছিল—এ কথা নিশ্চয়ই আমাকে বিশ্বাস করতে বলছো না। বরং আমরাই ওর কাছে গিয়েছিলুম। মনে মনে। একেই বলে মায়া।'

'কে জানে! উদ্ভিদের প্রাণ আছে এ কথাই কি একসময়ে কেউ বিশ্বাস করত!' জয়িতা উদাস গলায় বলল।

অফিস ফেরত রথীন দেখল সে ব্যারাকপুরের বাস ধরছে। শনিবার বেশ বাদুড় ঝোলা ভিড়। তারই মধ্যে সেদিনের মাঝরাতের স্মৃতিটা পেন্ডুলামের মতো দুলছে। তিনটে খিলান, তলায় ইট বেরিয়ে যাওয়া গোল থাম। বারান্দা...। মাঝখানে একটু স্ফীত। ওপরে বিবর্ণ টালির চাল। একখানা অলৌকিক দরজা, তার ভেতর দিয়ে

রহস্যকাহিনীর মতো ঘরের অভ্যন্তর দেখা যায়। মাঝখানে গেট। মাথায় বোগেনভিলিয়া, সাদায় আর ম্যাজেন্টায়, এপ্রিল মাসে বারান্দার ডালিতে যেন হোলির উৎসব। তারা না সাজাতে পারে কিন্তু ওই বোগেনভিলিয়াই সাজাতো বাড়িটাকে প্রতি বসন্তে।

'রোকো রোকো'—অন্যমনস্ক ছিল রথীন। তার স্টপ আরেকটু হলেই পার হয়ে যাচ্ছিল। কতদিন এ পথ দিয়ে যাতায়াত হয় না। পা চালালো রথীন। সামনের বাঁকটা পার হলেই...।

এ কী? একটা ধু ধু শূন্যতা সামনে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রথীন। তারপরে ভালো করে তাকিয়ে দেখল—না, ঠিক শূন্যতা একে বলা যাবে না। যেটুকু আকাশ আড়াল ছিল সেটুকু শুধু মুক্ত হয়ে গেছে। জমির ওপরটা প্রায় ভর্তি। লরি দাঁড়িয়ে আছে। বোঝাই হচ্ছে মেঝের মার্বেল। দেয়ালে গাঁথা আলমারির বার্মা টিক। জানলা-দরজা।

একটা লরি ছেড়ে গেলে রথীন দেখতে পেল ঘনিয়ে আসা সন্ধ্যার আধো অন্ধকারে সমস্ত জমিটার গায়ে রক্তপাত হয়েছে। লালচে রক্তের বিন্দু ইতস্তত ফুটে উঠেছে; সাদা বিন্দুও। রক্তের জলীয় পদার্থের মধ্যে সাদা আর লাল তো মিলে মিশেই থাকে। এ রকম আলাদা আলাদা! কে জানে কোন্ প্রাণীর রক্তের প্রকৃতি কেমন! রঙও তো মানুষের রক্তের মতো গাঢ় লাল নয়!

চোখের বিভ্রম কেটে গেল একটা ডাকে—'রথীদা ও রথীদা... আরে এ দিকে...' রাজেন ঘোষ ডাকছে। সে-ই এই জমিতে বহুতল গড়বে। বিমানের বন্ধুস্থানীয়।

'আরে দাদা, কখন থেকে ডাকছি, শুনতে পাচ্ছেন না?' এগিয়ে আসতে আসতে রথীকে স্তব্ধ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রাজেন গলা নামালো— 'অত সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়লে কি চলে দাদা! দেখুন না কী চমৎকার বিল্ডিং তুলি...।'

রথীন তখন দেখছিল তার বিভ্রম। বোগেনভিলিয়া। ছড়িয়ে আছে গোটা জমিময়। বোধহয় কী হতে যাচ্ছে টের পেয়ে তার সমস্ত নিহিত ঐশ্বর্য উজাড় করে দিয়েছিল লতাটা। তাই এত রক্ত তার ভূতপূর্ব বাড়ির গায়ে।

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে রাজেন ঘোষ বলল—ওহ, একখানা গাছ পুঁতেছিলেন বটে দাদা। কঙ্গো টঙ্গোর জঙ্গল থেকে আমদানি করেছিলেন না কী বলুন তো? আসুন এদিকে একটা জিনিস দেখাই...।

রথীর হাত ধরে একটা টান দিল রাজেন। পড়ে থাকা ইঁটের স্তূপের মধ্যে দিয়ে সাবধানে পা ফেলতে ফেলতে সে চেঁচিয়ে মিস্ত্রিদের ডাকাডাকি করতে লাগল— 'এই ওসমান, এই মেওয়ালাল, বিঁড়ি রাখ এখন, ওইখানের ইঁটগুলো আস্তে আস্তে সরা তো! হ্যাঁ সরা চটপট।'

উবু হয়ে বসে পড়ে রাজেন বলল—'দেখুন, দেখুন আপনার ওই আজব বোগেনভিলিয়ার শেকড়। একটা সুমো কুস্তিগীরের থাইয়ের মতো গোদা। কোনখান থেকে কোনখানে চলে এসেছে দেখছেন? যতই কোপ মারি কিছুতেই একে তুলতে পারা যাচ্ছে না। মাটি কামড়ে আছে একেবারে।

রথীন দেখল সাদাটে একটা মোটা লম্বা কাছির মতো বস্তু আন্দাজ যেখানে তাদের গেট ছিল সেখান থেকে শুরু করে অন্তত আট ন ফুট ভেতর পর্যন্ত গিয়ে যেন ডজন ডজন আঙুল বার করে মাটি খিমচে আছে।

ধরা গলা ঝেড়ে নিয়ে সে বলল— 'না রাজেন। বোগেনভিলিয়া নয়, এ বোধহয় আমাদের বাড়িরই শেকড়। লড়ে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মানুষের সঙ্গে পারল না।'

রোমান্স

অবসরের জীবনে ধীরে-সুস্থে রয়ে বসে উপভোগ করার মতো জিনিসের অভাব আব যারই থাক, অতীশ ভট্টাচায্যির অন্তত নেই। শীতের ঘুম, তৃতীয় কাপ চা, হরেক রকমের বই, পত্র-পত্রিকা, মর্নিং ওয়াক... ইচ্ছে হলে থিয়েটার-সিনেমা, ইচ্ছে হলে বাড়ি বসে যৌবনকালের বাংলা গান কিংবা শুধু টিভির স্ক্রিনে আলগা করে চোখ ফেলে বসে থাকা, কিংবা পুরনো বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা জমানো।

পুরো যৌবনটা কেটেছে ছোটাছুটি করে। একটু বেশি করে বিছানায় গড়ানো সেটাও যেন একটা আলাদা উপভোগের স্বাদ বয়ে আনে। ধরো মাঘ মাসের ভোর ছ'টা। কথায় বলে মাঘের শীত বাঘের গায়ে। তা তেমন শীত হতভাগা কলকাতাতে আর পড়ে না। তবু ভোরের দিকটা ওরই মধ্যে একটু জমজমাট। জলযোগের 'পয়োধি' মার্কা হয়ে থাকে। তা এতদিন তো সে পয়োধি চাখবার সুযোগ পাওয়া যায়নি। অফিসের আগের আবশ্যিক প্রাতঃকৃত্যগুলো তো 'ধর তক্তা মার পেরেক' জাতীয় ছিল। এখন অতীশ ঘাপটি মেরে থাকেন। মাথার অর্ধেকটা অবধি বালাপোষ চাপা দিয়ে। জয়া উঠে পড়েছে টের পান। কেমন একটা অবৈধ প্রেমের রোমাঞ্চ নিয়ে বালাপোষের মধ্যে আরও ঘন হয়ে যেতে থাকেন তিনি।

জয়ার উঠে-পড়ার মধ্যে আগেকার সেই তড়াক ভাবটা আর নেই। একবার-দুবার এ-পাশ ও-পাশ করল, হাউ-হাউ করে গোটা পাঁচেক হাই তুলল, পটপট করে কটা আঙুল মটকাল, তারপর এক পা লেপের ভেতরে, এক পা লেপের বাইরে, ভেতরে... বাইরে, ভেতরে... বাইরে, —তুমি কি কুমির-ডাঙা খেলছ? পিটপিট করে চোখ খুলে সোঁদা সোঁদা গলায় অতীশ প্রশ্নটা ছোড়েন।

'আমার দুঃখু তুমি আর কী বুঝবে?' ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলেন জয়া— অবসর তোমারই হয়েছে, আমার তো আর হয়নি! সমাজ-সংসার, আত্মীয়-স্বজন, লোকজন। নিজের ছেলে-মেয়ে পর্যন্ত স্বার্থপর। চোখ যতদিন না উলটোচ্ছি, কারও চোখ ফুটবে না। এক্ষুনি গিয়ে রামধনকে তুলতে হবে দুধ আনার জন্যে। কত করে বললুম বাড়িতে দিয়ে যাবে ব্যবস্থা করো। তা ক'টা পয়সার জন্যে... এখন ওই বুড়ো মানুষটা! কদিনই বা আছে? ওকে তুলে পাঠাও, মেয়ে তো নামেই আধুনিকা। আমি মা হয়ে অনুমতি দিচ্ছি তুই দুধ আনতে যা, মুদির দোকানে যা, কিছু হবে না। না তাঁর মান যায়! মুদির সঙ্গে সুখদুঃখের গল্প করতে করতে সময় জ্ঞান থাকে না। কী না জনসংযোগ করছি, তৃণমূল স্তরে, এ দিকে আড়াই শো চিনি নিয়ে আয় তো রে বললেই শ্রেণীচৈতন্য বেরিয়ে প ।—আচ্ছা মা, তুমি একটা যুবতী মেয়েকে মুদির

দোকানে পাঠাচ্ছ?—বলতে বলতেই জয়া ঘর পেরিয়ে, দালান পেরিয়ে ওদিকে। কলঘরের দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ।

অতীশ আবার বালিশে মুখ গুঁজে জয়ার ফেলে-যাওয়া ভাষণের টুকরো-টাকরা শব্দ চাখতে থাকেন। জয়ার আগে এত কথার বাঁধুনি ছিল না, এ বাঁধুনি ছিল জয়ার মায়ের কথাবার্তায়, তিনি চলে গেছেন, ভাষণগুলি মেয়ের কাছে ফেলে গেছেন। 'চোখ না উলটোলে চোখ ফুটবে না', 'কটা পয়সার জন্যে', 'মুদির সঙ্গে সুখদুঃখের গল্প', কেমন লাগসই ছবির মতো শব্দগুলো! দুতিন বছর আগে হলে এমন ভোর পার-হওয়া দৌড়ন্ত সকালে বিছানা মুড়ি দিয়ে শব্দের ছবিটা উপভোগ করা যেত?

তবে অতীশের সবচেয়ে পছন্দের জিনিস হল পুরানো বন্ধুদের আসা-যাওয়া এবং তাদের সঙ্গে অতীতচারণ।

শীতের বেলাটা ধরো মরে মরে আসছে।

আশপাশের বাড়ির আলসেতে, ন্যাড়াবোঁচা গাছগুলোর গায়ে মরাটে আলো। একেবারে বাসি মড়ার রং। এই সময়টা যতই চায়ের সঙ্গে মুচমুচে মুড়ি-কড়াইশুঁটি রেখে যাক জয়া, মনটা কেমন খারাপ-খারাপ করে। মরা আলোর সঙ্গে কেমন একটা তাদাত্ম্য এসে যায়। আয়না দেখতে ইচ্ছে যায়, মাথার ফাঁকা অংশটাতে আঙুল চলে যায়। নিজের হাত পা ধড় মুণ্ডু সব যেন ধোপার বাড়ি যাওয়ার যোগ্য ময়লা পুরনো কাপড়ের মতো লাগতে থাকে। এই সময়ে, যেমন আজ, বেলটা যদি মধুর সুরে বাজে এবং দরজা খুলে বাসন মাজুনি ঝোল্লার মায়ের বদলে শোভন-শোভনাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় এক মুখ হাসি নিয়ে, তবে তার চেয়ে খুশির জিনিস আর কী হতে পারে?

বুকটা চিতিয়ে অতীশ বলে ওঠেন—যাক রে শোভন এবারের মতো বাঁচিয়ে দিলি, আরেকটু হলেই আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলুম।

—তা, সেইরকম চেহারাই করেছেন বটে। মুখ যেন খ্যাংরা ঝাঁটা। খোক্কসের মতো নখ, ও জয়া তোর কর্তার বোধ হয় নেল পালিশ পরবার শখ হয়েছে রে! শোভনা চেঁচালো।

জয়া সিঁড়ির মোড় থেকে রেলিং বুকে চেপে ঝুঁকে পড়েন—

—আরে আসুন আসুন...

—ঠিক বলছ তো? আসব? না চা দেবার ভয়ে নুকিয়ে পড়বে?

শোভন ঘণ্টায় ঘণ্টায় চা খান। কবে জয়া থিয়েটারের টিকিট কাটা থাকায় পাড়ার বান্ধবীর সঙ্গে চলে গিয়েছিল বহুবার ক্ষমা চেয়ে, এবং দারুণ নাটকটা বাদ দিতে না পারার জন্য লজ্জিত হয়ে, শোভন আজও সে কথা তুলে খোঁটা দিতে ছাড়েন না।

জয়া বললেন—দেখুন অর্ধেকটা প্রকাশিত হয়ে রয়েছি। পুরোটা হলে না হয় আপনার বস্তা-পচা ঝগড়াটা শুরু করবেন। গ্যাসে অলরেডি জল বসিয়ে এসেছি।

—সর্বনাশ! সেবার গৃহত্যাগ করেছিলে, এবার কি গৃহদাহ?

এরই মধ্যে নিচের কোনও একখানা ঘর থেকে বেরিয়ে ঝিলিক হাত নেড়ে বলল— ওঃ বাবা মা কাকু, তোমাদের ভল্যুম একটু কমাও, নইলে ওপরে যাও, আমরা একটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছি।

—'ভল্যুম তো বেশ কমিয়েছি রে', শোভন বললেন। সাড়ে পাঁচ কেজি কমেছে, ডাক্তার বলছে...

—আহা বুঝতে পারছ না যেন। দেহের নয়, গলার। নবটা একটু ঘোরাও... বলে ঝিলিক পরদা সরিয়ে আধো-অন্ধকার ঘরটার মধ্যে সেঁদিয়ে গেল।

দুই দম্পতি মেয়ের কাছ থেকে বকুনি খেয়ে কাঁচুমাচু মুখে ওপরে উঠে গেলেন। জয়া বললেন—চলুন আমরা বারান্দায় গিয়ে বসি। আপনারা বসুন গিয়ে, আমি চা-টা নিয়ে আসছি।

বারান্দায় ভাল করে গুছিয়ে বসে শোভন বললেন—ঝিলিকটা কী এমন রাজকার্য করছে রে? কোচিং ক্লাস খুলেছে নাকি? ঘরের আধা-অন্ধকারের মধ্যে জোড়া জোড়া চোখ জ্বলজ্বল করছে বলে মনে হল, যেন বনের মধ্যে বনবেড়ালদের সভা বসেছে।

—যা বলেছিস। অতীশ সায় দিলেন, ওয়াইল্ড একেবারে।

—বলেন কী? চেয়ার-টেবিল ভাঙে নাকি? শোভনা ঘাবড়ে গেছেন।

—ভাঙেনি এখনও, তবে ভাঙলেই হল, যা জোরে চাপড়ায়।

জয়া একটা জাম্বো সাইজের ফ্লাস্ক নিয়ে ঢুকলেন। শোভনা গলা নামিয়ে বললেন —হ্যাঁ রে জয়া, ড্রাগ-ফ্রাগ খায় না তো! বিশ্রি একটা গন্ধ পেলুম যেন!

জয়া বললেন, অতটা বোধ হয় না। ড্রাগ-নিবারণী সমিতি না কী একটা করেছে যে!

—কী জানি! শোভনা বলে উঠলেন, পুলিশেরও তো চুরি-ডাকাতি করার কথা না, মানছে কি? আসলে গাঁজার গন্ধটা একজনের দৌলতে আমার চেনা কিনা!

—বিয়ে থা দে, বিয়ে-থা দে, শোভন দরাজ গলায় বলে উঠলেন। শোভনার গাঁজা প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্যেই কি না কে জানে!

—বিয়ে কি আজকালকার ছেলেপুলেদের কেউ দেয় রে। বিয়ে আজকাল করে। অতীশের নিঃশ্বাস পড়ল।

শোভনা বললেন—হ্যাঁ, আপনার মতো আগেকার ছেলেপুলেদের বিয়েই যেন কেউ ঘাড়ে ধরে দিয়েছিল। হেদুয়ার মোড়ে হা-পিত্যেশ, বসন্ত-কেবিনে আধখানা কবিরাজি কি কফি হাউজে সাড়ে তিন কাপ কফি নিয়ে টানা তিন চার ঘণ্টা, এলিটে 'ফেয়ারওয়েল টু আর্মস্', রূপবাণীতে 'জংলী'... এ সব যেন আর আমরা জানি না।

—জানো তো দেখছি অনেক কিছুই, কিন্তু ম্যাডাম ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছাড়া কি এত ডিটেল জানা যায়?

অতীশের কথায় জয়া হাততালি দিয়ে হেসে উঠল—খাপ খুলব না কি? শোভনা!... সামান্য একটু লজ্জা রুমাল দিয়ে মুছে নিয়ে শোভনা বললেন—সত্যি, দিনগুলো সব কোথায় গেল বল তো! কী দিনই ছিল।

—ইট ওয়াজ দা বেস্ট অব টাইমস, ইট ওয়াজ দ্য ওয়ার্স্ট অব টাইমস, সবার জীবনেই এই প্যারাডক্সিক্যাল দিনগুলো আসে, তারে কয় জৈবন।

—অতীশ বললেন, আমাদের এসেছিল, আমাদের পিতাদের এসেছিল, আমাদের পিতামহদের এসেছিল, এখন আমাগো পোলাপানদের আইস্যাছে।

—তা সে যাই বল অতীশ, আমাদের যৌবনকাল যেন একটা বিশেষ রকম ছিল। ঠিক ওই স্বাদটা... শোভনের গলায় রোমন্থনের আমেজ।

—জিভ বার কর, জিভ বার কর—এমন করে অতীশ বললেন যে ঘাবড়ে গিয়ে শোভন সঙ্গে সঙ্গে হ্যাঁ করে এক হাত জিভ বার করে ফেলেছেন।

—বলি জিভটা কার?

—এ আবার কী প্রশ্ন? এ জিভ আমার, আবার কার?

—তবে? নিজের জিভে অন্যের জৈবনের স্বাদ পাবি কী করে?

—কথাটা খানিকটা ঠিক অতীশ, কিন্তু তবু বলব দিনকাল পালটে গেছে ভাই। আমাদের সময়ের সেই সর্বাত্মক রোম্যান্স আর নেই। চিন্তা করে দ্যাখ, মণিকা আড্ডি আর শান্তনু চক্কোত্তি— কী জুটি রে? মণিকা চার ফুট দশ ইঞ্চি, শান্তনু ঝাড়া ছয় কি আরও বেশি। একটা চুমু খেতে গেলে পর্যন্ত হয় মণিকাকে মই লাগাতে হবে, নয় শান্তনুকে হাঁটু গেড়ে বসতে হবে। প্রেমে কোনও বাধা হয়েছিল? দুজনে কলেজ স্ট্রিট দিয়ে গণ্ডোলার মতো ভেসে চলেছে, শান্তনুর টাকা পয়সা মণিকার জিম্মায়, মণিকার নোট-পত্তর শান্তনুর ঝোলায়।

—তোমরা আর কী জানো? কতটুকুই বা জানো?— শোভনা জয়ার দিকে চেয়ে হেসে বললেন—জয়শ্রী লাহিড়ীকে মনে আছে তো? দারুণ মিষ্টি দেখতে! তোমরা সবাই তো তার জন্যে পাগল ছিলে।

—কোনকালে? কোনকালে?—অতীশ চেঁচামেচি করে উঠলেন। শোভন বললেন —আরে বাবা বেথুন-বিউটি বলে কথা! একটু আধটু দোলা তো দেবেই। তার ওপর সাজ কী? সব সময়ে ফিলিম-স্টারের মতো সেজে আছে। গালে রুজ, ঠোঁটে লিপস্টিক।

জয়া বললেন—মোটেই না। ওর চেহারাটাই ওই রকম। গালের চামড়া এত পাতলা আর মসৃণ যে লাল ব্লাড ভেসলগুলো দেখা যেত, তাতেই মনে হত কিছু মেখেছে।

শোভনা বললেন—জয়া ঠিকই বলেছে। জয়শ্রীর চোখের পাতাই এত ঘন আর কালো ছিল যে মনে হত কাজল পরেছে, ঠোঁট এমনি এমনিই লাল। কীর্তি জানো ওর? হস্টেলে থাকত তো! একদিন গিয়ে দেখি কপালে হাত দিয়ে শুয়ে আছে। আমায় দেখে বললে—ওহ্ ডগ-টায়ার্ড। ক্যান্ডিডেট ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে। একই ফিলম উনিশবার দেখা হল। উনিশজনের সঙ্গে।

—কোথায় এখন জয়শ্রী?

—এক বোকা ব্যারিস্টারকে শেষ পর্যন্ত বিয়ে করছে। আচ্ছা... তোদের অরিজিৎদার কথা মনে আছে? অরিজিৎ গোস্বামী!

শোভন বললেন—সেই রামস্বামী না কি মেয়েটা লেঙ্গি মারল বলে তো সুইসাইড করতে গিয়েছিল।

—রাইট। লাস্ট মোমেন্টে পেট ওয়শ করে বেঁচে যায়।

—শুধু কি প্রেম? বাঁধনহারা, ছন্নছাড়া, ওয়াইল্ড, স্যাক্রিফাইসিং... আরও কত কি ছিল। জলসা ছিল, গড়পাড়ের, বাদুড়বাগানের, শ্রীকৃষ্ণ লেনের, বউবাজারের। বিসর্জনের বাজনা বাজতে না বাজতেই শুরু হয়ে যেত। অতীশ বললেন—জলসাগুলো ছিল রোমান্সের আবহসংগীত। মেজাজ তৈরি করে দিত। আহা! ঠিক রাতদুপুর, আসর সরগরম, কানাতের ফাঁক দিয়ে শীতের হাওয়া ঢুকছে! সতীনাথ সেই হাওয়ায় বিরহ

ঢেলে দিয়ে গেলেন।

—শুধু বিরহ? অভিমান, আর্তি, আকুতি। তারপর শেষরাতে সেই বিরহের ঘুড়ি কেটে দিলেন দ্বিজেন মুখার্জি তাঁর ব্যারিটোন গলায়—শ্যামলবরণী তুমি কন্যা, ঝিরঝির বাতাসে ওড়াও ওড়না... আহা হা ভাবতে গেলে আর জ্ঞান থাকে না রে ভাই, জ্ঞান থাকে না।

এই সময়ে ঝিলিক হাতে একটা বড় প্যাকেট নিয়ে এসে বলল—কাকু, কাকিমা, তোমরা মোমো খাবে? গরম গরম আছে।

—হঠাৎ? কোত্থেকে এল? অতীশ জিজ্ঞেস করলেন।

মুখ টিপে মুচকি মতো হেসে ঝিলিক বলল বনবেড়ালরা এনেছে। এই নাও চায়ের সঙ্গে স্মৃতির সস মাখিয়ে খেয়ে ফ্যালো। ওড়না দুলিয়ে চলে গেল ঝিলিক। চোখদুটো ভ্যালভেলে করে শোভন বললেন—আমাদের বাল্যকালে ছিল লড়াইয়ের চপ, পকৌড়ি, দ্বারিকের শিঙাড়া। দেখতে দেখতে চপ হয়ে গেল... অতীশ তাড়াতাড়ি বললেন—ফ্লপ।

শোভনা বললেন—পকৌড়ি আর বলে না, বলে পাকোড়া।

জয়া বললেন—শিঙাড়াও বলে না, বলে সামোসা। এসে গেছে রোল, মোমো...

মোমোয় কামড় দিয়ে শোভন বললেন—স্মৃতির সস মাখিয়ে খাওয়াই বটে। ঝিলিকটা বলেছে ভাল। আচ্ছা অতীশ, তখন বনবেড়াল বললুম ও শুনতে পেল কী করে বল তো?

জয়া বললেন—ওর মাথার পিছনে দুটো চোখ আছে। রোটেটিং কান। কিছু চোখ কান এড়ায় না।

—তা ঘরের মধ্যে ওগুলো বনবেড়াল, না মন বেড়াল?

অতীশ হো হো করে হেসে উঠলেন—বলেছিস ভালো। আমাদের যুগের জয়শ্রী লাহিড়ী যদি উনিশটাকে খেলাতে পারে তো এ যুগের ঝিলিক ভট্টাচার্যই বা কম যাবে কেন?

—না না ঠাট্টা নয়। আচ্ছা জয়া—ঝিলিকের বয়স কত হল? কিছু মনে না করলে বল তো শুনি!

—মনে করার কী আছে? ঝিলিক তো আপনার রিন্টুর পরের বছরই হল। আটাশ পার হয়ে গেছে। এম এ হয়ে গেছে এক যুগ হতে চলল।

—করছে কী?

—কী করছে না তাই জিজ্ঞেস করুন। প্রথমে তো দিব্যি টুক করে কলেজে চাকরি পেয়ে গেল। করল বছর দুয়েক। তার পর একদিন খোঁজ পেলুম কলেজের চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছে।

—খোঁজ পেলি মানে? শোভনা অবাক হয়ে বললেন। তোদের সঙ্গে কি তোদের একমাত্র মেয়ের কোনও মানসিক যোগাযোগ নেই?

—আছে বললে আছে ভাই, নেই বললে নেই, জয়া বললেন।

—বুঝলুম না—শোভনা হতাশ।

—না বোঝার কী আছে? —অতীশ চেয়ার এগিয়ে বসেন, সকালেবেলা চা করে দিচ্ছে, বিছানা গুছোচ্ছে, বালিশ রোদে দিচ্ছে, দেয়ালে ঝুল দেখলেই ঝাড়ছে, মাকড়সা দেখলেই মুচ্ছো যাচ্ছে, ওর মায়ের আর ওর শতখানেক প্রসাধনের সামগ্রী নিয়ম করে

কিনে আনছে।

জয়া হাঁ হাঁ করে উঠলেন—শতখানেক প্রসাধনের আইটেম মানে? ইয়ার্কি পেয়েছ?

—আরে বাবা ক্রিমই তো খান পঞ্চাশেক। ঠোটের ক্রিম, চুলের ক্রিম, নাকের ক্রিম, কপালের ক্রিম, গালের ক্রিম...

শোভনা বন্ধুর সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন—আহা, ঠোটের আর গালেরটা ঠিক আছে অতীশদা। বাকিগুলো আপনার উর্বর মস্তিষ্কের প্রোডাক্ট। কথা বলবার সুবিধের জন্যে মানে আলাপটা বেশ রঙ্গিলা করে তোলবার জন্যে ব্যবহার করছিলেন।

—তোমরা সাইড-ট্র্যাকে যাচ্ছ—শোভন বিরক্ত হয়ে বললেন, আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল মা-বাবার সঙ্গে কন্যার মানসিক যোগাযোগ, সেটা...

—হ্যাঁ হ্যাঁ, অতীশ বললেন, ওই যা বলছিলুম, সবই করছে, বেরোনোর সময়ে বলেও যাচ্ছে, ইচ্ছে হলে ডেস্টিনেশন এবং ফেরবার সম্ভাব্য টাইমও। কিন্তু 'কোথায়' 'কখন' বললে কী হবে, 'কেন', 'কেমন' এসব বিষয়ে চুপ। ওগুলো নাকি ব্যক্তিগত ব্যাপার।

—এই এক 'ব্যক্তিগত' উঠেছে আজকাল, শোভনা ফোঁস করে উঠলেন, রিন্টুটাকে নিয়ে আমাদের কত জল্পনা-কল্পনা। ছেলে আমাদের বন্ধু হবে। বাপের বন্ধু, মায়ের বন্ধু। ছেলে তো বাপের ফাজলামি শুনতে শুনতে বড় হল। কিন্তু বন্ধু কই? এখন দেখছি সে গুড়ে বালি। 'ব্যক্তিগত'-তে এসে সব ঠেকে যাচ্ছে। 'ব্যক্তিগত'-টা আবার ঠিক কোনখান থেকে আরম্ভ হচ্ছে বোঝা দায়।

এই সময়ে ঝিলিক আবার এসে ঢুকল। ঝিলিক একটি অতি তন্বী পাঁচফুটি তরুণী। বয়সে যুবতী হলেও তাকে দেখলে আঠারো পার হয়েছে বলে মনে হয় না। রং মাজা। দেখতে সে ঠিক কেমন, সুন্দরী না বান্দরী সেটা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। কারণ অল্পবয়সের মহিমা তার সর্ব অবয়ব থেকে ঠিকরোচ্ছে। সে একটা ঝোল্লা কুর্তা পরেছে, যার ওপর কতকগুলো কার্টুন ফিগারের অ্যাপ্লিক সাঁটা। সালোয়ারটাও ঝোল্লা। ফলে ঝিলিককে আরও বেঁটে দেখাচ্ছে। কিন্তু তার চোখমুখ, হাঁটাচলা ইত্যাদি দেখলেই বোঝা যায় সে এ সব গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। ঝিলিকের মুখ তেলতেলে। প্রচুর চুলেও বেশ তেল। মাঝখানে সিঁথি কেটে দু দিক পেতে আঁচড়ানো। ঝকঝকে দাঁতে ঝিলিক হেসে বলল—বসতে পারি?

শোভন-শোভনা হাঁ-হাঁ করে উঠলেন—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই বসবি বই কি! এ তো আমাদের সৌভাগ্য!

—কেন? সৌভাগ্য কেন?—বলতে বলতে ঝিলিক বারান্দার গ্রিলের ফাঁক দিয়ে নিচের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে বলল—সদর দরজাটা ভাল করে টেনে দিয়ে যাস। এই পটাশ, পরের দিন রেকর্ডগুলো, মনে আছে তো?

নিচ থেকে কতকগুলো উচ্চ আওয়াজ এল। চার পাঁচটি ছোট বড় চুল ছেলে, চার পাঁচটা এলোমেলো চুল মেয়ে রাস্তা কাঁপিয়ে তর্কাতর্কি করতে করতে চলে গেল।

ঝিলিক এবার মুখ ফিরিয়ে বলল—কেন? সৌভাগ্য কেন?

—সৌভাগ্য মানে সৌভাগ্য কেন হবে? সৌভাগ্য বই কি। শোভন-শোভনা আমতা

আমতা করতে থাকেন।

ঝিলিক হেসে বলল—আসলে আমার কথা আলোচনা হচ্ছিল, খুব ঘাবড়ে গেছ আমি এসে বসতে। যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যে হয়। ঠিক? না, না, মিথ্যে কথা একদম বলবে না, মুখ দেখেই বুঝতে পারছি। আচ্ছা কাকু, তোমরা এত পি এন পি সি করো কেন বল তো?

জয়া রাগ করে বললেন—তুই তাহলে আমাদের পর? তোকে নিয়ে আলোচনা করলে পি এন পি সি?

—দেখ মা, তা যদি বল প্রত্যেকটা মানুষই প্রত্যেকটা মানুষের পর। আমার পেট কামড়ালে তুমি বড় জোর ওষুধ দিতে পার। ডাক্তার ডাকতে পার, কিন্তু আমার ব্যথাটা তুমি ভোগ করতে পার কি?

অতীশ জোর গলায় বেশ ঘোষণা করার মতো করে বললেন—ঝিলিক, আমরা কিন্তু মোটেই তোমাকে নিয়ে সারাক্ষণ আলোচনা করিনি, একদম শেষ দিকটায় তোমার সম্বন্ধে, মানে তোমার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে সামান্য কিছু আধা-সিরিয়াস আলোচনা হয়েছে। তাকে নিন্দা বা চর্চা কোনওটাই বলা চলে না।

—তা হলে কী আলোচনা হচ্ছিল এতক্ষণ?

—রোম্যান্স নেই, শোভন ঘোষণা করলেন, প্রেমও নেই, আমাদের সময়ে ছিল, এখন নেই। এই।

ঝিলিক হাসতে হাসতে বলল—খাবার দাবারগুলো এখন কেমন যেন লাগে, না কাকু? সে সবজিও নেই, সে মাছও নেই, সব ভ্যাসকা। সে রাঁধুনিও নেই। কাকিমা রাঁধে, টোক গিলে ভালো, কিন্তু কাকু তোমার মায়ের মতো শুক্তো করতে কি পারে? বড়ির টক? শাকের ঘন্ট? বলো? জনান্তিকেই বলো না হয়, কিন্তু বলো! আচ্ছা বাবা, তুমি তো দিবারাত্র হা-হুতাশ করছ—নাই নাই সে-সব গান নাই বলে, তা তোমার বাবা মানে আমার দাদু গান বিষয়ে তোমাকে কিছু বলেননি? দাদু বা দিদা? বলেননি আহা জ্ঞান গোঁসাই, কৃষ্ণচন্দ্র দে... সব কী গানই গাইতেন, তোমাদের আধুনিক গান সতীনাথ মুখার্জি, শ্যামল মিত্র তার কাছে দাঁড়াতে পারে না, একেবারে ছ্যা-ছ্যা। বলেননি?

—কী বলতে চাস তুই? অতীশ রে-রে করে উঠলেন, আমরাই বুড়ো হয়ে গেছি? আমাদের স্বাদ পাবার ক্ষমতা চলে গেছে আর পৃথিবীর সব কিছুই ঠিক আগের মতো আছে, এই তো?

—তুমিই বলছ বাবা কথাটা, আমি কিন্তু বলিনি—ঝিলিক মিটিমিটি হাসতে লাগল।

—গা জ্বালানো চিড়িক চিড়িক হাসিসনি আর—জয়া এবার তাঁর কথার বাঁধুনি বার করে ফেলেন—আর সব ছেড়ে রোমান্সের কথাই ধর না। রোমান্স আর নেই, সেই সুদূর, সেই বিধুর, ঝিলিক যোগ করল—হ্যাঁ হ্যাঁ সেই তিয়াস সেই হতাশা, সেই বিষাদ সেই বিরাগ, সেই অনুরাগ সেই অভিমান, সেই সর্বস্বত্যাগ সেই আত্মঘাত...

—হ্যাঁ হ্যাঁ সেই শরীরপাত সেই কুপোকাত—এভাবে বললে কমিক শোনাবেই কন্যে। কিন্তু কথাটা সত্যি। তোমাদের যুগে প্রেম নেই, সবই ক্যালকুলেশন। তোমাদের হচ্ছে 'ফ্যালো কড়ি, মাখো তেল, পোষালো তো পোষালো, নইলে কাটো'। চুটিয়ে ডেটিং করো, দায়িত্ব নেবার কথা বলো না, কিছু বলতে হলে শেয়ার-বাজারের কথা

বলো ব্যাঙ্ক থেকে কত লোন পাওয়া যাবে, কত ইন্টারেস্ট, কতটা ফেরত দিলে কতটা মেরে দিলে চলবে, বাড়ি মর্গেজ, গাড়ি মর্গেজ, ইনস্টলমেন্টের ফার্নিচার, ভাগের মা ভাগের বাবা, ভাগের ছেলেপুলে... আঙুল নেড়ে নেড়ে বলতে বলতে থেমে গেলেন শোভন।

—কী হল! গাড়ি স্কিড করে গেল কেন কাকু? আগে বাড়ো, ভালোই বলছ। অতীশ এইবার সুযোগটা নিয়ে নিলেন, বললেন—কথাটা ভালো ক(॥ বলার ব্যাপার নয় ঝিলিক। কথাটা হচ্ছে, তুই এখন কী করছিস, ভবিষ্যতেই বা কী করবি? কলেজের চাকরিটা ছাড়লি কেন? বিয়ে-থাই বা করবি কবে? এ সব তো 'আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার' বলে ড্রয়ারে চাবি দিয়ে রেখেছিস। আজ শোভনকাকুরা আসতে যদি তুমি চাবি খুললে তো কথাগুলো হয়েই যাক না! আপত্তি আছে?

—না, আপত্তি নেই—ঝিলিক এবার গম্ভীর হয়ে বলল—আমার এক নম্বর কৈফিয়ত শুনে নাও বাবা-মা, কলেজের চাকরিতে আজকাল বড্ড বায়নাক্কা, কষ্ট করে এম. এ. পাশ করলুম আটান্ন পার্সেন্ট মার্কস নিয়ে, তো বললে স্লেট পরীক্ষা দাও, তা যদি পাশ করলুম তো বললে ভাইভা দাও, তা যদি দিলুম তো বললে এম ফিল করতে হবে পি এইচডি করতে হবে, না হলে কদিন পরে আর ইনক্রিমেন্ট হবে না। এখন স্টাডি লিভ পাবার জন্যে কলেজের টি আর-দের সঙ্গে কনস্ট্যান্ট যোগাযোগ রেখে যেতে হবে, তার ওপর দলাদলি, কে সিপিএম, কে ফরওয়ার্ড ব্লক, কে কংগ্রেস, কংগ্রেসের সঙ্গে আবার সিপিএম-এর গোপন আঁতাত। এ সব বুঝতেই তো আমার বছরখানেক ঘুরে গেল। একে আমার অত ঘাড় হেঁট করে পড়তে ভালই লাগে না, তার ওপর অত তেল খরচা, অত ক্লিকবাজি, আমার পোষালো না, আমি বিদ্রোহ করলুম। ধরি মাছ না ছুঁই পানি করে চালাতে পারতুম অনায়াসেই। কিন্তু সেটা ক্ষমতার অপচয় মনে হল, স্রেফ ছেড়ে দিয়ে চলে এলুম।

—তা হলে তো তুই হার স্বীকার করে নিলি—শোভন বললেন।

—আমার জীবনটা তো এখনও শেষ হয়ে যায়নি কাকু। আমি, সবাই যা করে সেই হেঁ-হেঁ-টা করলুম না, সিস্টেমটাও আমার পছন্দ হল না, এটা বিদ্রোহ। বিদ্রোহ ব্যাপারটা কিন্তু রোমান্টিক। টাকা-আনা-পাইয়ের হিসেব যারা করে তাদের দ্বারা হয় না।

সকলে একটু চুপচাপ। ঝিলিক বলল—আচ্ছা কাকু, কাকিমা, আমি একাই কি প্রবেলম চাইল্ড? রিন্টু? রিন্টুকে নিয়ে তোমাদের কোনও সমস্যা নেই?

—তুমি প্রবলেম চাইল্ড কে বলেছে? শোভনা জয়া একসঙ্গে বললেন।

শোভনা বললেন—কে বলে রিন্টুকে নিয়ে সমস্যা নেই!

শোভন-শোভনা পরস্পরের দিকে তাকালেন।

—রিন্টু কি চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছে? ঝিলিক জিজ্ঞেস করল।

—বলিস কি? এই বাজারে ওই চাকরি ছাড়া? তুই মেয়ে বলে পেরেছিস।

—কিন্তু ও তো ভীষণ আনহ্যাপি ওখানে, বুঝতে পার না?

—সেটাই তো প্রবলেম, মুখটা ম্লান করে থাকে, খেতে শুতে দীর্ঘশ্বাস, রোগা হয়ে যাচ্ছে।

—তোমরা ঠিক জানো, চাকরিটাই ওর একমাত্র প্রবলেম?

—কেন? আর কোনও প্রবলেমের কথা তো আমরা জানি না।

—ঠিকই বুঝেছিলুম, তোমরা ওর কোনও খবরই রাখো না।

—কী করে রাখব! তোমাদের চাবি-দেওয়া ব্যক্তিগত ড্রয়ার আছে না? শোভনা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন।

—তা আর কী প্রবলেম ওর? শোভন জিজ্ঞেস করলেন।

—দীর্ঘশ্বাস ফেলা, ক্ষুধামান্দ্য—এ সব কিসের লক্ষণ কাকিমা, তোমাদের এক্সপিরিয়েন্স কী বলে?

—সে কি রে? ও কি প্রেমে পড়েছে? হুর রে, কী মজা! শোভনা প্রায় হাততালি দিয়ে ওঠেন আর কি;—তা ভাগ্যবতীটি কে?

—তাকেই ভাগ্যবতী হতে হবে কেন? কাকিমা, রিন্টুও তো ভাগ্যবান হতে পারে!

—রিন্টু ভাগ্যবান হলে আমাদের চেয়ে বেশি খুশি আর কেউ হবে না। মেয়েটি কে? যে রিন্টুকে ভাগ্যবান করেছে! আমরা চিনি?

—চেনো।

—তুই না কি রে? শোভনা রই রই করে উঠলেন।

ঝিলিক আবার সেই চিড়িক মারা হাসি হেসে বলল—আমি কি পাত্রী হিসেবে খুব ভালো কাকু? একে তো খেয়ালি, তার ওপর ভীষণ গোঁয়ার। রিন্টুর ছ ফুটের পাশে আমার পাঁচ ফুটই কি খুব মানানসই হবে?

শোভনা বললেন—তুই কি সেই জন্যে মত দিচ্ছিস না? দূর পাগলি। তুই আমাদের চেনাজানা, তোর বাবা-মা আমাদের বেস্ট ফ্রেন্ড। এর চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে? আমাদের সময়েও ওরকম লম্বু গুড়গুড়ে জুটি ছিল। ওতে কিছু এসে যায় না।

অতীশ এই সময়ে বললেন—শুধু একটা মই...

জয়া চোখ পাকিয়ে তাকাতে তিনি চুপ করে গেলেন।

শোভন-শোভনা বললেন—রাজি হয়ে যা ঝিলিক। আমরা খুব খুশি হবো।

ঝিলিক বলল—ধৈর্য ধরো। ধৈর্য ধরো, মেয়েটা আমি নয়।

—তুই নয়? হতাশ গলা শোভনার।

—তবে তাকেও তোমরা দেখেছ।

—দেখেছি? কে? কে? —শোভনা-জয়া একসঙ্গে হইহই করে উঠলেন।

—পটাশ।

—পটাশ? জয়া যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

শোভন বললেন—পটাশ না খটাশ? এ রকম আবার কারও নাম হয়? অ, তুই তখন ওপর থেকে বলছিলি বটে পটাশ রেকর্ড আনিস, না কী একটা!

শোভনা বললেন, ওই থ্রি কোয়ার্টার সুতো ঝোলা প্যান্ট আর ফতুয়া পরা মেয়েটা? চোখে বোধহয় সতেরো পাওয়ারের চশমা, দাঁত উঁচু ওকে আমি প্রথমটায় মেয়ে বলে বুঝতেই পারিনি। আমার রিন্টুর পাশে ওই পটাশ?

—প্রথমত কাকিমা, পটাশ নামটায় আপত্তি হলে ওর একটা পোশাকি নামও আছে। অনন্তযামিনী কৃষ্ণকামিনী সাবিত্রী কৌশল্যা আয়েঙ্গার। এখন উচ্চারণ করতে অসুবিধে বলে আমরা পটাশ বলেই ডাকি। দ্বিতীয়ত কাকিমা, কে কার পাশে থাকবে সেটা তো আর আয়না ঠিক করে দেবে না। কনভেনশন্যাল, রক্ষণশীল বিয়ে রোম্যান্টিক মানুষেরা

কখনওই করে না। মন যাকে চায় তাকেই...

শোভন গম্ভীরভাবে বললেন—তা রিন্টুর মন যাকে চেয়েছে ওই পটাশ না পটাশিয়াম সায়নাইডটি কে? কী?

—ও হল গিয়ে গ্লোব-ট্রটার। পর্যটক। ওকে নিয়েই তো এখন ডকুমেন্টারি করছি আমরা। সেই জন্যেই ওর রেকর্ডস আনতে বলছিলুম। সাইকেলে ভারত ভ্রমণ দিয়ে আরম্ভ করেছিল। এখন তো আলাস্কা অবধি চলে গেছে।

—ভালো। খুব ভালো। পছন্দ-অপছন্দ তোমাদের খুব ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমরা কিছু বলতে চাই না। তা রিন্টুর মন খারাপ করার কারণ কী? আমরা ওর পথের কাঁটা হয়ে থাকতে চাই না। অনুমতি দিয়ে দিচ্ছি, যা খুশি তাই করুক।

—তোমরা অনুমতি দিলে কী হবে? পাত্রী স্বয়ং যে টালবাহানা করছে।

—মানে? পটাশের রিন্টুকে পছন্দ হচ্ছে না? —জয়া আকাশ থেকে পড়লেন।

— কেন?

—অববিয়াসলি পটাশ আরও রোম্যান্টিক বলে। ওর দাবি রিন্টু ওই সরকারি চাকরিটা ছেড়ে দিক। ওরা দুজনে সারা পৃথিবী পর্যটন করে বেড়াবে। ট্রেনে, সাইকেলে, ট্রাকের মাথায়, হিচ হাইক আর কি, যখন যেমন জোটে।

—অন্নবস্ত্র? শোভনা হাঁ করে রয়েছেন। শোভন কোনওমতে জিজ্ঞেস করলেন।

—এ সব ব্যাপারে আজকাল কিছু স্পনসর-টর পাওয়া যাচ্ছে কাকু। তবে পটাস পরোয়া করে না। ওর থিওরি হল দুটো শিক্ষিত বুদ্ধিমান ছেলেমেয়ে যাদের গোটা হাত-পা আছে তাদের গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব হওয়ার কথা নয়। দরকার হলে মাল বইবে, দরকার হলে হোটেলে এঁটো বাসন ধোবে। মোট কথা ...

অতীশ-শোভন প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলেন—রিন্টু একটা ইকনমিকসের এমএসসি. আই এ এস অফিসার... সে মাল বইবে? এঁটো বাসন ধোবে?

জয়া বললেন— পটাশের ইচ্ছে হয় সে বাসন ধুগে যাক। তাকে মানাবে এখন।

মজা পাওয়া গলায় ঝিলিক বলল—পটাশ কিন্তু বায়োকেমিস্ট্রির ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট মা, আর পটাশরা তিন পুরুষ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসে আছে। ওর বাবা ডক্টর শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার এখন এডুকেশনের ডিরেক্টর।

—চমৎকার, তা তাঁর মেয়ের এমন মতিগতি কেন? বাসনই যদি মাজবে তো বায়োকেমিস্ট্রি পড়ার দরকার কী ছিল?

—পটাশ বলে, জীবনটাকে ঠিকমতো দেখতে শুনতে হলে, বুঝতে হলে, ল্যাবরেটরির বাইরে আসতে হবে। সমস্ত কাজ, সমস্ত পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে।

—ভালো, তা ঘর-টর বাঁধা, ছেলে মেয়ে মানুষ করা এ সব করবে কবে? বুড়ো হয়ে গেলে? — শোভনার গলায় ঝাঁঝ।

—কাকিমা সে-গুড়ে বালি, পটাশ বলে, পৃথিবীতে যথেষ্ট শিশু আসছে, তাদের আদর হচ্ছে না, তারা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এই পরিস্থিতিতে ওদের দুজনের আর শিশু আনবার প্রশ্নই উঠছে না। আর ঘর বাঁধা? পটাশ পথকেই ঘর বলে মনে করে। বুড়ো বয়সের নাকি প্রশ্নই নেই। ওর ধারণা এইভাবে পৃথিবী দেখতে-দেখতে ওরা যৌবনেই গত হবে, বৃদ্ধ আর হতে হবে না।

—বাঃ, হতভম্ব চার মা-বাবার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল।

অতীশ বললেন—তা এই চিরপথিক চিরনবীন পটাশকেই আমাদের রিন্টু বিয়ে করবে ঠিক করেছে? —অতীশের গলায় কি শ্লেষ?

ঝিলিক একটু চুপ করে রইল, তারপর মুখ তুলে আলতো করে বলল— সেখানেই তো আসল প্রবলেম।

চারজনেই হাঁ করে আছেন।

ঝিলিক বলল—কাকু, পটাশ বিয়ে করতেও চাইছে না।

—মানে?

—বলছে বিয়ে-টিয়ে ও সব পুরনো সমাজের পুরনো অভ্যেস। যতদিন পরস্পরের পরস্পরকে ভাল লাগে ততদিন একত্রে থাকলেই হল।

—অর্থাৎ?

—রিন্টুর ভাল না লাগলে রিন্টুর ফিরে আসার স্বাধীনতা আছে। পটাশেব ভাল না লাগলে পটাশেরও। এই নিয়েই ওদের টানাটানি চলছে এখন। রিন্টু ডিসিশন নিতে পারছে না। বেচারির অবস্থা খুব খাবাপ কাকু। পটাশকে ছাড়া ওর জীবন অন্ধকার, পটাশেরও তাই... এ দিকে... এই সময়ে ফোনটা ঝনঝন করে বেজে উঠল। অতীশ ধরবার জন্যে উঠছিলেন, ঝিলিক তড়াক করে লাফিয়ে উঠল, বলল, আমার একটা এস টি ডি আসার কথা আছে বাবা, আমি ধরছি।

ওঁরা চারজন বারান্দায় বসেছিলেন পরস্পরের দিকে মুখ করে, বারান্দার কোলে ঘর, ঘরটা ছায়া-ছায়া দেখাচ্ছে, ঝিলিকের বিস্কুট রঙের পোশাক ঘরের রঙের সঙ্গে প্রায় মিশে গেছে। ওর খোলা চুলের ঢাল দেখা যাচ্ছে, আর মাঝে মাঝে নাকের ডগা। সবাই প্রায় একসঙ্গে ঘরের দিকে মুখ ফেরালেন, কেননা—মাউথপিসের মধ্যে ঝিলিক বলছে—আরেকটু চেঁচিয়ে বল রিন্টু, ভালো করে শুনতে পাচ্ছি না, কেমন একটা ভোঁ ভোঁ আওয়াজ হচ্ছে.. হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে.. ডিসিশন নিয়েছিস! বাঃ, চমৎকার, হ্যাঁ ডিসিশনটাই আসল, তোর চোদ্দ আনা বুদ্ধিবৃত্তি-ম্যাচুওরিটি-জীবনবোধ ওই ডিসিশনের মধ্যে দিয়েই প্রকাশ পাবে। কী বললি? গুড। ভেরি গুড, আই কনগ্রাচুলেট ইউ, ঘটনাচক্রে কাকু-কাকিমা আজ এখানে। তুই ওদের বল, নিজেই বল... হ্যাঁ ন্যাচার্যালি খুশি হবেন।

মাউথপিসে হাত চাপা দিয়ে ঝিলিক এদিকে চেয়ে বলল কে আসবে? কাকু না কাকিমা, রিন্টু মালদা থেকে ফোন করছে, ডিসিশন নিয়েছে...

জড়বৎ বসে থাকেন শোভন-শোভনা। কী ডিসিশন রিন্টুর, যাতে ঝিলিক তাকে কনগ্র্যাচুলেট করে? কী সেই ডিসিশন যা শুনলে তাঁরা নাকি ন্যাচার্যালি খুশি হবেন? বুদ্ধিবৃত্তি-ম্যাচুওরিটি-জীবনবোধ? কী জীবনবোধের বার্তা শোনাবে রিন্টু, তাঁদের নয়নের মণি, একমাত্র আদরের সন্তান?